প্রেম অমনিবাস

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অনেকেরই মনে হয়েছিল, প্রেম-ভালোবাসার ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল। এই নির্মম, ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীতে মানুষে মানুষে পারস্পরিক বোঝা-পড়াই আসল কথা। পূর্বরাগ-প্রণয়-বিরহ ইত্যাদি প্রাচীন ধারণাগুলি নিয়ে মানুষ আর বাঁচতে পারবে না। আধুনিক কালের মানুষকে সব সময় রূঢ় বাস্তবের মোকাবিলা করে যেতে হবে। কল্পনা-বিলাসের আর স্থান নেই জীবনে। এই রকম বিশ্বাসে, নিখাদ প্রেম-ভালো-বাসার গল্প লেখাও বন্ধ করে দিলেন লেখকরা। যে-দু’চারজন লিখতেন তাঁদেরও পলায়নবাদী মনে করা হতো।

ক্রমে এই শতাব্দী যখন আরও একটু আধুনিক হলো, তখন বোঝা গেল যে, আধুনিক কালের মানুষও আসলে চিরকালের। জলকণার সাতটি বর্ণের মতনই স্নেহ, প্রেম, মমতা, দয়া, ঈর্ষা, অভিমান ও ক্ষমা, এই সব মনোবৃত্তি মানুষ কখনো ত্যাগ করবে না। মানুষ যেমন মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, তেমনই মানুষই মানুষকে ভালোবাসবে। হাজার রকম সমস্যা থাক, বেঁচে থাকার যত কষ্টই থাক, তবু কখনো কখনো এই বিশ্ব-সংসার তুচ্ছ করে এক পুরুষ ও এক রমণী পরস্পরের ভালোবাসার জন্য ব্যাকুল হবেই। শুধু পরস্পরকে চাওয়া কিংবা পাওয়া নয়, প্রেম তা ছাড়াও অনেক কিছু, যা ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না। বিশ্ব সাহিত্যে আমাদের প্রিয় বইগুলি মূলত প্রেম-কাহিনী। সব ক্লাসিক রচনাই, তার নিজের নিজের যুগে রোমান্টিক রচনা হিসেবে গণ্য হয়েছে।

আমি আজন্ম রোমান্টিক এবং নির্লজ্জভাবে প্রেমের বন্দনাকারী। এক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকার নীরব-গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকাই আমার কাছে আজও সুন্দরতম দৃশ্য বলে মনে হয়। সাহিত্য-রচনার শুরুতেই আমি কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে প্রধানত প্রেমের কথাই লিখেছি। সেই সব রচনা থেকে নির্বাচন করে প্রকাশ করা হল এই গ্রন্থ। এই বইয়ের পরিকল্পনা ও নির্বাচন সবই রাধানাথ মন্ডলের। দুঃসাহসী এই যুবকটি প্রেমের জন্য অনেক রকম ক্ষতি স্বীকার করতেও প্রস্তুত মনে হয়। দেখা যাক।

উপন্যাস

হে প্রবাসী

মায়া কাননের ফুল ★ সুপ্ত বাসনা

হীরকদীপ্তি

শকুন্তলা

গলপ

রাণী ও অবিনাশ ★ নীরার অসুখ ★ ভেতরের চোখ

কাঁটা ★ সিঁড়িতে ★ স্বর্গ দর্শন

কুকুরের ভাষা

কবিতা

হে প্রবাসী

এই কিছুদিন হলো বিল্ব দোতলা থেকে একতলায় নেমে এসেছে। দোতলার ঘরখানি ছিল দারুণ জানালাময়, সিঁড়ির ঠিক মুখেই, প্রচুর আলো হাওয়াযুক্ত সেই তুলনায় নিচতলার ঘরটি ছোট আর একদিকের দেয়ালে দুটি মাত্র জানলা। সবাই বলে পরস্পরবিরোধী জানলা না হলে সে ঘরে থাকার সুখ নেই। তবু, এটাকে যদি অধঃপতন বলা যায়, তাহলে এরকমটি বহুকাল ধরেই চেয়েছিল বিল্ব। সে বন্ধুদের বলে, স্বর্গ থেকে পতনের ফলেই মানব সভ্যতার যাবতীয় কাণ্ডকারখানা শুরু হয়েছিল, জানিস না?

দোতলার ঘরটিতে সে ছিল, আর দুই ভাইয়ের সঙ্গে, নিচের ঘরে সে একা। ঘরটি নিতান্ত তুচ্ছ নয়। একটি খাট, একটি বইয়ের আলমারি, একটি টেবিল ও একটি চেয়ার স্বচ্ছন্দে জায়গা করে নিয়েছে। জানলা দুটি পুরোনো আমলের হওয়ায়, সামনে বেশ চওড়া বেদী, তাতে বইপত্র রাখা যায়। বিল্ব অবশ্য অন্য কাজে লাগিয়েছিল। দিনের বেলাও যে ঘরটি একটু অন্ধকার সেটি বিল্বর পছন্দ। ফটফটে সূর্যের আলো চাই? সেজন্য তো যখন তখন রাস্তায় বেরিয়ে গেলেই হয়।

দরজা দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকে আলমারি ও টেবিল-চেয়ার, ডানদিকে খাট। একটিমাত্র আলোও ডানদিকের দেয়ালে, সেজন্য পড়াশুনোর ব্যাপারগুলো খাটে শুয়েই করতে হয়। যে কেউ বলবে, খাট আর টেবিল-চেয়ার দুদিকে বদলাবদলি করে নিলেই তো ভালো ছিল। এই কাজটি সোজা নয়, এর জন্য একটা যা-তা ধরনের অন্তত উদ্যম চাই। তাছাড়া, যারা এই উপদেশ দেবে, তারা কেউ মেপে দেখেনি যে আলমারি আর টেবিল দুটোকেই ডানপাশে আনলে একটা জানলা ঢেকে যায় কিনা। আবার এর যে কোনো একটিকে সরালে বাকি জায়গাটুকুতে খাটটা ধরে না। সুতরাং বিল্ব বেশ আছে। তাছাড়া, তার খাটে শুয়েই পড়তে বা লিখতে ভালো লাগে। রবীন্দ্রনাথ কাঠের চেয়ারে সোজা হয়ে বসে কৃচ্ছ্রসাধনার ভঙ্গিতে বসে লিখতেন প্রত্যক্ষদর্শীরা এ-রকম জানিয়েছেন। কিন্তু ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর চিঠিতে আছে যে তাঁর রবিকাকা যৌবনে বিছানায় বুকে বালিশ দিয়ে গীতাঞ্জলির টুকরো কবিতাগুলি রচনা করেছেন ধারাবাহিক দুপুরে। বিল্বর বয়েস তার চেয়েও কিছুটা কম।

ঘরটি পাওয়া গেছে এক দোকানদারের সৌজন্যে। বিল্বদের বাড়ির সামনের, রাস্তার দিকের, ঘরটি একটি মনোহারী দোকান। এর আগের দোকানদার দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে, নিজে এই পেছনের ঘরটিতে থাকতেন। তিনি প্রকাশ্যে অবিবাহিত ছিলেন। মাস তিনেক আগে কোনো এক অসুখে ভুগে তিনি আর নেই। কিন্তু অত্যন্ত সৌজন্য সহকারে তিনি এই ঘরটিতে মরেননি, সেই ব্যাপারটি তিনি চুকিয়ে ফেলেছিলেন জয়নগর মজিলপুরে।

বিল্বর বাবা দ্বিগুণ ভাড়ায় শুধু দোকানঘরটি আবার ভাড়া দিয়েছেন, কিন্তু দ্বিতীয় ঘরটি নতুন মালিক চায়নি, শোভাবাজারে তার পরিবার আছে। বিল্ব এক একদিন মধ্যরাত্রে এ ঘরের দেয়ালে প্রাক্তন দোকানদারের গায়ের গন্ধ পায়। তিনি লুঙ্গি পরতেন। ওঃ। এই সব মানুষ, বিল্ব ভাবে, যত তাড়াতাড়ি মরে ততই মঙ্গল। কবে যে পৃথিবী থেকে লুঙ্গি উঠে যাবে! বিল্বর বাবাও লুঙ্গি পরতে ভালোবাসেন।

পুরোনো আমলের বাড়ির স্বাভাবিক নিয়মবশতই একতলার ঘরের দেয়ালে ড্যাম্পের নানারকম ডিজাইন ফুটে থাকে এবং প্রায়ই বদলায়। কৈশোর এবং প্রথম যৌবনে যারা এই ধরনের ড্যাম্প লাগা ঘরে একা থাকবার মহান সুযোগ পায়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কবি হয়। যেমন বিল্ব।

একদিন রাত পৌনে এগারোটায় বিল্বর নবজন্ম হলো।

ট্রামের ভাড়া এক পয়সা বাড়াবার ফলে কলকাতায় একটি চমৎকার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। যখন তখন ট্রামে উঠে বলা ভাড়া দেব না! কেউ আপত্তি করে না। বারবার ট্রামে ঘোরাঘুরি করে ব্যাপারটা একটু ফিকে লাগে। কেউ আপত্তি করলে ঘুঁষি মারার জন্য হাতের মুষ্টি উদ্যত ছিল। কণ্ডাক্টরদের নিরুত্তাপ ব্যবহারের জন্যই বাধ্য হয়ে কলেজ ক্যান্টিনে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো ট্রাম পোড়াবার। ট্রাম পোড়ানো এত সোজা, বাসের মতন ঝামেলা নেই, ট্রাম তো আর ইচ্ছে মতন পালাতে পারে না। পেছন দিককার কেবল ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেই ট্রলিটা খুলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম অসহায়, তারপর যেখানে খুশি মারো শালা আগুন!

ঠনঠনের মোড়ে বিল্বও এরকম একটা খেলায় মেতে উঠেছিল। বেশ একটা শরীর চনমন করা উত্তেজনা। পরপর দুটো ট্রাম জ্বলছে,

বিল্ব তার বন্ধুদের সঙ্গে একটা ঝাঁপ ফেলা সেলুনের রকে বসে সিগারেট টানতে টানতে ঘন ঘন তাকাচ্ছে ডান দিকে বাঁ দিকে। সেলুনটা চেনা, এর মালিক এক 'ঠাকুর' ভক্ত। ইনি দোকানের নাপিতদের বলেন আর্টিস্ট। বিল্ব একদিন দুপুরে চুল ছাঁটাতে এসেছিল, মালিক তখন বলেছিলেন, আপনি একটু বসুন, আমাদের আর্টিস্ট বিড়ি খেতে গেছে!

বিল্ব মনে মনে ভাবছিল, কোনো ছুতোয় এই দোকানটায় আগুন লাগানো যায় কিনা। সেই সময় ডানদিকের ফাঁকা রাস্তায় বেশ দূরে দেখা গেল দুটি চলন্ত কালো বিন্দু। পুলিশের গাড়ি। নেমন্তন্ন বাড়িতে খেতে বসে মাংস না আসা পর্যন্ত যেমন একটা উসখুসে ভাব থাকে, সেই রকমই পুলিশের গাড়ির জন্য একটা অস্বস্তি ছিল। এবার ওরা নিশ্চিন্ত হলো। আধলা ইট তৈরি আছে। এর পরের দায়িত্ব নেবে বোম্বিং স্কোয়াড। বিল্ব অতিশয় ধুরন্ধর ছেলে, সে নিজের হাতে বোমা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে না, কেননা সে কবি, সে হুঙ্কার দেয় ও ইট মারে এবং পালায়।

ঝামাপুকুর লেন দিয়ে ছুটতে ছুটতে বিল্ব হঠাৎ বোধ করে যে সে একা। সামনে, গলির মোড়ে টিয়ার গ্যাস শেল সমেত বেঁটে বন্দুকধারী চারজন পুলিশ যেন অকস্মাৎ আকাশ থেকে নামে। পেছন দিকে বল্যাক মারিয়া বিল্ব নিজের চোখে দেখে এসেছে। এই সময় যে-কোনো বাড়িতে ঢুকে পড়ার জন্য সে প্রতিটি বাড়ির দরজায় ধাক্কা দেয়। প্রতিটি দরজা বিপুলভাবে বন্ধ। বিল্ব একবার ওদিকে একবার এদিকে, সে ক্রমাগত শুনতে পায় ক্রমাগত বুটের শব্দ, ক্রমাগত এত ভারী শব্দ যে কানে তালা লেগে যায়....। মৃত্যুর চেয়েও আহত হওয়ার ভয় বিল্বর বেশি। বিশেষত, যদি অন্ধ হতে হয়!

খাটাল উচ্ছেদ আন্দোলন তখন সবে শুরু হলেও মোটেই সার্থক হয়নি। তাই বিল্ব বেঁচে যায়। খাটালের দরজা থাকে না, তবু বিল্ব লাফ দিয়েছিল এবং একটি পা ভেঙেছিল। ঠিক ভাঙেনি, মচকেছিলই বলা যায়।

কোনোদিন বারোটা সাড়ে বারোটার আগে আলো নেভে না বিল্বর ঘরে। রাত দশটার পর বাড়ি ফিরলে টেবিলের ওপর ভাত ঢাকা থাকে। সেদিনও ছিল। কিন্তু যার পায়ে অসম্ভব ব্যথা, তার খিদে থাকে না। বিল্ব আধখানা ডিমের ঝোল খেয়ে ফেললো। তারপর খানিকটা ভাত

ও ঝোল থালায় মাখামাখি করে এমন একটা রূপ দেওয়া হলো যেন খুব একটা খাওয়া দাওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিল্ব খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গিয়ে সমস্ত ডাল-ভাত-তরকারি ফেলে দিল নর্দমায়। তিন বালতি জল ঢালতে হলো। বাড়ির আর সবাই ওপরে, নিচে বিল্ব একা।

বারান্দায় আলোটা জ্বেলে, ঘরের আলোটা নিভিয়ে সে এবার শুয়ে পড়বে, নিজের ভাঙা পাটাকে আদর করবে, পাজামার দড়ি আলগা করে দেবে, পাশ বালিশটাকে দুই উরুর মধ্যে প্রিয়তমার মতন জড়িয়ে নেবে, কিন্তু তার আগে একটি সমস্যা, বাঁ দিকের জানলা। বিল্বদের বাড়িতে পোষা বিড়াল নেই, সে নিজেরই বিড়াল।

প্রত্যেক দিন বাঁ দিকের জানলার ছেঁড়া জাল দিয়ে ইঁদুর ঢোকে। সদ্য রোমিও জুলিয়েট নামে নাটিকাটিপড়ার ফলে বিল্ব প্লেগ রোগ সম্পর্কে একটা রোমাণ্টিক ধারণা লালন করছে। সে কোনো ইঁদুরকে কাছে আসতে দিতে চায় না। সেইজন্য, প্রতি রাত্রেই সে ঘুমের আগে একটা ভাঙা খিল হাতে নিয়ে ইঁদুর মারার জন্য নৃশংস হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত একটাও মারতে পারেনি অবশ্য। কিন্তু ইঁদুর বিষয়ে সে এমনই মনোযোগী যে ওদের ওপরে সে একটা কবিতা লিখে ফেলেছে পর্যন্ত। অবশ্য কোনো এক দুর্বোধ্য কারণে সেই কবিতায় সে ইঁদুরের বদলে মুষিক শব্দটি ব্যবহার করেছিল।

কিন্তু আজ ব্যথাতুর পায়ে সে ঐ খেলাটি খেলতে পারবে না। ঘরের আলো নিভিয়ে দেবার পর, সে বাঁ দিকের জানলাটি আজ বন্ধই দেখবে ঠিক করলো। জানলা বন্ধ করতে এসে সে দেখালো একটি চলচ্চিত্র!

বিল্বর ঘরের পাশেই একটি গলি। গলির ওপরে একটি বড় বাড়ি। সেই বাড়িটি একটি মানবিক চিড়িয়াখানা। তার প্রতিটি ঘরে একটি করে ভাড়াটে। কারুর রান্নাঘর নেই, উঠোনে উনুন ধরিয়ে বারান্দায় রান্না। প্রতি সন্ধ্যাবেলায় ঐ বাড়ি থেকে তেরোটি উনুনে ধোঁয়া বেরোয়।

বিল্বর জানলা দিয়ে তিনটি ঘর দেখা যায়। একটি ঘর অন্ধকার। পাশাপাশি দুটি ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। একটি ঘরে সে স্পষ্ট দেখল, একজোড়া নারীপুরুষ বিছানার ওপর খবরের কাগজ পেতে খাবার খেতে বসেছে। বিল্বদের বাড়িতে এখনো এঁটো কাঁটার অনাবশ্যক বাছবিচার বলে এই দৃশ্যে সামান্য আকৃষ্ট হলো সে। বিছানার ওপর বসে বসে খাওয়াটা তো মন্দ নয়, বিল্ব নিশ্চয়ই একদিন একটা কোনো

রাজি করা মেয়ে পেলে এইভাবে খাবে। রাত্রিবেলা খবরের কাগজের কী অপূর্ব ব্যবহার!

মেয়েটির বয়েস যাই হোক না কেন, মুখখানা কিশোরীর মতন। সে জোড়াসনে না বসে একটা হাঁটু উঁচু করে তার ওপরে থুতনি রেখে খায়। পুরুষটি মধ্যবয়েসী, ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কসের (জুনিয়র) মতন গোঁফ। দু'জনেই নিঃশব্দ বা এত মৃদুস্বরে কথা বলে যে বিল্বর পক্ষে শোনা অসম্ভব।

পাশের অন্য ঘরে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে একটি বাচ্চা। বিছানায় শুয়ে বাচ্চাটি কেঁদেই চলেছে, কেঁদেই চলেছে। স্বামীটি পাজামা পরা, খালি গা। সে মশারি খাটাবার জন্য পেরেক ঠুকতে ব্যস্ত। স্ত্রীটি একবার ঘরের বাইরে যাচ্ছে আর আসছে। স্ত্রীটি গোলগাল ও পাঁচ ফুটের কম। কিন্তু তার পোশাক বিল্বর নিশ্বাস কেড়ে নেয়।

তার শাড়িটি বিছানার ওপর নদীর মতন ছড়ানো। ব্লাউজ নেই। শায়াটি টেনে তুলে বুকের ওপর বাঁধা। ওপর দিকে তার স্তনের অর্ধেক এবং নিচের দিকে তার হাঁটু থেকে নগ্ন। এরকম শায়াসজ্জা কখনো দেখেনি বিল্ব। স্ত্রীলোকটির নিচের দিকটা সে বেশি দেখতে পাচ্ছে না, ওপরের দিকে যা দেখেছে তাই যথেষ্ট। এর আগে কোনোদিন সে আলো নিভিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ায়নি এ সময়। সে এদের চেনে না।

পাশের ঘরের যুগলের খাওয়া হয় ধীরেসুস্থে। মেয়েটি থালা বাসন নিয়ে যায় বাইরে, পুরুষটি সিগারেট ধরায়। মেয়েটি দু'তিন মিনিটের মধ্যে বিছানা পেতে ফেলে, পুরুষটি প্রথম সিগারেট থেকে দ্বিতীয় সিগারেটে চলে যায়। এরা মশারি নিয়ে চিন্তিত নয়। পুরুষটি উরু চুলকোয়, মেয়েটি টুপ করে এসে যায় পাশের ঘরে। চিল কান্না-কাঁদা বাচ্চাটাকে তুলে নেয় খাট থেকে। এ ঘরের স্ত্রী ও পুরুষমানুষটি এই পাশের ঘরের মেয়েটির সঙ্গে নৈঃশব্দ্য ভাঙতে কথা বলে এবং নিজেদের টুকিটাকিতে ব্যস্ত থাকে। কিশোরীর মতন মুখ মেয়েটি শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে কান্না থামায়, তার মুখে তখন স্নেহের ডৌল, দেখায় পরিপূর্ণ ম্যাডোনার মতন, পাশের ঘরে তার স্বামীটি চতুর্থ সিগারেট ধরিয়ে শান্ত ভাবে বসে আছে। কোন ব্যস্ততা নেই। দুটি ঘরেরই অভিনয় এক-সঙ্গে দেখতে পাচ্ছে বিল্ব।

এক সময় এ ঘরের মশারি টাঙানো হয়ে যায়। অন্য ঘরের মেয়েটি

নিজের বুক থেকে শান্ত ঘুমন্ত বাচ্চাটিকে শুইয়ে দিয়ে মুখোজ্জ্বল করে হাসে। দুটো একটা কথা হয়। মেয়েটি বেরিয়ে এলে আলো নেভে।

মেয়েটি নিজের ঘরের দরজায় খিল দেয়। তার স্বামীর হাত থেকে সিগারেট নিয়ে এক টান দিয়ে ফেরত দেয় সঙ্গে সঙ্গে। তারপর ঠিক এক লহমার মধ্যে সে তার শাড়ি, ব্লাউজ, ব্রা, শায়া খুলে ফেলে। ঠিক যেন ঝড়ের বেগে। আবার স্বামীর কাছ থেকে সিগারেট নেয়, ধোঁয়া গড়িয়ে যায় তার নগ্ন বুকে।

বিল্ব প্রথমে মাথা নিচু করে ফেলে, তার শরীর কাঁপে, সে ভয়ও পায়। তার একুশ বছর বয়সে এই প্রথম একজন বাস্তব, জ্যান্ত, মাত্র কুড়ি ফুট দূরত্বের নগ্ন নারী। এই দৃশ্যটির জন্য সে ঠিক আট বছর ধরে প্রতীক্ষা করে আছে। যেন স্বপ্ন না হয় এই ভেবে সে আবার মাথা তুললো, খুব আস্তে আস্তে। এইটুকু রাত্রেই গলির জীবন একেবারে নির্জন, সে দেখলো, একটু আগের ম্যাডোনা এখন সমুদ্র থেকে উঠে আসা উর্বশী, মেয়েটি নিজেই ধরে আছে তার একটি স্তন, তার সরু কোমর, তার নাভি। আরও একটু দেখবার জন্য বিল্ব তার জানলার বেদীতে উঠে দাঁড়ালো।

সে প্রথমেই ধন্যবাদ দিল পুলিশকে। তার পা না মচকালে এই রাত্রি অন্য রকম হতো। সন্ধের একটু আগে, রাস্তার দুদিকে পুলিশ থাকার কারণে সে ক্ষণকালের জন্য অনুভব করেছিল মৃত্যুকে, তার বুক শুকনো হয়ে একরকমের শাঁ শাঁ শব্দ হচ্ছিল, আর এখন পৌনে এগারোটায় একটি সত্যিকারের নগ্ন নারী। তার জীবনে এই প্রথম, আগে বন্ধুরা সবাই গর্ব করেছে, কিন্তু বিল্ব মাথা নিচু করে থাকতো, সে শুধু ছবিতে ছাড়া....আজ এত কাছে এত সুন্দর, পৃথিবীতে এর চেয়ে সুন্দর আর কি আছে, বিল্ব নিশ্বাস বন্ধ করে আছে, বুকের ভেতরের দুপদুপ শব্দ বোধ হয় ওরা শুনতে পেয়ে যাবে, শুনতে পেল...

মেয়েটি হঠাৎ ঘরের আলো নিভিয়ে দিতেই বিল্ব আর পারলো না, সে নিজেরই ডান বাহুর নরম জায়গাটা কামড়ে ধরলো খুব জোরে হঠাৎ।

ভারত স্বাধীন হবার বছর দশেক পরে হঠাৎ দুমদাম করে নিত্য নতুন আইন প্রণয়িত হতে থাকে। লাল গোলাপপ্রিয় প্রধানমন্ত্রীর খুবই বিশুদ্ধ ও উদার হবার দিকে ঝোঁক। এই নব আইনের সুসংবাদ বিদেশী পত্রিকায় ছাপা হয়।

সেই সময় এমন একটি আইন পাশ হয়েছিল, যার সঠিক অর্থ তখনো কেউ বোঝেনি, এখনো বোঝে না, অবশ্য এখন আর কেউ তা নিয়ে মাথাও ঘামায় না। যা নিবারণ করা উদ্দেশ্য ছিল, এখন তা দিন দিন শশীকলার মতন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আইনটির নাম 'প্রিভেনশান অব ইমমরাল ট্রাফিক অ্যাক্ট।' সেই সময় একটি সংবিধান সংশোধন বিলে মে কিংবা শ্যাল ব্যবহৃত হবে, এই নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল প্রচুর। ব্রীফলেশ ব্যারিস্টারগণ তখন লোকসভার সদস্য হয়ে ইংরেজি ভাষা নিয়ে প্রচুর সময়ক্ষেপ করতেন। তাঁরই 'অবদান' আমাদের আইনটি। আমাদের বাংলা কাগজগুলিতেও প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে বিনা অনুবাদে এই ইংরেজি বাক্যবন্ধই প্রকাশিত হলো। ইমমরাল ট্রাফিক এই কবিত্বময় উৎপ্রেক্ষার মানে কী? সঠিক মানে না বুঝেই উত্তর কলকাতায় আশুতোষ অয়েল মিলের পাশের প্রসিদ্ধ বেশ্যালয়ের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অফিস ফেরত ট্রামযাত্রীদের মনে হয় এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। সোনাগাছিতে শুরু হলো এক্সোডাস। লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে যেমন একবার দেশে ধুম পড়ে গিয়েছিল যে যেখানে যত বিধবা আছে সবাইকে ধরে ধরে বুঝি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বিয়ে দিয়ে দেবে, ফলে যত দিদিমা, ঠাকুমা, পিসিমার দলও ফোকলা দাঁতে কান্না জুড়েছিল, ওগো একি ঘোর কলি কাল হলো গো, এবং সবাই লুকিয়ে ছিল ঠাকুরঘরে, সেই রকম এবার যত রাজ্যের ছুঁড়ি আর বেশ্যার দল ভাবলো, গভর্নমেণ্ট বুঝি তাদের গোবর খাইয়ে 'প্রাচিত্তির' করবে, ফলে বাদলের সময়কার পিঁপড়ের মতন সবাই পালালো গিয়ে নানান গর্তে। স্বয়ং গভর্নমেন্ট পর্যন্ত এ ব্যাপারে হতবাক।

বাংলার অনেক গ্রামে গঞ্জের দরিদ্র পরিবারে ফিরে এলো সমৃদ্ধশালিনী কন্যারা। অনেকে তাদের নোকর, তবলচি বা দালালদের মধ্যে কোন একজনকে মাস মাইনের চুক্তিতে স্বামী সাজিয়ে, ভদ্রলোক স্বামী–স্ত্রী হিসেবে ঘর ভাড়া নিল অচিহ্নিত পাড়ায়। সেখানে শুরু হল অনভ্যস্ত গৃহস্থালি। বৌবাজারের প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটের এক প্রৌঢ়া একদিন ধৈর্য হারিয়ে সটান হাজির হয়েছিলো মুচিপাড়া থানায়। সেখানকার ও সি সদ্য টেবিলের ওপর দাঁত খুলে রেখেছিলেন, হঠাৎ দেখলেন তাঁর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এক আকুল মূর্ধজা রমণী, চোখের

নিচে ঘুম-হীনতায় কালো, চিবুকের নিচে খানিকটা করুণ ছায়া। সেই রমণী বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে চেরা গলায় বললো, হ্যাঁগা সকলে বলাবলি করছে আমাদের পুলিশে ধরবে। তা ধরছে না কেন, আর কতদিন লজ্জা করবে? সাতদিন কেটে গেল, একটা খদ্দের আসে না, শেষে কি না খেয়ে মরবো? ধরতে হয় ধরো বাবা, আর কেন দেরি করছো? এ বয়সে আমি আর কোথায় যাবো?

মুচিপাড়া থানার ও সি তাঁর দারোয়ানকে ডেকে তৎক্ষণাৎ এই স্ত্রী-লোকটিকে বিদায় করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি কৌতুকপ্রবণ। তিনি তাড়াতাড়ি দাঁত পরে নিয়ে লালবাজারের টেলিফোন করলেন। তিনি বললেন হ্যাঁ স্যার, এইরকম ভাবে যদি সবাই আসে, বৌবাজারের রেড লাইট এরিয়ার সবাই যদি এসে পড়ে, তাহলে হাজত থেকে সব ক্রিমিন্যালদের ছেড়ে দিয়ে···তাও জায়গা হবে না,···অন্তত হাজার ছয়েক···আমিও কাগজে পড়েছি...। শোনা যায় লাল বাজারের বিভিন্ন দফতর ঘুরে শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ করা হয়েছিল পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি এই নিয়ে একটু ঘামালেন। ইম-মরাল ট্রাফিক, হুঁ। হেবিয়াস কর্পাস আছে। কোর্টে প্রোডিউস করে কোন্ চার্জশিট দেওয়া হবে? তিনি পরামর্শ চাইলেন আই জি-এর কাছে। আই জি বলটা ছুঁড়ে দিলেন তাঁর ওপরওয়ালা হোম মিনিস্টারের কোর্টে। হোম মিনিস্টার ছুটলেন চীফ মিনিস্টারের ঘরে! অকৃতদার চীফ মিনিস্টার বিখ্যাত কটুভাষী। তিনি প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, বয়েস কত?

—কার স্যার?

—তোমার বয়েস জিজ্ঞেস করিনি, মেয়েছেলেটির। বিভিন্ন প্রান্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে টেলিফোনে এই প্রশ্নটি যখন মুচিপাড়া থানায় এসে পৌঁছোলো, তখন পারুলবালা বসে আছে ও সি-র সামনের চেয়ারে। ইন্সপেক্টর,সাব ইন্সপেক্টর, জমাদাররা সবাই ঘরের মধ্যে ভিড় করে আছে,সকলেরই ঠোঁটে রসালো হাসি। পারুলবালার বয়েসের বার্তা ঘুরে তাতে পনেরো মিনিট সময় লাগলো। এই অবসরে মুখ্যমন্ত্রী যোজনা কমিশনের ফাইল দেখলেন ও কৃষ্ণনগরে গুলি চালনা বিষয়ে তথ্য নিলেন। তারপর মুখ তুলে বিরক্তভাবে বললেন, পঞ্চাশ বছর? বুড়ি বেশ্যা মাগীরা তো চির-কাল ঝিগিরি করে, তাই করতে বলে দাও....অফ দা রেকর্ড....সরকার কি বুড়ি বেশ্যাদের ধরে ধরে তারপর সারা জীবন বসিয়ে বসিয়ে

খাওয়াবে ? এ দেশটা কি রাশিয়া হয়ে গেছে ? অ্যাডভোকেট জেনারেলকে ডাকো।

অ্যাডভোকেট জেনারেল অসুস্থ ছিলেন, বাড়ি থেকে তিনি জানালেন কেন্দ্রীয় নতুন আইনটির পূর্ণ বয়ান এখনো পাওয়া যায়নি। শুধু সংবাদপত্রের রিপোর্টের ভিত্তিতে কিছুই বলা যায় না।

মুচিপাড়া থানায় পারুলবালা গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। শেষতম সংবাদের ভিত্তিতে ও সি তাকে জানালেন যে এখনো গ্রেফতারের সময় হয়নি। বাছা, তুমি নিজের ঘরে ফিরে যাও, যখন সময় হবে, তোমাকে জানাবো।

পারুলবালা দীর্ঘশ্বাস না ফেলে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল। এক খিলি পান কিনে সে চেপে বসলো একটি রিকশায়। বাড়ি পৌঁছে সে দোতলায় নিজের ঘরে রিকশাওয়ালাকে ডেকে নিয়ে এলো এবং বন্ধ করে দিল দরজা।

বিল্ব তিন চারবার বিছানা ছেড়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসেছিল বাঁ-দিকের জানলার কাছে। ওদিকে অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। কোনো শব্দ নেই। তবু কিছুক্ষণ আগে দেখা দৃশ্যটি ওখানে স্থির হয়ে আছে। একটি মঞ্চের দুটি ভাগ। এক ভাগে যে মেয়েটি ছিল মাতৃ-স্নেহে কোমল, অত্যন্ত জেদী-কান্নার শিশুকে যে মুহূর্তে শান্ত করে দিয়ে-ছিল, সেই মেয়েটিই নিজের ঘরে এসে বিদ্যুতের মতন নগ্ন হয়ে গেল। পূর্ণ আলোয় সে তার স্তন, কোমর, যোনি ও ঝকঝকে উরু মেলে ধরলো বিল্বর দিকে, মেয়েটি জানে না, সে এক নবীন যুবাকে নিয়ে গেল কোথা থেকে কোথায় !

বিল্ব দেখেনি, ঐ মেয়েটির স্তনদ্বয় খানিকটা অতিরিক্ত পৃথুলা। লক্ষ করেনি ওর তলপেটের ফাটা ফাটা দাগ। যে রূপের ঝাপটা লেগেছিল তার চোখে, তাতে তার মনে হয়েছিল, সুধাসাগর সেঁচে অকস্মাৎ আবির্ভূতা হয়েছিল ঐ নারী। তার একুশ বছরের জীবনে প্রথম দৈব উপহার। আজই বিকেলে তার বীরত্ব ও মৃত্যুকে এড়াবারও কৃতিত্বের জন্য এই উপহার তার প্রাপ্য ছিল। সে কৃতজ্ঞতায় নতজানু হয়ে বসে পড়ে। সে বঞ্চনা চেনে না। তার পায়ের ব্যথা সব উপে গেছে। সে তার কম্পিত শরীরটি নিয়ে প্রভূত আনন্দের মধ্যে লুটোপুটি খায়।

যুদ্ধের সময় দুটি বছর পূর্ব বাংলার গ্রামে কাটিয়ে বিল্ব পড়াশুনোয়

খানিকটা পিছিয়ে যায়, কিন্তু পল্লীনিসর্গের একটি অমর স্মৃতি বুকে গেঁথে রাখে। স্কুলে সে তার সহপাঠীদের মধ্যে ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী বয়স্ক, সতেরো বছরে ক্লাস টেন। সরস্বতী পুজো কমিটির অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি। সে রোগা ও লম্বা, কখনো লাজুক, কখনো বাচাল, কোনো বন্ধুর বোনের সঙ্গে তার নিভৃত ঘনিষ্ঠতা হয় নি, চিঠি বিনিময় হয় নি! তার জগৎ নারীবর্জিত। সমস্ত নারী শুধু বইয়ের পৃষ্ঠায়। সেজন্য তার খুব একটা অভাব বা দুঃখবোধ ছিল না, সে নির্লজ্জভাবে ছিল নিজের প্রেমিক, সে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত নিজেকে ভালোবাসতো। সে ভালো ছাত্র ছিল না, খারাপও ছিল না, অথচ সে বেশ পরিচিত ছিল। স্ট্রাইকের সময় লোহার গেটের সামনে সকলকে ছাড়িয়ে দেখা যেত তার ঝাঁকড়া-চুলো মাথা। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই, বয়ঃসন্ধিকালের ঠিকে অসভ্যতাগুলো সে একেবারেই শেখে নি, সে একটি খারাপ কথা উচ্চারণ করতো না কোনোদিন, খিস্তিপ্রবণ বন্ধুদের দিকে সে রক্তচক্ষে তাকাতো।

ক্লাস সেভ্‌ন থেকে ওপরের ক্লাসের সব ছাত্রের সরস্বতী পুজোর চাঁদা দু'টাকা করে। নিচের ক্লাসে যে যা দেয়। উঁচু ক্লাসের ছেলেদের জন্য খাতা আছে, নিচের ক্লাসে বিল্ব আর তিনটি ছেলে গিয়ে রুমাল পেতে ঘুরেছে, এগারো-রুমাল সিকি আধুলি বিকেলবেলায় গোনা হয়েছে স্কাউটরুমে বসে। গণনার সময় তার বন্ধু শুভব্রত কঠোরভাবে বিল্বকে বলেছিল, এইভাবে গোন্! অর্থাৎ পাঁচ সিকিতে এক টাকা। পাঁচ আধুলিতে দু'টাকা। এইভাবে তারা চার বন্ধু সরস্বতী পুজো উপলক্ষে প্রত্যেকে সাতান্ন টাকা করে উপার্জন করে। এই ব্যাপারটির জন্য বিল্ব শুভব্রতর কাছে খুব চওড়াভাবে কৃতজ্ঞবোধ করেছিল। কারণ বাড়ির ছেলে হিসেবে সে ছিল একেবারে নিঃস্ব, হা-ঘরে। এই প্রথম নিজের টাকা খরচ করার মৌলিক উত্তেজনায় সে সাতটি কবিতা লিখতে পারে। তার মধ্যে একটি কবিতার উপমায় ছিল গৌতম বুদ্ধের চোখ।

স্কুলটি ব্রাহ্ম পরিচালিত বলে মূল ভূখণ্ডে পুজোর অনুমতি ছিল না। বড় করে মণ্ডপ বাঁধা হয়েছিল বাইরে। আগের রাত্রে ছেলেরাই মণ্ডপ সাজাবে। সেই উপলক্ষে বিল্ব বাড়ি থেকে অনুমতি পেয়েছিল সারারাত বাইরে কাটাবার। কুমোরটুলি থেকে কিনে আনা হলো রঙিন কাগজের শিকলি, শোলার ফুল ও জরির ডাক-সাজ। আড়াইশো লাল-

নীল টুনী বাল্‌ব। পট করে ট্যাক্সি ভাড়া করে ওরা কয়েকজন ধর্মতলায় এসে নিজামে গোরুর মাংসের কাবাব-রোল খেল। সম্পূর্ণ আয়না মোড়া পানের দোকান থেকে খেল মশলা-সোডা, কেউ কেউ খেল পান এবং সিগারেটও, বিল্ব নয়। সে বিউগ্‌ল বাজায়, সিগারেটে দম কমে যাবে।

তারপর রাত্রির রাস্তায় এলোমেলো ঘোরাঘুরি। শেষ শীতের নরম বাতাস, পথে লোক নেই তবু আলোগুলি জ্বলে, হঠাৎ এক একটা রিকশা পাশ দিয়ে ছুটে গিয়েই অদৃশ্য হয়ে যায়, কোনো বাড়ির চার তলার ঘরে একটি স্ত্রীলোক উঁচু গলায় হাসে—এইসব কিছুর মধ্যে রয়েছে তীব্র আনন্দ। গায়ের আলোয়ান কোমরে জড়িয়ে বেঁধে বিল্ব লাফাতে থাকে। প্রেসিডেন্সী কলেজের সামনের বকুলগাছের ডাল সে ছোঁবে। পারে না। তার পায়ের তলায় পিষে যায় ঝরা-বকুল।

রাত আর কত হবে, আড়াইটে-তিনটে, বিল্ব হঠাৎ দেখেছিল প্রতিমা মণ্ডপে সে একা। সব কিছু সাজানো-গোছানো শেষ, কয়েক-জন বন্ধু ক্লান্ত হয়ে ফিরে গেছে তাদের কাছাকাছি বাড়িতে। নির্মল আর শুভব্রত দারোয়ানের খাটিয়া টেনে নিয়ে শুয়ে আছে বাইরের ফুটপাথে। বিল্ব একবার গিয়ে ওদের দেখলো, ওরা দুজনে গুটিসুটি মেরে শুয়ে রয়েছে একই আলোয়ানের তলায়, সেটা বিল্বরই। সে তো আর ঘুমন্ত বন্ধুদের গা থেকে আলোয়ান খুলে নিতে পারে না। সে তাহলে কী করে ঘুমোবে?

পর্দা সরিয়ে বিল্ব ফিরে এলো মণ্ডপে। এখন সে ইচ্ছে করলে হঠাৎ গানের রেকর্ড চালিয়ে সকলের ঘুম কেড়ে নিতে পারে। দয়াবশত সে ইচ্ছে করলো না। যেখানে পুরোহিতের বসবার কথা, সেখানে বিল্ব বসলো কুশের আসন পেতে। ভেতরটা ঝলমল করছে আলোয়। আর হোয়াইট শার্টিনের শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছেন দেবী সরস্বতী। পায়ের তলায় পদ্ম ও বিসদৃশ রকমের বড় রাজহাঁস। হাতে বীণা। তার চোখ ঠিক বিল্বর দিকে। বিল্ব যেদিকেই মাথা ঝোঁকায়, মূর্তির চোখ সেদিকেই যায়। এত আলো, এত স্তব্ধতা, এত বেশি রকমের রাত্রি, তার মধ্যে বিল্বর কাছাকাছি আর কেউ নেই। শুধু এই এক মাটির নারী। তাঁর গর্জনতেল মাখা ঠোঁট, তাঁর নিথর নিবদ্ধ চোখ, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, রক্তাভ হাতের পাঞ্জা, নকল মুক্তোর শোভিত কুচযুগ, তার কোমরের নিখুঁত খাঁজ ও উরু।

বিল্বর সমস্ত শরীরে একটা ঝাঁকুনি লাগলো। একবার চকিতে তার মনে পড়লো, ঘাটশিলায় বেড়াতে গিয়ে দেখা ছোট মাসির বান্ধবী দময়ন্তী নামের এক নারীকে, তার বুক ব্যথা করতে লাগলো।

বিল্বর মনে হলো, এই নিখিল বিশ্বে তার আর কেউ নেই। যদি কাল সকালেই সে মরে যায়, তার জন্যে কেউ কাঁদবে না। সে জন্যই বেঁচে থাকা সব কিছুকে ছিনিয়ে নেবার লোভ জাগলো তার। সে ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে সেই গর্জন তেল মাখা ঠোঁটে চুমু খেল। তারপর মুখটা সরিয়ে নিয়ে দেখলো তখনো সেই মূর্তির মুখ হাসি হাসি, তখনো তার চোখে চোখ।

কেউ দেখার নেই জেনেও বিল্ব ভয়ে ভয়ে একবার তাকালো পেছনে। পর্দা ফেলাই আছে। বিল্বর সারা শরীরের মধ্যে আগুনের ফুলকি ছোটাছুটি করছে। এবার সে নিবিড় আলিঙ্গন করে চুমু খেলো সরস্বতীর ঠোঁটে। বুকে হাত রাখলো। বাতাবী লেবুর মতন বুক। বিল্বর নিজের মুখ রাখলো সেখানে। তারপর পাগলের মতন চুমু খেতে লাগল কোমরে, উরুতে, আর সেই জায়গায়।

বিল্ব টিউশানি করতে যায় নিউ আলিপুরে। আর দেড় মাস বাদে অনার্স পরীক্ষা শুরু হবে। শুভব্রত ট্রাম আন্দোলনে জেলে গেছে। বিল্ব একটু খুঁড়িয়ে হাটে। সিকিটা অচল বলে ভবানীপুরের কাছে ট্রাম থেকে নামিয়ে দিল তাকে। আর পয়সা না থাকলেও বিল্ব পরবর্তী ট্রামে ঐ অচল সিকি দেখিয়ে আরও খানিকটা যেতে পারতো। তার পরের ট্রামে আরও খানিকটা। কিন্তু সে উঠলো না। হাঁটতে লাগলো। ছিপছিপে বৃষ্টি ছিল সারা সন্ধে, এখন বেশ জোর বৃষ্টি শুরু হলো, বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা ঠিক যেন ঝাটার মত সাফ করে দিল ব্যস্ত রাস্তাটি। এলগিন রোড পার হয়ে এসে ক্যাথিড্রালের পাশ দিয়ে বিল্ব শুধু একলা পথিক। নীল রঙের প্যাণ্ট, সাদা হাওয়াই শার্ট, পায়ে রবারের চটি, সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বিল্ব হাঁটছে, দুরন্ত হাওয়ায় মাখানো বৃষ্টি লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে তাকে, তবুও বিল্ব হাঁটছে আস্তে আস্তে, তার বুকভরা অকারণ অভিমান. তার পেটে দাউ দাউ করছে খিদে, সে বিড় বিড় করে কথা বলছে আপন মনে, তার যেন একটুও বাড়ি ফেরার তাড়া নেই।

বিল্বর এক বন্ধুর নাম দেবজ্যোতি। সে সাবান খায়, টুথপেস্ট খায়, কাঁচা ফুলকপি খায়, কপিইং পেনসিলের শিস খায়, নিজের

পেচ্ছাপ খায়, সর্ষের তেল খায়, সেদ্ধ বেগুনের বোঁটা খায়, বেগুনের ভেতরের পোকা খায়, ছেলেদের ঠোঁটে চুমু খায়, পানিফলের খোসা খায়, ইত্যাদি। এঃ, প্রত্যেকটা সত্যি বিল্বর নিজের চোখে দেখা।

বিল্বর বন্ধু দেবজ্যোতি একজন ক্ষণজন্মা সাধু। সে বি এস-সি পড়ে। সে থাকে রামমোহন হস্টেলের তিনতলার রাস্তার দিক, ডানদিকের ঘর। আই এস-সি পরীক্ষার সময় দেবজ্যোতি টুকলি করার মানসে ছোট্ট ছোট্ট কাগজে পিঁপড়ে হেঁটে যাওয়া অক্ষরে পাঁচ-খানা প্রশ্নের উত্তর লিখে নিয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে একটাও আসেনি। কিন্তু হঠাৎ এসে পড়েছিল ইনভিজিলেশান টিম। সেই কাগজগুলোকে গোতা পাকিয়ে দেবজ্যোতি টুক করে গলার মধ্যে ছুঁড়ে দিল এবং চিউইংগামের মতো অনেকক্ষণ বেশ তরিবৎ করে খেল। বিল্বর ঠিক পাশের সিটে।

তারও আগে অর্থাৎ ইণ্টারমিডিয়েট পড়বার সময়, যখন তাদের গায়ে সদ্য কলেজের গন্ধ, গ্রীন হর্ন, তখন বায়োলজি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে প্রথমবার যেই চিংড়িমাছ ডিসেক্ট করতে দেওয়া হল, অমনি ছাত্রদের মধ্যে একটা রঙের কোলাহল পড়ে গিয়েছিল। (উল্লাসের কোলাহলের বদলে রঙের কোলাহল লেখা হল। 'সারা গগনতলে তুমুল রঙের কোলাহলে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন।) বেস মেমরির মতন, কিছু কিছু জ্ঞান ছাত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকারক্রমে এসে যায়। অর্থাৎ চিংড়িমাছের পিঠ চিরে মামুলি শিরা-উপশিরাগুলি ডেমনস্ট্রেটরকে দেখিয়েই যে সেটা নিয়ে ছুটে যেতে হয় কাছেই মধুদার চায়ের দোকানে, সে-কথা ছাত্ররা জেনে গিয়েছিল প্রথম দিনই। বেশ বড়ো বড়ো বাগদা চিংড়ি। মধুদার চায়ের দোকানে সেগুলো ভেজে দিলেই বিনে পয়সায় ফ্রায়েড প্রন। এরকম চলছিল। ডিসেকশনের পর চিংড়ি মাছগুলো ছাত্ররা খেয়ে ফেলল না কোথাও ফেলে দেওয়া হল, তাতে কারুর কিছু যায় আসে না, তবু কলেজ কর্তৃপক্ষ একদিন দুষ্টুমি করলেন। সেদিন কাঁচা চিংড়িগুলো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে তারপর দেওয়া হল ছেলেদের পাতে। অর্থাৎ ট্রে-তে। এই উপলক্ষে একটা ধর্মঘট ডাকা যায় কিনা এ রকম একটা বেতার তরঙ্গ চলছিল ছাত্রদের ভুরুতে ভুরুতে, তখন মাইক্রোসকোপটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে প্র্যাকটিক্যাল রুমের ঠিক মাঝখানে দু'পা ফাঁক করে দাড়িয়ে দেবজ্যোতি বলল, আরে

ধুর। আমাকে অ্যাসিড দেখাচ্ছে। তারপর সে আস্ত, অ্যাসিড ভেজানো কাঁচা চিংড়িমাছটা টক করে ছুঁড়ে দিল মুখের মধ্যে।

এর পরপরই যে বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের ছাত্রদের চিংড়িমাছ শাস্ত্রবিষয়ে জ্ঞান অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ কর্তৃপক্ষের কোনো হাত নেই। তার কারণ ফরেন এক্সচেঞ্জ। যোগাযোগটা কাকতালীয়। সমুদ্রে স্তরে স্তরে আছে নানান তরঙ্গ। সেই তরঙ্গে ভেসে ভেসে চিংড়ির ঝাঁক ভ্রমণ করে জলের পৃথিবী। বঙ্গোপসাগরে এলে কেন যেন তাদের শরীরটা বেশ মিষ্টি হয়ে যায়। এদের রক্তে হিমোগ্লোবিন নেই, আছে হিমোসায়ানিন, তাই এদের রক্তের রঙ লাল নয়, নীল। এরা দশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের কাছাকাছি রোদকে ভালোবেসে ফেলে। বর্ষার সময়, এই বঙ্গোপসাগরের জলের লবণ আর সব সাগরের চেয়ে কম। সেই জলে সাঁতার কেটে কেটে চিংড়িরা মানুষের খাদ্য হবার জন্য নিজেদের আরো সুন্দরী করে তোলে প্রতিদিন। বঙ্গোপসাগরের চিংড়ির সুনাম রটে যায় দিগ্বিদিকে। পশ্চিম পৃথিবীর সাহেবসুবোদের ককটেল পার্টিতে এরা সগৌরবে নিজেদের স্থান করে নেয়, সেখানে এদের নাম হয় শ্রিম্প। কলকাতার বাজারে এদের দাম বাড়তে থাকে, বাড়তে বাড়তে একদিন অদৃশ্য হয়ে যায়। সুতরাং ছাত্রদের আর চিংড়িশাস্ত্র দরকার নেই, তার বদলে তারা ব্যাঙ কাটুক।

হস্টেলে দেবজ্যোতির রুমে প্রায়ই খুব ঝাঁঝালো আড্ডা বসে। তার রুমমেট মহীতোষ বড়োই শান্ত ও পেটরোগা। মহীতোষ ঘন ঘন দেশে চলে যায় বলে তার বিছানায় এসে দিনের বেলা শুয়ে থাকে বিল্ব লম্বা শরীরটা দ-এর মতন গুটিয়ে।

একদিন ঐ ঘরে যখন তুমুল আড্ডা, দেবজ্যোতি সর্বসমক্ষে কোমরের বেল্ট ও প্যান্টের বোতাম খুলতে লাগল। যেন ঘরের মধ্যে কেউ নেই, আপনমনে সে বলল বাথরুমে যাব। তারপর খালি গায়ে, আণ্ডারওয়্যার পরে দাঁড়িয়ে সেই আণ্ডারওয়্যারের দড়ি আলগা করতে করতে সে উচ্চকন্ঠে জানাল, দেখবি? একটা জিনিস দেখবি?

সে তার বাঁ হাতটা পেছনের দিকে চামচের মতন বাড়িয়ে দিয়ে আবার বলল, দেখবি, আমি আমার ইয়েও খেতে পারি।

দেবজ্যোতির মুখখানা অন্যরকম হয়ে যেতেই সকলে **'ওরেস শালা'** বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হুড়মুড় করে।

সকলের ঐ ভীত-প্রস্থানই প্রমাণ করে যে তারা সত্যিই বিশ্বাস করেছিল যে দেবজ্যোতি পারবে। সে সব পারে।

কাশীর বিখ্যাত ত্রৈলঙ্গস্বামী নিজের যে পশ্চাৎ-ফসল দিয়ে বিখ্যাত প্রাতরাশ করতেন বলে শোনা যায়, দেবজ্যোতিও তাই খেতে চেয়েছিল। তার অসাধ্য কিছু নেই।

এই দেবজ্যোতিকে হিংসে করে বিল্ব।

সদর দরজাটা খোলাই রাখতে হয়। তারপর একটি ছোট্ট চৌকো উঠোন। তারপর আর একটি দরজার এপাশে টানা অলিন্দ। কেউ বাড়িতে এল বা কেউ গেল, বোঝা যায় ঐ দরজার শব্দে। কখনো আস্তে শব্দ হয়, ব্যস্ত শব্দ, কখনো বা ফেরিওয়ালার খুট খুট। বিল্বর ধ্যান ভেঙে যায়। তার জ্বর, কপালে জলপট্টি, চিৎ হয়ে চোখ বুজে শুয়ে থাকে, অনেকক্ষণ স্তব্ধতা ও একাকিত্ব মিলেমিশে যাবার পর সে দেখতে পায় অচেনা জায়গা, অচেনা মানুষ, দিঘির পাশ দিয়ে একটা সরু পায়ে চলা পথ, এক বিধ্বস্ত রাজপ্রাসাদের মধ্যে দিয়েও নির্দ্বিধায় সেই পথ চলে গেছে, তারপর এক লিচুবাগান, বাদুড়ে ঠোকরানো লিচু ছড়িয়ে আছে কত। বিল্ব ওরকম জায়গায় কখনো যায়নি, কোনোদিন সে দেখেনি এক বিধ্বস্ত রাজপ্রাসাদের মধ্য দিয়ে মানুষের পায়ে পায়ে তৈরি রাস্তা, তবু কেন চোখ বুজে ঐ দৃশ্য? এ কি কোনো নির্মাণ? কিন্তু এক মুহূর্ত আগেও তো সে ভাবেনি।

খুব জোরে দরজায় শব্দ। বাবা। বিল্বর বাবা এ পৃথিবীর ব্যস্ততম মানুষদের একজন। মাসে একবার দু'বারের বেশি বিল্বর সঙ্গে মুখোমুখি দেখাই হয় না। কথা বিনিময় হলে সেটা ঐতিহাসিক ঘটনার মতন গণ্য।

এইজন্য বিল্বর জ্বর ভালো লাগে। জ্বরের মধ্যে শরীর ও মাথাটা কেমন যেন পলকা হয়ে যায়, তখন চোখ বুজে শুয়ে থাকলে, সে নিজে নয়, তার মস্তিষ্ক নয়, তার বন্ধ চোখের মধ্যে ছানার জলের মতন পাতলা নীল যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার দৃশ্যের পর দৃশ্য তৈরি করে, তখন তার শরীর অদৃশ্য হয়ে যায়, সে মিশে থাকে ঐ অভূতপূর্ব দৃশ্যের মধ্যে। এটা তার এক তীব্র নেশা। মাঠভরা সর্ষে ক্ষেতে ফুল ফুটে আছে, ঠিক একটা হলুদ জোয়ার, তার মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটছে একটি বালক, এই দশ-এগারো, এটা তার খেলা নয়, সে পালাচ্ছে কোথাও—অথচ এটা বিল্বর স্মৃতির পৃষ্ঠা নয়, সে কখনো দেখেনি

অতখানি ফুটন্ত সর্ষের ক্ষেত, ঐ ছেলেটির মুখও অবিকল কোনো অচেনা অন্য ছেলের মতন, তবু কেন চোখ বুজলেই সমুদ্রের ঢেউয়ে দাপাদাপি করার মতন, এক বালক সর্ষে ক্ষেতের মধ্যে ছুটতেই থাকে, ছুটতেই থাকে ?

কখনো কখনো দরজায় শব্দ হয়, অথচ কেউ আসে না। কারুর পায়ের শব্দ নেই। বিল্ব উৎকর্ণ হয়ে থাকে। তারপর সে, নিরালা দুপুরে, খাট থেকে উঠে বাইরে আসে, জলপট্টি খসে পড়ে যায় কপাল থেকে।

সে দেখে দরজাটা কিরকির শব্দে খুলে যাচ্ছে একটু একটু। কেউ নেই। হাওয়ায়।

'হাওয়া কি কেউ না ?'

একদিন সকালের দিকে একজন রোগামতন লোক সরাসরি একেবারে বিল্বর ঘরে এসে উপস্থিত। প্রায় ষাট-ছোঁওয়া বয়েস, ধুতির উপর ফুল শার্ট, মুখখানি খুব ছোট্ট, ঠোঁট লাল, নির্লজ্জ বাঙাল,ভাষায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা হরিনাথের বাসা ?

বিল্ব শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল, উঠে বসতে হল।

লোকটি চেয়ার টেনে নিয়ে আবার বললেন, তোমার নাম কী ? তুমি হরিনাথের বড়ো পোলা ? বাবা আছে বাসায় ?

বিল্ব বুঝতে পারল, ইনি কোনো গুরুজন শ্রেণীর লোক। বাঙালদের অসংখ্য আত্মীয় থাকে। লোকটি নিশ্চয়ই প্রণাম চাইছে, পা দু'খানা জোড় করা। বিল্ব অগ্রাহ্য করে গেল ব্যাপারটাতে। বসুন, বাবাকে ডাকছি।

সরাসরি ডাকার কথা বিল্ব মানে না। সে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ওঠে, প্রথম ঘরটিতে তার ছোটো বোন কৃষ্ণাকে পেল, বলল বাবাকে ডাক, কে একজন এসেছে।

এইসব ক্ষেত্রে, এরপর বিল্ব গায়ে জামাটি চড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের বাড়িতে বসবার ঘর নেই। আত্মীয়স্বজনরা যায় ওপরে। এই ধরনের আগন্তুক আসে খুব কম। কারণ, সবাই জানে, বিল্বর বাবাকে বাড়িতে পাওয়া যায় না। তিনি সকাল সাড়ে ছটায় বেরিয়ে পৌনে দশটায় ফেরেন, আবার পৌনে এগারোটায় বেরিয়ে ফেরেন রাত দশটায়। ছুটির দিন বিল্ব একদণ্ড বাড়িতে থাকে না। তখন দশটা বেজে দশ।

বিল্ব জামা পরবার আগে দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে নেয়, সিগারেটের প্যাকেট-ট্যাকেট আর অসমীচীন কোনো বই বাইরে ছড়ানো আছে কি না। সিগারেট–দেশলাই টেবিলের ওপর, লোকটি দেশলাইটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। ওগুলো সরাতে পারলে হত। তার আগেই লোকটি বলল, আমারে এক গেলাস জল খাওয়াবা ?

জল এনে দেবার আগেই সিঁড়ি দিয়ে দুদ্দাড় করে নামলেন বাবা। বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, অমূল্যদা ?

লোকটি দুই হাত তুলে একটি আর্তনাদ করলেন, হরিনাথ ! তারপর ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে খুব দাপটের সঙ্গে কেঁদে উঠলেন।

এই নাটকীয় ঘটনা বিল্বকে একটু থমকে দেয়।

বিল্বর বাবা বাক-কৃপণ, গম্ভীর এবং আবেগ গোপন করতে ভালোবাসেন। একজন বয়স্ক মানুষের কান্নায় তিনি ছেলের সামনে একটু বিব্রত বোধ করে ঠিক যন্ত্র-পুতুলের মতন একবার ডান দিকে একবার বাঁ দিকে তাকালেন। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে ব্যক্তিত্বে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে বললেন, বসুন অমূল্যদা, বসুন, কবে এলেন, সব শুনি—

তারপর ছেলের দিকে ফিরে বললেন, তোর মাকে বল, একটু চা করে দিতে। 'চা' শব্দটা উচ্চারণ করে তিনি তিন মুহূর্ত থেমেছিলেন। অর্থাৎ শুধু চা যেন না দেওয়া হয়।

লোকটি বললেন, আমি চা খাই না। আমি চা খাই না। আমি আজ তোমার এখানে ভাত খেয়ে যাব।

সংবাদটি মাকে জানিয়ে বিল্ব বাড়ি থেকে প্রস্থান করল।

পরবর্তী ঘটনাবলী খন্ড খন্ড ভাবে সে তার মা ও ভাইবোনদের কাছ থেকে জেনেছিল।

অমূল্য নামের ঐ লোকটি পূর্ববঙ্গে তাদের গ্রামের মুদি। কলকাতায় কোনো মুদির সঙ্গে কোনো মধ্যবিত্ত ক্রেতার ওরকম আলিঙ্গন ও কান্নাকাটি খুবই কষ্ট-কল্পনার বিষয়, কিন্তু গ্রাম-সম্পর্ক আলাদা। অনেক সুখদুঃখের কথা হল। এবং সেই সকালে তিনি বিল্বদের পরিবারের ভারসাম্যটি টলিয়ে দিলেন।

খেতে বসবার ঠিক আগে তিনি পকেট থেকে বার করলেন অনেকদিনের বিবর্ণ লম্বা লম্বা কাগজের ফালি। এই দেখো হরিনাথ তোমার বাবার সই, এই দেখো তোমার দাদা দেবনাথের, সব সন তারিখ দিয়ে লেখা, ওঁরা বলেছিলেন সুদিন এলে শোধ করে দেবেন, হায় সুদিন !

হরিনাথ, আজ আমি নিজেই পথের ভিখারি, নইলে কোনোদিন কি তোমাকে এসব কথা বলেছি ? মাত্র তিন হাজার দুশো বাইশ টাকা। এককালে আমি কতজনকে এরকম···

হরিনাথ স্থিরভাবে তাকিয়েছিলেন। তাঁর চওড়া মুখে কোনো দুঃখ-বোধ ফোটে না। তিনি সারাদিন ধরে ক্লান্ত থাকেন, সব সময়। অমূল্য মুদির কথা এমনই অস্বাভাবিক ও অবাস্তব যে, তিনি কোনো প্রতিবাদও করতে পারছিলেন না। কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেকার ঋণ....হরিনাথ ছাত্র বয়েস থেকেই কলকাতায়, পরে চাকরি পেয়ে নিজের বাবা-দাদাকে টাকা পাঠাতেন মাসে মাসে, বাবা বহুদিন নেই, দাদা এখন হরিদ্বারে সন্ন্যাসী, নিজের এখন বড়ো সংসার, ছেলেমেয়ে, ছোটো ভাই, বিধবা দিদি, সকাল সাড়ে ছটা থেকে রাত দশটা অবধি পরিশ্রম।

আপনি খেতে বসুন অমূল্যদা।

আগে কথা দাও। আমার কিছু নেই, বেলেঘাটার এক বস্তিতে উঠেছি, ঘরবাড়ি সব আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, তোমরা যদি কিছু কিছু দাও, এখানে আবার একটা দোকান···

আমার পক্ষে তা এখন অসম্ভব, অমূল্যদা।

তুমি বামুনের ছেলে হয়ে পিতৃঋণ অস্বীকার করবে, হরিনাথ ? অন্তত মাসে মাসে দুশো টাকা কি দেড়শো টাকা···

আপনি খেতে বসুন, অমূল্যদা। দেরি হয়ে গেছে, আমাকে এক্ষুনি বেরুতে হবে।

আগে একটা কিছু কথা দাও। তোমাকে কতটুকু বয়েস থেকে দেখেছি। কোলেপিঠে নিয়ে আদর করেছি। আজ সেই তোমার কাছে আমাকে টাকা চাইতে হচ্ছে, এ যে কত বড়ো লজ্জার, কিন্তু আমি ভিক্ষে চাইতে আসিনি হরিনাথ, আমি এক পয়সা সুদ ধরিনি···

আমি নিজেই যে বড়ো বিপদের মধ্যে রয়েছি, অমূল্যদা !

আমার থেকেও বেশি বিপদ ? তোমার তবু চাকরি-বাকরি আছে, আমি এসেছি একবস্ত্রে, তুমি যদি না দিতে চাও, আমি মামলা-মকদ্দমা করতে যাব না, সে সামর্থ্য নেই, সবই ছেড়ে দেব তোমার ধর্মের ওপর।

একটা দীর্ঘশ্বাস ! কাঁধ দুটো একটু নুয়ে যাওয়া। বসুন অমূল্যদা খেতে বসুন, দেব। যা আমার সাধ্য দেব কিছু কিছু, আস্তে আস্তে....

দুদিন পরে, সন্ধেবেলা কফি হাউসে খুব তর্কাতর্কি হয়েছে, রবীন্দ্র-নাথের মুণ্ডপাত করেছে বিল্ব, শঙ্খ ঘোষ নামের এক তরুণ কবির

কবিতা মুখস্থ শুনিয়েছে, তারপর বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে এসে তেলে-ভাজা ও মুড়ি, আবার হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির দিকে, রাত দশটা আন্দাজ নিজের ঘরে বসে সিগারেট ধরিয়ে, সন্ধেবেলা তর্কের সময় যে-সব কট প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি, এখন মনে মনে জ্বলন্ত ভাষায় সেগুলিই বলে যাচ্ছে....

মাঝের দরজায় দড়াম করে শব্দ, জুতোর মশমশ। প্রতিরাত্রে এই শব্দ সোজা দোতলায় উঠে যায়, আজ থেমে গেল বারান্দায়।

খোকা, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।

বিল্ব সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলল খাটের নিচে। ডান হাতটা পাখার মতন করে ধোঁয়া তাড়িয়ে উঠে এল চট করে।

বাবার গলার আওয়াজ অন্যদিনের তুলনায় ভাঙা ভাঙা। চোখের দৃষ্টিও অন্যদিনের মতন খর নয়। ক্লান্ত কাঁধ।

তোর পড়ার খরচ আর আমি টানতে পারব না, খোকা। আমার সামর্থ্য নেই। চাকরি-বাকরির চেষ্টা কর। রথীনবাবু বলছিলেন, ওঁদের অফিসে একজন স্টেনোগ্রাফার নেবে....

আ লবস্টার ইজ আ লেডি ফিশ।

সে মাসের গল্পভারতী পত্রিকার সাতান্ন পাতা খুলে দেবজ্যোতি বলল, এই দেখ আমার নিজের কাকা এই কাগজে লিখেছে। কাকার লেখা প্রায়ই ছাপা হয়।

বিল্ব জিজ্ঞেস করল, প্রবন্ধ ?

না রম্যরচনা বলে একে। কাকা বলছিলেন, আজকাল এই নতুন নামটা বেরিয়েছে, রম্যরচনা।

বিল্ব লেখাটায় দ্রুত চোখ ছুটিয়ে গেল। চিংড়িমাছ লেডিও নয়, মাছও নয়। এই বিষয়ে প্যানপেনিয়ে পাঁচ পাতার লেখা। লেখকের নাম দেবপ্রিয় মজুমদার।

পত্রিকাটা আমাকে দু-একদিনের জন্য দিবি দেবজ্যোতি ? নৃপেন্দ্র-কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখাটা পড়ব।

তোদের বাড়িতে এ পত্রিকা রাখে না ?

আমাদের বাড়িতে কোনো পত্রপত্রিকাই রাখা হয় না।

'দেশ'ও রাখিস না ?

বললাম তো, আমরা খবরের কাগজও রাখি না।

তোরা এত গরিব কেন রে বিল্ব? গরিবদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। গরিবদের মন ছোট হয়।

বিল্ব হাসল। দেবজ্যোতির মা নেই, বাবা নেই। ওর কাকা আর দুই মামা ভাগাভাগি করে হস্টেলে থাকবার খরচ দেয়। মাকে মেরে ও জন্মেছিল, মাতৃস্নেহ কাকে বলে জানেই না।

তোদের বাড়ির সকলের নাম বুঝি দেব দিয়ে?

হ্যাঁ। আমার বাবার নাম ছিল দেবদুর্লভ, হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা, নামটা শুনলে তোর কী মনে হয়? সত্যিই দেবদুর্লভ নাম ছিল। আমার জ্যাঠামণির নাম দেবনন্দন, দুই জ্যাঠতুতো দাদার নাম দেবশঙ্কর আর দেবাশিস।

বেচারা তোর কাকা।

কেন?

সবচেয়ে খারাপ নামটা পেয়েছেন।

দেবপ্রিয় নামটা খারাপ?

দেবানাং প্রিয়, দেবপ্রিয়। ডিকশানারি খুলে দেখে নিস, ওর মানে হল মূর্খ।

সত্যি?

বললাম তো, দেখে নিস।

তুই সায়েন্স পড়তে এলি কেন রে বিল্ব? আর্টস পড়তে পারলি না?

একটা ছিল রাজপ্রাসাদ, বুকের মধ্যে
পায়ে চলার পথ
হালকা নীল অরণি বন, খানিক দূরে নদী
উর্বশীর উরুর মতো রৌদ্রমাখা জল···

এই পর্যন্ত লিখে বিল্ব থামল। উর্বশীর উপমাটি দিয়ে সে খুব রোমাঞ্চিত। অনেকদিন আগে সে অভিধানের মধ্যে একটি দু অক্ষরের অসভ্য কথা দেখে শিউরে উঠেছিল। ছাপার অক্ষরের মধ্যেও যেন ঝাঁক ঝাঁক বুলেট থাকে। হঠাৎ এসে বুকে লাগে। ঐরকম একটা সাংঘাতিক কথা দিব্যি অভিধানের মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে শুয়ে আছে। সেই রকমই উর্বশীর উরু, একটু আগেও মনের মধ্যে ছিল না। এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, পারস্য—ছুরিকার মতন ঝকঝকে, উর্বশী এইমাত্র জলের

মধ্যে নগ্ন করলেন তাঁর উরুদেশ...বিল্ব নিজের পা–জামার দড়ি আলগা করে দিল....রোদ্দুর দিয়ে উর্বশী মাজছেন তাঁর উরু। আশ্চর্য, এই সঙ্গেই বিল্বর মনে পড়ল চাইবাসার হাটে সে দেখেছিল এক সাঁওতাল রমণী, এক ঝলকের জন্য হঠাৎ তার উন্মুক্ত উরু, সম্পূর্ণ নিস্পৃহভাবে ছেকাছেনি ভাষায় কথা বলতে বলতে সে চলে গেল রোরো নদীর দিকে .. উর্বশীর রঙ কি সাঁওতাল রমণীর মতন শ্যামলিম, না, তা হতে পারে না, যাকগে, ঐ যা ঠিক আছে।

লাইনগুলো প্রথম থেকে আর-একবার সে পড়ল। প্রথম কমা-টা রাজপ্রাসাদের পরে, না বুকের মধ্যের পরে দিলে ভালো হয়? রাজ-প্রাসাদটা বুকের মধ্যে না পথটা রাজপ্রাসাদের বুকে? দু'বার দু'জায়গায় কমা-টা সরিয়ে শেষ পর্যন্ত সে তুলেই দিল একেবারে। কমা'র দরকার নেই।

অরণি বন? সত্যের খাতিরে লিচুবাগান দেওয়া উচিত। তা হলে ছন্দও ঠিক থাকে। কিন্তু কিসের সত্য? বাস্তবে তো ওরকম কোন লিচুবাগান দেখেনি বিল্ব। আর দেখলেই বা কী, যা দেখবে তা যে লিখতে হবে, এমন কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি। অরণি বন লেখার জন্য তার খুব লোভ হচ্ছে। থাক না। অরণি বন কথাটা হয়? গ্রামা-টিক্যালি কারেক্ট? অরণি কাষ্ঠ শুকনো হয় না? কিন্তু সব গাছের কাঠ কি অরণি হয়? তা হলে অরণি কাষ্ঠ বলে কেন? আম কাঠ জাম কাঠের মতন অরণি কাঠ। তাহলে অরণি বন হবে না কেন?

লিচু বাগান-এর মধ্যে ল আর ন আছে। তার আগে হালকা নীল-এর মধ্যেও তাই। সুতরাং ধ্বনির দিক থেকে মানায়। 'হালকা নীল লিচু বাগান,' হ্যাঁ, এটাই ভালো—

অরণি বন কাটতে গিয়েও থমকে গেল বিল্ব।

অরণি বন–এর মধ্যে আছে দুটো দু'রকম ন। হালকা নীল-এর পরে আরো দুটো ন'-এর ধ্বনি....

মা ডেকে বললেন, এই খোকা, বাজারে যাবি না?

যাচ্ছি।

বিল্ব উঠে পড়ল। বাজারের থলি আর টাকা। মা বললেন, কাঁচা হলুদ আর আদা আনতে যেন ভুল না হয়। চৈত্রমাস পড়ে গেছে। পক্স হচ্ছে চারদিকে।

বাজার করতে বিল্বর মোটেই খারাপ লাগে না। কবিতা লেখার

চেয়ে মোটেই খারাপ নয়। অন্তত চার আনা পয়সা উপার্জন হবে। ধর্মপথে, কেননা, বিল্ব মাকে ঠকাবে না, ঠকাবে দোকানদারদের।

ডুমুর সব সময় কাঁচা কিনতে হয়, পাকা ডুমুর অস্বাস্থ্যকর। কাঁচ-কলা গাছের খোড় নিতে নেই। মোচার ফুল দাঁতে কেটে স্বাদ নিয়ে দেখতে হয়, নইলে তেতো মোচা গছিয়ে দেয়। মাছের গা চকচকে না হলে বুঝতে হবে সে মাছ টাটকা নয়।

অরণি বন না লিচু বাগান?

অরণি বনের পর আছে খানিক দূরে। খানিক-এ আর একটা ন। এটাই ভালো।

অবশ্য, লিচু বাগান লিখলে, খানিকটা কেটে অল্প করা যায়। হালকা নীল লিচু বাগান অল্প দূরে নদী। এখানে একটা অতিরিক্ত ল পাওয়া যাচ্ছে। ল ধ্বনি ভালো, না ন?

বাঁশপাতা মাছ সাতটাকা কিলো হলে, সাড়ে তিনশো কত হয়? বিল্ব মাছওয়ালার দিকে তীব্র চোখে চেয়ে আছে। দু'টাকা পঁয়তাল্লিশ। পাঁচ পয়সা খুচরো নেই, দু'টাকা চল্লিশে হবে?

পাঁচ পয়সা আয় হল। এভাবেই অন্তত চার আনা।

কী যেন নিতেই হবে? আদা, আর? পেঁয়াজ, না? রসুন, না? মনে পড়ছে না। কতবেল? পাঁচফোড়ন? না, না। কুমড়ো ফুল? বকফুল, দুতছাই। অরণি বন না লিচু বাগান?

কাঁচা হলুদ! কোথায় পাওয়া যায় কাঁচা হলুদ? মশলার দোকানে না সবজির দোকানে?

চেনা দু'জনের সঙ্গে দেখা হল বাজারের মধ্যে। পাড়ার লোক। এমন হয়। টুকটাক কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে বিল্ব, আর ভেতরে ভেতরে বিড়বিড় করছে অরণি বন না লিচু বাগান? দুদিন বাদেই হয়তো এই কবিতাটি এতই অপছন্দ হবে তার যে সে ছিঁড়ে ফেলবে, কেউ জানতেই পারবে না এর অস্তিত্ব, তবু আজ সকালবেলা মাথার মধ্যে থেকে এর মুক্তি নেই।

বারোটার সময় বিল্ব একজায়গায় ইন্টারভিউ দিতে যাবে, খেতে বসেছে। মা বাঁশপাতা মাছ ভাজছেন। এদিকে বিল্বর ডাল তরকারি খাওয়া হয়ে গেছে, থালায় আধখানা চাঁদের মতন ভাত। চাকরিটা পেলে বিল্ব নিয়েই নেবে, কী হবে আর পড়াশুনো করে? বোগাস। চাকরি

মানেই স্বাধীনতা! কথাটা শুনতে অদ্ভুত চা-ক-রি! অথচ তার সঙ্গে স্বা-ধী-ন-তা! হেঃ!

কড়াইতে তেল ছাড়া হয়েছে, তেল গরম হবার একটা শব্দ, তারপর ছ্যাঁক করে বাঁশপাতা মাছ ছাড়া হল, আর কতক্ষণ লাগবে? বেশি দেরি হলে....ঠিক বারোটার মধ্যে...অথচ মাছ না খাইয়ে মা....

বিল্ব অধৈর্য হয়ে থালায় আঁকিবুকি কাটতে লাগল আঙুল দিয়ে। অরণি বন না লিচু বাগান?

শোভাবাজারের রাজা উপাধিধারী বিখ্যাত দেবদের আগ্রহে একসময় কাছাকাছি এলাকায় বহু জ্যোতিষী ও কবিরাজদের বসতি হয়েছিল। যেমন ঠাকুর, মল্লিক বা দত্ত প্রভৃতি সম্ভ্রান্তদের সৌজন্যে স্থাপিত হয়েছিল সোনাগাছি। গ্রে স্ট্রীটে তখনো কিছু জ্যোতিষী ও কবিরাজ রয়ে গেছে। এঁদের মধ্যে একজন লাভলীমোহন।

ব্রিটিশ আমল থেকেই কলকাতায় কিছু ছেলে-ধরা প্রতিষ্ঠান ছিল। এদের আবার পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা। ছাত্ররা যাতে রাজনীতির দিকে না ঝোঁকে সেই উদ্দেশ্যে প্রভুভক্ত, আই, সি, এস গুরুসদয় দত্ত শুরু করেছিলেন ব্রতচারী আন্দোলন। সেই একই উদ্দেশ্যে বেডেন বাওয়েল প্রতিষ্ঠিত বয়েজ-স্কাউট আন্দোলনও এদেশে খুব ছড়ায়। ছেলেমেয়েরা যাতে অন্যদিকে মন না দেয়, মা-বাবা নিশ্চিন্ত হতে পারে। ওদিকে জোরদার মুসলীম লীগ, এদিকে গজিয়ে উঠল আর, এস, এস। স্বাধীনতার পর এগুলি চলতে লাগল আর এক প্রতিক্রিয়া হিসেবে মিনমিনে স্বদেশীবোধ নিয়ে মণিমেলা, সব পেয়েছির আসর, ভ্রাতৃ সংঘ, মিলন সংঘ, আমরা সবুজ ইত্যাদি। এমনকি কম্যুনিস্ট পার্টির উদ্যোগে কিশোর বাহিনী। কুচকাওয়াজ, প্রভাতফেরী আর সমস্বরে গান, কয়েকজন দাদার দাদাগিরি।

বিল্ব পর্যায়ক্রমে এর মধ্যে প্রায় সবকটি প্রতিষ্ঠানেই ঘোরাঘুরি করেছে। কিছুদিনের জন্য যায়, ছেড়ে দেয়, আবার যায়, তারপর হঠাৎ অন্য একটিতে। প্রথমে সে ছিল বয়েজ-স্কাউটে, সেখান থেকে এক আড়কাঠি তাকে নিয়ে আসে আর, এস, এস-এ। গান্ধী হত্যার পর পুরো নামটি গুপ্ত করে শুধু সংঘ বলা হত। এক একটি স্থানীয় ইউনিটের নাম শাখা। এখানে একটি লাঠির মাথায় তোলা হয় গেরুয়া পতাকা, নিচের বেদীতে থাকে একটি বাঁধানো ফোটোগ্রাফ, একটি গুম্ফবান বলিষ্ঠ ব্যক্তির সেই ছবির গলায় মালা। এই ব্যক্তির নাম

হেডগেয়র, ইনি মারাঠী, ইনি শিবাজীর আদর্শে ভারতে আবার হিন্দু-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এখানে শোনানো হত বীর সাভারকরের জীবনীর চুটকিলা এবং শেখানো হত লাঠি ও তলোয়ার খেলা। ঐ তলোয়ার খেলার দিকেই বিল্বর প্রধান আকর্ষণ। চামেচা, বাহেরা···। আসল তলোয়ার নয়, ছিপছিপে, তেল মাখানো বেত এবং চামড়ার ঢাল। চামেচা, বাহেরা....একটি ক্লাস এইটের ছেলে সেই বেতের তলোয়ার হাতে নিয়েই রাণা প্রতাপ। হো নীল ঘোড়া কা সওয়ার। কিংবা রিচার্ড দা লায়নহার্টেড...ছদ্মবেশে ঘুরতে ঘুরতে জঙ্গলের মধ্যে এক ডাকাতের সামনে...রব ইন দা উড···

সংঘের হেড কোয়ার্টারের নাম 'নিবাস'। একদিন সেখানে গিয়ে বিল্ব দেখল সত্যিকারের ঢাল-তলোয়ার। সে সারা শরীরময় উত্তেজনা নিয়ে বলল, আমি তলোয়ারটা একবার হাতে নিতে পারি? একটি গম্ভীর কণ্ঠ তাকে জানাল, নিতে পারো, কিন্তু তার আগে তোমার আঙুল কেটে দুফোঁটা রক্ত দাও। সঙ্গে সঙ্গে বিল্ব বাড়িয়ে দিল তার বাঁ হাত। সেই গম্ভীর কণ্ঠ আবার জানাল, উঁহু, বাঁ হাত নয়, দক্ষিণ হস্ত। এই অবিচারে বেশ ক্ষুব্ধ হল বিল্ব। বাঁ হাত আর ডান হাতের রক্ত কি আলাদা? শুধু শুধু ডান হাত কাটার কোনো মানে হয়? সে পেছিয়ে গেল লাজুকভাবে। তখন দু তিনজন হামবার্গ তাকে বলল, ছিঃ, তুমি ভীরু, কাপুরুষ, তুমি ভারতমাতার সন্তান হবার...। অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বিল্বকে দিতে হল ডান হাতটা, ধারালো ক্ষুর এগিয়ে এলো তার তর্জনীর দিকে, বিল্ব ভয়ে চোখ বুজলো এবং চেঁচিয়ে উঠলো, আঃ। সে কাপুরুষই, তবু এরপরও সে রক্তমাখা হাতে চেপে ধরল তলোয়ারটি।

কিন্তু হিন্দু বীর হওয়া তার হল না। দু'মাস বাদেই তার বন্ধু শুভব্রত তাকে নিয়ে গেল কিশোর বাহিনীতে। সেখানে একটি রোগা লম্বা চেহারার যুবক মাঝে মাঝে এসে খুব দৌড়াদৌড়ি করে খেলত সকলের সঙ্গে। বেশ কিছু পরে সে যক্ষ্মায় মারা গেলে জানা গিয়েছিল, সেই সুকান্ত ভট্টাচার্যই একজন বিরাট কবি।

বয়েজ-স্কাউটে থাকার সময় বিল্ব গান শিখেছিল: জন ব্রাউনস্ বডি লাইজ আ মোর্নিং ইন দা গ্রেভ···হিজ সোল ইজ মার্চিং অন।

সংঘের গান: হাম হিন্দু হোকে হৃদয়মে হরদম নিশানা ভাগোয়া বরকর আ হ্যায়...

কিশোর বাহিনীতে ঃ নাকের বদলে নরুন পেলাম টাক ডুমাডুম ডুম। জান দিয়ে জানোয়ার পেলাম লাগল শেষে ধুম।

ব্রতচারীতে ঃ চল কোদাল চালাই/ভুলে মানের বালাই/ঝেড়ে অলস মেজাজ/হবে শরীর ঝালাই...

সব মিলিয়ে এক কালচারের জগাখিচুড়ি।

কিশোর বাহিনীতে থাকতে থাকতেই বিল্ব কিছুদিনের জন্য অভিযাত্রী সংঘের মেম্বার হয়। তাদের পাড়ার একটি ছেলে তাকে বলেছিল তোর স্বাস্থ্য তো ভালো, তুই আমাদের ক্লাবে বিউগ্ল বাজাবি?

বিউগ্ল শব্দটি তখন তলোয়ারের চেয়েও বেশি রোমাঞ্চকর লাগে। যুদ্ধ....ওয়াটার্লুর ছাউনির সামনে মেঘলা ভোরবেলা...বুকের ওপর ডান হাত রেখে পায়চারি করছেন নেপোলিয়ন···অল্প দূরে এক তরুণ এনসাইন বাজাচ্ছে জাগরণ গীতি....বিশ্ব রাজি হয়ে গেল।

এই অভিযাত্রী সংঘের সভাপতি লাভলীমোহন শাস্ত্রী। ইনি একই অঙ্গে দুই, অর্থাৎ জ্যোতিষী ও কবিরাজ। দারুণ রবরবা। গ্রে স্ট্রীটের ওপর দুই মহলা বাড়ি। সোম ও বৃহস্পতিবার ইনি ক্লাব নিয়ে মেতে থাকেন। ক্লাব মানে ব্যাণ্ড পার্টি, আট দশটা কেট্ল ড্রাম, ছটা ব্যাগ পাইপ, একটা বিগড্রাম, একটা ঝাঁঝর ও একটা বিউগ্ল। গোটা কুড়ি পঁচিশ ছেলে সোম ও বৃহস্পতি এগুলি নিয়ে প্র্যাকটিসের ধুমধাড়াক্কা করে পাড়ার লোকদের হাড় পিত্তি জ্বালিয়ে দেয়। ধুতির ওপর ফতুয়া পরা কোবরেজমশাই তাঁর ঝকঝকে চুলহীন মাথাটি ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সেটা খুব উপভোগ করেন। বিলাতি সংগীতের প্রতি তাঁর এই অনুরক্তির কারণ ঠিক বোঝা যায় না। সপারিষদ শ্রীগৌরাঙ্গের মতন তিনি মাঝে মাঝে হঠাৎ ছেলেদের মধ্যে এসে দু'হাত তুলে নাচতে নাচতে বলেন, বাজাও, আরো জোরে, আরো জোরে। নাচতে নাচতে তাঁর কোমরের ধুতির গিঁট আলগা হয়ে যেত। তখন একহাতে ধুতি মুঠো করে ধরে আর এক হাত তুলে...

কুলোকে বলত, ঐ সময় মোদকের নেশা করে তুরীয় অবস্থায় তিনি থাকতেন। কোকেন খেলে যে রকম দেয়ালের চুন চাটার ইচ্ছে হয়, সেই রকম মোদক খাবার পর উচ্চ গ্রামের বিলিতি শব্দের প্রতি আকর্ষণ জাগে কিনা, সে সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

অনেকের ধারণা, বিউগ্ল বাজালে টি বি হয়, তাই ক্লাবের কেউ ওটা নিতে চায়নি। টি, বি'র ডাক নাম থাইসিস। তখন থাইসিস

খুব বাজারে চলছে। অধিকাংশ রোমান্টিক বাংলা উপন্যাসের নায়ক বা নায়িকা এ রোগে ভুগছে। সোনার মতন উজ্জ্বল হলুদ রঙের বিউগ্‌লটি দেখে বিল্ব এমনই মুগ্ধ হয়ে গেল যে রোগের ভয় তার মাথাতেই এলো না। স্নেহময় আঙুলে সে ঐ জিনিসটাকে আদর করে। এবং প্র্যাকটিস করার কারণে সে ওটাকে বাড়িতে নিয়ে যাবার অনুমতি পেল।

ভোরবেলা উঠে বিল্ব ছাদে চলে যায়। কিছুক্ষণ দূরের সবুজ গাছ-পালার দিকে তাকিয়ে থাকে কটমট করে। স্থির দৃষ্টি, একটু পরেই তার চোখে জল আসে। এই রকম ব্যায়াম করলে দৃষ্টিশক্তি ভালো হয়। পি, সি, সরকার তাঁর সরল জাদুবিদ্যা বইতে লিখেছেন, যারা সম্মোহন শিখতে চায় তাদের আগে এক ঘন্টা চোখের পলক না ফেলে কোনো গাছের দিকে তাকিয়ে থাকা রপ্ত করতে হবে।

প্রথম প্রথম বিউগ্‌লে কোনো শব্দ বেরুতে চায় না। ঠোঁটে চেপে ধরে যত জোরেই ফুঁ দেওয়া হোক, শুধু গালটাই ফুলে যায়, গালটা ফুলতে ফুলতে এমন অবস্থা হয় যে মনে হয়, এক্ষুনি ফেটে যাবে। বিউগ্‌ল বাজবার কোনো নামই নেই। তারপর হঠাৎ একদিন ভ্যাঁ করে একটা শব্দ হয়। সাতদিনের মধ্যে বিল্ব শিখে যায় প্রথম গৎ, টি টিট টি টি-ই-ই, টি টিট্‌ টি টি ই-ই-ঈ-ঈ, টি-টি-টি, টি-টি-টি টি টিট টি-টি-ই-ই।

পরেশনাথের মিছিলে অভিযাত্রী সংঘ একবার তাদের ব্যাণ্ড বাজিয়ে এল। তারপর নেতাজীর জন্মদিনে প্রভাতফেরিতে। দলের ঠিক মাঝখানে বিল্ব, সাদা ফুলপ্যান্ট, সাদা শার্ট, সাদা কেডস্‌, মাথায় হাই-ল্যাণ্ডার টুপি, ব্রাসো দিয়ে মাজা ঝকঝকে বিউগ্‌ল লাল সিল্কের কর্ড দিয়ে বাঁধা, দুলছে গলা থেকে, বিল্ব হাঁটছে স্লো মার্চে, বাজাবার সময় সে পা দুটো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় সামনের দিকে... রাস্তার দুপাশের বারান্দা-গুলি থেকে কত লোক তাকে দেখছে....। ঐ যাচ্ছে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিউগ্‌লার বিল্ব চ্যাটার্জি, কী স্মার্ট....।

ফেরা

ছোটোমামার বিয়ে উপলক্ষে আবার যাওয়া হল দেশে। সেটা আসলে আর দেশ নয়। ছিল পূর্ব বাংলা, হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান। মামাবাড়ির সুখোজ্জ্বল স্মৃতি আছে বিল্বর। প্রথমেই মনে পড়ে, ধান-গাছের পাতায় আঙুল কেটে যাওয়া। মাঠে গিয়ে, পোষা ছাগলকে

খাওয়াবার জন্য কয়েকটা ধানপাতা টেনে ছিঁড়তে গিয়েছিল, ঠিক ধারালো ব্লেডের খোঁচার মতন আঙুল কেটে ঝরঝর করে রক্তপাত। সঙ্গে সঙ্গে কাটা আঙুলটা মুখের মধ্যে। আর সেই রক্তমাখা ধানপাতাই কচি ছাগলটা খেয়ে নিল মুচমুচিয়ে। তার ন'দিন পর সেই ছাগলটার মাংস খেয়েছিল বিল্ব। হেঁসো দিয়ে ঐ ধান গাছগুলোও কেটে নেওয়া হল কার্তিকের গোড়ায়। সেই ধানগাছ, সেই ছাগল কেউ আর নেই। কিন্তু বিল্বর আঙুলে কাটা দাগ রয়ে গেছে।

একলা একলা আলপথ ধরে হেঁটে যাওয়া! কিছুই না, দুপুরের আকাশের নিচে নির্জন ধানক্ষেত, তার মধ্য দিয়ে এক বালক, উঁচু আলের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে যাওয়া, ছট ছট শব্দে লাফিয়ে যায় সবুজ ঘাস-ফড়িং, যাদের আর এক নাম কয়া, এমন কিছুই না, শুধু সেই একলা দুপুরে, দু'পাশে ঢেউ খেলানো ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে এমন কিছু না, কিন্তু ভীষণ আপন আপন।

এবারে সব-কিছুই কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া, ফাঁকা ফাঁকা। চর-মুগুরিয়া স্টিমারঘাটার লোকেরা কেমন যেন আড়চোখে তাকায়। কেউ কোনো কথা জিজ্ঞেস করে না। আগে এখানে নামলেই মনে হত এই তো এসে গেলাম নিজের বাড়িতে। এখন সব অন্য রকম। সবাই অচেনা মতন। বিল্বর একটুও ভালো লাগেনি।

বাবা আসতে পারেননি। বিল্ব এসেছে দুই মামার সঙ্গে। সবাই এখন কলকাতায়, শুধু ছোটো মামাই পূর্ব পাকিস্তানে জমি জায়গা-পুকুর-বাগান-খাল-বিল নিয়ে রয়ে গেছেন। শ্রী অরবিন্দ বলেছেন না দশ বছরের মধ্যে ভারত পাকিস্তান আবার এক হয়ে যাবে?

চর-মুগুরিয়া থেকে নৌকো। আগে নিজেদের নৌকো আসত, এখন কেরায়া। নদীর দুধার যেন জনশূন্য মনে হয়! অথচ নদী অনেক স্বাস্থ্যবতী হয়েছে। বিল্বর নটি বয় শু-তে কাদা লেগেছিল, গলুই-এর কাছে উপুড় হয়ে শুয়ে সে একপাটি জুতো জলে ডুবিয়ে কাদা ধুচ্ছিল। কে জানত এত স্রোত, হুস করে টেনে নিয়ে গেল জুতোটাকে। আরে, আরে, আরে! নৌকোর অচেনা মাঝি হাসলো। হলদে ছোপ-ওয়ালা দাঁত। যাক, জুতোটা হারাবার ফলে তবু বিল্ব ঐ লোকটিকে একবার অন্তত হাসতে দেখল। এখন একপাটি জুতো পরে সে কী করে বরযাত্রী যাবে? কাকে বলবে জুতো কিনে দেবার কথা।

অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসে। এখন সব কিছুই নদী। মামা-

বাড়ির স্মৃতি মানেই একটি ঝলমলে বাড়ি। অজ পাড়াগাঁ, বিজলী নেই, কিন্তু পেট্রোমাকস আর হ্যাজাকের চোখ জুড়োনো আলোয় বাড়িটি দেখা যেত অনেক দূর থেকে। কতরকম লোকজন, কত আশ্রিত, নায়েব, গোমস্তা, হৈচৈ।

আজ অন্ধকারে সবই নীরব। নৌকো নদী ছেড়ে ঢুকল খালে, তারপর এসে এক জায়গায় থামল। এ কোন্ অন্ধকার মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ সাঙ্গ হল যাত্রা? না, এটাই মামাবাড়ি, এখানেই নামতে হবে। হ্যাঁ। এই তো সেই হরীতকী গাছ। বাড়ির ভেতর থেকে কেউ ছুটে এল না। কোনো সাদর অভ্যর্থনা নেই! দুই মামার হাত থেকে ঝলকে ঝলকে টর্চের আলো ছুটে গেল। যেখানে একটি বিশাল আটচালা ছিল সেখানে শূন্যতা জিভ লকলক করছে। নায়েব-গোমস্তাদের ঘরগুলি ধূলিসাৎ। শুধু পড়ে আছে দোতলা বাড়িটা, তার গেটে লোহার ফটক।

ছোটোমামার নাম ধরে ডাকা হল দু'বার। কেউ সাড়া দিল না। বাড়ি ভুল হয়েছে? না, হতেই পারে না, দুই মামার জন্ম এই বাড়িতে এমনকি বিল্বও এর প্রতিটি অণুকণা চেনে। অনেক বদলে গেছে, কিন্তু সেই বাড়িই। কিন্তু একটাও লোক নেই? ছোটোমামা কোথায়? এত মানুষজনে গমগম করত যে বাড়ি····

নৌকো থেকে নেমে সবাই হাঁকডাক দিতে দিতে এগিয়ে চলল। সঙ্গে বিয়েবাড়ির প্রচুর দামী দামী জিনিস, তাই বড়ো মামার কোমরে গোঁজা রিভলবার, তিনি কোমরে হাত দিয়ে আগে আগে যাচ্ছেন। লোহার গেট ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে তিনি ডাকলেন, মা! মা!

বারান্দার ওধার থেকে গেল একটা আলোর রেখা। আলোটা দুলছে। তারপর দেখা গেল এক ছায়ামূর্তি, হ্যারিকেন হাতে ঝুলিয়ে মাটিতে পা ঘষে ঘষে এগিয়ে আসছে, খুব ছোটো চেহারা, হয়তো কোনো দাসী। তারপর লোহার গেটের ওপাশে সেই ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল, সারা মুখে অসংখ্য ভাঁজ। মাথার চুল ধপধপে সাদা, দুচোখে দৃষ্টি নেই মনে হয়। হ্যারিকেনটা উঁচু করে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বড়ো মামা আর্ত চিৎকার করে উঠলেন, মা!

বিল্বর বুকটা ধক্ করে উঠল। এই দিদিমা? মা চার বছরে এতখানি বদলে গেছেন? এত বুড়ি? চার বছর আগেও বিল্ব কলকাতায় মামাবাড়িতে দেখেছিল। দারুণ স্বাস্থ্যবতী দিদিমা একাই

পঞ্চাশজনের রান্না করতে পারেন। মাথার চুল পাকা ছিল না। সব সময় হাসিখুশি।

মা, বাড়িতে আলো জ্বালোনি কেন?

আর-সব কোথায় গেল?

রতন কোথায়?

বৃদ্ধা কম্পিত হাতে তালা খুললেন। ক্ষীণ কন্ঠে বললেন, আয়! গেট সরিয়ে সবাই হুড়মুড় করে চলে এল ভেতরে। বৃদ্ধা তখন বারান্দা দিয়ে আবার এগোতে শুরু করেছেন। গম্ভীরভাবে।

মা, রতন কোথায়? বাড়িটা এত চুপচাপ কেন?

বিল্বর দিদিমা কোনো উত্তর দিলেন না। একটা ঘরের দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে উঁচু করলেন হ্যারিকেনটা। সেই হলদেটে আলোয় অসম্ভব কৃত্রিম দেখায় তাঁর মুখখানা। সারা মুখে মাকড়সার জাল। তিনি হ্যারিকেনটা দোলাচ্ছেন, কিংবা তাঁর হাত কাঁপছে, তিনি ধরে রাখতে পারবেন না বেশিক্ষণ।

বড়োমামা দৌড়ে গিয়ে বললেন, মা কী হয়েছে? কথা বলছ না কেন? রতন কোথায়?

বন্ধ ঘরের দরজাটা ঠেলে খুলে দিয়ে দিদিমা বললেন ঐ যে!

খাটের ওপর ছোটোমামা রতনের শায়িত শরীর। মুখে তখনো শুকনো রক্ত। ঘাড়ের পাশে গভীর ক্ষত, মাথাটা প্রায় চূর্ণ। কিন্তু চোখ দুটো আরো মেলা, অস্বাভাবিক সাদা দুটি চোখ স্থিরভাবে দেখছে ঘরের ছাদ। ঘরের মধ্যে বিকট পচা গন্ধ।

দিদিমা আবেগহীন গলায় বললেন, তোরা আসবি বলে ওকে রেখে দিয়েছি। আর সবাই ভয়ে পালিয়ে গেছে।

দুইমামা একসঙ্গে কেঁদে উঠলেন, মা, কী করে হল? কী করে হল? আমরা যে রতনের বিয়ের জন্য সব নিয়ে এসেছি। সেই মুহূর্তে দিদিমা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো মাটিতে। ঝনঝন শব্দে ভাঙল হ্যারিকেনটা।

সেই প্রথম বিল্বর মৃত্যু দেখা। মৃত ছোটোমামার সাদা দুটো চোখ। বিল্ব কাঁদেনি, তার আগেই একটা বিকট খ্যা-র-র খ্যা-র-র শব্দে সে চমকে ভয় পেয়ে প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল। বারান্দার ঘুলঘুলিতে ডানা ঝটপটিয়ে কী যেন একটা বড়ো ধরনের পাখি উড়ে চলে গেল বাইরে। একটা সাদা রঙের প্যাঁচা। ঐ প্যাঁচাটাও যেন ওদের

জন্যেই অপেক্ষা করেছিল, এবার চলে গেল। আর কখনো ফিরে আসবে না।

নিউ আলিপুরে

গড হ্যাজ গীভ্‌ন মী এনাফ! আই ক্যান সেন্ড মাই সান ইভন টু আজমীর...

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ সিংহের মতন গজরাতে লাগলেন বিনায়ক। তিনি ছ'ফিট ছাড়ানো সুপুরুষ, লাউঞ্জ সট পরে আছেন, একটু আগে ক্যালকাটা ক্লাব থেকে তিন পেগ কালো কুকুর পান করে এসেছেন, তাই ক্রোধটা একটু বেশি এখন। তাঁর ফর্সা মুখে অপমানের পেতছায়া। তিনি আবার হুঙ্কার দিয়ে বললেন, ছেলেপেলেরা মারামারি করেই, আমি নিজে, ইন মাই চাইল্ডহুড, কতবার হাত-পা ভেঙেছি খেলতে গিয়ে, আমার দুটো দাঁত নেই, এই দ্যাখেন আমার দুটো দাঁত ভাঙা, বিলাত থেকে ভালো করে বাঁধিয়ে এনেছিলাম···আর আমার ছেলে সামান্য মারামারি করেছে বলে, আপনি কী বলেন মাস্টারমশাই···

বিল্ব কী বলবে জানে না। সে চুপ করে আছে।

বিনায়ক বললেন, আমি ওকে আজমীরে পাঠাব। সে ক্ষমতা আমার আছে। এমনকি, ইংল্যাণ্ডে, বাবলু, তোকে আমি ইংল্যাণ্ড পাঠাব, এই বছরই।

রুচিরা স্বামীর বাহু ছুঁয়ে শান্তভাবে বললেন, অত মাথা গরম করছ কেন? এখন একটু বিশ্রাম নাও। বিনায়ক বললেন, কেন বিশ্রাম নেব, আ অ্যাম নট টায়ার্ড, কোন সাহসে দুই পয়সার পাদ্রিরা আমাকে এরকম অপমানের চিঠি পাঠায়? ইল-ম্যানার্ড? তোরা ম্যানার্সের কী জানিস? বলেন মাস্টারমশাই, ওকে আজমীরে পাঠানো ঠিক হবে, না ইংল্যাণ্ডে?

বিল্ব আজমীর তত্ত্বটা ঠিক জানে না। কী আছে আজমীরে? বিনায়কের ছেলে বাবলু তার ছাত্র। সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ে। খেলার মাঠে সে সাংঘাতিক মারামারি করেছে বলে ক্লাস টিচার চিঠি দিয়েছেন, বাবলুকে স্কুল থেকে সরিয়ে নেওয়া হোক, ওঁরা টি, সি, দেবেন।

বাবলুর মাথাতেও ফেট্টি বাঁধা। সে একটি বড়ো রকম হাঙ্গামাই

বাধিয়ে এসেছে। কিন্তু তার সুকুমার দুরন্ত মুখখানিতে মিটিমিটি হাসি। তার বাবা তার পক্ষে আছে।

রুচিরা স্বামীকে বললেন, তুমি ছেলেকে বেশি লাই দিয়ো না। এমন ভাবে মারামারি করে এসেছে, কেন করবে, ওর নিজেরও তো চোখটা আর একটু হলে....

বেশ করবে! ছেলেপেলেরা একটু মারামারি করবে না? মাস্টারমশাই, আপনি মারামারি করেননি?

রুচিরা বিল্বকে তুমি বলে ডাকেন। বিনায়ক আপনি। রুচিরা বললেন, বিল্ব, তুমি বরং আজ বাড়ি যাও, কতক্ষণ আর এই পাগলের চ্যাঁচামেচি শুনবে?

রুচিরা স্বামীর সম্পর্কে পাগল বিশেষণটি এমনভাবে দিলেন, যেন তার সঙ্গে খানিকটা বাৎসল্য মাখানো রইল। রুচিরাকে বিল্ব কোনো দিন তার ছাত্রর মা বলে ভাবতে পারে না। ঠিক যেন ইনগ্রিড বার্গম্যানের যমজ বোন। এইসব নারীদের ঠিক মা হিসেবে মানায় না। এদের জন্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়।

বিল্ব উঠে দাঁড়াল। বিনায়ক আবার চেঁচিয়ে উঠলেন আমি আমার ছেলেকে রাখব না ঐ পচা স্কুলে। আজমীরে কিংবা ইংল্যাণ্ডে পাঠাবই। আমার এক কথা!

বিল্ব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অর্থাৎ তার এই টিউশানিটা গেল। পঁচাত্তর টাকা। বন্ধুরা সবাই হিংসে করে বিল্বকে এইজন্য। নিউ আলিপুরে নতুন বাঙালী শিল্পপতির বাড়িতে বিল্বর অবাধ প্রবেশ-অধিকার; প্রত্যেকদিন চায়ের সঙ্গে সন্দেশ। এবং পঁচাত্তর টাকা মাসে। তার বদলে বিল্বকে কিছুই করতে হয় না, ছাত্রের সুন্দরী মা এবং দিদিদের সঙ্গে গল্প করে যায়। ছাত্র এত দুরন্ত যে কিছুতেই পড়তে চায় না, অধিকাংশ দিনই আটটার আগে বাড়ি ফেরে না, তারপর পড়তে বসেই ঝিমোয়। তবু অসাধারণ মেধা ও প্রাণশক্তি বাবলুর, সে একটা কিছু হবেই জীবনে।

দরজার কাছে পৌঁছে বিল্ব জিজ্ঞেস করল আজমীরে বুঝি কোনো বড়ো স্কুল আছে?

আপনি জানেন না? সেখানে শুধু রাজকুমার পড়ে।

রাস্তায় বেরিয়ে এসেই বিল্ব এক ঝলক ঝড়ের হাওয়া খেল। আকাশে লাল মেঘ। চতুর্দিকে নতুন বাড়ির সুগন্ধ। জলা জমি ভরাট

করে এই নতুন বসতি। প্রত্যেকটা বাড়ি কত সুন্দর কায়দার। বাস রাস্তায় পৌঁছোবার জন্য বিল্বকে অনেকটা হাঁটতে হয়। হাওয়ায় ক্রমশ শব্দ বাড়ছে। আপনি জানেন না? সেখানে শুধু রাজকুমাররা পড়ে। নতুন বাড়ির গোলোকধাঁধার মধ্যে দিয়ে বিল্ব দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে জোরে জোরে হাঁটতে লাগল। আপনি জানেন না? সেখানে শুধু রাজকুমাররা পড়ে? আজমীর! আজমীর! আপনি জানেন না? বিল্বকে আর এ পাড়ায় আসতে হবে না। পঁচাত্তর টাকা গেল। কোনো-ক্রমে বি এস সি পাশ করে সে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছে। এখন শুধু ইণ্টারভিউ আর ইন্টারভিউ! আপনি জানেন না? সেখানে শুধু রাজ-কুমাররা পড়ে! গড হ্যাজ গীভ্ন মী এনাফ, আই ক্যান সেণ্ড মাই সান ইভন টু আজমীর। রুচিরা দেবী কী সাংঘাতিক সুন্দরী, তাকালেই বুক কাঁপে…উনি কি লক্ষ করেছেন আমি প্রায়ই ওঁর দিকে গোপনে তাকিয়ে থাকি? কখনো উনি একটু হাত উঁচু করলে যদি ওঁর বগলের কচি ঘাসের মতন রোম দেখা যায়, মাথার ভেতরটা কীরকম অবশ অবশ হয়ে যায়। আপনি জানেন না? সেখানে শুধু রাজকুমাররা পড়ে। আপনি জানেন না? আমি শালা কিছুই জানি না। আমি একটা গাণ্ডু! আমি শালা একটা বাঙাল, একটা নর্থ ক্যালকাটার গাঁইয়া ভূত।

একটা ইঁটে হোঁচট খেতেই বিল্ব অসহ্য ব্যথায় উঃ করে উঠল। বুড়ো আঙুলের নখটা উঠে গেছে? না, কিন্তু লেগেছে সাংঘাতিক।

ব্যথা কমাবার জন্য একটু দম নিয়ে বিল্ব নতুন বাড়িগুলির দিকে ক্রুদ্ধ-রক্তাক্ত চোখে তাকাল। সব বাড়ির জানলায় জানলায় আলো। সব জানলায় নতুন পর্দা। কোথা থেকে ভেসে আসছে টুং টাং পিয়ানোর শব্দ।

বিল্ব বিড়বিড় করে বলল, এই শোনো, নিউ আলিপুর। তোমাকে আমি একদিন ধ্বংস করে দেব? তোমার এই সব নতুন বাড়ি-ফাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে আমি ধুলোয় মিশিয়ে দেব। আমাকে চেনো না। আমি বিল্ব চ্যাটার্জি, সাবধান, আলিপুর, তোমাকে শেষ করে দেব আমি। শিগগিরই।

সিঁড়ির ওপরে দোতলাটা একটা আলাদা জায়গা। ওখানে বিল্ব কদাচিৎ যায়। ওখানে থাকে বাবা, মা, ভাইবোনেরা। সম্পূর্ণ সংসার। আর বিল্ব একা ঐ সংসারের বাইরে, সে গুহাবাসী তার একতলার ঘরে।

নিচের বাথরুমের চিরুনিটা পলাতক। 'মানুষের গড়া দৈত্য' বই-টির মলাটের ছবির মতন সারা কপালে চুল ঝুলিয়ে বিল্ব উঠে গেল ওপরে। সেখানকার বাথরুমটা বন্ধ।

ভেতরে কে?

দিদি। দেরি হবে? চিরুনিটা একটু—। কার চিরুনি? ঘরে দ্যাখ। বাবার ঘর। মা ও ছোট বোনের ঘর। দিদি আর ছোট ভাইয়ের ঘর। সব ঘরের সামনে দিকে টানা বারান্দা। শুধু দিদির ঘর ছাড়া আর সব ঘর চূড়ান্ত অগোছালো। যেখানে সেখানে লুটিয়ে আছে ছাড়া জামাকাপড়।

বিল্বর চুল মোটা মোটা জট পাকানো। মেয়েলি চিরুনি তার পক্ষে সুবিধাজনক। ছোট বোনেরা স্কুলে, মা রান্নাঘরে। বিল্ব দিদির ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়াল। তিন বছর আগেও এই ঘরটা তার ছিল। এখানে সে স্বপ্নে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে। এই ঘরের জানলা দিয়ে দেখা একটা ছোট পৃথিবী ছিল। এখন সব কিছুই অচেনা। অন্তত দু তিন মাসের মধ্যে বিল্ব এ-ঘরে একবারও ঢোকেনি। দিদির সঙ্গে বোধ হয় একটাও কথা হয়নি দশ-বারো দিন।

বিল্ব ভাবল, আমিও এক সময় হাফ প্যাণ্টের তলায় লম্বা লম্বা ঠ্যাং বার করা অকোয়ার্ড চেহারার ছেলে ছিলাম। যে-বয়েসে মামা-বাড়িতে বেড়াতে যাবার কথা উঠলেই উত্তেজনা জাগত। হেঃ। এই ঘরটা এক সময় আমার ছিল, এখন আর নেই। এই ঘরটা যার ছিল, সে আর নেই। ওপরতলাটার বড্ড বাড়ি বাড়ি গন্ধ। বিল্বর আজকাল আর একদম পছন্দ হয় না। সকাল বেলায় একবার শুধু বাজার করে দেওয়া ছাড়া এ বাড়ির সঙ্গে বিল্বর আর কোন সম্পর্ক নেই।

চুল আঁচড়ানো শেষ হয়ে যাবার পর বিল্ব দিদির খাটের ওপর বসে রইল। প্যান্ট ও হাতকাটা গেঞ্জি পরা শরীরে একটু শিরশিরে ঠান্ডা আমেজ। ক'দিন ধরে নারকোল তেল জমতে শুরু করেছে। বিল্ব খেতে গেল না! বালজাককে কে একজন এসে বলেছিল, আপনার মায়ের অসুখ, আপনাকে একটু দেখতে চান। লেখা থেকে মুখ তুলে বালজাক বললেন, আঃ বিরক্ত কোরো না। যখন-তখন মায়ের সঙ্গে দেখা করা যায় না। মায়ের সঙ্গে দেখা করারও একটা নির্দিষ্ট সময় আছে।

ঘটনাটা বেশ পছন্দ হয়েছে বিল্বর। আজ সকালেই পড়া। ঠিক

সাহেবদের মতন কথা। বিল্বও মা আর দিদিটিদিদের সঙ্গে দেখা করার সময় নির্দিষ্ট করে রাখবে। আজ দিদির সঙ্গে। বিল্ব পায়ের ওপর পা তুলে গম্ভীরভাবে বসল।

স্নান সেরে ঘরে ঢুকে সুদেষ্ণা প্রথমে বিল্বকে লক্ষ করেনি। বুক থেকে আঁচল ফেলে শাড়িটা ঠিক করে পরতে গিয়েই সে ঘুরে তাকাল। একটু অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, কী রে?

বিল্ব উঠে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, তোর খবর কী রে দিদি?

বেশবাসপর্ব চটপট সেরে নিয়ে ভ্রূভঙ্গি করল সুদেষ্ণা। তার মানে?

এমনি, তোর খবর নিতে এলাম।

কিসের খবর?

পিঠোপিঠি ভাইবোন। একসময় ধারাবাহিক ঝগড়াঝাঁটি ছিল। আজকাল সুদেষ্ণা গম্ভীর হয়ে রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছে। বিল্ব নিজেই দেখেছে তার দিদিকে ধর্মতলার মোড়ে কৌটো ঝাঁকিয়ে চাঁদা তুলতে। সেই দৃশ্যটা বিল্বর চোখে ভেসে উঠতেই সে খানিকটা বিদ্রূপের হাসি ফোটাল। ফরোয়ার্ড ব্লক। কুইসলিং-এর পার্টি। ওরা এখনো মনে করে সেই ভদ্রলোক ফিরে আসবেন। 'আদেশ ছিল দিল্লি চলো, দিল্লি মোরা জয় করেছি, আজি তুমি কোথা নেতাজী? আজি তুমি কোথা নে—তা-জী-ঈ-ঈ-ঈ-ঈ···।' ওদের গানের মধ্যে এখনো 'মোরা' শব্দটা থাকে। মোরা? আজ নয়, আজি। নেতাজীর সঙ্গে মিলিয়ে। ভারী সুইট, তাই না? কারা লেখে এসব?

কিন্তু বিল্ব দিদির সঙ্গে রাজনৈতিক তর্ক তুলবে না।

বিল্বর চুপচাপ মুখ দেখে সুদেষ্ণা আর একটু বিরক্ত হয়ে বলল, কিছু বলছিস না যে? পয়সাকড়ি নেই আমার কাছে। কিছু দিতে পারব না।

সুদেষ্ণা একটা মর্নিং স্কুলে পড়াচ্ছে, এই তিন মাস হল। একশো পাঁচ টাকা মাইনে পায়। বিল্বর তুলনায় ইদানীং সে বেশ অবস্থাপন্ন।

না, পয়সা চাইতে আসিনি।

আমার কাছে তোর মোট সতেরো টাকা ধার, শোধ করে দিস।

দেব। সে কথা নয়। আমি ভাবলাম, তোর সঙ্গে আমার বেশ কয়েকদিন কোনো কথাবার্তা হয় না। অথচ একই বাড়িতে আমরা

থাকি। এ ধরনের অ্যালিয়েনেশান ভালো নয়। একটা যোগাযোগ থাকা উচিত।

সুদেষ্ণা কয়েক পলক ভুরু তুলে রইল। গলায় বাঁকা টান রেখে বলল, এ তো মনে হচ্ছে মুখস্থ করা কথা। কে শেখাল? সুরঞ্জন? সেও তো শুনছি আজকাল ইনটেলেকচুয়াল। তোদের পার্টিতে আজকাল এই তো সব ইনটেলেকচুয়ালের নমুনা।

বিল্ব এই প্ররোচনাও এড়িয়ে গেল। এবার সে ভালো মানুষের মতন হেসে বলল, তোকে আজ বেশ ভালো দেখাচ্ছে!

সুদেষ্ণা বলল, ইয়ার্কি হচ্ছে, না? আমার খিদে পেয়েছে খেতে হবে। এক্ষুনি আমাকে বেরুতে হবে।

কোথায়?

তোকে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি?

ও, ভালো কাথা মনে পড়েছে। তোর সঙ্গে আমার সত্যিই একটা জরুরি কথা আছে।

আমার এখন কোনো জরুরি কথা শোনার সময় নেই। আমি খেতে যাচ্ছি।

তুই রেগে যাচ্ছিস কেন আমার ওপরে। পাঁচ দশ মিনিট সময় দিতে পারবি না আমাকে?

তুই জানিস, খোকন, আমি পছন্দ করি না সুরঞ্জনের সঙ্গে তোর মেলামেশাটা। অথচ তুই আজকাল সব সময় তার সঙ্গেই ঘুরিস!

মাঝে মাঝে দেখা হলে কথা বলব না?

মাঝে মাঝে? মলয় গ্রীলে রোজ সকালে ওর সঙ্গে আড্ডা দিস।

তাও তুই লক্ষ করেছিস?

তুই তো এখন আর ছাত্র নেই। তবু এস, এফ-এর ছেলেদের সঙ্গে তোর এত মেলামেশা কেন? বুড়ো বয়সেও যারা ছাত্র-রাজনীতি করে—

এই বুড়ো বিশেষণটা যে তাকে নয়, সুরঞ্জনদাকে উদ্দেশ করেই, তা বিল্ব জানে। তবু সেটা বিল্ব নিজের গায়ে টেনে নিয়ে বলল, আমি কেন ছাত্র-রাজনীতি করতে যাব। আমি ফুল ফ্লেজেড পার্টি মেম্বার, আমি রেগুলার কার্ড হোল্ডার।

তাহলে ওদের সঙ্গে সব সময় মিশিস কেন?

বিল্ব রাজনীতির তর্কে যাবে না। আবার সজাগ করল নিজেকে। উঠে দাঁড়িয়ে বলল চল, খেতে যাই!

জরুরি কথাটা কী শুনি ?

বাবা সামনের জানুয়ারিতে রিটায়ার করছেন।

সে তো আমি জানিই।

ওরা এক্সটেনশান দেবে কিনা ঠিক নেই। নভেম্বর শেষ হলে বাবা দু' মাসের ছুটি নিয়ে নেবেন।

তাতে ?

প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে হাজার তিনেক টাকা পেতে পারেন। বাবা জিজ্ঞেস করছিলেন, ঐ টাকাটা তিনি তোর বিয়ের জন্য রাখবেন, না বরানগরে একটা জমি....

বাবা এসব ব্যাপারে তোর মতামত নেওয়া শুরু করলেন কবে থেকে ?

তা জানি না। কিন্তু বাবা আমাকে পরশুদিন রাত্রে এ কথাটা জিজ্ঞেস করলেন।

আমাকে তো বলেননি। তুই যদি বাবার প্রতিনিধি হয়ে আমার মতামত নিতে চাস, তা হলে আমি বলছি, বরানগরের জমি সম্পর্কে আমার কোনোই বক্তব্য নেই। কিন্তু আমার বিয়ের ব্যাপারে কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমি বিয়ে করি বা না করি, সেটা অন্য প্রশ্ন কিন্তু সে ব্যাপারে এ বাড়ির কক্ষনো একটাও পয়সা খরচা হবে না।

জানিস দিদি, প্রথম প্রথম যখন ট্রামে চড়তাম, তখন দেখতাম একদল লোক ঠনঠনে কালীবাড়ি এলেই সেদিকে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করে। তখন ভাবতাম, আট-দশ বছরের মধ্যে এই লোকগুলো বদলে যাবে। তখন আর কেউ ঠিক ওরকম মাথা ঝুঁকিয়ে চোখ বুজে প্রণাম করবে না। কিন্তু তা হয়নি। এখনো অন্য একদল লোক ঠিক ঐরকম ভাবেই···

—তাতে কী হল ?

এখনো বিয়েবাড়িতে ম্যারাপ বাঁধে। দেড়শো দুশো লোক খেতে বসে।

তুই কিছুই জানিস না, খোকন। আমার বন্ধু সুতপা বিয়ে করল গত মাসে, সবসুদ্ধু খরচ হয়েছে বাইশ টাকা।

সে তো মিহিরদাও কফি হাউসে সবার কাছ থেকে একটাকা দুটাকা করে চাঁদা তুলেছিলেন, সেই টাকায় বিয়ে করলেন সেদিনই সন্ধ্যেবেলা। কিন্তু তিনমাস বাদে মিহিরদার বাবা আবার ধুমধাম করে লোকজন খাওয়ালেন।

সবাই তোদের মিহিরদা নয়।

বেশ ভালো কথা।

তোকে আর-একটা কথাও বলে রাখছি, বাবাকে জানিয়ে দিস। এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে রেশনের টাকা আর ছোট দুটোর পড়ার খরচ আমিই চালাব।

সুরঞ্জনদার ওপর তোর এত রাগ কেন? মানুষটা কিন্তু খারাপ নন।

এটাই তা হলে তোর আসল কথা। এতক্ষণ চালাকি করছিলি? খোকন, তুই কিন্তু মার খাবি আমার কাছে। কোনোদিন এসব কথা আর আমার কাছে উচ্চারণ করবি না। তুই সুরঞ্জনের হয়ে দালালি করতে এসেছিস আমার কাছে?

না, না!

তোর কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি মাথা গলাতে যাই? বিল্ব একটু অসহায় বোধ করল। সুরঞ্জনের কথাটা সে হঠাৎ কেন বলতে গেল, সে নিজেই জানে না। কোনো কারণ ছিল না, সুরঞ্জনদাও ওকে কিছু বলেননি। এমনিই মনে এলো।

সুরঞ্জনদা বহুদিন দিদির প্রেমিক ছিলেন। সেই ছোটবেলা থেকে সবাই ধরেই নিয়েছিল, সুরঞ্জনের সঙ্গেই দিদির বিয়ে হবে, এমনকি মা-বাবাও। মাস ছয়েক হল কী যেন ঘটেছে, দিদি আর কথা বলে না সুরঞ্জনের সঙ্গে। সুরঞ্জনদা এ পাড়া দিয়ে হাঁটবার সময় মাথা নিচু করে চলে যায়, তাকায় না এ বাড়ির দিকে।

আগে সুরঞ্জনদাকে খুব একটা পছন্দ করত না বিল্ব। মেনে নিয়েছিল। একটু হামবাগ হামবাগ ভাব, বেশি চেহারা কনশাস! প্রায়ই যে-সব বইয়ের নাম উচ্চারণ করত, সেগুলো সব নিজে পড়েনি! কিন্তু আজকাল কিছুদিন সুরঞ্জনদা বদলে গেছে অনেকখানি। আগের মতন বেশি কথা বলে না, ভদ্র হয়ে গেছে খুব। সবচেয়ে বড় কথা, বিদ্রূপ, রাগ বা দুঃখ—এর কোনো সুরেই সে কক্ষনো বিল্বর সামনে তার দিদির নাম উচ্চারণ করে না। অন্যান্য বন্ধুদের জন্য, আজকাল মলয় গ্রীলে সকালের আড্ডায় বিল্বকে সুরঞ্জনদার টেবিলেই বসতে হয়। কিন্তু সুরঞ্জনদা তাকে অস্বস্তিতে ফেলেনি একবারও।

দিদির সঙ্গে সুরঞ্জনদার কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছে বিল্ব জানে না, কিন্তু ওদের দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ প্রায় সম্পূর্ণ। দিদির যে ভয়ানক

জেদ বিল্ব তা জানে। তার দিদিকে দেখতে খুব ভালো নয়, খুব খারাপও নয়, তবে দিদিকে কেউ সাধারণ মেয়েদের দলে ফেলতে পারবে না। মুখের মধ্যে একটা তেজী তেজী ভাব আছে। দিদি কক্ষনো ইয়ার্কি করেও একটা মিথ্যে কথা বলে না।

বিল্ব মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে, ব্যর্থ প্রেমের জন্যই কি সুরঞ্জনদার এই পরিবর্তন? ব্যর্থ প্রেম যেন ঐ হামবাগ লোকটিকেও অনেক মহান করে তুলেছে। মুখের হাসিটাও বদলে গেছে অনেক। কথাবার্তার মধ্যে গভীরতার ছাপ পড়েছে, আর দুমদাম করে না-পড়া বইয়ের নাম উচ্চারণ করে না। প্রত্যাখ্যানের আঘাত মানুষের এতখানি? দুঃখ হয়, বিল্বর খুব দুঃখ হয়। তার এ পর্যন্ত এরকম কোনো অভিজ্ঞতা হল না। দু' চার মাসের জন্যও যদি কোনো মেয়ে তাকে ভালোবাসতো, বিল্ব তাকে চিঠি লিখত অসংখ্য, তারপর না-হয় মেয়েটি পদাঘাত করে বিদায় করে দিত বিল্বকে। তবুও তাতেই মোড় ফিরে যেত তার জীবনের। সুরঞ্জনদা কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, মুখে একটা বিষণ্ণ হাসি লেগে থাকে। অথচ বিল্বর জীবনে এখনো কোন মেয়েই...

এই যে তার দিদি, এইরকম একটি মেয়েই যদি। তার দিদি সুদেষ্ণা যদি অন্য কোন বাড়ির মেয়ে হত, তাহলে দিদির সঙ্গেই প্রেম করতে পারত বিল্ব। দিদি মানে সেই অন্য বাড়ির মেয়েটি আর কি! দিদি বাংলাটা ভালো জানে, দিদির মতন মেয়েকে চিঠি লিখেও আনন্দ ছিল, তবে বিল্বর মতন ফাজিল ছেলেকে দিদির মতন মেয়ে সহ্য করতে পারত না—বেশিদিন। বিল্ব নিশ্চয়ই গায়টায় হাত দিয়ে আদর করতে যেত, আর দিদি নিশ্চয়ই তখন, মানে সেই অন্য বাড়ির মেয়েটি তখন...।

দিদি কি সুরঞ্জনদাকে কোনোদিন চুমুটুমু খাওয়া অ্যালাউ করেছে? মনে তো হয় না, দিদি যা মরালিস্ট।

বিল্ব সুদেষ্ণার কাঁধে হাত রেখে বলল, দিদি, তুই জানিস না, তোকে আমি কত ভালোবাসি?

থাক, আর ন্যাকামি করতে হবে না।

কালো দুর্গ

সপরিবারে সেই একবারই বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল পুরীতে।

বিল্বর বয়েস তখন দশ বা এগারো। ছোট ভাইটা তখনো জন্মায়নি। আশ্চর্য, তার চেয়েও আরো ছোট বয়েসের অনেক কথা মনে আছে, কিন্তু পুরী ভ্রমণের বিশেষ কিছুই মনে নেই কেন? কিংবা, কিছু কিছু দৃশ্য যা তার মনে গেঁথে আছে, সেগুলি নাকি আসলে ভুল। যেমন, বিল্বর পুরীতে যে বাড়িটাতে থাকত, ভাড়া নেওয়া হয়েছিল এক মাসের জন্য, সেই বাড়ির পাশ দিয়েই রেললাইন। মাঝরাত্রে ঘুমের মধ্যে সে শুনতে পেত চলন্ত মেল ট্রেনের ঝমঝম শব্দ। এমন-কি সেই ট্রেনের আলো ঠিকরে পড়ত তাদের দোতলার ঘরের আয়নায়। অথচ মা-দিদিরা এই কথাটা শুনলে হাসে। পুরী শহরের মধ্যে ট্রেনলাইন নেই, সেই বাড়িটার পাশ দিয়ে ট্রেন যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সেই রকম পুরীর সম্পর্কেও বিল্ব একটি ভুল ছবি বাঁধিয়ে রেখেছে মনের মধ্যে। সে একটা পাথরে গড়া বিশাল মন্দির, খাড়া উঠে গেছে সমুদ্রের কিনারা ঘেঁষে, সমুদ্রের নীল ঢেউ ছলাত ছলাত করে আছড়ে পড়ছে মন্দিরের দেওয়ালে। এতেও ওরা হাসে। বিশেষত নীল ঢেউ শুনে। অথচ বিল্ব যে স্পষ্ট দেখতে পায়!

একটা ঘটনা অবশ্য খুব ভালো মনে আছে। সকালবেলা জল উঠে আসত অনেকখানি, প্রায় রাস্তা পর্যন্ত, বিকেলবেলা নেমে যেত অনেক নিচে। প্রথম কয়েকদিন ঝিনুক খোঁজার পর ব্যাপারটা এক-ঘেয়ে হয়ে যাওয়ায়, বিল্ব সেই ভিজে বালির ওপর বসে খেলা করত একলা একলা। সেই সময় বিল্বর রাজকাহিনী পড়া অভিভূত মনে চিতোর দুর্গের ছবি বড় মোহ দিয়েছিল। সে দুর্গ বানাতো। একদিন দুপুর থেকে বসে বসে অনেকখানি জায়গা খুঁড়ে বানিয়েছে দুর্গ, ঠিক তার মনের মতন চিতোর, আর ঠিক সেই সময় তিনটি ঢ্যাঙা কিশোর স্বর্গদারের দিক থেকে এল ছুটতে ছুটতে। ডাবল মার্চের ভঙ্গিতে। তারা থমকে দাঁড়িয়ে কয়েক পলক দেখল বিল্বর হাতে গড়া দুর্গ। তাদের চোখে ফুটে উঠল প্রশংসার ছায়া। তারপর তারা অট্টহাসি দিয়ে লাফিয়ে পড়ল, বিল্বর কীর্তি তছনছ করে দিয়ে আবার ছুটে চলে গেল সামনের দিকে।

প্রায় তিরিশ চল্লিশ গজ দূরে বালির ওপর কাত হয়ে শুয়ে বিল্বর বাবা বই পড়ছিলেন। ছেলের ওপর তাঁর চোখ রাখার কথা।

বিল্ব বেদনাময় কণ্ঠে ডাকল, বাবা।

তিনি কিছু দেখলেন না, পাশ ফিরলেন না, সাড়া দিলেন না। সজল বাতাস বোধহয় তাঁকে ঘুম এনে দিয়েছে।

কিছুক্ষণ ক্ষুব্ধ হয়ে বসে থাকার পর বিল্ব আবার সেই ভাঙা দুর্গ মেরামতের কাজে মন দিয়েছিল। সে তখন আর বিল্ব নয়, বাপ্পাদিত্য। সে তন্ময় হয়ে ডুবেছিল ঐ কাজে, ছেলেমানুষরা যতটা তন্ময় হতে পারে, সে আর কোনোদিকে তাকায়নি, তাই সে চমকে উঠেছিল হাসির শব্দে।

সেই তিনটি ছেলে ভাবল মার্চ করতে করতে আবার ফিরে এসেছে। শেষ বিকেলের রোদে তাদের মুখ উদ্ভাসিত। তাদের চোখে কৌতুক ছটা তাদের একজন বলল, বাঃ!

ঠিক আগের মতন খলখলিয়ে হেসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছ'খানা পায়ে তছ-নছ করে দিল সবটা। ওরা যা পছন্দ করে, তা-ই ভাঙতে চায়।

বিল্ব দু'বার ডাকল, বাবা, বাবা।

কোনো উত্তর পেল না।

বহিরাগত আক্রমণকারীদের মতন জয়ের গৌরবে ছেলে তিনটে আবার ছুটল সামনের দিকে। বিল্বর মধ্যে জেগে উঠল গোঁয়ার রাণা, সে একাই ছেলে তিনটিকে তাড়া করে গেল, হাতের কাছে কোনো ইঁট বা পাথর না পেয়ে সে একটা মরা জেলি মাছ ছুঁড়ে মারল একজনের ঘাড়ে। তারপর একমুঠো বালি!

তিনটি ছেলেই বিল্বর চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড়। তারা ঘুরে দাঁড়িয়ে খুব উপভোগের সঙ্গে বিল্বকে মেরে ধরাশায়ী করল, একজন তার খালি পায়ের পাতা দিয়ে একটা চাঁটি দিয়ে গেল বিল্বর গালে।

সব ব্যাপারটাই ঘটে গেল বিনা বাক্যব্যয়ে। বিল্ব আর তার বাবাকে ডাকেনি।

ব্যথার চেয়েও প্রবল অভিমানে বিল্ব গড়াগড়ি দিচ্ছিল মাটিতে। সে আর কোনোদিন বাবাকে ডাকবে না। গুণ্ডারা এসে যদি তাকে মেরেও ফেলে তবু সে আর কখনো সাহায্য চাইবে না তার বাবার কাছে।

হঠাৎ আকাশে তাকিয়ে চমকে গেল বিল্ব। একটা দারুণ দৃশ্যের ঝাপটায় সে নিথর হল। শেষবেলার রক্তাক্ত আকাশে একটা বিশাল কালো মেঘের দুর্গ। এমনই জমকালো গাম্ভীর্য তার যে, বিল্ব নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে যায়। সে যখন বালি দিয়ে দুর্গ বানাচ্ছিল ঠিক সেই সময়ই আপন মনে আকাশে গড়ে উঠছিল আর একটি মহান, সুন্দর,

অলীক। বড় গম্বুজ ও প্রাকারঘেরা যেন এক কষ্টিপাথরের দুর্ভেদ্য প্রাসাদ।

আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে বিল্ব একবার চারপাশে তাকাল। সে ভেবেছিল সে অন্যমনস্ক ছিল অতক্ষণ কিন্তু বাকি সব লোক নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ধরে মুগ্ধভাবে দেখছে আকাশের সেই ভাস্কর্য। কিন্তু না তো, আর তো কেউ আকাশের দিকে চেয়ে নেই। বেলাভূমিতে এখন অনেক মানুষ, অনেকে হাত ধরাধরি করে ঘুরছে, গল্প করছে, হাসছে, অথচ কেউ তো আকাশের দিকে তাকাচ্ছে না! আর কেউ দেখতে পায়নি? ঐ দুর্গ শুধু বিল্বর একার জন্য? বিল্ব বারবার আকাশ ও বারবার বেলাভূমির মানুষদের দেখতে লাগল পর্যায়ক্রমে। সত্যিই, আর সবাই অনবহিত। বিল্ব শুধু একা দেখেছে। রোমাঞ্চে তার শরীর কাঁপতে থাকে।

প্রাক্ কৈশোরে পুরীর টকটকে লাল আকাশে সেই কালো দুর্গ সত্যিই দেখেছিল বিল্ব। তার স্পষ্ট মনে আছে।

রাস্তার ওপাশে

মানিকতলার মোড়ে দেবজ্যোতির সঙ্গে দেখা। দুপুর একটা। বিল্ব তখন মানিকতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে কী করছিল কে জানে। দেবজ্যোতি তাকে দেখে বলল, ট্রামে উঠব ভেবেছিলাম, কিন্তু এইটুকু তো রাস্তা। চল, হাঁটি।

বিল্ব একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে প্যাকেটটা দেবজ্যোতির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নিবি?

আমি সিগারেট খাই না। তুই খাস কেন?

বিল্ব কাঁধ ঝাঁকালো। যার মানে অবান্তর, অবান্তর!

দেবজ্যোতি বলল, সিগারেট খেলে জিভের স্বাদ খারাপ হয়ে যায়। তুই যদি কখনো টী টেস্টার হতে চাস?

না, হতে চাই না।

তুই তাহলে কী হতে চাস!

বিল্ব আবার কাঁধ ঝাঁকালো।

আমি জানি তুই কী হবি। গভর্নমেন্ট অফিসের ক্লার্ক কিংবা স্কুল মাস্টার। এইজন্য আমি গরীবদের দেখতে পারি না। তাদের কোনো

অ্যামবিশান থাকে না। তারা কোনোরকমে টিঁকে থাকতে পারলেই বর্তে যায়।

তুই এত বেলায় কোথায় যাচ্ছিস, দেবজ্যোতি ?

সায়েন্স কলেজ। প্রথম দুটো ক্লাস মিস হল। ও, একটা ভালো খবর আছে, তুই শুনিসনি নিশ্চয়ই। পরশুদিন আমার বড়ো মামা মারা গেছে।

দেবজ্যোতির বড়ো মামাকে বিল্ব চেনেই না, সুতরাং তাঁর মৃত্যুর খবরটা ভালো না খারাপ তা জানবে কী করে বিল্ব।

জ্বলজ্বলে হাসিমুখে দেবজ্যোতি বলল, এখন বাকি রইল আমার কাকা। এই কাকা মারা গেলেই আমার আর কোনো গার্ডিয়ান থাকবে না, আমি একেবারে ফ্রি হয়ে যাব, তখন আমার যা খুশি....

তোর কাকা মানে, সেই যাঁর নাম দেবপ্রিয় মজুমদার, যিনি লেখেন ?

লেখাটা তো এলেবেলে, এমনিতে খুব বড়ো কাজ করেন। উনি হচ্ছেন অ্যাকচুয়ারি। কাকে বলে জানিস অ্যাকচুয়ারি ? যারা সারা দেশের মানুষদের গড় আয়ু ঠিক করে। খুব খটোমটো অঙ্কের ব্যাপার। এত বড় দেশটার এত মানুষের মধ্যে কতরকম ক্লাস, কতরকম ফুড-হ্যাভিট, রোজগারের ডিসপ্যারিটি, কোন্ কোন্ অসুখ এখন হাওয়ায় ভাসছে, আরো সব নানান ফ্যাকটার, এর মধ্যে থেকে ঠিক করতে হয়, আগামী দশ বা পনেরো বছরের মধ্যে....এদেশের অ্যাভারেজ মানুষ কত বয়স পর্যন্ত বাঁচতে অ্যালাউড, বুঝতে পারলি তো, গোটা লাইফ ইনসিওরেন্সের ব্যাপারটা এই হিসেবের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

না, বিল্ব বুঝতে পারেনি, বোঝার চেষ্টাও করছে না।

দেবজ্যোতি আবার বলল, গত বছরে অ্যাভারেজ ইণ্ডিয়ানদের লাইফ স্প্যান কত ছিল জানিস ? সাতচল্লিশ। ডেমোগ্রাফিক্যাল ইয়ারবুকে বেরিয়েছে, দেখে নিস। আমার কাকার বয়েস এখন সাতান্ন। সেই-জন্য আমি একদিন বললুম অ্যাভারেজ ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে আরো দশ বছর গ্রেস পেয়েছ; আর কতদিন বেচে থাকবে, কাকামণি ?

উনি কি বললেন ?

বললেন, চেষ্টা করছি, চেষ্টা করছি। দেখছ না, এই যে রোজ দুটো করে সন্দেশ খাই ?

তার মানে ?

আরে ইডিয়েট, একথাটা কি সত্যি সত্যি জিজ্ঞেস করেছি নাকি ?

মনে মনে হচ্ছে এ–সব ডায়ালগ। আমার কাকামণির হেভি ডায়াবিটিস, অথচ মিষ্টি খাবার খুব লোভ, তাতেই বুঝে গেছি, আর বেশিদিন নেই। কাকা মারা গেলেই আমি একদম, ফ্রি-প্রপার্টি ফ্রপার্টি যা আছে সব বেচে দিয়ে প্রথমেই যাব নরোয়ে।

নরোয়ে?

হ্যাঁ, দুর্দান্ত জায়গা, ছেলেবেলা থেকে আমি ভেবে রেখেছি নরোয়ে যাবার কথা, ল্যাণ্ড অফ দ্য মিডনাইট সান।

এবার রাস্তা পার হতে হবে, কিন্তু বিল্ব থমকে দাঁড়াল, ওপারে লাল রঙের বড় বাড়িটা। বিল্ব বলল চলি রে, দেবু!

তুই আয় না আমার সঙ্গে।

আমি কোথায় যাব? আমি সায়েন্স কলেজে গিয়ে কী করব?

চল না, আমার পাশে বসে থাকবি। প্রফেসাররা কিছু বলবেন না। ভাববেন অন্য ডিপার্টমেন্টের ছেলে!

না।

আরে চল না।

না।

দেবজ্যোতি বিল্বর হাত ধরে টানাটানি করে রাস্তার মধ্যে অনেকখানি নিয়ে গেল, বিল্ব আবার জোর করে ফিরে এল এপারে। দেবজ্যোতি বলল, আচ্ছা চল, তোকে ক্লাস করতে হবে না। চা খাওয়াব, আমাদের ক্যান্টিনে ভালো সিঙাড়া পাওয়া যায়।

বিল্বর চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। বুকের মধ্যে ঠেলা দিচ্ছে অভিমান। সে এইমাত্র ঠিক করল কোনোদিন সে গেট পেরিয়ে ঐ লাল বাড়িটার মধ্যে ঢুকবে না। এমন কি, কখনো এ পথ দিয়ে যেতে হলে, সে বিপরীত ফুটপাথ দিয়ে হাঁটবে, ঐ লাল বাড়ির পাশ দিয়েও যাবে না। তাকাবেও না। তাকে ওখানে ঢুকতে দেয়া হয়নি।

চা খাবি না?

না, আমার অন্য কাজ আছে।

তুই এম এস সিতে ভর্তি হলি না কেন রে বিল্ব? ফর্ম টর্ম সব নিয়ে গিয়েও...

ইচ্ছে হল না। আমার আর পড়াশুনা করতে ভালো লাগে না।

তোদের গরীবদের নিয়ে আর পারা যায় না। একটা কেরানিগিরি জোটাবার জন্য হন্যে হয়ে ঘোরাঘুরি শুরু করেছিস নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ রে, ঠিক ধরেছিস।

আমি যখন নরোয়ে যাব, তোকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। তুই যাবি ?

উত্তর না দিয়ে বিল্ব হাসল শুধু।

ঘড়ি দেখে ব্যস্ত হয়ে দেবজ্যোতি বলল, কাল পরশু দেখা করিস একবার....চলি, আর সময় নেই—

বিল্ব কিছুক্ষণ দাড়িয়ে রইল এক জায়গায়। দেবজ্যোতি ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। তিনটি মেয়ে ও দুটি ছেলের একটি ছোট দঙ্গল সেই সময় ডান পাশ দিয়ে আসছিল, তাদের মধ্য থেকে একটি মেয়ে চলে এল দেবজ্যোতির কাছে। কী একটা কথায় তারা দু'জনেই মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল। তারপর সবাই ঢুকে গেল ভেতরে।

লোহার গেট ও উঁচু দেয়াল দিয়ে সায়েন্স কলেজ বিল্ডিংটা রাস্তা থেকে আলাদা করা। ওর ভেতরে একটা অন্যরকম জগৎ আছে। বিল্বর কোনোদিন দেখা হবে না।

হে প্রবাসী

বিল্ব একটা বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়ায়। কিন্তু সে বাড়ির কোনো মানুষকে যে চেনে না! বিল্ব রাস্তা দিয়ে হাঁটে, এই রাস্তা তার অজানা। বিল্ব তার বাল্যকালের দিকে ফিরে তাকায়, সে নিজেকে দেখতে পায় না সেখানে। সে এখানকার কেউ নয় ? কেউ যে সন্ধে-বেলা ডাকে, ফিরে এসো, ফিরে এসো! কারা ডাকছে, কোথায় যাবার কথা! একলা একলা ঘুরতে ঘুরতে বিল্ব হারিয়ে যায়, খুব গভীরভাবে হারিয়ে যায়। একটা পার্কের মধ্যে ঢুকে পুকুরের জলের দিকে তাকিয়ে সে ফিসফিস করে বলে, এবারে খুঁজে নিতে হবে, নিজেকে খুঁজে নিতে হবে।

মায়াকাননের ফুল

এই লেখাটি পড়তে গিয়ে প্রথম দিকে পাঠক-পাঠিকাদের খানিকটা খটকা লাগতে পারে। মনে হবে অজস্র ছাপার ভুল। আসলে ইচ্ছে করেই অনেক বাক্য অসমাপ্ত রাখা হয়েছে। বাংলা ভাষার ক্রিয়াপদগুলো একটু একঘেয়ে। অনেক সময় সেগুলো বাদ দিলেও পুরো বাক্যের মানে বোঝা যায়। যেমন আমরা মুখের কথায় অনেক সময়।

লেখক খানিকটা বলে দিচ্ছেন বাকিটা পাঠক-পাঠিকারা কল্পনা করে নেবেন। অর্থাৎ লেখক ও পাঠক মিলেমিশে বাক্যগুলি তৈরি করছেন। এইভাবে, একটি উপন্যাসের মধ্যে লেখক ও পাঠকের সরাসরি যোগাযোগ হতে পারে। তবে, বলাই বাহুল্য, এটা একটা সামান্য পরীক্ষা মাত্র, বিরাট কোন দাবি নেই। তাছাড়া সব জায়গাতে যে ক্রিয়াপদ বাদ দিতেই হবে, এমন কোন ধনুর্ভঙ্গ পণও আমার। যখন যেমন মনে। অনেকটা কৌতুকের ছলেও।

কোথায় যাবো ? কোনো একটা নতুন জায়গায় ।

যেতে হবে ট্রেনে। আগে থেকে টিকিটফিকিট কিছুই। ইচ্ছেই তো জাগলো বিকেলে। সারা ট্রেনটি মানুষে জম-জমাট। প্ল্যাটফর্মের এক-প্রান্ত থেকে অন্য-প্রান্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে। কোন কামরাতেই আর একজনও অতিরিক্ত মানুষের জায়গা হবে না। শুধু ফার্স্ট ক্লাসের বগিগুলো এখনো কিছু ফাঁকা। কিন্তু থার্ড ক্লাসে টিকিট ফাঁকি দেবার অভ্যাস থাকলেও ফার্স্ট ক্লাসে নেই। এরকম ঝুঁকি নিতে সাহস ঠিক।

কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা নিচে নামিয়ে রেখে একটা সিগারেট। যা হোক কিছু একটা করা।

স্টেশন থেকে কোনোদিন ফিরে যাইনি। শেষ মুহূর্তে যে কোনো কামরায় লাফিয়ে উঠেও অন্তত।

শুনেছি, কাকে যেন ঘুষ দিলে থ্রি-টায়ার বা টু-টায়ার কামরায় টিকিট পাওয়া যায় যে কোনো সময়ে। কিন্তু যাকে সেই ঘুষটা দিতে হবে তাকে খুঁজে বার করবো কী উপায়ে ? ঘুষখোরদের কি মুখ দেখে চেনা যায় ? তাছাড়া ঘুষ দেবার সঠিক পন্থাটা কী ? টাকাটা কি আগে থেকেই বাড়িয়ে দিতে হয়, না ওরা নিজেরাই ? ওদের মধ্যে যে একটি মাত্র সৎলোক আছে, যদি আমি ঠিক তার সামনেই পড়ে যাই ? যদি সে রাগ ও দুঃখের সঙ্গে বলে, ছিঃ, আপনি আমাকে অপমান ?

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, আমি এ পর্যন্ত কখনো কারুকে ঘুষ দিই-নি। কারুকে নিতেও দেখিনি। এমনকি, এতগুলো বছর বেঁচে আছি এই পৃথিবীতে, এরকম একটা বড় শহরে, অথচ আমার চোখের সামনে একটাও মৃত্যু ঘটেনি, দুর্ঘটনাও না। আর সবাই দেখেছে, আমারই দেখা হয়নি। কোনো নিষ্ঠুর রমণীও আমার চোখে পড়েনি। কত কী যে বাকি আছে।

—দাদা, আগুনটা

পাশ ফিরে দেখলাম, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একজন মধ্যবয়স্ক ফর্সা চেহারার লোক, মুখে সিগারেট গোঁজা, হাতটা আমার সিগারেটের দিকে। লোকটির নাক ও চোখে স্পষ্ট মঙ্গোলীয় ছাপ। এমন হতে পারে, তিব্বতরাজ একবার যখন বাংলাদেশ জয় করেছিলেন, তখন তাঁর সৈন্য বাহিনীর কারুর সঙ্গে এদের পরিবারের রক্তের সংমিশ্রণ। এরকম হঠাৎ মনে আসে।

ধীরে সুস্থে পকেট থেকে দেশলাইটা। ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত

লক্ষ রাখলাম লোকটির দিকে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যে অন্য কারুর কাছ থেকে আগুন চায়, সে নির্ঘাত কৃপণ। কেননা কাছেই দেশলাই কিনতে। এটাও আমার এক মুহূর্তের চিন্তা। পরে ভুল প্রমাণিত।

দেশলাইটা ফেরত দিয়ে লোকটি হন হন করে চলে গেল সামনের দিকে। ধুতি পরা লোকের এতজোরে হাঁটা কি ঠিক ?

বাচ্চাদের ঝুমঝুমির যে রকম আওয়াজ, স্টেশনের মানুষজনের ভিড়ের মধ্যে সেই রকম একটা আওয়াজ সব সময়। তাছাড়া, একই সঙ্গে এখানে ব্যস্ততা ও মন্থরতা। বেঞ্চগুলোতে যারা জায়গা পেয়েছে তারা এরই মধ্যে একটু ঘুমিয়ে নেয়। গরম দেশে শুধু পুরুষ নয়, নারীরাও প্রকাশ্যে ঘুমোতে লজ্জা পায় না। এই সন্ধেবেলাতেও। আমার একটুও ভালো লাগে না এসব দেখতে।

জানালাগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে। কোনো জানলার পাশে যদি কোনো সুন্দরী। যে কোনো একটা কামরায় উঠতেই হবে, তখন মোটামুটি একটু চোখের আরাম যাতে। সে রকম কেউ নেই। হঠাৎ নাকি জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মেয়েদের গলার হার টেনে ছিঁড়ে নেয় আজকাল। মেয়েরা তাই ভেতরের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে।

আমার খুব কাছেই দুটি যুবক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কলা খাচ্ছে। বেশ নধর, পাকা হলুদ রঙের। লক্ষ রাখি, কলার খোসা ওরা কোথায়। ছেলেবেলায় বয়স্কাউট ছিলুম তো। কেউ প্ল্যাটফর্মে বা রাস্তার ওপর ফেললে তার সামনেই তাকে অপমান করার জন্য আমি খানিকটা আড়ম্বরের সঙ্গে পা দিয়ে সেগুলো সরিয়ে।

ছেলে দুটির কলা খাওয়া এখনো শেষ হয়নি, এর আগেই একটা অন্যরকম দৃশ্য। ওদের সামনে দাঁড়ালো একটি ভিখিরি। বেশ বৃদ্ধ ও লম্বা। ওরা প্রথমে তার দিকে নজর দেয় না। তারপর একসময় বিরক্ত। একজন তার হাতের অতিরিক্ত একটি কলা বৃদ্ধটির দিকে বাড়িয়ে বলে, এই নাও।

এটা নতুন কিছু নয়। এর পরেরটুকু।

ভিখিরিটি যেন কুঁকড়ে গেল। অত্যন্ত বিনীতভাবে বললো, না, না, না, আমার ভুল হয়েছে। আপনাদের মুখের গ্রাস।

—আরে নাও না, নাও না, বলছি তো।

—আমায় মাপ করবেন, আমার ভুল হয়েছে।

ভিখিরিটি দ্রুত সেখান থেকে পা চালিয়ে। আমি সেদিকে একটু

চিন্তিতভাবে। অদ্ভুত তো। এই ঘটনাটা দেখে আমার কিছু একটা মনে হওয়া উচিত ছিল। চোখের সামনের যে কোনো ঘটনা সম্পর্কেই আমরা তক্ষুনি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে। এই ভিখিরিটিকে দেখে আমার খুশি হওয়া উচিত না বিরক্ত? ভদ্র ভিখিরি হিসেবে এ অনন্য, কিংবা অন্য ভিখিরিদের চেয়েও অনেক বেশি বোকা?

তারপর হাসি পেল। ভিখিরিও মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিতে চায় না। অথচ।

ঘন্টা বাজলো। এবার ট্রেন। আমি সোজা সামনের কামরার দিকেই পা বাড়াচ্ছিলুম, এমন সময় সেই মঙ্গোলিয়ান মুখ ভদ্রলোকটি হন্তদন্ত হয়ে আমার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কোথায় যাবেন?

—কেন বলুন তো?

—একটা টিকিট আছে, এক্সট্রা...আমাদের একজন লাস্ট মোমেন্টেও এলো না।

—কোথাকার টিকিট?

—ডেহরি অন শোন···আপনি যা দাম দিতে চান, মানে আপনি যদি অতদূরে নাও যান...এখন তো আর ফেরত দেবার সময় নেই...

—আমি ডেহরি অন শোনেই যাবো। কত টাকা দিতে হবে।

—আগে উঠে পড়ুন, উঠুন, গাড়ি এক্ষুনি।

লোকটি আমার হাত ধরে প্রায় টানতে টানতেই। দরজার সামনে বেশ ভিড়। তার মধ্যে সেই ভিখিরিটা। কেউ কেউ তাকে ধমক দিচ্ছে, আরে বাবা, সরো, সরো—

আমি কোনোক্রমে ভেতরে ঢুকে। আস্ত একটি বাঙ্ক আমার জন্য। টিকিট ও রিজার্ভেশন কার্ড হাতে দিয়ে লোকটি বললো, একেবারে ওপরেরটা। আপনার অসুবিধে হবে না তো?

—না, কিছু না।

—আপনি ডেহরি অন শোনেই যাচ্ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—আশ্চর্য! কি অদ্ভুত যোগাযোগ।

বস্তুত এইখান থেকেই গল্পের শুরু। ডেহরি অন শোনে আমার চেনা কেউ নেই, কোনো দিন সেখানে যাওয়ার কথা ভাবিইনি। একে-

খারে নিরুদ্দেশে কেউ বেরিয়ে পড়ে না, বিশেষত আমি পরীক্ষাতেও ফেল করিনি, প্রেমেও ব্যর্থ হইনি এখনো। মনে মনে এঁটে রেখে-ছিলাম, সমীরের ওখানে যদি...খুব বেশি দূর নয়।

কিন্তু অত্যন্ত ভিড়ের ট্রেনে যদি কেউ আমাকে হঠাৎ একটা টিকিট দেয়, তবে আর সেখানে না যাওয়ার কোনো যুক্তি আমার নেই। ব্যাপারটাকে আরও যুক্তিযুক্ত করার জন্য আমি কাঁধের ব্যাগটা ওপরের বাঙ্কে রেখে, ফের দরজার কাছে এসে সেই লম্বা মতন ভিখিরিটাকে দশ পয়সা। সে যখন নমস্কার করতে আসে, আমি লক্ষ করি, তার ডান হাতে ছটা আঙুল।

মঙ্গোলিয়ান-মুখ লোকটির নাম অরবিন্দ ভৌমিক। তার বন্ধুর আসার কথা ছিল, কেন আসতে পারেনি, সেজন্য ঈষৎ দুশ্চিন্তিত মুখে আমায় প্রশ্ন করলো, বলতে পারেন, বেলেঘাটার দিকে আজ কোনো গণ্ডগোল হয়েছে কিনা।

এটা আমি সত্যিই জানি যে সকালবেলা বেলেঘাটায় একজন রাজ-নৈতিক কর্মী নিহত হয়েছে। দুপুরবেলা রেডিওতে।

—আপনার বন্ধুর নাম কি?

—অশেষ মজুমদার, চিনতে পারবেন বোধ হয়, জাস্টিস চন্দ্রভূষণ মজুমদার—যিনি আবার ক্রিকেট কণ্ট্রোলবোর্ডে...তাঁর মেজো ছেলে.... আমার ফার্স্ট ফ্রেণ্ড।

একটু থেমে কি যেন চিন্তা করে আবার বললো, অশেষ কোনোদিন কথা দিয়ে ফেইল করে না। যাক গে, আপনাকে কিন্তু ট্রেনে এই নামেই, মানে চেকার যদি আসে—নাম জিজ্ঞেস করে না অবশ্য, তবু যদি, আপনি তা হলে ঐ নামটা—

—কোন নাম?

—আমার বন্ধুর নাম যা বললাম।

এমনও হতে পারে, অশেষ মজুমদারই আজ বেলেঘাটায়। রেডিওতে যেন ঐ রকমই একটা নাম। ট্রেনে আমাকে ঐ নামেই। কিন্তু অরবিন্দ ভৌমিকের বন্ধু হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, বয়েসের তফাতের জন্যই—

চলন্ত ট্রেনের হাওয়ায় কেউ বুকের কাছে জামায় হাপর দিয়ে ঘাম শুকোবার। বাইরে আলো অতি ক্ষীণ। এর মধ্যেই ওপরের বাঙ্কে

উঠে বসা চলে না, রাত মাত্র আটটা। কেউ কেউ অবশ্য এরই মধ্যে ঘুমের তোড়জোড়।

অরবিন্দ ভৌমিক একা নয়, তার সঙ্গে একজন বৃদ্ধা। তিনি উল্টো দিকে চক্ষু বুজে। অরবিন্দ ভৌমিক বললো, মা তুমি একটু এ-দিকে এসে বসো তো—ওনাকে একটু বসার।

একজন মাসিক পত্রিকা পাঠরত যুবকের পাশে আমি এসে। তার-পর পকেট থেকে টাকা পয়সা বার করে অরবিন্দ ভৌমিকের সঙ্গে। সামান্য খুচরো সাত পয়সার হিসেব মেলানো যায় না। সে বললো ঠিক আছে।

আমি সেটা মানতে রাজি নই। ভিখিরিটিকে দশ পয়সা না দিলে ঠিকই হিসেব মিলে যেত—একথা অবধারিতভাবেই আমার মনে পড়ে। সে কথা মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আমি বললাম, আচ্ছা, কাল সকালে।

—আপনি আচ্ছা লোক তো—মোটে সাতটা পয়সা।

সাতের সঙ্গে পাঁচ যোগ করলেই একটা দেশলাই কেনা যায়। আমি পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করে ওর দিকে এগিয়ে দিতে গিয়েই ফের হাত সরিয়ে। ওর মায়ের সামনে।

কিন্তু ওর মায়ের সামনে কি আমি সিগারেট খেতে পারি? মনঃস্থির করতে পারি না। বৃদ্ধা যখন সরু চোখে আমারই হাতের দিকে। আমি ম্যাজিশিয়ানের কায়দায় সিগারেট দেশলাই লুকিয়ে। একটা অস্বস্তি।

আমার পাশের যুবকও অন্যমনস্কভাবে ফস করে সিগারেট জ্বালিয়েই ধোঁয়া ছাড়লো সোজা সামনে। এর কোনো বাধা নেই। এ তো অরবিন্দ ভৌমিকের বন্ধুর টিকিটে যাচ্ছে না।

এবার কামরাটার দিকে ভালো করে চোখ বুলিয়ে। আমাদের কিউবিক্‌লে ছ'জন মানুষের মধ্যে বাকি দু'জন: একজন বছর তিরিশেক বয়সের বউ ও একটি চোদ্দ পনেরো বছরের ফ্রক পরা মেয়ে। এদের আমি আগেই দেখেছি কিন্তু সরাসরি চোখের দিকে তাকাইনি। এখন আমরা সহযাত্রী, এখন কোনো বাধা নেই।

—আপনি ডেহরি অন শোনে কোথায় যাবেন?

এর উত্তর আমি একটু আগেই ভেবে ঠিক করে। আলগাভাবে বললাম, ওখান থেকে আবার ট্রেন বদলাবো।

—কোনদিকে ? ডাল্টনগঞ্জের দিকে ?

যেন ঐ সব অঞ্চল আমার কতই চেনা, এই ভঙ্গিতে শুধু মাথা নাড়ি। তারপর ব্যস্তভাবে বলি, একটু আসছি।

অরবিন্দ ভৌমিক আমার বন্ধু নয়, আমার অভিভাবক নয়, তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসার তো কোনো প্রয়োজন নেই। তবু যেন কেন আমার একটু কৃতজ্ঞ ভাব। একটা টিকিট দিয়েছে বলে ? টিকিটটা ওর নষ্ট হতোই। কিন্তু, প্ল্যাটফর্মের মত ভিড়ের মধ্যে শুধু আমাকেই নির্বাচন।

অকারণেই একবার বাথরুমের দিকে ঘুরে ফিরে। অন্যান্য কিউবিক্‌লের যাত্রীরা এরই মধ্যে বিছানাপত্র গোছাতে ব্যস্ত, মাত্র আটটা বেজে পনেরো কুড়ি। অনেকে খাবারের কৌটো খুলে। চারজন যুবক তাস খেলায়। সমস্ত কামরাটি ঘুরে এসে আমি একটি কালো সিল্কের বোরখা পরা, ইদানীং মুখটুকু খোলা, মুসলমান রমণীকেই সুন্দরী শ্রেষ্ঠা আখ্যা দিই। আমাদের জায়গাটা থেকে সে অনেকটা দূরে। ভোরবেলা উঠেই এঁর মুখ দর্শন করতে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাতেই মনে পড়লো, সারারাত কি এই জন্য আমাকে বারবার উঠে আসতে হবে ? সিগারেট ছাড়া তো আমি বেশিক্ষণ। তা ছাড়া এত হাওয়ায় সিগারেট ঠিক জমে না।

চাঁদের হালকা ছায়া পড়েছে পৃথিবীতে। অসুন্দর শহরতলিও এখন একটু একটু রহস্যময়। বিশেষত খাল বা পুকুরের জল যখন অন্ধকারের মধ্যে চকচক করে ওঠে। জলের প্রতি আমার বড় বেশি টান। অচেনা জল দেখলেই ভালোবাসতে। হঠাৎ বুকের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে শৈশব।

মনে হয়, জলের ওপাশে ঐ যে প্রান্তর, যেখানে অন্ধকার আরও গাঢ়, সেখানে একটা গোপন সুড়ঙ্গ হয়তো। তার ওপাশেই স্বর্গ। এসব ছেলেবেলার কথা। পকেটে সব সময় একটা গুলিসুতোর ডিম থাকতো যদি কখনো সুড়ঙ্গে ঢুকতে হয়—

ফিরে এসে দেখলাম, সকলেই বিছানা পেতে ঠিকঠাক। মাসিক পত্রিকা-হাতে যুবকটি বললো, আপনি বসবেন তো বসুন না—

তাহলে ওদের বিছানার ওপরেই বসতে হয়। বিছানাটি বধূটির। ইংরেজ-ভদ্রতার সঙ্গে বলি, না, না, আমি ওপরেই.

একদম নিচের দুটি বাঙ্কে মহিলা ও বৃদ্ধা। মাঝখানের দুটিতে কিশোরী ও মাসিক পত্রিকা। আমার ওপাশে অরবিন্দ ভৌমিক।

চটি খুলে ওপরে আগে রেখে তারপর কসরত করে ওঠা। ব্যাগটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়তেই অরবিন্দ ভৌমিক বললো, আপনি বিছানা আনেননি ?

আমি আরও কী কী আনিনি তার একটি তালিকা তক্ষুনি শুনিয়ে দেওয়া উচিত। তার বদলে একটু সাদা-মাটা হাসির সঙ্গে জানালাম, না, দরকার হয় না।

—আমার সঙ্গে একটা এক্সট্রা বালিশ আর চাদর আছে।

অনেক মানুষই বোঝে না যে অপরের কাছ থেকে কোনো রকম দয়া বা সাহায্য নেওয়া কারুর কারুর পক্ষে কি রকম অস্বস্তিকর। আমি আপন মনে থাকতেই বেশি।

—না। সত্যিই কোনো দরকার নেই।

—আরে নিন না। শুধু শুধু কষ্ট করবেন কেন ?

নিতেই হলো। অপরের চাদর ও বালিশে কি রকম যেন অন্য লোক অন্য লোক গন্ধ। যদিও হোটেল কিংবা ডাকবাংলোতে একথা মনে হয় না। ধন্যবাদ বলার বদলে আমার মুখটা আড়ষ্ট হয়ে। ঝোলা থেকে একটা বই বার করে।

একটা দেশলাইয়ের বাক্স খালি হয়ে গেছে। সেটা অ্যাশট্রে হিসেবে। এখানে সিগারেট ধরাতে কোনো অসুবিধে নেই। এবার বেশ আরাম বোধ। ট্রেনে শুয়ে শুয়ে যাওয়া কী সৌভাগ্য। এখানে প্রত্যেকের জন্য প্রমাণ মাপের শোওয়ার জায়গা। অতিরিক্ত মাত্র সাড়ে চার টাকা। অন্য কামরাগুলোতে বহুলোক দাঁড়িয়ে। অনেকে দু'পায়ের উপর সমান ভার রাখতেও পারেনি।

কোনো নতুন জায়গায় যাওয়ার আগেই সেই জায়গাটা কল্পনায় দেখে নেওয়া আমার অভ্যেস। ডেহরি-অন-শোন জায়গাটা কেমন ? স্টেশনের ওপর দিয়ে অনেক বার গেছি কিন্তু কোনো বারই। এখন কেনই বা আমি যাচ্ছি সেখানে। যাই হোক, জায়গাটা কী রকম ? স্টেশনের পাশেই একটা বিশাল গুলমোহর গাছ। ব্রীজের গা দিয়ে নদীতে নামার জন্য সিমেন্টের সিঁড়ি। তার মধ্যে একটা সিঁড়ি মারাত্মক রকম ভাঙা। সিঁড়িতে সামান্য রক্তের দাগ। আমি স্পষ্ট দেখতে।

শুকনো রক্ত। একদল ছেলে দুপদাপ করে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে। জানতে হবে তো রক্তের ছোপটা কিসের।

কিশোরী মেয়েটি এর মধ্যে ঘুমিয়ে। অরবিন্দ ভৌমিকের সঙ্গে চোখাচোখি এড়াতে গেলে আমাকে ওরই দিকে তাকাতে।

একটা ব্যাপারে খটকা লাগে। অরবিন্দ ভৌমিক যাচ্ছে তার মায়ের সংগে, আর এক বন্ধুর আসার কথা ছিল। কি রকম যেন অদ্ভুত কম্বিনেশন। মাসিক-পত্রিকা পড়া যুবকটির সঙ্গে বিবাহিতা মহিলা ও কিশোরীটির সম্পর্ক কি? মহিলাটি ও যুবকটি ভাই বোন? এরা এত কম কথা বলে কেন। কিশোরী মেয়েটি, বিশেষত, কি দারুণ গম্ভীর। ট্রেন যাত্রার চাঞ্চল্য পর্যন্ত নেই। এই বয়েসের সকলেই তো। হোক না অচেনা, তবু ঠিকঠাক সম্পর্ক না মিললে মনটা কী রকম যেন অপ্রসন্ন হয়ে।

কী একটা স্টেশনে ট্রেন থেমেছে। তুমুল হৈ হৈ। বহু লোক জোর করে কামরায়। শুয়ে-থাকা মানুষগুলো চিৎকার করে উঠলো, দরজা, দরজা। কেউ নিজে থেকে উঠছে না। কামরা প্রায় ভরে গেছে বাইরের লোকে। তখন শুয়ে-থাকা মানুষের হুকুম, এই নিকালো, নিকালো. দেখতা নেই হ্যায়, রিজার্ভ কম্পার্ট—

—কে দরজা খুলেছে, কে? দরজাটাও বন্ধ করে রাখা হয়নি? অ্যাঁ?

আমি চোরের মতন গুটিশুটি মেরে চুপচাপ। শেষবার আমিই সিগারেট খাবার সময় দরজা খোলা রেখে। কেউ কি টের পেয়েছে যে আমিই?

অনেকক্ষণ ধরে চ্যাঁচামেচি ও হল্লা। যারা উঠে এসেছে তারা কেউ নামবে না। তাদেরও তো যেতেই। কণ্ডাকটর-গার্ড উধাও। বচসা চলতে চলতেই ট্রেন হঠাৎ ছেড়ে। তখন আদি যাত্রীরা যে-যার নিজের বাঙ্কে গিয়ে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে, প্রত্যেকেই একটু বেশি লম্বা হয়ে যায়, যাতে আর একটুও জায়গা না থাকে, আর কেউ সেখানে বসতে।

ফর্সা জামাকাপড় পরা নবাগতরা দাঁড়িয়েই থাকে, তাদের মুখমণ্ডলে অভিমান ও রাগ। অন্যরা মেঝেতেই। আবার ঠিক চোখের নিচেই এক জোড়া সাঁওতাল দম্পতি, এদের কাপড় যদিও অত্যন্ত পরিষ্কার, তবু এরা মেঝেতেই এবং মুখে কোনো অভিমান নেই। দুটি

পুঁটলির ওপর ওরা দু'জন। ওদের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে। যেন বিহ্বলতার সমুদ্র থেকে এই মাত্র স্নান করে এসেছে।

অরবিন্দ ভৌমিক মুখ বাড়িয়ে ফিসফিস করে বললো, ঘুমের দফা গয়া। মালপত্তরের ওপর নজর রাখতে হবে, বুঝলেন! কত চোর-ছ্যাঁচোড় আছে এর মধ্যে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস।

কিশোরী মেয়েটি এখন জেগে। সম্পূর্ণ খোলা চোখ, তার ঠোঁটে একটু দুঃখ-দুঃখ ভাব। এই বয়সে হয়। এত হৈ চৈ-এর মধ্যেও ও একটিও কথা বলেনি।

মেয়েটির নাম কি?

আমার কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু এই স্বল্পবাক কিশোরীটির একটি নাম না দিলে, এর চরিত্র সম্পূর্ণতা পায় না। হলুদ রঙের স্কার্টের বদলে যদি ও শালোয়ার কামিজ পরে থাকতো, তা হলে আমি যেমন ওকে অগ্রাহ্য।

বার বার ওর দিকেই আমার চোখ। শুধু ওর রূপের জন্যই নয়। ওর নীরবতা। এই বয়েসের সব মেয়েরই শরীরে একটা হঠাৎ-আসা লাবণ্য বড় উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এর রূপ তার চেয়েও কিছু বেশি। কিন্তু এই বয়েসটা তো উচ্ছলতারও। ও কেন এত চুপ?

চোখ বুঁজে মেয়েটির একটা নাম বসাবার চেষ্টা করছি এমন সময় কান্নার শব্দ। চমকে নিচের দিকে। প্রথমে বুঝতে পারি না। কে? কোন দিকে? তারপর শব্দ অনুসরণ করে। কিশোরী মেয়েটিই দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। মধ্যের যুবকটি হাত বাড়িয়ে উদ্বেগের সঙ্গে বললো, রমু, কি হয়েছে?

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে কান্না থামিয়ে দেয়। যুবকটি আবার বলে, এই রমু, কি হয়েছে?

বুঝতে পারি সমস্ত কামরা উৎকর্ণ হয়ে আছে মেয়েটির উত্তর শোনার জন্য। একতলার বধূটিও উঠে দাঁড়িয়ে।

অতি ব্যস্ততায় আমার এক পাটি চটি পড়ে গেল নিচে। সাঁওতাল যুবকটির গায়ের ওপরে।

সাঁওতাল যুবকটি তার সুন্দর বড় চোখ মেলে তাকালো আমার দিকে। তাতে বিস্ময় কিংবা বিরক্তি আছে বোঝা যায় না।

আমি মরমে মরে গিয়ে অত্যন্ত লজ্জিত গলায় বলি, ভাই, কিছু মনে করো না।

চটিটা আমার হাতের ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে ওর গায়েই। ছি ছি। এই বিশ্রী ব্যাপারটার জন্য আমি সেই মুহূর্তে মেয়েটির দিকে মনোযোগ দিতে পারি না।

আমি নিচে নামবার আগেই সাঁওতাল যুবকটি আমার চটিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

এতে আমি আরও বেশি লজ্জিত বোধ। অপরের জুতো হাতে নেওয়া মোটেই সুচারু ব্যাপার নয়। কেন ও আমার জুতো। আমি ওর কাঁধে স্নেহের হাত রেখে বলি, ভাই, কিছু মনে করোনি তো।

এ কথার কি উত্তর দিতে হয় সে জানে না। এ সব ভদ্রলোকি ভাষা। যেমন আমি ওকে 'তুমি' সম্বোধন করছি। কাল সকাল থেকে আমি ওকে আপনি।

ঠিক। অনেক কিছুই কাল থেকে শুরু করবো, এই রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার বহুদিনের দুর্বলতা।

আমার নিচের বাঙ্কের যুবকটি ওকে একটু ঠ্যালা মেরে বললো, এই একটু হঠ্ যাও তো!

তারপর কিশোরী মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো, এই রমু, তোর কি হয়েছে? বল্ না কি হয়েছে?

মেয়েটি কান্না থামিয়ে এখন নীরব। অনেক সময় স্বপ্নের মধ্যে ভয় বা দুঃখ পেয়ে এ রকম কান্না। কিন্তু মেয়েটি তো জেগেই। এক মিনিট আগেই দেখেছি। ওর খোলা চোখ। ওর এখনকার নীরবতাই আরও বেশি কৌতূহল-উদ্দীপক।

—রমু, কাঁদছিলি কেন?

মেয়েটি এবার বললো, কিছু না। তারপর সে অন্যদিকে মুখ। এই সময় ট্রেন একটা ব্রীজের ওপর দিয়ে যায়, বিরাট শব্দ। যেন সমস্ত লৌহসভ্যতার তারস্বরে চিৎকার।

—তোর পেট ব্যথা করছে?

—না।

—তাহলে কাঁদছিলি কেন?

একতলার বাঙ্কের মহিলাটি উঠে এসে শান্ত হুকুমের সুরে বললেন, কি হয়েছে আমাকে বল তো।

—কিছু হয়নি বলছি তো।

—আমার দিকে মুখ ফেরা।

কিশোরী মেয়েটি মুখ ফেরালো। তখনো তার চোখের দুপাশে অশ্রুরেখা। আমার বুকটা মুচড়ে ওঠে। এই চোদ্দ পনেরো বছরের মেয়েটির কি এমন দুঃখ, যাতে রাত্রে ট্রেনের কামরায় একা একা সে কেঁদে ওঠে। মনে হয় এই দুঃখের অতলতা আমি ছুঁতে পারবো না। আমি সতর্ক হয়ে রুমাল। অন্য কারুর কান্না দেখলে হঠাৎ আমারও চোখে।

অরবিন্দ ভৌমিক বললো, যদি পেট-টেট ব্যথা করে....আমার কাছে ওষুধ আছে।

দেখা যাচ্ছে অন্যদের সাহায্য করার জন্য এর কাছে অনেক কিছুই মজুত। অবশ্য ওর কথায় কেউই ভ্রূক্ষেপ। মহিলাটি মৃদু ধমকের সুরে মেয়েটিকে বললেন, ছিঃ, এরকম কোরো না।

যুবকটি ও মহিলাটি দু'জনেই গম্ভীর। খুব একটা ব্যস্ততা বা উদ্বেগের চিহ্ন তো। ভেবেছিলাম ওঁরা মেয়েটির হঠাৎ কেঁদে ওঠার কারণ জানার জন্য। কিন্তু এখন মহিলাটি বললেন, কেঁদে কী হবে? ও রকম ভাবে কাঁদতে নেই।

মেয়েটি হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছলো। তারপর বললো, ঠিক আছে, তোমরা শোও।

মহিলাটি চলে গেলেন নিজের বিছানায়। যুবকটি তখনো দাঁড়িয়ে। সমস্ত কামরার লোক যে ওদেরই দিকে তাকিয়ে আছে, এটা জেনে সে একটু বিব্রত। ফস করে একটা সিগারেট জ্বেলে সে বললো, রমু ঘুমিয়ে পড়—

যেন ঘুমটা কারুর হুকুমের ওপর নির্ভরশীল। মেয়েটি কোনো উত্তর দিল না। তার গাম্ভীর্য ও কান্না, এই দুটি মিলিয়েই এই কিশোরী মেয়েটিকে বেশ খানিকটা উঁচু করে।

অরবিন্দ ভৌমিকের নাক সশব্দে। কামরায় হুড়হুড় করে অবাঞ্ছিত লোক উঠে পড়ায় ও বসেছিল, চোর ছ্যাঁচোড় থাকতে পারে। সারারাত জেগে নজর রাখতে হবে।

কিশোরী মেয়েটি চিত হয়ে শুয়ে। হাত দুটি আড়াআড়ি করে চোখের ওপরে। কান্না লুকোবার জন্য কিংবা আলো আড়াল করার

জন্য, কে জানে। আমি ওর পায়ের ডগা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে তন্ন তন্ন করে। পায়ের নখে রক্তকুঙ্কুম। পরিচ্ছন্ন গোড়ালি। হাঁটু পর্যন্ত নগ্ন। তার সুডৌল পায়ের গোছ দেখে সাহেবরা প্রশংসা করতো। হলুদ রঙের স্কার্ট। কোমরে একটা বেল্টের মতন স্ট্র্যাপ থাকায় কোমরটি যথেষ্ট সরু দেখায়। তার বুকের স্বাস্থ্য ভালো। তার গলা দেখলে টিনকাটা মাখনের কথা মনে আসবেই। ধারালো চিবুকে খানিকটা জেদী ভাব। ঠোঁটে যেন লেগে আছে অভিমান। কিংবা ওটা আমার কল্পনা। রমু। ওর পুরো নাম কি? রমা কিংবা রমলা নাম তো ওকে মানায় না। দেখলেই বোঝা যায়, ও এখনো ঘুমোয়নি। কি ওর দুঃখ?

পাশের কিউবিক্‌লে কিসের যেন বাগ্‌বিতণ্ডা। উৎকর্ণ হই। নতুন কিছু না, জায়গা দখলের লড়াই। আমাদের এদিকে নিচের দুটি বাঙ্কেই স্ত্রীলোক বলে কেউ জোর করে বসতে আসেনি। অন্য জায়গায় ছাড়বে কেন? এদিকের মেঝেতে সাঁওতাল দম্পতি ছাড়া আর কেউ নেই। দূরে এখন সবাই মোটামুটি মালপত্রের ওপর একটা না একটা বসার জায়গা।

পুঁটলি থেকে খাবার বার করে সাঁওতাল দম্পতি এখন ডিনার সেরে নিচ্ছে। কয়েকটা লাড্ডু। ইঁটের মতন শক্ত চেহারা। সেগুলো দাঁত দিয়ে ভাঙতে ভাঙতে খুব নিম্ন স্বরে কথা। আগে লক্ষ করিনি, মেয়েটি গর্ভবতী। তাই ওর চোখে মুখে এত অলস লাবণ্য। আমি লোভীর মতন ওদের খাওয়া। আমার খিদে পায়নি, শুধু দেখতে ভালো লাগছে এখন! পরের জন্মে আমি সাঁওতাল হবো। এই রকম গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে ট্রেনের কামরায় মেঝেতে বসে লাড্ডু খাবো।

ট্রেনে আমার সহজে ঘুম আসে না। যদি জানলার কাছে বসার জায়গা একটা! অন্য সবাই এখন ঘুমোচ্ছে মনে হয়। আর একবার কিশোরীটির দিকে। কি জানি বোঝা যায় না। নিঃশ্বাসের স্পন্দনে তার বুক উঠছে নামছে না। কি সুন্দর এই বয়েস, যেন সবেমাত্র ভোর হলো। ভোরবেলার মতন একটি কিশোরী পা ফেলে আসছে যৌবনের দিকে। একমাত্র তাকেই মানায়, আমি বললুম সুন্দর, তাই এ পৃথিবী সুন্দর হয়ে উঠলো। তবু সে একা আপনমনে কেঁদে ওঠে কেন? আর কিছু না, তার ঐ রহস্যটার জন্যই তার খুব কাছাকাছি যেতে।

খুব সাবধানে বাঙ্ক থেকে নিচে। চটি জোড়াটা হাতে। আমি চলে এলাম বাথরুমের দিকে। এখানে মেঝেতে অনেক লোকজন বসে আছে, এত লোকের চোখের সামনে দিয়ে বাথরুমে যাওয়া বিশ্রী ব্যাপার।

একটু বিরক্তভাবে আমি বললাম, অন্য কোনো কামরায় আর জায়গা নেই ?

একজন বিদ্রূপের সুরে বললো, তাহলে আর এখানে এসেছি কেন, এখানে কি বেশি মধু আছে ? আপনি শোওয়ার জায়গা পেয়েছেন, শুয়ে থাকুন না।

শুধু শুধু এদের কাছে ধমক। কী দরকার ছিল আমার মাথা ঘামাবার ! সত্যিই তো অন্য কামরায় জায়গা থাকলে কেনই বা এখানকার মেঝেতে। আমরা অনেক সময় জেনেশুনেও এরকম অবাস্তব প্রশ্ন।

আমি বাথরুমের দরজায় হাত দিতেই আর একজন বললো, ভেতরে লোক আছে।

অগত্যা একটা সিগারেট। আমার বিদ্রূপকারীই ফস করে হাত বাড়িয়ে বললো, একটু আগুনটা।

লিকলিকে চেহারার একটি ছেলে। এই রকম রোগা লোকরা বেশির ভাগ সময়ে রেগে থাকে। শারীরিক শক্তির অভাবটা কণ্ঠস্বর দিয়ে।

—কত দূর যাবেন ?

—আর দুটো স্টেশন। আচ্ছা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?

আমি উৎসুকভাবে তাকাই। লিকলিকে ছেলেটি সিগারেটটা গাঁজার কল্কের স্টাইলে ধরেছে আঙুলের ফাঁকে। কণ্ঠস্বর বেশ ভরাট। প্রশ্ন করলো, আপনি কি রাজবল্লভপাড়ায় থাকেন ?

—না তো।

—আপনার দাদা এরিয়ান্স ক্লাবে সেণ্টার ফরোয়ার্ড খেলে না ?

—না, আপনি ভুল করেছেন।

—কিন্তু আপনাকে আমি কোথাও দেখেছি। খুব চেনা চেনা লাগছে।

ছেলেটির দুটি তথ্যই সম্পূর্ণ ভুল। আমাকে ও অন্য কারুর সঙ্গে।

এরকম আমার প্রায়ই হয়। আমার চেহারা এতই সাধারণ যে অনেকেই ভাবে, আগে কোথাও।

তখন মনে পড়লো, আমি অশেষ মজুমদারের টিকিটে। ইচ্ছে হলো এই কৌতূহলী ছেলেটিকে বলি, আমার নাম অশেষ মজুমদার, আমি খুব সম্ভবত আজ সকালেই বেলেঘাটায় নিহত হয়েছি!

এই কৌতুক আমি নিজেই মনে মনে উপভোগ। ঠোঁটে চাপা হাসি নিয়ে আমি ওকে জানাই, আমার কোনো দাদা নেই। রাজবল্লভপাড়ার নাম শুনেছি বটে, কখনো যাইনি! আপনি আমাকে দেখে থাকতে পারেন।

—কোথায় বলুন তো, কোথায় বলুন তো—

—কার্জন পার্কে। ওখানে আমি ম্যাজিক দেখাই।

ছেলেটি সন্দেহভরা চোখ নিয়ে আমার মুখের দিকে। তারপর বলে, ট্রেন লেট করবে মনে হচ্ছে।

বাথরুমের দরজা এই সময় খোলে।

ফিরে এসে আমি আবার আমার বাঙ্কে। বইটা খুললাম। তারপরেই তাকালাম পাশে। কিশোরী মেয়েটি চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে। চোখ দুটি খোলা। সেখানে নিঃশব্দে অশ্রু। আমি অত্যন্ত ব্যাকুলতা বোধ করি। কেন একটি মেয়ে একা একা শুয়ে কাঁদবে? ওর সঙ্গের পুরুষ ও মহিলাটি এখন ঘুমন্ত। আমি ওর অচেনা, আমি তো ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে। যদি আর একটু ছোট হতো, যদি খুকি বলে সম্বোধন করা যেত। কিন্তু এখন ওর বিপজ্জনক বয়েস, অচেনা লোকের বেশি কৌতূহল কেউ সুনজরে দেখে না।

মেয়েটি পাশ ফিরলো। মনে হয় ওর শরীরটা কেঁপে কেঁপে। কান্না চেপে রাখার চেষ্টায়। কিংবা এটা আমার দেখার ভুল। কাঁপছে না! কেউ যদি স্নেহময় হাত ওর মাথায় বুলিয়ে এখন ওকে ঘুম পাড়িয়ে।

আমি কতদিন কাঁদিনি? বই পড়তে পড়তে কিংবা সিনেমা দেখার সময় প্রায়ই আমার চোখে জল আসে। সে অন্য। নিজের কোনো দুঃখে? মনে পড়ে না।

বইটা চোখের সামনে মেলা, আমি পড়ছি না। আমার সমস্ত কৌতূহল ঐ মেয়েটির দিকে। ও এখন আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে।

আমার ঐ রকম বয়সে, সদ্য স্কুল থেকে কলেজে, তখন আমি ম্যাজি-সিয়ান হবার স্বপ্ন ! ম্যাজিসিয়ান হয়ে দেশ-বিদেশে। পি সি সরকারের বই নিয়ে হিপনটিজম। জাদুসম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী ভোরবেলা ছাদে উঠে দূরের সবুজ গাছপালার দিকে একদৃষ্টে। ওতে চোখের জোর বাড়ে। শ্রেণীবদ্ধ নারকেল গাছগুলির পাশেই যে বাড়ি তার ছাদে একটি মেয়ে হাতে একখানি বই নিয়ে গোল হয়ে ঘুরতো। ভোর-বেলা ঘুরে ঘুরে পড়া মুখস্থ করার অভ্যেস ছিল তার। এবং আসলে সে-ই জানতো ম্যাজিক। অবিলম্বে সে আমাকে তার পোষা কুকুর বানিয়ে।

এর চার পাঁচ বছর বাদে নন্দিতা যখন সুশোভনকে বিয়ে করতে চায়, এবং আমাকে জানায়, তখন আমার মনে হয়েছিল, আমি দাতা কর্ণের চেয়ে বড়। আমি সব কিছু বিলিয়ে দিতে পারি, এমনকি আমার প্রেমিকাকেও। একদিন মাত্র আমি কথার ছলে সুশোভনের সামান্য নিন্দে করেই অত্যন্ত অনুতপ্ত বোধ করে। আমি এত নিচে নামতে পারি না। পৃথিবীতে আর যাকেই হোক, সুশোভনকে কোনো দিন নিন্দে করার অধিকার আমার নেই। সে আমার প্রেমিকার স্বামী। সে চিরকালের সম্মান পাবে।

ট্রেন কোন একটা স্টেশনে যেন। অস্পষ্ট শব্দ। ট্রেন কি অনেকক্ষণ থেমে আছে। এখন কত রাত। না, আবার চলছে···

নন্দিতার বিশেষ সাধ ছিল কোনো একদিন আমার সঙ্গে প্যারিসের রাস্তায়। তারপর যখন ও নিজেই যায় আমি তখন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়...একদিন একটা সাপ....

তন্দ্রার মত এসেছিল। মনে হয় যেন এক মুহূর্ত আগে চোখ বুজেছি, আসলে বেশ কিছুক্ষণ। বইটা পাশে ঝুলছে, আর একটু হলেই। বইটা তুলতে গিয়ে চোখ পড়লো। মেয়েটি তার জায়গায় নেই। কোথায় গেল ? রাত প্রায় দুটো। আমি ওর ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা। শূন্য বাঙ্কটার দিকে চোখ। সারা কামরা ঘুমন্ত। আমারও আবার ঘুম-ঘুম আসছিল, কিন্তু মেয়েটি ফিরে না এলে। এটা যেন আমারই দায়িত্ব।

তাকিয়ে আছি তো তাকিয়েই। এতক্ষণ কি করছে ও ? বাথরুমের দরজা বন্ধ ? এত রাত্রে ও যেখানে খুশি যেতে পারে। আমি বাধা দেবার কে ?

আমি আবার ঘুমোবার। চোখ বুজলেই একটা হালকা লাল রঙের আভা। চোখের ওপরেই আলো। পাশ ফিরলাম। এবারে বেশ মনোমতন অন্ধকার। যেন একটা ঘন জঙ্গল। প্রত্যেকদিন এই জঙ্গলটাকে দেখি। একদিন আমি ওখানে। হঠাৎ মনে হয় কোনো একটা জরুরি জিনিস বোধহয় বাড়িতে ফেলে। কি? টাকা, টুথব্রাশ, একটা ডটপেন, পাজামা, তোয়ালে—আর কি লাগতে পারে? আগামী কাল কি কারুর সঙ্গে দেখা করার। কিছু যেন একটা ভুল হয়ে। পেছনে, কলকাতায়, ফেলে এসেছি কোনো ভুল। কাল সকালে যদি মনে পড়ে, তখন অন্তত আড়াইশো মাইল।

মাস তিনেক আগে, যখন আসামে গিয়েছিলাম, শিলচর থেকে ডিমাপুর যাবার পথে, কি যেন স্টেশনের নামটা, কি যেন, ওরাং....না, না, ডিভিভ....না, না লালডেঙ্গা···না না মনে পড়েছে, হারাংগাজাও, কি চমৎকার নাম, যেন আমার পূর্বজন্মের জন্মস্থান, সেখানে, যেন, সেখানে একজন খুনে ডাকাত, হাতে হাতকড়া, আমাকে বলেছিল, আমাকে, পাশেই দাঁড়ানো দুটি পাহাড়ী তরুণী, তারা···

ধড়মড় করে জেগে উঠলাম। সত্যিই ঘুমিয়ে। এরকম উচিত হয়নি। তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে দেখলাম, ওদিকের দ্বিতীয় বাঙ্কটা তখনো ফাঁকা। মেয়েটি গেল কোথায়? এতক্ষণ।

খুব ব্যস্ত হয়ে আমি নেমে। ওর সঙ্গী যুবক ও মহিলাটি নিশ্চিন্ত ঘুমে। আমি প্রথমেই যাচ্ছিলাম বাথরুমের দিকে। তার দরজাটা খোলা। ঢকাস ঢকাস শব্দ হচ্ছে, তবু আমি একবার তার ভেতরে উঁকি।

মেঝেতে অনেক লোক বসেছিল, এখন একজনও নেই। মাঝখানের কোনো স্টেশনে নিশ্চয়ই সবাই। খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, হ্যাণ্ডেল ধরে, বাইরে মুখ ঝুঁকিয়ে।

আমি থমকে একটু দূরে। মেয়েটি যদি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাওয়া খেতে চায়, তা হলে আমার আপত্তি করার কি আছে? বিশেষত অচেনা মেয়ে। কিন্তু যে মেয়েটি খানিকক্ষণ আগে একা একা কাঁদছিল, সে যদি চলন্ত ট্রেনের খোলা দরজায়। আমি মনঃস্থির করতে পারি না। রাত্তিরবেলা চলন্ত ট্রেনের দরজায় দাঁড়ালে বিপদের স্পর্শ আছে, গুরুজনরা বকে, কিন্তু ঐ বয়েসে আমিও।

একটু দূরে আমি বিসদৃশ। অন্য সবাই ঘুমিয়ে, আমি একটি কিশোরী মেয়ের কাছাকাছি উঁকিঝুঁকি। খুব সহজভাবে যদি ওর সঙ্গে ভাব করা যায়, সেটাই খুব স্বাভাবিক, কিন্তু আমি কখনো সহজ হতে পারি না।

হঠাৎ মনে হলো, মেয়েটি বুঝি আরও ঝুঁকছে সামনের দিকে, হ্যাণ্ডেল ছেড়ে দেবে। আমি দৌড়ে এসে।

এই রকম সময়ে বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত কম্পন হয়। বাতাস লাফিয়ে ওঠে, তোলপাড় শুরু হয়, যেন এক্ষুনি দম বন্ধ। আমি পৌঁছোবার আগেই যদি মেয়েটি—

দরজা থেকে সে অনেকটা ঝুঁকে ছিল, আমি দ্রুত এসে তার একটা হাত। সে বোধহয় টের পায়নি আমার উপস্থিতি আগে। তবু কোনো চমক ফোটেনি তার চোখে। সে তার নীরব মুখ আমার দিকে।

আমি ব্যস্তভাবে বলি, কি হচ্ছে কি ?

মেয়েটি বললো, কি ?

—এখানে...দরজার সামনে...এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন ?

—এমনিই....কেন ?

হয়তো সবটাই আমার ভুল। অতিরিক্ত কল্পনা। অন্যের জীবনের যে কোনো ঘটনাই আমি নাটকীয় ভাবে দেখতে। নাটকীয় শব্দটা স্বাভাবিক নয় এই অর্থেই কেন যে আমরা। অথচ কত নাটক জীবনের মতই স্বাভাবিক।

মেয়েটির বদলে আমিই লজ্জা। আত্মহত্যায় উদ্যত একটি কিশোরীকে হঠাৎ রক্ষা করায় আমার গর্বিত হওয়ার কথা। কিন্তু যদি আত্মহত্যার কোনো চিন্তাই ওর মনে না এসে থাকে, এমনিই দরজার কাছে।

আমার লজ্জাকে আমি ঈষৎ দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করে বলি, এত রাত্রে দরজার কাছে, এই সময় দরজা খোলা রাখা।

—কেন, তাতে কি হয়েছে ?

আমি আগেই তার হাত ছেড়ে দিয়েছিলাম, এই সময় সে সম্পূর্ণ আমার দিকে ফেরে। তার ভুরুতে একটু রাগের চিহ্ন।

আমি এক পা পিছিয়ে গিয়ে ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে বললাম সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি ভাবলাম।

তৎক্ষণাৎ খেয়াল হলো, রাত দুপুরে কোনো কিশোরীর হাত ধরে এটা ক্ষমা চাইবার ভাষা নয়। এ অন্যরকম ভাষা। এক এক সময়, আমি যে ভালো, এটা প্রমাণ করাই কত যে শক্ত হয়ে ওঠে।

অগৌণে নিজেকে শুধরে নিয়ে আমি আবার তাড়াতাড়ি বললাম, দরজা খোলা দেখে আমি তোমার জন্য ভয় পেয়েছিলাম।

মেয়েটি বললো, আমার ঘুম আসছিল না, খুব গরম।

—তবু এখানে এরকমভাবে দাড়িয়ে থাকা—হঠাৎ ঝাঁকুনিতে অনেক সময় বিপদ হয়। আমি তোমার জন্য ভয়...

—আমার জন্য? কিসের ভয়? আপনি কেন আমার জন্য ভয় পাবেন।

—বাঃ, এ রকম অবস্থায় যে কেউ...সত্যিই তোমার জন্য ভয় পেয়েছিলাম, তুমি এতখানি ঝুঁকে।

—আমার কিছু হবে না। তা ছাড়া আমি মরে গেলেই বা কার কি আসে যায়।

কৈশোরের এই অভিমান কি অপূর্ব সুশ্রী। একমাত্র এই বয়েসটাই পারে মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে।

তখন আমি বলতে চেয়েছিলাম, আমাকে তোমার বন্ধু করে নেবে? আমাকে তোমার গোপন কথা।

কিন্তু প্রকাশ্যে অচেনা কারুকে এরকমভাবে কথা বলার অভ্যেস নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি।

যেন সে নাম জানাতে চায় না, এই রকম মুখের ভঙ্গি। একটু ইতস্তত। তারপর বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে যেন হাওয়াকে উদ্দেশ করে বললো, অনুরাধা বসুমল্লিক।

ওর ডাকনাম রমু শুনে আমি ভেবেছিলাম, ওর নাম রমলা বা রমা এই ধরনের। সব সময় এই অনুমান খাটে না। তবে, অনুরাধা নামটিও ওকে মানায়নি। অনুরাধা নামে যে আর দুটি মেয়েকে আমি চিনি, তারা বেশ নরম ও শান্ত। তারা মাঝরাতে একা ট্রেনের দরজার সামনে দাঁড়াবে না।

—তুমি এবার শুতে যাও।

—যাচ্ছি।

সত্যিই সে যখন ফিরে যেতে লাগলো তার বাঙ্কের দিকে, তখন

আমি বেপরোয়াভাবে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে একটা কথা...তুমি কাঁদছিলে কেন!

মেয়েটি স্থির হয়ে দাঁড়ালো। সোজাসুজি তাকালো আমার মুখের দিকে। অচঞ্চল দীপশিখার ন্যায় সেই বালিকা তেজের সঙ্গে বললো, আমি বলবো না। কেন সবাই জানতে চায়?

আমি আমার প্রাপ্য পেয়েছি। অন্যায্য কৌতূহলের জন্য। মেয়েটির চেয়ে বয়েসে অনেক বড় হয়েও আমি অপরাধীর মতন নত-মস্তকে।

সে তবু দাঁড়িয়েই রইলো। যেন আমাকে আরও শাস্তি, হ্যাঁ! আরও শাস্তি আমার প্রাপ্য। আমি একজনের পবিত্র গোপনকে উচ্ছিষ্ট করতে। অন্য কেউ যদি এরকমভাবে আমার। অবশ্য কান্না অনেক প্রশ্ন আনে। আনবেই।

মেয়েটি একটুক্ষণ থেমে, যেন আমার ওপরে দয়া করেই বললো, আমার খুব চেনা একজন পরশুদিন মারা গেছে।

আমি জানি, পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী বোঝাটির নাম গোপনীয়তা। একা একা তা বেশিক্ষণ বহন করা যে কত কষ্টের। আমি চুপ করে।

—আজ তাকে পোড়াবার কথা। হয়তো এতক্ষণে—

তক্ষুনি সব ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। দুটি মাত্র কারণেই শুধু, মৃত্যুর দু'দিন পরে কারুকে পোড়াবার ব্যবস্থা হয়। আত্মহত্যা অথবা খুন। এ ক্ষেত্রে যে কোনটা, তাও বোঝা যায়, কণ্ঠস্বরে দুঃখের সঙ্গে ক্রোধ মিশে থাকার জন্য। আমি ওকে খুব ভালো করেই চিনি। মেয়েটিকে ওর আত্মীয়-স্বজন জোর করে দূরে কোথাও। এই জন্যই সকলে এত গম্ভীর।

আমি বললাম, কে মেরেছে? পুলিশ।

—হ্যাঁ।

—ওর নাম কি?

...ওর নাম....না, বলবো না, আপনি কে? কেন এইসব কথা জানতে চাইছেন? আপনার কি আসে যায়?

ডিটেকটিভ, স্কুলমাস্টার আর লেখক—এই তিনজনই মানুষের চরিত্র সবচেয়ে ভালো বোঝে, কে যেন বলেছিলেন এই কথা? স্কুলমাস্টারবা বছরের পর বছর এত শিশুকে বড় হয়ে উঠতে দেখে যে মানুষের মোটামুটি সবকটা টাইপ তার জানা। ডিটেকটিভ আর লেখকরা

বেশি উঁকি দেয় মানুষের গোপন জীবনে। বাইরের মানুষ আর ভেতরের মানুষে যে তফাত তা তাদের চোখে অনেকটা।

ট্রেনের গতি আগেই মন্থর হয়ে এসেছিল, এই সময় একটা আলো-ঝলমল প্ল্যাটফর্মে। অনুরাধা আর কোনো কথা না বলে ফিরে গেল বাঙ্কের দিকে। আমি দরজার কাছেই একটুক্ষণ।

স্টেশনটা প্রায় জনহীন। সব-কটা আলো জ্বলছে, এর মধ্যে সব কিছুই ঘুমন্ত। আমি প্ল্যাটফর্মে নামি। দূরের একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে কেউ উঠছে বা নামছে। অনেক মালপত্র। যে দিকে তাকাও, মনে হবে জীবন কত স্বাভাবিক। মধ্যরাত্রির ট্রেন কোনো অখ্যাত স্টেশনে থামলে এরকমই দৃশ্য, প্ল্যাটফর্মে মানুষ ঘুমোয়, একটা কুকুর অনর্থক ছুটে যায়, ফু-র-র-র করে বেজে উঠলো গার্ডের হুইস্‌ল্‌, সবই ঠিকঠাক। আর এই সময় কলকাতার শ্মশানে একজন কেউ পুড়ে ছাই হচ্ছে অসময়ে, যে চেয়েছিল কিছু বদলাতে, আর অনেক দূরে, ট্রেনের কামরার মধ্যে একটি মেয়ের হঠাৎ হঠাৎ কান্না—কান্না তাকে বিশুদ্ধ করবে, না জীবনটাই বদলে দেবে এমন একদিকে।

চলন্ত গাড়িতে লাফিয়ে উঠে আমি দরজাটা খুব শক্ত করে বন্ধ। সতর্কভাবে চারিদিকে দেখে নিই। কেউ জাগেনি। সাঁওতাল বধূটির মাথা হেলে পড়েছে তার স্বামীর কাঁধে। স্বামীটির মুখ ঘুমের মধ্যেও বেশ দায়িত্ববান।

মেয়েটি শুয়ে আছে দেয়ালের দিকে মুখ। আমি তার বাঙ্কের কাছে দাঁড়ালাম। খুব কাছে। যেন আমি একবার তার কপালে হাত। যদি সে মুখ ফেরাতো, আমি তাকে আরও দু'একটি কথা। এরকমভাবে দাঁড়ানো মোটেই। অন্য কেউ দেখলে। কিন্তু অনুরাধা আমার উপস্থিতি টের পেলেও মুখ ফেরাচ্ছে না। আমি অগত্যা নিজের বাঙ্কে বেশ সশব্দেই। তবু ওর মুখ অন্যদিকে। ওর সঙ্গে আমার খুব চেনা হয়ে গেল আজ থেকে।

ঘুম যখন ভাঙলো, তখন সকালের আলো এসেছে জানলা দিয়ে। খুব গাঢ় আলো নয়, শহরে নিজের বাড়িতে শুয়ে থেকে এরকম সকাল আমি চোখে দেখি না।

অনুরাধা ও তার সঙ্গী দু'জন বিছানা গুটিয়ে পরিষ্কার। পরবর্তী স্টেশনের জন্য প্রস্তুত। আমার প্রথম আকাঙ্ক্ষা হয়, আমিও ওদের সঙ্গে।

মেয়েটির সম্পূর্ণ গোপনীয়তা হরণ করার জন্য আমার ভেতরে একটা দুর্দমনীয় চোরের মতন। কেনই বা নামবো না। আমি তো যেখানে খুশি।

কিন্তু মেয়েটি যদি ভাবে আমি ওকে অনুসরণ ক'রে। ভাবে ভাবুক। অন্যের সামান্য একটু ভাবনার জন্য আমি কি নিজের। এক কামরার লোক অনেক সময় কি একই স্টেশনে নামে না ? তবে, মুশকিল হচ্ছে এই, আমি কাল অরবিন্দ ভৌমিককে বলেছিলাম ডেহরি-অন-শোনেই—। ওরা শুনেছে নিশ্চয়ই।

অনুরাধা এখন নিচের বাঙ্কে বধূটির পাশে বসে আছে, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হবার সম্ভাবনা নেই। দিনের আলোতে বুঝতে পারি, সঙ্গের যুবক ও বধূটির মুখও খুব বিমর্ষ।

ট্রেনের গতি মন্দ হয়ে আসে, তবু আমি মনঃস্থির করতে না পেরে। অরবিন্দ ভৌমিকও জেগে উঠে মিটিমিটি তাকালো আমার দিকে। আমি এই স্টেশনে নামতে গেলেই নির্ঘাত চেঁচিয়ে নানারকম প্রশ্ন। কেন যে কিছু না ভেবেচিন্তে লোকের সঙ্গে ঠাট্টা করতে!

গাড়ি একেবারে থামবার আগেই ওরা দরজার কাছে গিয়ে। থামলো, দরজা খুললো, আরও কয়েকজনের সঙ্গে ওরাও প্ল্যাটফর্মে। ওদের আর আমি দেখতে পেলাম না। এই স্টেশনে বেশ চ্যাঁচামেচি। আমি ব্যস্ত হয়ে নেমে পড়লাম বাঙ্ক থেকে।

অরবিন্দ ভৌমিক অবধারিত প্রশ্ন করলো, কোথায় যাচ্ছেন ?

—চা খেতে !

নিচে নেমে এসে ওদের আর কোথাও কোনোদিকেই। ভিড়ে মিলিয়ে গেছে। এখনো আমি ইচ্ছে করলে হ্যাণ্ডব্যাগটা নিয়ে এসে। ভিতরের দোলাচল কিছুতেই সিদ্ধান্ত নিতে দেয় না। যাক স্টেশনের নামটা জানা রইলো, দু'একদিনের মধ্যেই আমি আবার।

ভাঁড়ের চায়ে চুমুক দিয়ে একটু শান্তি এলো। বেশ ভালো চা। টাকা ভাঙিয়ে পরপর দু'ভাঁড়। তারপর কি মনে হলো, আরও এক ভাঁড় হাতে নিয়ে উঠে এলাম কামরায়, সেটা অরবিন্দ ভৌমিকের মুখের সামনে।

অরবিন্দ ভৌমিক বললো, একি, আপনি আবার কষ্ট করে আমার জন্য।

—আপনার মায়ের জন্য আনবো কি ?

—না, না, উনি বাইরে কিছু খান না।

আমি আবার নেমে এলাম প্ল্যাটফর্মে। ইঞ্জিনে জল ভরছে। দেরি হবে। একটু পায়চারি করার জন্য পা বাড়াতেই। আমাদের কামরা-তেই অন্য একটি জানালার পাশে সেই মুসলমান রমণী। কালো সিল্কের বোরখাটা এখন মুখ থেকে নামানো। আমার বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা। কী অসম্ভব রূপ। ভোরবেলায় ফোটা শিশির-ধোওয়া কোনো সাদা ফুলের সঙ্গে এর তুলনা চলবে না। কারণ, ফুলের চেয়েও মানুষ অনেক বেশি সুন্দর হতে পারে, তা আমি কয়েকবার। মুখখানা দেখলেই মনে হয়, অন্তত এক যুগ এঁর কোনো অসুখ হয়নি।

নারীটিকে কয়েক পলক দেখে আমি সামনের দিকে পা চালিয়ে। আমার একটু একটু মনখারাপ। তখন বুঝতে পারি, কোনো কোনো সুন্দর জিনিস দেখলে কষ্ট হয়, কবিরা কেন একথা। এ এক অনির্বচনীয় কষ্ট, শিলিগুড়ি শহর থেকে জীবনে প্রথম তুষারমৌলি দেখে আমার অনেকটা এ রকম। পর্বতশৃঙ্গ কিংবা সমুদ্রের চেয়েও যে নারীর রূপ তুলনার অধিক পাওয়া যায়, কাপুরুষরা একথা স্বীকার করতে পারে না। আমার ইচ্ছে হয় প্রণাম জানাতে। আমি এই সুন্দরের অংশভাক।

পরক্ষণেই মনে মনে একটু অনুতাপ বোধ। আমার মন এত বিক্ষিপ্ত। একটু আগেই আমি একটি কিশোরীর দুঃখের জন্য, আর এখন আমি আবার নির্লজ্জভাবে অপর নারীর রূপ। অনুতাপ থেকে ক্রোধ জন্মায়। অনুরাধার কান্নার জন্য সমস্ত পৃথিবী দায়ী। এর শোধ তুলতে হবে। অনুরাধা, নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে আবার আমার।

এই স্টেশনে অনেকক্ষণ ট্রেন। এখনো ইচ্ছে করলে ব্যাগ নামিয়ে এনে। ছোট শহরে হয়তো মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে—কিন্তু ওর দুঃখের শোধ তোলার জন্য কি করতে পারি। শুধু লুকোবার জন্য আমি দশদিককে অন্ধ হতে বলি।

পুনরায় আমি গতি মেলাই ট্রেনের সঙ্গে। চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে। ডেহরি-অন-শোন-এ এসে আমি বিনা আড়ম্বরে বিদায় নিই অরবিন্দ ভৌমিকের কাছ থেকে। তার সবরকম সাহায্যের আহ্বান আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান। আমার প্রথম কাজ নদীর ঘাটে। স্বপ্নটার সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে।

সিঁড়ি একটা আছে ঠিকই। কিন্তু সেই সিঁড়ির প্রত্যেকটি ধাপে

তন্নতন্ন করে খুঁজেও আমি কোনো রক্তের দাগ খুঁজে তো। অথচ, তন্দ্রার মধ্যে কেন দেখেছিলাম দু'তিনটি সিঁড়িতে লেগে আছে পুরোনো রক্তের ছোপ। কী এর মানে? দু'তিনবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করেও। হয়তো অন্য কোনো রক্ত, আমার স্বপ্নের মধ্যে—স্বপ্ন অনেক রকম কোলাজ্ সৃষ্টি করে।

বিশাল সেতু, সেই তুলনায় নদীটি এখন একটু ছোট। আমি একেবারে ধারে নেমে গিয়ে নদীর জলেই চোখ মুখ! এমনভাবে কোনোদিন প্রক্ষালন করিনি। বেশ ঠাণ্ডা জল। স্নানটাও সেরে নিলে। জামা, প্যান্ট খুলে ফেললাম, কেউ তো দেখবার নেই, ব্যাগ থেকে তোয়ালেটা বার করে। প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর একেবারে বেশি জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে। আরে বেশ স্রোতের টান আছে তো! দু'একবার হাত ছুঁড়ে সাঁতার কাটতেই জড়তা কাটে। সাঁতার আর সাইকেল একবার শিখলে আর কেউ ভোলে না, প্রমাণিত হলো এবার। ব্যাপারটা পুরো ঠিক নয় যদিও! চাইবাসায় একটা সাইকেল পেয়ে, বছর দশেক অনভ্যাসের পরও অতি উৎসাহে চড়তে গিয়ে আমি প্রথম-বার এক আছাড়।

কয়েকটা ডুব দিয়ে ঘাটের দিকে মুখ ফেরাতেই দেখি আমার ব্যাগ ও জামা কাপড়ের কাছে একটি ন-দশ বছরের বাচ্চা ছেলে উবু হয়ে। ছেলেটিকে তো একটু আগেও দেখিনি, যেন অন্তরীক্ষ থেকে হঠাৎ টুপ করে। বেশ চতুর চোখ মুখ। ছোঁড়াটা যদি আমার ব্যাগটা তুলে নিয়ে পিঠটান দেয়, আমি কি সাঁতরে পারে গিয়ে দৌড়ে ওকে ধরতে? আমি জাঙ্গিয়া পরা অবস্থায় ভেজা গায়ে একটা বাচ্চা ছেলের পেছনে ছুটছি, এই দৃশ্য।

ছেলেটির দিকে চোখ রেখে আমি চিত ও ডুবে নানারকম সাঁতারের কসরত দেখাই। তারপর পারের দিকে। সিঁড়িতে এসে বসার পর বেশ অবসন্ন লাগে। সাঁতারে দুরন্ত ব্যায়াম। অনেকদিনের অনভ্যাস। যদিও আবার ইচ্ছে হয় জলে নামতে।

তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে আমি জিজ্ঞেস করি, এই, তোর নাম কি।

সে আমার চোখে চোখ রেখে চুপ করে থাকে। বাচ্চা ছেলেদের একটা ব্যাপার আছে, তারা কখন কোন কথায় উত্তর দেবে না দেবে, সেটা সম্পূর্ণ তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর।

পরে মনে হলো, এটা বাংলায় প্রশ্ন করার জায়গা নয়। সুতরাং :

—কেয়া নাম হ্যায় তুমহারা।

—ছোটেলাল।

—ঘর কাঁহা হ্যায় ?

—নেহি হ্যায়।

—কেয়া, ঘর নেহি হ্যায় ?

—নেহি হ্যায়।

অবাক হতে গিয়েও সামলে নিই। দেশের পঞ্চাশ কোটি লোকের প্রত্যেকেরই যে ঘর থাকে না, এ নতুন কথা ? ছেলেটি বেশ সপ্রতিভ। ঠিকই ধরেছিলাম, ছেলেটা আমার ব্যাগটা চুরি করে পালাতেও।

—কাঁহা রয়তা হ্যায় ?

ছেলেটি রেলস্টেশনের দিকে হাত দেখিয়ে বলে, উধার। বুঝলাম রেলস্টেশনের পরগাছা। প্রায় প্রত্যেক রেলস্টেশনেই কিছু কুকুর ও কিছু বেওয়ারিশ বাচ্চা থাকে।

জামা-প্যান্ট পরে নিতে নিতেই বেশ খিদে চন্‌চন ক'রে। স্নান করলেই তৎক্ষণাৎ আমার এরকম খিদে। দিনের যে-কোনো সময়েই হোক।

ব্যাগ হাতড়ে দেখলাম, চিরুনি আনতে ভুলে। বাঁ হাতের আঙুল-গুলো চুলের মধ্যে চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা ছোটেলালজী, হিয়াঁ খানা মিলতা হ্যায় ?

—হাঁ, মিলতা

—কাঁহা ?

—বহুৎসা হোটাল হ্যায়।

আমার এই প্রশ্নগুলি অবান্তর। যে ছেলেটা নিজে রোজ খেতে পায় কিনা সন্দেহ, সেও হোটেলের খোঁজ রাখে। এবং আমি তাকে।

ব্যাগটা তুলে নিয়ে আমি তার মাথায় একটা আলতো চাঁটি মেরে জিজ্ঞেস করি, হিয়াঁ পর কিঁউ আয়া ?

সে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার দরকার মনে করে না। আমি তবু হিন্দী বলার উৎসাহে আবার বলি, তুমহারা পিতা মাতা কোই হ্যায় ?

আমার এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটি তার ইজেরটা খুলে ফেলে। কোমরে একটা ঘুনসি বাঁধা। তরতর করে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে এবং জলের পোকার মতন সাঁতার কাটে। সে যে আমার চেয়ে

শহরের মধ্যে টায়ার সারাবার দোকান আর কচৌরি মিঠাই, ডাক্তার-খানার শো-কেসে মদের বোতল। একটি ছোট রেডিওর দোকানের মালিককে বাঙালী বলে চিনতে পারা যায়। তিনিও চেনেন পরিতোষকে, পরিতোষের স্ত্রী পুজোর সময় ষোড়শী নাটকে নাম ভূমিকায়। রেডিও দোকানের মালিকই একটা সাইকেল রিক্সাকে ডেকে।

স্থানীয় জেলখানা পেরিয়ে এসে সাইকেল রিক্সা একটা বাড়ির সামনে। সদর দরজায় মস্তবড় তালা। পাশের বাড়ির অপর সর-কারী অফিসার, মাদ্রাজী, জানালেন, পরিতোষ দু'দিন আগে সফরে বেরিয়েছে, স্ত্রীকেও সঙ্গে।

এখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা, একটা কোনো থাকার জায়গা না পেলে।

মাদ্রাজী ভদ্রলোক সরু চোখে আমার আপাদমস্তক। উনি লুঙ্গির ওপর হাওয়াই শার্ট পরে আছেন, মাথার চুল অবিকল শিশুদের মতন পাশ থেকে সিঁথি কাটা। অপরের কৌতূহলী দৃষ্টি আমার সহ্য হয় না। আমি মাটি থেকে আমার ঝোলাটা। মনে মনে প্রস্তুত হয়ে আছি কিছু ন-ড-এ মেশানো ইংরেজি শোনার জন্য।

—আর ইউ মিঃ বন্দোপাধ্যায়,জ ইয়াংগার ব্রাদার।

অপ্রত্যাশিত রকম বিশুদ্ধ উচ্চারণ। ব্যানার্জী না বলে বন্দ্যো-পাধ্যায়। আমি আগেও লক্ষ করেছি, উচ্চশিক্ষিত হলেও দক্ষিণ ভারতীয়রাই সবচেয়ে কম সাহেবীয়ানা অভ্যেস করে।

না, আমি পরিতোষের ছোট ভাই নয়। গত রাত্রে আমি ট্রেনে অশেষ মজুমদার। আজ আবার অন্য পরিচয়, ক্ষণতরে লোভ হয়, তবু কোনোক্রমে নিজেকে সংবরণ!

—না, কেন বলুন তো।

মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট ভাইয়ের বেড়াতে আসার কথা ছিল। তাই আমাদের কাছে ঘরের চাবি রেখে গেছেন।

—আমি পরিতোষের বন্ধু। এবং আমার আসার কোনো কথা ছিল না!

—বন্ধু। মানে উনি কি জানেন, আপনি হঠাৎ এসে পড়তে পারেন? অধিকাংশ মানুষেরই কোনো পরিচয়পত্র থাকে না। উনি যদি জেরা করেন, আমি পরিতোষের কতদিনের বন্ধু, কতখানি ঘনিষ্ঠতা, কীভাবে তার প্রমাণ? হঠাৎ এসেছি খবর না দিয়ে, পরিতোষ গেছে সফরে,

সরকারী অফিসাররা তো এরকম প্রায়ই। উনি আমাকে ঘরের চাবিটা দেবেন কিনা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। আজকাল কতরকম তঞ্চক-বঞ্চক।

হঠাৎ আমার মাথায় বিদ্যুতের মতন একটা। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, পরিতোষ কখনো কফিতে চিনি খায় না।

মাদ্রাজী ভদ্রলোক সজোরে হেসে উঠলেন। ঠিক বুঝতে। উনি হয়তো আমাকে জেরা করতে (চেয়েছিলেন কিংবা চাননি)।

তৎক্ষণাৎ নিজের ঘর থেকে চাবি এনে। নিজেই চাবি ঘুরিয়ে তালা। আলোর সুইচ। তারপর আমার দিকে ফিরেই বললেন, আপনার বন্ধু দু'দিন বাদেই ফিরবেন।

আমার রাত্রে থাকার একটা জায়গার দরকার ছিল। আমি ওঁকে তিনবার ধন্যবাদ।

উনি চলে যেতেই আমি দরজা ভেজিয়ে সোজা ঝপাং করে পরিতোষের বিছানায়। নিভাঁজ চাদরপাতা এরকম বিছানা দেখলেই আমার। একটা সিগারেট ধরিয়ে অনুচ্চ-কণ্ঠে বললাম, ইট মাস্ট বী ওয়াণ্ডারফুল টু বী অ্যালাইভ। কেন একথাটা আমি ইংরেজিতে বললাম, আমি নিজেও জানি না। অনেক সময় একা একাও ইংরেজিতে। অকস্মাৎ পাহাড়ের বাঁক পেরিয়ে একটা বন্য নদীর মতন খাসা দৃশ্য দেখেও আমরা বলি, বিউটিফুল! বেশ জোর দিয়ে!

একটু পরেই দরজায় শব্দ ও সামান্য ফাঁক হলো। সেই ভদ্রলোক। একটু আগেই আমি ওঁর নাম শুনেছি এবং ইতিমধ্যেই ভুলে। শেষটা যেন মনে হয়েছিল নেড়ুচেনঝিয়ান! এরকম কোনো নাম হয়? কিংবা ভুল শুনেছি। প্রথম নামটা কি যেন? খুব অন্যায় নাম ভুলে যাওয়া।

ভদ্রলোক আমাকে রাত্রে খাবার নেমন্তন্ন করলেন ওঁদের বাড়িতে। আমি ভয়ে শিউরে। ভয়টা আসলে অভদ্রতার। ভদ্রলোক সত্যি অতি ভদ্র, কণ্ঠস্বরে তা বোঝা যায়। কি করে এঁকে প্রত্যাখ্যান।

দক্ষিণ-ভারতীয়দের আর সব কিছুই আমি ভালবাসি, সঙ্গীত পর্যন্ত, কিন্তু ওদের রান্না খাওয়ার কথা ভাবলেই আমার গায়ে জ্বর। আগাগোড়া নিরামিষ খাদ্য আমার দু'চক্ষের বিষ। পৃথিবীর সমস্ত নিরামিষ জিনিসের মধ্যে আমি একমাত্র পছন্দ করি বিধবা নারীদের।

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমি তো খেয়ে এসেছি।

—খেয়ে এসেছেন ? তাতে কি। আর একবার খাবেন, আমাদের সঙেগ। ভেরি লাইট ফুড। আমার ওয়াইফ বললেন।

—না, সত্যিই আজ আর কিছু খেতে পারবো না। একদম পেট ভরা।

—তা হলে আসুন, এক কাপ কফি খাবেন অন্তত।

এর পর আর না বলা যায় না। ওঁরা ভাবছেন আমি একলা একলা ঘরের মধ্যে সেই জন্যই কিছু অন্তত ভদ্রতা না করলে। সহকর্মী বন্ধু, খানিকটা সৌজন্য তার প্রাপ্য।

উনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি স্নান করতে চাই, গরম জল লাগবে কিনা। তা হলে ওঁর বাড়ি থেকে।

—না, না, না।

—খুব সহজেই অ্যারেঞ্জ করা যায়। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি ওয়াস করে তার পর আসুন। ডোন্‌ট হেজিটেট টু আস্‌ক ফর এনিথিং—

অনেকের অভ্যেস আছে সন্ধ্যের পর স্নানের।

বিশেষ করে ট্রেন জার্নির পর। আমি অনেকটা গাঁজাখোরের মতন বেশি স্নান-টান এড়িয়ে। দিনে একবারই যথেষ্ট। বিশেষত আজ সকালেই শোন্ নদীতে সাঁতার কেটে।

এক হাঁড়ি গরম জলে ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে আমি কোনোক্রমে মুখে হাতে ঘাড়ে। বাকি জলটা গড়িয়ে ফেলে দিলাম। তারপরও পাঁচ সাত মিনিট বাথরুমে চুপ করে দাঁড়িয়ে; স্নান করতে যতটা সময়।

এই সবগুলো সত্যি মজার ব্যাপার। কেউ কি সত্যি দেখছে আমি বাথরুমের মধ্যে স্নান করছি কি না ? তবু আমি স্নানের অভিনয় অকারণেই পরিতোষের আফটার শেভ লোশান থেকে খানিকটা গালে। বাথরুমে পরিতোষের স্ত্রী শ্রীলেখার ব্যবহার্য কোনো জিনিসই নেই। মেয়েলি গন্ধও না। সিনেমা হলে গিয়ে কতবার আমার মেয়েদের বাথরুমটার ভেতরটা দেখতে ইচ্ছে।

উনি বাইরের দরজার কাছেই। জিজ্ঞেস করলেন, ফিলিং ফ্রেশ ? আমি অমায়িক হাস্যে উত্তর।

পাশাপাশি দুটি ছোট একতলা হুবহু একরকম ! কিন্তু পরিতোষের তুলনায় মিঃ নেডুচেনঝিয়ানের (?) বাড়ি কত ঝকঝকে পরিষ্কার। মেঝে

তেল চকচকে। মঙ্গোলিয়ান ও আর্যদের তুলনায় দ্রাবিড়দের পরিচ্ছন্নতা বোধ অনেক বেশি। এ ছাড়াও অবাক হবার মতন একটা জিনিস।

কফি প্রস্তুত। বসবার ঘরে নিচু খাটের ওপর নক্সা-কাটা মাদুর। তার ওপর ছোট্ট ছোট্ট লাল মখমলের তাকিয়া। পাশে একটি টেবিল। কিন্তু সবচেয়ে যা দেখে আমি প্রথমে খুব অবাক, তা হলো দোলনায় বসা একটি নারী। ঘরের ঠিক মাঝখানে ঝুলছে দুটি দোলনা। বসবার ঘরে এরকম দোলনা আমরা আশা করি না। বাচ্চাদের জন্য নয়, রীতিমতন বড়দের। পরে মনে পড়লো, মহারাষ্ট্রে কোনো কোনো বাড়িতে এমন দেখেছি। চেয়ার টেবিলের চেয়ে ব্যবস্থাটা খারাপ নয়।

দোলনায় বসেছিলেন ভদ্রলোকের স্ত্রী। ঘাগরা ধরনের লাল শাড়ি, গাঢ় নীল ফুল-কাটা পাড়। কাঞ্জিভরম শাড়ির নাম বিজ্ঞাপনে দেখেছি, এইটাই? মহিলার গায়ের রং তেঁতুল বিচির মতন বেগুনি-কালো সেই রকমই মসৃণ। অত্যন্ত সুশ্রী মুখখানি আরো লাবণ্যময়ী হয়েছে একটি নাকছাবিতে। কতদিন পর একজন নাকছাবি পরা নারীর সঙ্গে কথা বলবো সামনাসামনি।

আমি বললাম, নমস্কার।

দোলনা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, বসুন।

পরিষ্কার বাংলা। মেয়েরা অনেক চটপট ভাষা শিখতে। ভদ্রলোক বাংলা একেবারেই। ইস, এঁর নাম নেড়ুচেনঝিয়ান কিংবা ঐ টাইপের কিছু না হয়ে নাইডু বা রামস্বামী জাতীয় সহজ কিছু হতে পারতো না? কিংবা কোনো ক্রিকেট খেলোয়াড়ের নামে, তা হলে মনে রাখা।

মহিলাটির নাম, স্বামী বললেন পদ্মা, উনি নিজে বললেন, পদ্মা। কোথায় পদ্মা নদী, এখন বিদেশে, আর কোথায় দক্ষিণ ভারতে সেই নাম। অবশ্য বাংলাদেশেও তো কাবেরী নামে। নদীর নামে নামের মেয়েরা স্বভাবতই একটু উচ্ছল। এই নারীটির সারা শরীরে বাজনা।

পদ্মার স্বামী আর আমি দোলনায় বসলাম। টেবিলের ওপর কফি পট আর বীয়ার মগের মতন বড় বড় কফির কাপ। কিছু চানাচুর ও সেমুই ভাজা। যা ভেবেছিলাম তাই, সারা বাড়িতে নিরামিষ গন্ধ। নিরামিষ খেয়েও এদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে কি করে? নিরামিষ খেয়েও নারীরা রূপসী হয়। আর্যরা ছিল প্রায় সর্বভুক এবং অতি মাংসাশী, অথচ ভারতের বেশির ভাগ মানুষই নিরামিষাশী। আসলে সাহেব ও আরবরাই খাঁটি আর্য।

আমরা যেমন বেশির ভাগ সময় চা, এরা তেমনি কফি। কারণ খুব সাধারণ। যে-কারণে উত্তর ভারতে বেশি অ্যামবাসেডর গাড়ি, দক্ষিণ ভারতে ফিয়াট। কিন্তু উত্তর ভারতের লোকেরা বেশি মাছ খেলেও এরা।

দোলনায় দুলতে দুলতে কফি। এবার কলকাতায় ফিরেই বসবার ঘরে একটা দোলনা। বেশ জোরে জোরে দুলতে লাগলাম, কফি উছলে পড়ছে না। খাটের ওপর বসে আছেন পদ্মা, হাতে চানাচুরের প্লেট। আমি দুলে সেখানে গিয়ে খপ্ করে এক মুঠো চানাচুর তুলেই আবার। সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল হাসি। ইস, এখানে না এলে এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে।

পদ্মা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এখানে কোনো কাজে এসেছেন ?

—না, এমনিই। বেড়াতে।

—বেড়াতে। এখানে বেড়াতে।

পদ্মা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। এর মধ্যে আবার হাসির কী আছে রে বাবা।

স্বামীটি বললেন, এখানে কেউ বেড়াতে আসে ! কি আছে দেখবার। তবু যদি ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে যেতেন ; কিংবা যদি রিজার্ভ ফরেস্ট যেতে চান—

—কেন, জায়গাটা খারাপ।

পদ্মাই আবার বললেন, খুব বাজে। খুব বাজে। আমার বিচ্ছিরি লাগে।

অবাঙালী নারীর মুখে বাংলা বেশ মিষ্টি। বিচ্ছিরি শব্দটাও সুন্দর।

আমি হেসে বললাম, কেন এখানে তো কোয়েল নদী আছে।

পদ্মা তাঁর ঠোঁট ওল্টালেন অবজ্ঞায়। এই ভঙ্গিটি দেখতে বেশ চমৎকার লাগে। কিন্তু আমি বেশি বেশি না দেখে। জানি না, ব্যবহারে কোথায় কি ভুল হয়ে। নিজেদের জন্মস্থান থেকে এত দূরে, মাতৃভাষায় কথা বলার একটিও লোক নেই, বিহারে এই ক্ষুদ্র শহরে নেই কোনো উত্তেজনা, ওদের ভালো না লাগবারই তো। পছন্দ মতন খাদ্যও কি এখানে কি ক্যাপসিকাম পাওয়া যায়। শুধু কোয়েল নদী দিয়ে কি ধুয়ে খাবে।

স্বামীটি, এর নাম আমি রাখলাম স্বামীনাথন, বললেন—সন্ধের পর

অনেক ভালো সাঁতার জানে, এটা দেখানোই যেন তার। এক একবার ভুস করে মাথা তুলছে আর হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। প্রথম নজরে দেখেই বুঝেছিলাম, অতি পাজি ছেলে।

ওকে জব্দ করার একমাত্র উপায়, ওর দিকে নজর না দেওয়া। আমি মুখ ফিরিয়ে সিঁড়ির ওপারের দিকে। ছেলেটা চেঁচিয়ে কি যেন বলে। আমি শুনতে চাই না। ও যদি গালাগালও করে আমাকে, বিনা কারণেই, আমার সাধ্য নেই ওকে শাস্তি দেবার! হঠাৎ আমার সামনেই কি রকম অবলীলাক্রমে ইজেরটা!

হোটেল খুঁজে দু'খানা চাপাটি আর এক প্লেট পাঁঠার মাংস নিয়ে। মাংসটা এমনই ঝাল আর মুখরোচক যে আর এক প্লেট না নিয়ে পারি না। সঙ্গে লেবুর আচার। জীবনে এর থেকে শ্রেষ্ঠ আনন্দ আর কী? ঝালের চোটে উঃ আঃ করতে করতে বেরিয়ে আসি বাইরে। সেখান থেকেই দেখা যায় ছেলেটা এখনো জলে দাপাদাপি। ওকে বকবার কেউ নেই। এত কম বয়েসের এমন স্বাধীন ছেলে আগে দেখিনি কখনো।

খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে কয়েকটা নৈরাশ্যজনক খবর। শোন্ নদীর ধারে অপূর্ব সুন্দর ডাকবাংলোটিতে থাকবার জায়গা নেই। হোটেলগুলির চেহারা সুবিধের নয়, তাছাড়া হোটেলে থেকে বিলাসিতা করার মতন পয়সা।

ফিরে এসে রেলস্টেশনের বেঞ্চিতে। যে-কোনো দিকের ট্রেন এলেই। কুলির কাছ থেকে জানা গেল, ডাল্টনগঞ্জের দিকে ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেনই সবচেয়ে কাছাকাছি সময়ে। ডাল্টনগঞ্জই বা খারাপ কী? ওখানে পরিতোষ থাকে না! ঠিকানা জানি না অবশ্য, তবে স্থানীয় বাঙালীদের কাছে।

ডাল্টনগঞ্জের মত যোগারূঢ় নামের জায়গাগুলি চাক্ষুষ দেখার আগে কিছু বিস্ময় রেখে দেয়। হয়তো জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে আছে ইওরোপের একটা টুকরো। সার সার ঢালু ছাদওয়ালা বাংলো।

পৌঁছে দেখলাম, সে সব কিছুই না। ধুলোয় ভরা রাস্তা, কুদৃশ্য বাড়ি, বিহারের সমতলভূমির যে-কোনো এলেবেলে শহরের মতন। এইসব শহরের চেয়ে শহরতলি অনেক সুন্দর হয়, যেখানে ভূমি স্পর্শ করে দিগন্ত, একটা অচেনা নামের ছোট নদী, মকাই খেতের পাশে মোষের পিঠে বালক, তন্বী রমণীর মাথায় সোনার মতন উজ্জ্বল পেতলের কলসি।

এখানে কিছুই করার নেই। মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়রা থাকলে তবু একটু আড্ডা হয়। কিন্তু ওঁরা প্রায়ই বাইরে বাইরে।

পদ্মা বললেন, অন্য সময়ে আমরা কি করি জানেন, দু'জনে মিলে তাস খেলি।

সত্যিই এটাকে আনন্দের জীবন বলা যায় না। শুধু চাকরির জন্য দুটি স্বাস্থ্যবান নারী-পুরুষ দিন দিন শাকচচ্চড়ি হয়ে যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে এঁদের কোনো সন্তান। বাড়িতে নেই কোনো শিশুর শব্দ কিংবা ভাঙা খেলনা।

স্বামীনাথন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী সার্ভিসে আছেন?

—সার্ভিস!

—গভর্নমেণ্ট না পাবলিক এণ্টারপ্রাইজে। কিংবা বোধহয় নিজের বিজনেস।

এক মুখ হেসে বললাম, বেকার।

স্বামীনাথন বললেন, বাঃ। এর চেয়ে সুখের জীবন আর কী হতে পারে!

কিন্তু শ্রীমতী পদ্মা আমার বেকার থাকার কথাটা তেমন পছন্দ করলেন না। বোধহয় ভাবলেন, বাঙালীরা বড্ড বেশি বেকার থাকে। বাঙালীদের উদ্যম নেই। শুধু রাজনীতি।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন এখনো সার্ভিস নেননি কেন?

পাছে আমি বিব্রত বোধ করি, তাই স্বামীনাথন তাড়াতাড়ি বললেন হী মাস্ট বী ইয়াংগার দ্যান মী, এখনো অনেক সময় আছে, যতদিন ফ্রি থাকা যায়।

এবার আমি পদ্মার দিকে তাকিয়ে বেশ গুরুত্ব দিয়ে বললাম, আমি একজন রাইটার।

—রাইটার। আপনি কি লিখেন।

—পোয়েট্রি।

স্বামী স্ত্রীর একবার চোখাচোখি। আশাই করেননি। এরকম নির্লজ্জভাবে। যেন কেউ বলছে আমি বেকার, কিন্তু মাঝে মাঝে চুরি করি।

পদ্মা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি গান করেন।

তেমনি সহাস্য মুখে আমি, না।

—তবে কবিতা লিখে কি করেন।

—কাগজে ছাপা হয়। কেউ কেউ পড়ে।

—একটা শোনান না।

—বাংলা।

—তা হোক। তবু শোনান

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' কবিতাটা আবৃত্তি করতাম, 'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে—' ইত্যাদি লাইন আষ্টেক এখনো মুখস্থ আছে, শুনিয়ে দিলাম। একই কথা।

স্বামীনাথন বললেন, এবারে মনে পড়ছে, আপনার কথা আমি মিঃ বন্দোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছি। তার এক বন্ধু পোয়েট্রি লেখে, খুব বোহেমিয়ান।

বুঝলাম, আমি নয় পরিতোষ নিশ্চয়ই শক্তির কথা। প্রতিবাদ না করে, মৃদু মৃদু হাসি মুখে চুপ করে তাকিয়ে। দোলনায় জোরে জোরে দোলা।

এরপর কিছুক্ষণ পরিতোষ আর শ্রীলেখার কথা। আমিও সোৎ-সাহে। আমি যে ওদের বন্ধু তার নির্ভুল প্রমাণ।

দু'কাপ কফি খাওয়া হয়ে গেছে, এবার ওঠা উচিত। দোলনা থেকে নামতেই পদ্মা বললেন, আপনি তাস খেলতে জানেন?

আমি অন্তত সাত আট রকম তাসের খেলা, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে নতুন কিছু খেলা আছে কিনা জানি না।

—কী খেলা?

—ফিস, রামি?

—জানি।

—খেলবেন।

—এখন? অনেক রাত হয়ে গেছে না! এমনিই আপনাদের অনেক কষ্ট দিলাম

স্বামীনাথন বললেন, ইফ ইউ ডোন্ট ফিল স্লিপি—আমরা অনেক রাত পর্যন্ত।

—আমার আপত্তি নেই।

অবিলম্বে নিচু খাটের ওপর তাস খেলায়। ওঁরা ওঁদের রাত্তিরের খাবার দুটি প্লেটে সাজিয়ে পাশে নিয়েই। নিরামিষে এঁটো হয় না।

রামির তাস বিলি হতেই আমি বললাম, রামি খেলা তো স্টেক ছাড়া জমে না!

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বললেন, এগজ্যাক্টলি। রোজ আমরা দু'জনে স্টেকেই খেলি, কিন্তু নিজেদের মধ্যে, এত বাজে লাগে··· । আজ আমরা একজন পোয়েটকে পেয়েছি, তাকে হারাবো !

—লেট আস সি ।

একটুক্ষণের মধ্যেই তাস খেলা বেশ। ওঁরা দু'জনেই পাকা খেলোয়াড়। মেয়েটিরই নেশা বেশি। গোড়ার দিকে বেশ কয়েকবার পুরো হাত হারলাম ! মুশকিল হচ্ছে আমার পুঁজি কম। বেশি টাকা নিয়ে না বসলে বাজির খেলায় পৌরুষ দেখানো যায় না।

খেলতে খেলতে আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি। গত রাত্রে ছিলাম ট্রেনে, অচেনা লোকদের সঙ্গে। আজ আবার অচেনা মানুষের সঙ্গে তাস। আমার ডাল্টনগঞ্জে পরিতোষের কাছে আসার কোনো কথাই। কলকাতা ছেড়ে বেরুবার সময় ক্ষীণ ইচ্ছে ছিল চাইবাসায় সমীরের কাছে। কিন্তু এখানে না এলে এই দম্পতির সঙ্গে।

আমার ঠিক উল্টো দিকেই বসেছে পদ্মা, ডান পাশে স্বামীনাথন। পদ্মার চোখের পল্লবগুলি অনেক দীর্ঘ, হাতের আঙুলগুলি এত কোমল মনে হয়। পা দুটো মুড়ে বসেছে বলে তার একটি সম্পূর্ণ উরু। কোন স্বাস্থ্যবতীর মাংসল উরুর সঙ্গে কি পারস্যের ছুরির উপমা দেওয়া যায় ? পাখির নীড়ের সঙ্গে যদি চোখের।

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল অনুরাধার মুখ। একটা ছোট্ট স্টেশনে নেমে মিলিয়ে। বাড়ির লোক ওকে জোর করে কলকাতা থেকে দূরে কোথাও। ওর নীরবতা ও দুঃখ আমার মধ্যে এমন একটা ছাপ ফেলেছে। যেন আমাকে যেতেই হবে ঐ ছোট্ট শহরটিতে, আবার দেখতে হবে ঐ কিশোরীকে যতক্ষণ না ওর গোপনীয়তা। অনুরাধা, আমি যাবো তোমার কাছে, তুমি আমাকে চিনতে পারবে না, তবুও।

একটু পরেই স্বামীনাথন হারতে লাগলেন। ভুলভাল তাস ফেলে ফেলে। তাঁর স্ত্রীর মৃদু বকুনি। আমি পরপর দু'বার পদ্মাকে পুরো হাত সমেত হারিয়ে দিতেই সে বেশ উত্তেজিত। সে হারতে ভালবাসে না। তাকে রাগিয়ে দেবার জন্যই আমি প্রাণপণ মনোযোগে। তবু আমিই হারলাম। পরের বারও। পরাজয় উসুল করার জন্য আমি তার বুক ও নগ্নকোমরে কয়েকবার চোখ বুলিয়ে।

খুশিতে উচ্ছল হয়ে সে আবার দ্রুত তাস বিলি। স্বামীকে বলে, নাও, নাও, তুমি এত স্লো।

এক মিনিট পরেই স্বামীনাথনের হাত থেকে তাসগুলি ঝরঝর করে। বসে থাকা অবস্থাতেই তার নাক ডাকে। তারপর মাথা হেলে পড়ে পাশে!

আমি সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে পদ্মার দিকে। পদ্মার চোখ। হাত। কাঁধের ডৌল। খসে পড়া আঁচল। পারস্যের ছুরি।

পদ্মা বললো, একি, আর খেলা হবে না।

আমি হাতের তাসগুলো উল্টে দিয়ে বললাম, আপনার স্বামী তো ঘুমিয়ে পড়েছেন।

পদ্মা সেদিকে তাকিয়ে একটা বিরক্তির ভঙ্গি। পরক্ষণেই ঠোঁটে দুষ্টু হাসি। শাড়ির আঁচলটা পাকিয়ে সরু করে স্বামীনাথনের নাকের মধ্যে। আমার চোখে চোখ, যেন আমরা একই ষড়যন্ত্রের অংশীদার।

নাকে খোঁচা খেয়ে স্বামীনাথন ধড়মড় করে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মাতৃভাষায় কি যেন, মনে হয় যেন বিরক্তিসূচকই। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মাপ চাইবার ভঙ্গিতে হিন্দীতে বললেন, সরি, ভেরি সরি, নিদ আ গিয়া।

ঘুমের ঘোরে উনি ভুলে গেছেন আমি হিন্দীভাষী নই। বিহারে থাকার জন্য আচমকা ঐ ভাষাতেই।

আমি বললাম, আপনার ঘুম এসে গেছে, এখন খেলা বন্ধ থাক।

পদ্মা আদুরে আনুনাসিক গলায় বললো, না, রাত তো বেশি হয়নি, এর মধ্যেই ঘুম।

স্বামীনাথন চোখ কচলে বললেন, ঠিক আছে, আর একটু যদি খেলতে চাও।

হঠাৎ ঘুম থেকে উঠলে মানুষকে একটু দুর্বল। মানুষের মুখে বুদ্ধির ছাপটার নামই তো ব্যক্তিত্ব, ঘুমের সময় বুদ্ধি ছুটি নেয়।

স্বামীনাথন এক ফাঁকে উঠে বাথরুমে। পদ্মা আবার তাস বিলি করছে, আমি দেখছি ওর আঙ্গুল, রক্তাভ নখে স্বাস্থ্যের আভা। নারীটি বেশ ছটফটে, এই মফঃস্বলের জীবন ওর জন্য নয়। যেমন—

—আপনি সাউথ ইণ্ডিয়ায় কোথাও গেছেন!

পদ্মার এই প্রশ্নে হঠাই চমকে উঠি, আমি তখন অন্য কথা। আমি এখানে ছিলাম না কয়েক মুহূর্তের জন্য। মুখ তুলে বললাম, হ্যাঁ, কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত।

—আপনি বুঝি খুব

—হ্যাঁ

—বেশ মজার তো। ছেলেরা পারে, মেয়েরা পারে না।

মেয়েরা আবার এমন অনেক কিছু পারে, যা ছেলেরা—

—কী রকম?

উত্তর দেওয়া হলো না। স্বামীনাথন ফিরে এলেন। আমার একটা লঘু ইয়ার্কির কথা মনে এসেছিল, যা কোনো স্বামীর সামনে বলা যায় না। বললে কোনো দোষ নেই, কিন্তু আড়ালেই।

তাস তুলে নিলাম। আরও কিছুক্ষণ খেলা। কিন্তু আর ঠিক জমছে না। স্বামীনাথন বড় বড় হাই। বেচারীকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। হারছেও খুব! স্বামীর ঘুম তাড়াবার জন্য একবার পদ্মা রেকর্ড প্লেয়ারে একটা গান চালিয়ে দিল, এম এস শুভলক্ষ্মী। তাতেও সুবিধে হলো না, যখন কারুকে ঘুমে পায়।

মাঝে মাঝে পদ্মা মৃদু ভর্ৎসনা করছে স্বামীকে। তখন আমি নীরবে। চোখ চলে যায় পদ্মার দিকে। ওর কোমর ও পেটের অনেকখানি নগ্ন। কোনো নারীর পোশাক যদি হ্রস্ব হয়, সেদিকে তাকানো কি অসমীচীন। তাহলে পোশাক হ্রস্ব কেন। আমি ঠিক বুঝতে পারি না। সুন্দরী বা স্বাস্থ্যবতী নারীদের কোমর আমার কাছে একটি অত্যন্ত প্রিয়দৃশ্য, আমি স্বীকার করছি, বারবার সেই দিকে চোখ।

স্বামীনাথন আর একবার ঢুলে পড়তেই আমি নিজেই বললাম, আর খেলতে ইচ্ছে করছে না, আমারও এবার।

স্বামীনাথন লজ্জিত ও কৃতজ্ঞভাবে আমার দিকে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ওরা দু'জনেও।

পদ্মা বললো, আপনারও ঘুম পেয়েছে।

—হ্যাঁ, মানে, খেলা আর জমছে না।

—আপনি বললেন না তো, মেয়েরা কি এমন পারে যা ছেলেরা পারে না!

আমি এমনভাবে হাসলাম, যার তেষট্টি রকমের মানে হতে পারে। এমন কি চৌষট্টি রকমও। ওকে একটু ধাঁধায় রাখলে ক্ষতি কি।

বিদায় নেবার জন্য সময় না নিয়ে আমি দ্রুত দরজার কাছে

স্বামীনাথন জানালেন, কাল সকালে আমার কফি। রাত্রে কিছু দরকার হলে যে-কোনো সময়।

দরজার ওপরে একটা হাত তুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পদ্মা বললো, আমার মোটেই এত তাড়াতাড়ি ঘুমোতে ইচ্ছে করে না—

এ ব্যাপারে মীমাংসার ভার ওর স্বামীর ওপরে দিয়েই আমি বাইরে। আসলে আমার পেট চুঁই চুঁই করছে খিদেতে। ওদের বাড়ির নিরামিষ খাবার প্রত্যাখ্যান করে ভেবেছিলাম, রাতটা না খেয়েই। কিন্তু এখন দাউদাউ আগুন।

রাত দশটা বাজে। এখনো কোনো কোনো পাঞ্জাবীর হোটেল। দরজায় তালা দিয়ে রাস্তায়। বেশি দূর যেতে হলো না, পেট্রোল পাম্পটার পাশেই বৃদ্ধ সর্দারজী তাঁর দোকান খুলে বসেছিলেন যেন শুধু আমারই প্রতীক্ষায়। ভাত নেই, কিন্তু রুটি। তরকা। আলু-মটর, আলু–পনীর। না, ফিশ কারি, মাটন কারি, ফাউল কারি—সব শেষ। এখানেও নিরামিষ খেতে হবে? আজ রাতে আমার নিরামিষ ভবিতব্য? আণ্ডা হ্যায় তো? ঠিক হ্যায়, ভাজো! রুটির সঙ্গে তিন তিনটে ডিমভাজা। খাওয়ার পর শরীরে বেশ একটা।

ফেরার পথে নিস্তব্ধ রাস্তায় শুধু আমার জুতোর শব্দ। শরীরে আরাম দিচ্ছে মদালসা বাতাস। কোথাও একটা রাতপাখির ডাক। হঠাৎ ওপরে চোখ যায়। বিশাল উদ্যান। এর নিচে আমি কী অসম্ভব ছোট ও একা। নিজের ক্ষুদ্রত্ববোধে আমি যেন আরও চুপসে যাই। কিংবা যেন আমি আর নেই, অদৃশ্য হয়ে। রাস্তায় কেউ নেই, শূন্য, নির্জন, তার ওপরে মাতৃস্নেহের মতন জ্যোৎস্না। প্রথম যে চাঁদে পা দিয়েছিল তার নাম নীল আর্মস্ট্রং। আমার নামে নাম। মৃত্যুর আগে আমি বলে যাবো, আমিও সুন্দরকে।

খুব মন্থরভাবে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় বাড়ির কাছে। স্বামীনাথনদের দিকে তাকালাম। দরজা বন্ধ, আলো নিভে গেছে। এর মধ্যেই কি? পদ্মা বলেছিল। এখন আবার গিয়ে ডাকা যায়? কেনই বা ডাকবো? 'কী কথা তাহার সাথে, তার সাথে?'

আমার, অর্থাৎ পরিতোষের ঘরের দরজার কাছে একটা কুকুর। আগে তো ছিল না। চেহারাটা বেশ ভয়াবহ। এদিক ওদিক একটা ইঁটের টুকরোর জন্য। সেটা ছুঁড়ে মারতেই কুকুরটা প্রচণ্ড গলায় ঘাউ

ঘাউ করে। বিশ্রীভাবে ভেঙে দিল রাত্রির নিস্তব্ধতা। এই সঙ্গে কি স্বামীনাথনরা জেগে উঠবে? কুকুরটাকে রাগাবার জন্য আমি আরও দু'বার পাথর ছুঁড়ে। ওটা আসলে ভীতু, তাই অত গলার জোর, ছুটে পালালো।

ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালিয়ে আরাম করে একটা সিগারেট। আমার চোখে ঘুমের চিহ্নমাত্র নেই। এখনো সামনে দীর্ঘ রাত। পরিতোষ কল্পনাও করতে পারবে না, এই সময় আমি তার বিছানায়। অনেক দিন আগে পরিতোষের কাছে যখন এসেছিলাম, তখন ওর ছোট খাট ছিল, সেবার আমাদের সঙ্গে দীপকও কত কষ্ট করে যে তিনজন সেই খাটে। এখন এত বড় বিছানায় তিন চার জন অনায়াসেই। বড় বিছানা বলেই আমার খুব একা একা লাগতে।

আমি জীবনে কী চাই! জীবন আমার কাছ থেকে কী? জানি না, জানি না, জানি না! কতগুলো বছর কেটে গেল, কিছুই জানি না। জানার কি খুব দরকার? আজ সকাল পর্যন্ত আমি কী চাই, তা জানতাম। আমি চেয়েছিলাম অনুরাধা নাম্নী একটি মেয়ের দুঃখের। কে অনুরাধা। ট্রেনে কিছুক্ষণের জন্য। অসম্ভব গভীর মনে হয়েছিল তার দুঃখ। ঐ মেয়েটির বদলে যদি একটি ছেলের দুঃখ? তা হলেও? সত্যি জানি না, জানি না, জানি না। জানার কি খুব?

পরিতোষের ঘরে বইটই বিশেষ নেই। রাত্রে একটা বইকে অন্তত সঙ্গী করে না শুলে। র‍্যাকের ওপরে দুটো সরু মোটা টাইম টেব্‌ল, কয়েকটা সিনেমার পত্রিকা। নিচের তাকে গীতবিতান, দুটি বাংলা উপন্যাস (পড়া), তিনখানা আমারই বন্ধুদের লেখা কবিতার বই, একটি রাশিয়ান উপন্যাসের অনুবাদ, কয়েকখানা ইংরেজি পেপার-ব্যাক, একটা ডায়েরি, সহজ সাঁওতালি ভাষা শিক্ষা। এর মধ্যে কোনো বইটাই ঠিক আকৃষ্ট। অথচ একটা বই চাই-ই। আমি চোখ বুঁজে হাত বাড়িয়ে যে কোনো একটা।

গীতবিতানটিই উঠে এলো। গীতবিতান পড়তে পড়তে ঘুমের চর্চা! তবু পাতা উল্টে উল্টে। বইয়ের মাঝখানে গানের চেয়েও আকর্ষণীয় অন্য কিছু টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া কাগজ। মনে হয় চিঠি। এত ছোট টুকরো করা হয়েছে মনে হয় হাওয়ায় উড়িয়ে দেবার জন্যই। তবু যত্ন করে রাখা কেন বইয়ের ভাঁজে? চিঠিটা যে ছিঁড়েছে

সে পরে নিশ্চয়ই মত বদলেছে। ছেঁড়া চিঠি বলেই মনে হয় অনেক কিছু গোপন। আমি টুকরোগুলো সাজাবার চেষ্টা করি। আমি ভুল···সেদিন বিকেলে···জানি কেউ···ভয় নেই···তোমার মু··· ভারি তো এক···আমার ছো····বনের কিছুই....সেও তো দু...বর্ধমানে.... তোমার বু....নেক আশা....

না, অসম্ভব, এ টুকরোগুলো মিলিয়ে পাঠ উদ্ধার। জেলখানার কোনো কয়েদীকে যদি এ কাজ দেওয়া যায় তার বেশ ভালোই সময় কেটে যাওয়ার। আমার আর ধৈর্যে। চিঠিটা কি শ্রীলেখার? সেগুলি গীতবিতানের মধ্যেই রেখে দিয়ে আর একটা বই। ইংরেজি পেপারব্যাক, মলাটে পুরোপুরি খোলামেলা মেয়ে, যারা রেল স্টেশনের বুক স্টল আলো করে থাকে। এটাই আপাতত।

মাঝে মাঝে খুটখাট শব্দ। ইঁদুর আছে নাকি! খাটের নিচে উঁকি মেরেও কিছু। হয়তো মূষিকরূপী চপল ইন্দ্রিয়। কী ভীষণ একা লাগছে। হোটেলের ঘরে থাকলে একটা। আমার বইতে চোখ। মন্দ না, মেয়েটির নাম সুজি, সে কারুকে ভালোবাসতে পারে না—

বাইরে কিসের যেন ছপছপ শব্দ। কেউ যেন জল ছেটাচ্ছে। বৃষ্টি নাকি? না তো, মাঝে মাঝে হাত দিয়ে জল ছেটানোর মতন, আমার ঘরটার ঠিক পাশেই। আমি পায়ে পায়ে বাইরে চলে এলাম, শব্দটা আসছে বাড়ির পেছন দিক থেকে। সেখানে একটা বাগান, ছোটখাট হলেও, অনেক ফুলগাছ।

সেই দিকে এসে অদ্ভুত দৃশ্য। জ্যোৎস্না যামিনী, সেই জ্যোৎস্নার বাগানে এক নারী, তার কাঁধে জলভরা কলসী। আপন মনে ঘুরে ঘুরে জল ছেটাচ্ছে। প্রথমে গাটা ছমছম। অপ্রাকৃত মনে হয়। মানুষ, না অলীক? তবে ভয়েরও নেশা নেশা ভাব। আরও বেশি ভয় পেতে ইচ্ছে। আমি আরও একটু এগিয়ে গিয়ে অনুচ্চ স্বরে। কে?,

নারীটির ভ্রূক্ষেপ নেই। গাছে গাছে জল-ছড়া দিতে দিতে। একবার সে আমার দিকে মুখ। হাসলো। কালো রঙের মুখে অত্যন্ত ফর্সা হাসি। পদ্মা।

—এ কি?

—আপনি ঘুমোননি?

—না, শব্দ শুনে উঠে এলাম। কী করছেন?

—বলেছি তো আমার তাড়াতাড়ি ঘুম আসে না।

—কী করছেন এখানে ?

—গাছে জল দিচ্ছি ?

—এত রাত্রে রাত্রে কেউ গাছে জল দেয় ?

—দেয় না বুঝি ?

—কখনো দেখি নি।

—আমি দিই। রোজ রাত্রে। তাই তো ফুলগুলো এমন।

—আপনার ভয় করে না ?

পদ্মা উত্তর না দিয়ে কুলকুল করে হাসলো। আবার জল দিতে দিতে অন্য দিকে।—আমি একদৃষ্টে। বাগানের জল দেবার জন্য ঝারি পাওয়া যায়, তার বদলে ওর কাঁধে কলসী। ঠিক কোনো গ্রাম্য মেয়ের মতন। ওর কোমরের গড়নটা কী অপূর্ব। ঠিক পাথর কেটে কোনারকের মূর্তিগুলি যেমন। আমি বড় কোমর-লোভী, দু'চোখ ভরে ওর কোমর। ঘাগরার ওপরে ব্লাউজ, উড়নিটা রেখে এসেছে।

জল ছড়াতে ছড়াতে ও আমার কাছেই। আমি দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে অঞ্জলিবদ্ধ করে বললাম, আমাকে একটু জল দেবে। আমার তেষ্টা লেগেছে।

ও হেসে কি যেন উত্তর। মনে হলো না।

আমি বললাম, একটু জল দেবে না ? তুমি বুঝি শুধু গাছকেই জল দাও, মানুষকে দাও না ?

ও এবার কলসী উপুড় করে দেখিয়ে বললো, নেই।

—আর নেই ? আমার যে তেষ্টা পেয়েছে ?

—খুব ?

—হ্যাঁ।

আমাকে বিস্মিত হবার সুযোগ না দিয়ে ও বললো, এই নাও !

ততক্ষণে ও ব্লাউজের দুটো বোতাম খুলে ফেলেছে, বন্দী একটা বলের মতন বেরিয়ে এসেছে ওর স্তন।

আরও একটু কাছে এগিয়ে এসে ও খুব স্বাভাবিকভাবে বললো, এই নাও।

আমি সেই মুহূর্তে একটি শিশু। প্রথমে জিভ ছোঁয়ালাম ওর স্তনবৃন্তে। কী গরম। তারপর সম্পূর্ণ মুখটা চেপে। ও আমার মাথায় হাত। আমার শরীর কাঁপছে। সেই শক্ত অথচ কোমল, স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ স্তনে আমার মুখ ও চোখ। ততক্ষণে শিশু থেকে পুরুষ,

আমি দু'হাতে ওর কোমর। যেন ওকে কতদিন থেকে চিনি, অথচ আজই প্রথম শরীরের চেনা।

নিজেকে বিযুক্ত করে একবার ওকে দেখা। বৃষ্টির মতন জ্যোৎস্না ঝরে ঝরে পড়ছে ওর মাথায়। ওর সামনে পেছনে, দু'পাশে গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপ, ও দাঁড়িয়ে আছে ঋজু হয়ে, একটি স্তন শুধু অনাবৃত।

ও হাত বাড়িয়ে বললো, এসো। আমি ওর ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নিতেই ও মুখটা সরিয়ে। আমার মাথাও জোর করে নিচের দিকে। ফের ওর বুকে। যেন আমি ওকে তৃষ্ণার কথা বলেছি বলে ও তৃষ্ণা মেটাতে চায়। কিন্তু পুরুষমানুষের তৃষ্ণা। আমি হাঁটু গেড়ে বসে বসে ওর দুই উরু জড়িয়ে ধরে ওর কোমরে এক লক্ষ চুম্বন। কিংবা এক লক্ষের থেকে একটা দুটো কম হতে পারে।

ও বললো, এখানে নয় আর। এসো।

দৌড়ে গেল আমারই ঘরের দিকে। আমিও পিছু পিছু! ঘর পেরিয়ে বাথরুমে। দাঁড়াও আসছি। আমি শুনলাম না। আমিও ভেতরে। বাথরুমের দরজার পাশে ও আমার কাঁধে হাত দিয়ে মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এমন চুম্বন আমি জীবনে আগে কখনো। আমি উর্বশীর ঠোঁট থেকে অমৃত নিচ্ছি। একবার দুবার তিনবার, আরো দাও, আরো দাও—

খুট খুট খুট খুট শব্দ। হাত থেকে বইটা মাটিতে। আলো জ্বালা, দরজা খোলা। আমি কোথাও যাইনি? পদ্মা কোথায়? সে যে এখানেই এই মাত্র। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তবে কি? কিন্তু আমার ঠোঁটে যে এখনো চুম্বনের। শরীরে সেই উষ্ণতা। তা হলে! আবার সেই খুট খুট খুট খুট। কিসের শব্দ? মূষিকরূপী ইন্দ্রিয়? কপালে ঘাম জমেছে। স্বপ্ন এত তীব্র হয়। আমি কি জল ছড়ানোর শব্দ শুনিনি।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরে। ঘুরে পেছন দিকটায়। সত্যিই একটা বাগানের মতন আছে! বেশ কিছু গোলাপ গাছ। আমি তো এদিকটায় আগে আসিনি, বাগান দেখিনি, তাহলে কি করে স্বপ্নে? বাগানের মধ্যে ঢুকে আমি নিচু হয়ে মাটি পরীক্ষা করতে লাগলাম। মাটি ভিজে ভিজে। গোলাপগুলির পাপড়িতে ও পাতায় ফোঁটা-ফোঁটা জল। সত্যিই জল ছড়িয়েছে একটু আগে মনে হয়। তাহলে কোথায় সেই এক বুক খোলা নারী, যে এখানে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নার মধ্যে স্নান।

স্বামীনাথদের বাড়ির দিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কোনো জীবনের চিহ্ন নেই। একই সঙ্গে আমার লজ্জা ও দুঃখ। ব্যাপারটা সত্যি হলে আমি লজ্জিত বোধ করতাম। সত্যি নয় বলেই বিষম দুঃখ, বিষম দুঃখ।

ফিরে এলাম ঘরে। এখানেও কোনো চিহ্ন নেই। দরজা খোলাই ছিল যদিও। বাথরুমের মধ্যে। এখানেও কেউ। তখন আমি সেই বাথরুমের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে এক কাল্পনিক নারীকে তিনবার প্রগাঢ় চুম্বন। ওষ্ঠ থেকে অমিয়। তার ঊরু চেপে ধরে পায়ের কাছে। স্বপ্নের চেয়েও এই জেগে থাকা কাল্পনিক প্রণয়লীলা কম তীব্র হয় না। এর পরেও বিরাট অতৃপ্তি নিয়ে আমি ফিরে আসি বিছানায়। তারপর পাজামার দড়ি খুলে।

পরদিন খুব ভোরেই আমার ঘুম। বিছানায় উঠে বসেই একটা গুরুতর সিদ্ধান্ত নিতে হয় আমাকে। আজ সারাদিন কীভাবে? পরিতোষ দু'তিন দিনের মধ্যে ফিরবে না। শ্রীলেখাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে যখন। এই দু'তিন দিন আমি? এখান থেকে যাওয়া যায় অবশ্য, কোনো অসুবিধে নেই, পরিতোষের ভাঁড়ারে চাল ডাল আছে, আমি নিজেই খিচুড়ি ফুটিয়ে কিংবা কাছেই পাঞ্জাবী হোটেল। কিন্তু কী করবো একা একা? অথচ একা থাকতেই তো আসা, নইলে কলকাতা ছেড়ে। যেখানে হাজার পরিচিত মানুষ।

কালকের স্বপ্নটাই যত গণ্ডগোল। এরপর পদ্মার কাছে মুখ দেখাতে। সামান্য পরিচয়, তাতেই এমন অবৈধ। দুপুরে স্বামীনাথন অফিসে যাবে। তখন কি পদ্মা ঘুমোয়। সেই সময় তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। হতে পারে না? যদি হয়? অনেক সময় অসম্ভবও তো। ওর হয়তো কোনো অতৃপ্তি আছে, যেরকম ছটফটে ভাব—। আসলে তা-ও নয়। যেটা ওর সারল্য, যেটা ওর পবিত্র মনের চঞ্চলতা, সেটাকেও আমি অতৃপ্তি ভেবে।

হঠাৎ নিজেকে আমার একটা লম্পটের মতন। সকালবেলা উঠেই এক নিরীহ দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোকের স্ত্রী সম্পর্কে। যেন কোনো মহিলা অপরের সঙ্গে একটু হেসে কথা বললেই ব্যভিচারে রাজি হবে। ইডিয়েট! আমি নিজের গালে ঠাস করে এক চড় কশালাম। তবু মনের মধ্যে একটু ছুঁকছুঁকে ভাব। তখন নিজেকে আরও শাস্তি দেবার

জন্য সকালবেলা সিগারেট খাবোই না এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে। এবং আরও ঠিক করলাম স্বামীনাথন-পদ্মার সঙ্গে দেখা না করেই।

পরিতোষরা গেছে ছিপাদহের দিকে। আমি ওদের খোঁজে অনায়াসেই। এদিককার পথঘাট আমার খুব অচেনা নয়। হিটারে গরমজল চাপিয়ে ততক্ষণে ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে। এত ভোরে বহুদিন দাড়ি কামাইনি।

সদর দরজাটায় তালা লাগিয়ে দাঁড়ালাম। মাত্র সাড়ে পাঁচটা। স্বামীনাথনরা এখনো। একটা খামের মধ্যে চাবিটা ভরে, সেই খামেরই গায়ে কয়েক লাইন লিখে সেটা ওদের লেটার বক্সে। যাক, নিশ্চিন্ত। এবার বড় রাস্তায়।

মনের মধ্যে একটা কাপুরুষ-কাপুরুষ ভাব। যেন আমি পালিয়ে, হেরে। কোথায় পালাচ্ছি? আত্মসংযমীকে বীরপুরুষ বলা উচিত না? কেউ তো ব্যাপারটা জানলো না। তা হলে হয়তো কিছু প্রশংসা। তার বদলে, মনে মনে বলছি, শালা, ভীতু কোথাকার—পদ্মা মেয়েটার ছলাকলা দেখেও।

বাস ছাড়তে এখনো দেরি আছে। একটা ট্রাক দাঁড় করিয়ে। যাবে বেতলায়, পথেই ছিপাদহ। দু'টাকায় রফা। আমি উঠে ড্রাইভারের পাশে।

ট্রাকটা বহুদূর থেকে আসছে, সারারাত ধ'রে। ড্রাইভারের চোখ দুটো লাল। গলায় একটা মাফলার। তার পাশে বসে ক্লীনার। একটা অসম্ভব রোগা ছেলে, দেখলে কিছুতেই ঠিক বয়েসটা। ক্লীনার শব্দটাই কি রকম রোগা-রোগা।

পেছনে দশ-বারো জন নারী-পুরুষ মুখে কাপড় মুড়ি দিয়ে বসে বসেই ঢুলছে। ড্রাইভারের পেছনে একটা চৌকো ফুটো, সেখান দিয়ে আমি মাঝে মাঝে ওদের দিকে। দৃশ্যটা কী রকম যেন করুণ করুণ, ওরা সারা রাত্রি এইভাবে। ড্রাইভারের মুখখানা এমনই রুক্ষ, যেন মনে হয় দস্যুদলের সর্দার।

আর একটা অদ্ভুত জিনিস। অনেকগুলো মাছি ভনভন ভনভন। অসম্ভব দ্রুত চলছে ট্রাকটা, তবু মাছি। ড্রাইভার মাঝে মাঝে স্টিয়ারিং-এর ওপর থেকে হাত ছেড়ে, মুখের সামনের মাছিগুলিকে। ভয়-ভয় করে। যে-কোনো সময় অ্যাকসিডেন্ট। এত মাছি কেন? তাড়ি-টাড়ি খেয়েছে নাকি? সেই গন্ধে মাছি? ত'হলে তো আরও সাংঘাতিক।

ক্লীনার ছেলেটাও ঘুম ঘুম। মাঝে মাঝে আমার কাঁধের ওপর। ছেলেটার কষে লালা। ক্রিমির দোষ আছে নিশ্চিত। আমি হাত দিয়ে ওকে সরিয়ে।

সবে আলো ফুটছে। দু'পাশে হালকা জঙ্গল। ল্যাজ গুটিয়ে একটা শিয়াল। বাঁ পাশে শিয়াল দেখা কিসের যেন লক্ষণ? শুভ না অশুভ? আমি দূরে চলে যাচ্ছি ক্রমশ। পদ্মাকে আর জীবনে কখনো হয়তো। কী সুন্দর কোমর! বাঁধিয়ে রাখার মতন। ঐ সৌন্দর্য দূরেই থাক। স্পর্শের বদলে চোখে।

একটা ছোট নদীর ওপর সরু ব্রীজ। ট্রাকের গতি ক্রমে কমে। ভোরের হালকা আলোয় ক্ষীণ নদীটি অপরূপ। এইসব অচেনা পাহাড়ী নদী দেখলেই আমার মনে হয়, এরা বড্ড একা। দিনের পর দিন চুপচাপ কাটিয়ে যাচ্ছে মাঠের মধ্যে। কেউ কি কখনো এখানে গাগরীতে জল ভরতে? দাপাদাপি করে না শিশুরা। বালির ওপর দিয়ে তিরতিরে জলধারা।

নদীটি অবশ্য তখন একা ছিল না। ব্রীজের পাশে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ। হাত উঁচু ক'রে। ট্রাকটা বেশ জোরে ব্রেকের শব্দ। লোকটি কাছে এগিয়ে এসে আমার দিকে সন্দেহজনক চোখে। তারপর দুর্বোধ্য হিন্দীতে ড্রাইভারকে কী যেন। ড্রাইভারও উত্তরে সেই রকম। তারপর লোকটি একতাড়া নোট। ড্রাইভার সেগুলো না গুনেই জেবের মধ্যে ভরে আমাকে বললো, একটু উঠুন তো বাবুজী।

উঠে দাঁড়ালাম। সিটের গদি সরাতেই ভেতরে একটা বাক্সের মতন। তাতে কয়েকটা পুঁটলি। ড্রাইভার দুটো পুঁটলি তুলে রাস্তার লোকটার হাতে। সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক মাছি সেই পুঁটলি দুটো অনুসরণ করে।

মনের মধ্যে একটা খটকা। কি এমন মাছি-ভনভনে বস্তু, যার বিনিময়ে অতগুলো টাকা? আমার কৌতূহলী চোখ একবার ড্রাইভারের দিকে, একবার সেই লোকটার।

আরও দু'একটা বাক্য বিনিময়ের পর ট্রাক আবার। এখনো কয়েকটা মাছি। কী যেন আমার মনে পড়বার কথা। কেউ একবার বলেছিল, ট্রাকে যদি মাছি থাকে।

উল্টো দিক থেকে একটা সরকারী জীপ। ট্রাক ড্রাইভার আমার দিকে একবার আড়চোখে। সেই দৃষ্টিতে অপরাধ। তৎক্ষণাৎ আমার

মাথার মধ্যে চিড়িক করে। আফিং। নিশ্চিত আফিং। ধানবাদে সেই যে একবার। চৌধুরীদা ছিলেন একসাইজের লোক।

ট্রাকটা জীপটাকে পথ ছাড়লো না। নিজেই জোরে বেরিয়ে।

আমি আমার কাঁধ থেকে ক্লীনারের মাথাটা ঠেলে তুলে বিরক্তির সঙ্গে বললাম, এ লোকটাও আফিং খেয়েছে নাকি?

ড্রাইভার সচকিতভাবে জিজ্ঞেস করলো, কেয়া?

—মালুম হোতা হ্যায় কি ইয়ে ভি আফিং খায়া?

ক্লীনারটা চোখ খুলে মিটিমিটি হাসছে। বোধহয় আমার হিন্দী বলার কসরৎ দেখেই। আর একটু কৌতুকের জন্য আমি বললাম, আফিংকা কারবার মে কিৎনা নাফা হোতা হ্যায়?

ড্রাইভারের মুখটা সম্পূর্ণ ঘুরলো। রক্তচক্ষু। লোকটির কোনো কৌতুকবোধ! কর্কশ গলায় বললো, আফিং কা কেয়া বাৎ হ্যায়!

—ওঁ চীজ কেয়া? আফিং নেহি?

—উও তো তামাক হ্যায়।

—ভোরবেলা রাস্তায় খাড়া হোকে, ইৎনা রুপিয়া দেকে আদমি লোক তামাক খরিদ করতা হ্যায়? তব ইৎনা মচ্ছর কাঁহে?

—মচ্ছর?

মচ্ছর মানে মশা না মাছি? বোধহয় মশা-ই। তা হলে মাছির হিন্দী কি? যেমন বোলতার হিন্দী জানি না। এই নিয়ে তারাপদর রসিকতা, আপলোক বোলতা কো বোলতা নেহি বোলতা হ্যায় তো কেয়া বোলতা হ্যায়?

সেই রসিকতাটা ওদের শোনাবো শোনাবো, তখন ক্লীনারটি হঠাৎ রেগে-মেগে এক চিৎকার, এই জন্যই বলছিলাম, বাঙালী বাবুদের কক্ষনো তুলতে নেই।

ড্রাইভারটি তাকে জানালো, সুরৎ দেখে আগে বুঝিনি যে এ বাঙালী।

সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক। উতার যাইয়ে।

—অ্যাঁ?

—উতার যাইয়ে।

বলে কি এরা? এই মাঠের মধ্যে নেমে যাবো? এরা আফিং চোরাচালান করে, তাতে আমার কি? আমি কি কোনো আপত্তি? শুধু একট রসিকতার জন্য।

ড্রাইভারটির চোখ দেখে রীতিমতন ভয়ে গা ছমছম্। গুটিগুটি নেমে পড়তেই। ক্লীনারটি আমার হাত চেপে ধার বললো, রুপিয়া?

কোনো তর্কের মধ্যে না যাওয়াই। দু' টাকাই ওদের। এবং বললাম, নমস্তে। বাকি সব টাকাও যে কেড়ে নেয়নি, সে তো ওদের দয়া। শুধু মাঝরাস্তায় এমনভাবে ফেলে।

একবার ভেবেছিলাম ট্রাকের নম্বরটা। পকেট থেকে কলম বার করেও মতবদল। পুলিশকে জানিয়ে কোনো লাভ নেই। পুলিশকে না জানিয়ে কেউ কক্ষনো চোরা কারবার করে নাকি? মাত্র দু'টাকা অতিরিক্ত লাভের জন্য যে আমাকেও এরা ট্রাকে জায়গা। অতিরিক্ত দুঃসাহসী না হলে।

মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে সকালের প্রথম সিগারেট। ইচ্ছে করলে এখনো পরিতোষের বিছানায়। শুধু শুধু একটা স্বপ্নের জন্য।

কাছাকাছি বাড়িঘর কিছু নেই। বিরাট ফরাসের মত মাঠ। পরবর্তী কোন ট্রাক বাসের জন্য কতক্ষণ? তার চেয়ে বরং হাঁটতে হাঁটতেই। ছিপাদহ আর কতদূর?

আধঘণ্টা মতন হাঁটার পর দূরে একটা কালো গাড়ি। প্রায় মাঝ রাস্তাতেই হাত উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। গ্রাহ্য করলো না গাড়িটা, একরাশ ধুলো উড়িয়ে। শেষ মুহূর্তে আমি সরে না দাঁড়ালে হয়তো চাপা দিয়েই। আমার চেহারাটা কি যথেষ্ট বিপন্ন এবং বিশ্বাসযোগ্য নয়?

আবার হেঁটে হেঁটে এক দিগন্ত মাঠ পার হবার দ্বিতীয় দিগন্তে কিছু ঘরবাড়ি। খাপরার চাল। ছোট একটি গ্রাম। যদি ওখানে চা। স্বামীনাথন কফি খাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, চমৎকার মানুষ। ওরা দুজনেই চমৎকার। শুধু আমারই দুর্ভাগ্য।

একটি ঘরের দাওয়ায় একজন বৃদ্ধ। মাথার চুলগুলি এত শাদা যে মনে হয় ওর বয়েস অন্তত দুশো বছরের কম নয়। প্রথমে তাকে আমি কপালে হাত ছুঁইয়ে নমস্কার। তার মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। ঘরের দেয়ালে পরিবার পরিকল্পনার সরকারী বিজ্ঞাপন।

জিজ্ঞেস করলাম, কাছাকাছি চায়ের দোকান আছে?

বৃদ্ধটি নির্বিকার। নিরুত্তর।

দু' তিনবার প্রশ্ন করে একই। তখন জানতে চাইলাম, ছিপাদহ কতদূর।

বুড়োটা নিশ্চয়ই কালা। কিংবা কোনো উত্তর দেবে না প্রতিজ্ঞা করেছে। দুচ্ছাই, এত বুড়ো-ফুড়ো দিয়ে কোনো কাজ হয় না। বাড়িতে কি আর কেউ নেই? উঁকিঝুঁকি দিয়েও আর কারুকে।

খানিকটা দূরে আর একটা বাড়ি। শালিক পাখির মতন ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে দুটি শিশু। একজন মাঝবয়সী লোক পেঁয়াজের খেতে কোদাল দিয়ে। পাশেই একটি চালার নিচে একটি গরু বাঁধা। যথারীতি খড়ের বাছুর। একজন স্ত্রীলোক মাটির হাঁড়ি নিয়ে সেই দিকে।

অল্প খানিকটা জমিতে নধর পেঁয়াজকলি। আমি সেখানে। পুরুষটি একবার শুধু মুখ তুলে। কিন্তু কোনো প্রশ্ন না করে আবার! তার পাঁজরার হাড়গুলো বেরিয়ে আছে। কত গ্রামে গ্রামে ঘুরলাম, কিন্তু একটিও স্বাস্থ্যবান পুরুষ দেখি না।

—ইধার চা-কা দুকান হ্যায়?

লোকটি সিধে হয়ে আমার দিকে ভালোভাবে। কোদালের ফলাটা কি চকচকে!

—আপনি কোথা থেকে আসছেন? (হিন্দীতে)

—এইসাই ঘুমতা হ্যায়।

—ঘুমতা হ্যায়?

লোকটির বিস্ময়ের কারণ আমি বুঝতে পারি। সদ্য সকালে এক-জন ফিটফাট বাবু চেহারার লোক এই গ্রামে। সচরাচর তো।

—এদিকে চায়ের দোকান নেই?

—না, বাবু।

—আপলোগ চা নেই পিতা?

—হাটে গেলে কোনো কোনো দিন খাই। এদিকে তো কোনো দোকান নেই।

অনেকখানি হেঁটে আমি একটু ক্লান্ত। সকালবেলা চায়ের জন্য বুকের ভেতরটা টাস্ টাস্। চা না খেলে সিগারেট জমে না।

চ্যাঁ—চোঁ—চ্যাঁক—চ্যাঁক আওয়াজে দৃষ্টি ফিরিয়ে! স্ত্রীলোকটি দুধ দুইছে। গরুটি শান্তভাবে। মুখে জাবর, ডান উরুতে দুটি মাছি, সেই জায়গার চামড়াটা কুঁচকে কুঁচকে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুধ দোয়া দেখতে বেশ। স্ত্রীলোকটি এ কাজে বেশ নিপুণা। এই জন্যেই মেয়েদের আর এক নাম দুহিতা। অনেক-দিন আমি এ-রকম কাছে থেকে দুধ দোয়া।

হাঁড়িটা প্রায় ভরো ভরো। অনেকটা দুধ তো। এরা গরীব হলেও বেশ একটা ভালো গরু।

— আপলোগ ইতনা দুধ কেয়া করতো হ্যায় ? বেচতা হ্যায় ?

— হ্যাঁ বাবু, বিক্রি করি।

— কাঁহা ?

— ছিপাদহ কিৎনা দূর হ্যায় হিঁয়াসে ?

লোকটি হাত তুলে বললো, কাছেই।

সে দেখালো দূরের এক 'ধূধূ'র দিকে। এদের 'কাছেই' মানে অন্তত দু'তিন মাইল ! কিন্তু আর উপায় কি ?

মধুর শব্দে দুধ দোয়া তখনো। হঠাৎ শেষ হলো। স্ত্রীলোকটি উঠে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে শিশু দুটিকে। শিশু দুটি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে। স্ত্রীলোকটি একটা পোয়ামাপের কাঁসার গেলাস হাঁড়ির মধ্যে ডুবিয়ে ওদের একজন একজন করে। বাচ্চা দুটি চোখের নিমেষে। স্ত্রীলোকটি তারপর এক গেলাস পুরুষমানুষটিকে। আমি খুবই অবাক হয়ে। এরকমভাবে কাঁচা দুধ খেতে কারুকে দেখিনি। তাও গেলাসটা কলসীর মধ্যে ডুবিয়ে। স্বাস্থ্য বইয়ের লেখকরা এ দৃশ্য দেখলে অজ্ঞান হয়ে যাবে !

পুরুষটি হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলো, বাবুজী, আপনি কি একটু দুধ খাবেন ? লাল রঙের গরু, এর দুধ খেলে খুব তাগৎ হয়।

আমি শশব্যস্তে বললাম, নেহি, নেহি, বহুৎ মেহেরবানি আপকা।

লোকটি তখন খুবই পেড়াপেড়ি। স্ত্রীলোকটি ততক্ষণে আর এক গেলাস। আমি বারবার আপত্তি জানিয়েও।

একটা খাটিয়া আনা হলো আমার জন্য। আমি গেলাসটা হাতে করে একটুক্ষণ। বলতে পারতাম, দুধটা যদি একটু গরম করে। সঙ্কোচ হলো। এরা যদি কাঁচা দুধ খেতে পারে তাহলে আমিই বা।

আস্তে আস্তে চুমুক। প্রথমে একটু বুনো বুনো গন্ধ। কিংবা কাল্পনিক। তারপর আস্তে আস্তে ভালো লেগে যায়। স্ত্রীলোকটি ব্যগ্রভাবে আমাকে।

স্ত্রীলোকটির বয়েস বছর চল্লিশেক কিংবা পঁচিশ-ছাব্বিশও, ঠিক বোঝা শক্ত। স্বাস্থ্যটি দৃঢ় কিন্তু মুখে অনেক দুঃখ, অনেক অভিজ্ঞতা এবং সংগ্রাম। চোখ দুটিতে বিস্ময় এবং স্নেহ এখনো তবু।

হঠাৎ আমার চোখে জল এসে যায়। এক অভূতপূর্ব মমতাময় ভালো লাগার স্পর্শ। কোথায় একটা অচেনা গ্রামে, একটা অচেনা বাড়িতে, জীবনে প্রথম টাটকা কাঁচা গরুর দুধ ঠোঁট দিয়ে ছুঁয়ে। এদের এত আন্তরিকতা। এতটা কি আমার পাওনা ছিল? আমি কার জন্য কী করেছি? যদি কখনো অন্য কারুর জন্য। যদি কখনো অনুরাধাকে।

অনুরাধার কথা মনে পড়তেই বুকের মধ্যে টনটন। আর কি কখনে দেখা? ভোরবেলায় স্টেশনে নেমে সে কোথায় হারিয়ে। কেন তাকে আমি এমনভাবে হারাতে। সে যে আমার খুবই আপন।

দুধটার জন্য পয়সা দেবো কিনা এই নিয়ে মনের মধ্যে। ভারতীয় আতিথ্য বলে একটা কথা আছে। দারিদ্র্য তার চেয়ে আরও অনেক বেশি ভারতীয়। একটুক্ষণ অপেক্ষা করি। তারপর বলি, এক অনজানে মেহমান কে লিয়ে আপলোগ কা বহুৎসা দুধ খরচা হো গিয়া

আমার হিন্দী শুনে এরা হাসে না, ভাষা নিয়ে এদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। কথাটা সবটা বুঝতে না পারলে দু'এক পলক মুখের দিকে।

লোকটি একটু পরে জানালো যে, ওর ভাবী তো এক্ষুনি ছিপাদহে যাবে দুধ বেচতে, সুতরাং আমিও তার সঙ্গে। আমাকে রাস্তা চিনিয়ে।

এতক্ষণ বাদে আমি ওর নামটা। আশ্চর্য, ওর নাম সাহেবরাম। দু'তিনবার শুনেও বুঝতে পারি না। সাহেবরাম? কি আশ্চর্য মিলন। এখনো ঠাকুর-দেবতার নামেই এদের নাম রাখার রেওয়াজ। এর এক সঙ্গে দুই দেবতা।

আমি তার মাটি-রঙা পিঠে আমার একটা হাত। কি ঠাণ্ডা। এত ঠাণ্ডা হয় কেন?

স্ত্রীলোকটি আঁচলটা গাছকোমর। হাঁড়ির মাথায় একটা পাতলা কাপড় বেঁধে বললো, চলুন।

সে মাঠের মাঝখান দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথ চেনে। আমি তার পিছু পিছু। দুজনেই নিঃশব্দ। সে এত দ্রুত যায় যে আমাকেও হনহন করে।

একটা ছোট্ট ডোবার পাশে দুটি তালগাছ। অল্প ছিরছিরে জল। তালগাছ দুটি যেন দুই প্রহরী। কিংবা বন্ধু। চিরকাল জল দেখলেই আমার। একবার দৌড়ে গিয়ে পা ডুবিয়ে।

—মায়ি, একটু দাঁড়াবে ?

স্ত্রীলোকটি দাঁড়ালো ঠিকই, ভুরুতে বিরক্তির রেখা। হয়তো ওর দেরি হয়ে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ে দুধ। হঠাৎ একটা কথা মনে এলো। এ তো দুধে জল মেশানো না ? আমার সামনেই তো সবকিছু। দুধে জল মেশাতে জানে না। শিখিয়ে দেবো ? এই ডোবার জলই বা মন্দ কি ? হাসি পেল। এসব বাঙালী-চিন্তা।

ডোবার জলে পা ছোঁয়াতেই খুব আরাম ! কাছেই দু'তিনটে ব্যাঙ। যেন এদের সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছিল, দেখা না করে চলে গেলে খুবই। সেই জন্যেই তো তোমার কাছে। পা দিয়ে জল ছলছল শিশুর মতন অনেকক্ষণ খেলা করে সময় কাটানো যেত। তবু উঠে আসতে।

আবার যাত্রা। এর মধ্যেই মাইল খানেক অন্তত। সারাটা পথ কোনো কথা না বলে কি ?

—মায়ি, তুমি রোজ দুধ নিয়ে যাও ?

—জী

—কখন ফেরো ?

—তিন বাড়িতে দুধ মেপে দিয়ে ফিরে আসি।

—যেদিন বৃষ্টি হয় ? সকালে যদি বৃষ্টি হয় ?

সে আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন আমি ওকে অকারণে ধাঁধা জিজ্ঞেস করছি। ছেলেমানুষি।

কিন্তু আকাশ হঠাৎ কালো; কোথা থেকে কালো মেঘ। যদি হঠাৎ এক্ষুনি বৃষ্টি নামে, আমরা দু'জন কোথায় ? কাছাকাছি আর বড় গাছও নেই। সেই ডোবাটার কাছেই ফিরে যেতে। দু'জনে দুটো তালগাছে হেলান দিয়ে। ছবিটা চোখের সামনে ভাসে।

বৃষ্টি এলো না। মাঠ ভেঙে আমরা বড় রাস্তায়। অদূরে কিছু কিছু বাড়িঘর। এবং চায়ের দোকান। আর আমি চা না খেয়ে এক পা-ও। আমার পথপ্রদর্শিকাকে কি এক কাপ চা ?

—মায়ি, চা খাবে ?

এবার মুখটা পাশের দিকে ফিরিয়ে সে অদ্ভুত লজ্জার সঙ্গে হাসি চেপে। মুহূর্তে সে খুকির মতন। এই মুখখানা যদি কোনো ছবিতে।

ফুলুরি ভাজছে। চায়ের সঙ্গে বেশ। এখন যদি আমার পথের সঙ্গিনীর সঙ্গে বেশ জমিয়ে বসে চা ও বিস্রম্ভালাপ। জানি, তা হয় না।

শহরে জন্মায়নি বলেই এই নারী ইহজীবনে কোনো চায়ের দোকানে।
আমার কাছ থেকে কোনো রকম বিদায় না নিয়েই সে হনহনিয়ে। এটাই স্বাভাবিক। আমি ওর নাম জিজ্ঞেসে করিনি। এই নাম না জানা রমণীর কাছে আমার কৃতজ্ঞতাটুকু সারা জীবনের জন্য।

পর পর দু' গেলাস চা। ছোট ছোট গেলাস, ঠিক জমে না। ফুলুরিও বিস্বাদ, সম্ভবত তিল তেলে। দোকানে আমিই একমাত্র, উনুনে বড্ড ধোঁয়া।

সরকারী বিশ্রাম ভবনের সন্ধান জেগে উঠে দাড়িয়ে। বেশি দূর নয়। এখানে অনেকেই কাঠের কারবারী। কয়েকটা বেশ ভালো বাড়ি। সার সার ট্রাক বিশ্রামরত। শুকনো পাতা পোড়ার গন্ধ। আমার ক্লান্ত পা।

বাংলোটা একদম উঁচুতে। কাঠের গেটের পরে খানিকটা বাগান। তারপর চওড়া বারান্দা, সেখানে পরিতোষ আর তার স্ত্রী, সামনে চায়ের সরঞ্জাম। চমকে দিতে হবে। নিঃশব্দে কাঠের গেট খুলে আমি গুটিগুটি!

হয়তো পিঠে কিল মেরেই বসতাম, তার আগেই। পরিতোষ তো নয়। অচেনা স্বামী-স্ত্রী। কোনো সাড়া শব্দ না করে একটা কাছে চলে আসা খুবই। আমি অপ্রস্তুতের একশেষ।

লোকটি কোন প্রশ্ন করার আগেই আমি পরিতোষের নাম।

লোকটি স্নায়ু শিথিল করে ইংরেজিতে জানালো, মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস ব্যানার্জি তো একটু আগেই...

কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে পরিতোষের সম্পর্কে। আজ সকালেই ওরা গেছে বেতলা। সেখানেও থাকতে পারে, অথবা। আমি কি এখন পরিতোষের খোঁজে বেতলায়? বেতলায় চমৎকার জঙ্গল। জীপ নিয়ে ঘুরলে হরিণের পাল, কখনো বাঘ, কিংবা হাতি ও দারুণ ব্যাপার। কিন্তু যদি সেখনেও গিয়ে দেখি পরিতোষ ইতিমধ্যে আবার? এখন এইভাবেই পরিতোষকে খুঁজতে খুঁজতে আমার সারা জীবন।

একটু হাসি পায়। ঠিক যেন গেছোবাবা। আমি যাই উত্তরে তো সে দক্ষিণে। আমি টালা গেলে সে চেতলায়। তা ছাড়া আমি পরিতোষকে এত খুঁজছিই বা কেন? কলকাতা থেকে বেরুবার সময় তো।

মনঃস্থির করে ফেলি। এবার ফেরার পালা!

অচেনা দম্পতি ভদ্রতা-মেশানো চা আমার জন্য। আমি প্রত্যাখ্যান। আমি ওঁদের কাছে এমন ভাব দেখালাম যেন আমায় এখনই পরিতোষের খোঁজে।

বাংলো ছেড়ে হেঁটে এসে রাস্তার ওপরে। আর ট্রাক নয়। এদিক দিয়ে বাস যায় জানি। একঘণ্টা—দু'ঘণ্টা পর পর।

একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েই অনেকক্ষণ। ঘড়ি নেই, কতটা সময় কাটলো জানি না। কটা সিগারেট খরচ হলো সেই অনুযায়ী সময়। এক প্যাকেটে যদি দু'ঘণ্টা চলে তাহলে সেই হিসেবে সাতটা সিগারেটে প্রায় দেড় ঘন্টা। একা থাকলে অবশ্য একটু বেশি ঘন ঘন!

যেন আমার জীবনের দেড় ঘন্টা আয়ু ছিপাদহের এক গাছতলায় খরচ করার কথা ছিল। ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে ঝগড়ায় মত্ত এক ঝাঁক ছাতারে পাখি। এই দৃশ্যটিও নির্দিষ্ট আমার জন্য। পর পর তিনটি নারীচরিত্র-বর্জিত মোটরগাড়ির ঠিক এই সময়েই এই রাস্তা দিয়েই।

একটু একটু বিরক্তির ভাব আসতেই আমি তাড়াতাড়ি সতর্ক। না বিরক্ত হলে চলবে না তো। পদ্মপাতায় টলটল করছে জল, কখন গড়িয়ে পড়বে তার ঠিক নেই, এর মধ্যে আবার বিরক্তির সময় নষ্ট? তার বদলে গুনগুন করে একটা গান। ধারে কাছে কেউ না থাকলেই আমি ভরসা করে একটু গান গাইতে।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি কিশোরী মেয়ের অভিমানী মুখ। কেন এই মুখটা ভুলতে পারছি না? ট্রেনে মাত্র কয়েকঘণ্টার জন্য। এরকম তো আরও কতবার। অনুরাধা, শুধু এই নামটা জানি, আর ওর সম্পর্কে কিছুই না। হলুদ ফ্রক পরে শুয়েছিল বাঙ্কের ওপর, চোখের পাশ দিয়ে জলের রেখা। ওর সঙ্গে জীবনে আর আমার দেখা হবার কথাই নয়। তবু যদি এখনো। হয়তো এখনো।

বহুদূরে বাসের চেহারা। আমি চাঙ্গা হয়ে সোজা হয়ে। তখন চোখে পড়লো, খুব কাছেই উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসছে কলসী মাথায় সেই স্ত্রীলোকটি। সাহেবরামের ভাবী। দুধ বিক্রি শেষ। দু' একবার আমার দিকে চোখ। কোনো কথা নেই।

আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি মায়ি, ঘর যা রহা হ্যায়?

যেন কতকালের চেনা। সে নিঃশব্দে ঘাড় হেলিয়ে। আমি তার

গাম্ভীর্য ভাঙার চেষ্টা করি। হালকা গলায় আবার বলি, সব দুধ খতম ? থোড়া সে দেওনা হামকো ?

সে এবারও কথা বলে না। তবে হাসে। একটা হাত ঘুরিয়ে ইঙ্গিতে জানায়, নেই, নেই।

ওর সঙ্গে ওদের গ্রামে আবার ফিরে গেলে কেমন হয় ? থেকে যাবো সাহেবরামদের বাড়িতে। খাটবো সবজি ক্ষেতে। সকালবেলা কাঁচা দুধ। বিকেলে মহুয়া। একটা ইস্কুল খুলে মাস্টারবাবু হয়ে বাকি জীবনটা ?

বাস এসে ওকে আড়াল করে দাঁড়ায়। আমি আর কিছু চিন্তা না করে লাফিয়ে। কলকাতার ছেলে আবার কলকাতায়। এই গ্রামে তিন দিনের বেশি চারদিন থাকতে হলেই পাগল হয়ে। ওসব কল্পনাতেই।

আঃ, বাসটা কি এইসময় একটু খালি থাকতে পারতো না ? একটা বসবার জায়গা ? গিস্‌গিসে ভিড়। এত লোক সকালে উঠেই কোথায় যায় ? আমি দেড়ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে। ভিড়ের মধ্যে তীব্র মানুষ-মানুষ গন্ধ। যদি রাক্ষস হতাম, সব কটাকে।

ওই ভিড়ের মধ্যেই একজোড়া বরবধূ। বউটি বসবার জায়গা পেয়েছে, বর দাঁড়িয়ে। বরের কপালে তখনো চন্দনের ফোঁটা। যেন বাসরশয্যা থেকে সোজা উঠে এসে। দৃশ্যটার মধ্যে খানিকটা যেন ট্র্যাজিক সুর মেশা। নতুন বউয়ের মুখটা অবিকল নতুন বউয়ের মতন। হয়তো পরশু দিন পর্যন্ত ও ছিল কুলি-রমণী, আবার কাল পরশু থেকে। মাঝখানে এই একটা দুটো দিন ওর মুখটা একেবারে আলাদা। ওদের জন্য একটা ঘোড়ায় টানা রথ অর্থাৎ অন্তত একটা টাঙ্গা যদি। শুধু আজকের জন্য। আজ ওদের খানিকটা আলাদা সম্মান। তবু কেন বাসে ? হয়তো দূরত্ব আরও বেশি।

ডালটনগঞ্জ আসতেই নেমে। এখান থেকে আবার ট্রেন। বেশ গরম। একবার স্নান করতে পারলে। স্টেশনের প্লাটফর্মে একটা কলে দু'জন লোক। আমি লোকজনের চোখের সামনে কিছুতেই।

চট করে পরিতোষের বাড়িতে গিয়ে ? স্বামীনাথনরা যে রকম সহৃদয়, আমাকে আবার দেখলে নিশ্চয়ই খুব খাতির যত্ন। অনায়াসে ওখানে স্নানটান করে, খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে।

সেদিকে পা বাড়িয়েও ছিলাম। আবার থমকে। এখন দুপুর। স্বামীনাথন নিশ্চয়ই অফিসে। দুপুরবেলা একা পদ্মা। শরীরে আলতো বিদ্যুৎ–তরঙ্গ খেলে খেলে। হয়তো মেয়েটি খুবই ভালো, সেটা হওয়াই তো স্বাভাবিক, শুধু শুধু আমার লোভ। নির্জন দুপুরে একটি ভালো মেয়েকেও আমি।

ফিরে এলাম। কয়েক মিনিট বাদে আবার। মনটা চঞ্চল হয়ে অবাধ্য। গেলে ক্ষতি কি? মেয়েটি বড্ড সুন্দর। শুধু চোখে দেখতেও। কিন্তু তা হয় না। চোখ অস্থির গর্জন করবে। শরীর যেন চুম্বক, কিছুতেই কাছাকাছি না এসে।

অতিকষ্টে নিজেকে দমন করতেই। একটা যেন দারুণ বীরত্ব। আমার বন্ধুর বাড়ি, যেখানে যাওয়ার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, সেখানেও।

স্নান হলো না। একটা দোকানে খেয়ে নিয়ে ট্রেনের কামরায় বসে লম্বা ঘুম।

ডেহরি–অন–শোন–এ পৌঁছোতে পৌঁছোতে রাত। এক্ষুনি বম্বেমেল। টিকিট কেটে উঠলেই সোজা কলকাতা। এবারের মতন ভ্রমণ শেষ।

কিন্তু আমার বুকের মধ্যে একটা ঝনঝন শব্দ। আমাকে অন্য কোথায় যেন। না গিয়ে উপায় নেই, যেতে হবেই হবেই, হবেই হবেই। কথা দেওয়া আছে। কার কাছে? নিজের কাছেই, আবার কার?

একটা শেয়ারের ট্যাক্সি তখনই ঔরঙ্গাবাদের দিকে। উঠে জায়গা করে। চোখ খর করে সব সময় বাইরে। পেরিয়ে না যায়। জায়গাটা ঠিক যদি চিনতে না পারি। না চিনলে আর আফশোসের। সুলেমান–পুরে আসতেই চেঁচিয়ে উঠলাম, রোখকে, রোখকে।

কেউ জানে না কেন আমি সুলেমানপুরে। অন্য লোকরাও অবাক। একজন জিজ্ঞেস করলো, এখানে কার কাছে যাবেন? উত্তর দিলাম না। মুখ দিয়ে শুধু একটা অস্পষ্ট শব্দ করে।

ট্যাক্সিটা দূরে মিলিয়ে। আর কোনো উপায় নেই। এবার আমি একা।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। এ জায়গায় আগে কখনো আমি। কারুকে চিনি না। শুধু একটা নাম জানি, অনুরাধা। এই নামটা শুধু সম্বল করে কোথায় যাবো, কোথায়?

তবু এখানেই।

ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে।

এই শহরে এখন কে আমাকে আশ্রয়? কোথাও কোনো হোটেল কিংবা। রাত্তিরটা অন্তত।

যে-কোনো একটা বাড়িতে গিয়ে কি? যদি বলি, আমি পথিক যদি আমাকে একটু। সেসব দিন এখন আর নেই। অচেনা লোককে কেউ অতিথি করে না। শুধু তারাই আশ্রয় দেয়, যারা পয়সা নেয়। রূপকথার গল্পের মতন কোনো বাড়ির জানলা থেকে এখন কেউ যদি আমাকে হাতছানি দিয়ে।

খানিকক্ষণ হাঁটার পর রাস্তার দু'ধারে সারি সারি বন্ধ দোকান। সম্ভবত বাজার। একটা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ, কিন্তু ভেতরে ক্ষীণ আলো। টুকরো টুকরো কথাবার্তা।

—শুনছেন। এই যে, শুনছেন।

প্রথমে কেউ সাড়া দেয় না। কথাবার্তা থেমে। আমি আবার টিনের দরজায় ঠকঠক শব্দ।

—কে?

একটু খুলবেন?

দরজা সামান্য ফাঁক। এটা একটা ভাতের হোটেল। টেবিলের ওপর চেয়ারগুলো ওল্টানো। এক কোণে নিজেদের লোকেরা খাবার-টাবার নিয়ে—

—কি চাই?

—কিছু খাবার পাওয়া যাবে?

—না, দোকান বন্ধ হয়ে গেছে।

—শুনুন না, একটু খুলুন—

একটি মহিলাকৃতি লোক এগিয়ে এসে বললো, কি বলছেন কি?

সেই বিরাট লোকটির সামনে আমি প্রায় চুপসে। কোনো রকমে মিনমিন করে বললাম, আমি একটু থাকা আর খাওয়ার জায়গা খুঁজছিলাম।

—কোথা থেকে আসছেন?

—এমনিই ঘুরতে ঘুরতে। এখানে আর কোনো হোটেল নেই?

—না। ঔরঙ্গাবাদে চলে যান।

—সে তো অনেক দূর। আপনার এখানে একটু থাকার জায়গা।

লোকটি রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে আমার দিকে খুব ভালোভাবে। সন্দেহাকুল চোখ। অধিকরাত্রে অজ্ঞাতকুলশীল।

—এখানে কি জন্য এসেছেন ?

চট করে উত্তর দিতে পারি না। সম্বল মাত্র একটি নাম। অনুরাধা বসুমল্লিক।

একটি কিশোরীর নাম করে কি কোনো খোঁজ ?

—এদিকে জমির খোঁজে এসেছিলাম।

—জমি ?

—হ্যাঁ। শুনেছিলাম এদিকে সস্তায় জমি পাওয়া যাচ্ছে। ট্যাক্সি ব্রেকডাউন হয়েছিল, পৌঁছোতে দেরি হয়ে গেল।

আমাকে দেখলে কি জমি কেনা মানুষ ব'লে ? তবু যদি ওরা ভাবে আমার সঙ্গে অনেক টাকা। বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য আমি আবার বলি, জমি কিনে একটা ফ্যাকটরি হবে, আমার মামার, তিনিই পাঠিয়েছেন।

জাঠমলের কাছে খোঁজ করুন

—কিন্তু রাত্তিরটা কোথায় থাকা যায় ? আপনার হোটেলে ঘর নেই ?

—এটা থাকার হোটেল নয়, শুধু খাওয়ার।

দু'জন অল্পবয়েসী বেয়ারাও বাইরে এসে। একজন বললো, ডাক-বাংলোতে যান।

—কত দূরে ?

—দু' আড়াই মাইল

—এত রাত্রে সেখানে যাবো কি করে ? গিয়েও যদি জায়গা না পাই ? আপনার ওই টেবিল দুটোর ওপরে যদি শুয়ে থাকি ?

ভবিষ্যৎ ফ্যাক্‌টরি মালিকের ভাগ্নের কাছ থেকে এরকম প্রস্তাব প্রত্যাশা করা যায় কিনা, ওরা সেটা ঠিক বুঝতে। এ ওর মুখের দিকে। দীর্ঘকায় লোকটি বললো, ওটার ওপরে এই ছেলেরা শোয়।

—আর কোনো জায়গা নেই ? যদি একটু সাহায্য করেন !

ওরা নীরব। আমি যেন বেশি বাড়াবাড়ি। সামান্য রাত্রে ঘুমোবার জন্য ! বৃষ্টি নেই, মাঠে-ঘাটে গাছতলাতেই তো। আমার তো নেই বাটপাড়ের ভয় ! আসলে হয়তো, এই রিকেটি হোটেলের নড়বড়ে

কাঠের টেবিলে শোওয়ার জন্যই আমার লোভ। ওই জায়গাটাই আমার চাই। এ-রকম অসংগত লোভ আমার মাঝে মাঝেই। যেন ওই জায়গাটা না পেলে কিছুতেই আজ আমার ঘুম।

ছেলে দুটি স্থানচ্যুত হতে চায় না। একজন বললো, পদমজীর বাড়িতে ইরিগেশানের বাবুরা ছিল কিছুদিন।

—দ্যাখ তো সেখানে ঘর খালি আছে কিনা।

একটি ছেলে আমাকে সংগে নিয়ে। বড় রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্য দিয়ে। পদে পদে হোঁচট খাওয়ার ভয়। কোথা থেকে কোথায়। কাল রাত্রে কোথায় ছিলাম। আর আজ। সুখের বিছানা ছেড়ে এই মাঠের মধ্যে। এই অনিশ্চয়তায় আমার দারুণ আরাম।

একটা লম্বা স্কুলবাড়ির মতন। অনেক ডাকাডাকি করে পদমজীকে। টকটকে লাল চোখ। আশু মুখুজ্যের মতন গোঁফ। বোঝা যায় সন্ধে থেকেই গাঁজা।

ছোট ছেলেটি আমার সমস্যা বুঝিয়ে বলায় সে কোনো রকম বিস্ময় দেখায় না। তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে বললো, তিনরুপিয়া চার আনা রোজ।

রেট যথেষ্ট বেশি। সাধারণ হোটেলেই চার টাকা। তবু দরাদরি না করে আমি একটা দশ টাকার নোট। এবং কিছু চিন্তা না করে বললাম, তিন রোজকা।

ঘরটা বিস্ময়কর রকমের পরিষ্কার। ধপধপে শাদা দেয়াল, মাঝখানে একটি খাটিয়া। সব মিলিয়ে বেশ একটা শুকনো টাটকা ভাব। এতটা আশা করিনি।

ছেলেটাকে বিদায় দিয়ে আমি অবিলম্বে শুয়ে। আজ রাতের মতন পেটে কিল মেরে।

কোথায় কখন থাকি, তার ঠিক নেই। তবু এই ঘরটা কেন তিন দিনের জন্য? যেন এখানে একটা চুম্বক আছে। আমাকে টেনে রাখছে।

রাত্রে ঘুমের মধ্যে অস্পষ্ট গোলমাল। গাঁজাখোরদের হল্লা। কখনো একটি স্ত্রীলোকের সরু কণ্ঠস্বর। তবু আমি না উঠে। অচেনা জায়গায় বেশি কৌতূহল দেখানো ভালো নয়।

সকালে উঠেই চায়ের জন্য। এখানে চা পাওয়া যায় না। যেতে

হবে বাজারে। একবারেই বেরিয়ে পড়া যাক! মুখ-টুক ধুয়ে নিয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে।

চা খাওয়ার পর আমার কর্মপদ্ধতি ঠিক করে ফেলি। শুধু একটা নাম। ওতে কোনো লাভ নেই। যুবকটিরও পদবী যদি। সুতরাং সারা শহরটা টহল মেরে। যদি হঠাৎ।

শহরটা ছোট। বাজার আর কিছু খুচরো দোকান, ছড়ানো ছেটানো বাড়ি। একটা তিরতিরে নদী। রেল স্টেশন ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই।

মন্থরভাবে প্রতিটি রাস্তা দিয়ে। প্রতিটি বাড়ির দিকে সতর্ক চোখ। দরজার দিকে, জানলার দিকে। বাড়ির পেছনের উঠোনে। যে-কেউ আমাকে ভাবতে পারে পুলিশের লোক।

কেন আমি এ-রকম করছি? কেন ঐ মেয়েটিকে? নিজেই জানি না। মেয়েটিকে খুঁজে পেলেই বা কি লাভ? জানি না। আমি তাকে কি বলবো? জানি না। হঠাৎ কেউ আমার গতিবিধি নিয়ে প্রশ্ন করলে কি উত্তর? জানি না।

অন্তত তিনবার গোটা শহরটা চষে ফেলে। এখানে বাঙালীই প্রায় চোখে পড়ে না। এমন হতে পারে ওরা এর মধ্যে এ জায়গা ছেড়ে। কিংবা এই রেল স্টেশনে নেমে দূরের কোনো গ্রামে। তাহলে আমি এখানে কি করছি? তিন দিনের জন্য ঘর ভাড়া।

একটা বাড়ির দিকে আমার বারবার চোখ। পুরোনো বাড়ি। চারদিকে দেয়াল, দেয়ালে আইভি লতা। বাড়িটার গেটে বাংলা অক্ষরে লেখা 'চৌধুরী কুঠি'। এরা বাঙালী। সুতরাং এখান থেকে কোনো রকম খবর হয়তো। কিন্তু চৌধুরীদের সঙ্গে বসুমল্লিকদের কী আত্মীয়তা? জানি না। একজন প্রৌঢ় লোককে সে বাড়ির সামনে কয়েকবার। বেশ রাশভারী চেহারা। বাড়িটার পেছনে ঘন ঘন মুর্গির ডাক। বেশ কয়েকটা মুর্গি আছে বোধহয়।

প্রৌঢ় লোকটিকে জিজ্ঞেস করলে? কিন্তু কি জিজ্ঞেস? একটি মেয়ের নাম? সে আমার কে হয়? যদি আমাকে লম্পট হিসেবে? মহা মুশকিল দেখছি!

সকালটা বৃথা গেল। দুপুরে বাজারের দোকানে। খেয়ে পদমজীর ঘরে ঘুম। কিন্তু গাঢ় ঘুম হয় না। অনেক রকম স্বপ্ন, এলোমেলো। একবার অনুরাধাকেও। সেই দুঃখ ও রাগ মেশানো মুখ। অনুরাধার

সঙ্গে দেখা হলেও ও কি আমাকে চিনতে ? কি জানি, ভয়। কেনই বা চিনবে ? আমি ওর কে ? এমনকি ভালো মতন আলাপ তো।

বিকেলে আবার। জানি পণ্ডশ্রম, তবুও নেশার মতন। পৃথিবীতে আমার এখন একমাত্র কাজ অনুরাধা বসুমল্লিককে খুঁজে বার করা। না হয় শুধু একবার তাকে দেখেই। হয়তো সে এখানে নেই। তবু এখানে সে ট্রেন থেকে নেমেছিল, সেই জন্যই শহরটা চুম্বকের মত।

ঠিক সন্ধের আগে আমি যুবকটিকে হঠাৎ। সে একটা ডাক্তারখানা থেকে বেরুচ্ছিল। আমি তাকে এক পলক দেখেই। কিন্তু সেও কি আমাকে ? আমি চট করে মুখটা ফিরিয়ে।

আমার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দে দুম্‌দুম্‌, যেন বাইরের লোকও শুনতে। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে নিরাশ হবার ঠিক পরেই এই আশাতীত। এত বেশি আনন্দ যে অনেকটা ভয়ের মতন। দারুণ ভয় ও দারুণ আনন্দের প্রতিক্রিয়া যেন একই রকম।

ডাক্তারখানায় কেন ? কার অসুখ ? অনুরাধার ? তা হলে সে বিছানায় শুয়ে নিশ্চয়ই। কিছুতেই দেখা হবে না। আমি যদি ডাক্তার হতাম, ইস্‌ !

ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে যুবকটি আবার একটি দোকানে। আমি খানিকটা দূরে। বেশ একটা উত্তেজনার ভাব। যেন গল্পের বইয়ের গোয়েন্দা। সিগারেট ধরিয়ে বারবার আড়চোখে।

যুবকটি সেই দোকান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করতেই, আমিও তার পেছন পেছন। বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে। হয়তো যুবকটি আমাকে দেখলেও। ট্রেনের কামরার সঙ্গীদের কে মনে রাখে ! আমি রেখেছি, আমি তো রাখবোই !

আসলে আমি সারাদিন খুবই বোকামি। একটি মেয়ের বদলে একটি ছেলেকে খুঁজে বার করা অনেক সহজ ! আমি যদি ছেলেটিকেই কোনো না কোনো দোকানে। কিংবা বাজারে। একটা ছেলে তো আর সারাদিন বাড়িতে। আসলে ছেলেটির কথা আগে আমার মনেই। সব সময় অনুরাধার মুখ।

শহর ছাড়িয়ে একটু বাইরে যুবকটি যে বাড়ির সামনে আসে, সেই বাড়ির কাছ দিয়ে আমি আগে অন্তত পাঁচ ছ' বার। এই তো সেই বাড়িটা ! সেই চৌধুরী কুঠি। কুকুরের মতন শুঁকে শুঁকে আমি তাহলে ঠিক বাড়িতেই। ইস্‌ একটা বেলা শুধু শুধু।

বাড়িটা হলুদ রঙের একতলা। সামনে ছোট বাগান। বেশ পুরোনো আমলের বাড়ি, মোটামোটা থাম। গেটটা ভাঙা। রাত্তিরে যে-কোনো চোর অনায়াসেই। বাড়িটার চারপাশে অবশ্য দেওয়াল।

সামনেই রাস্তার ওপাশে মাঠটা ঢালু হয়ে। একটা বিরাট তেঁতুল গাছ। সেই তেঁতুল গাছের ওপাশে হেলান দিয়ে একজন মানুষ যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। আমার পা ব্যথা করে। অস্বস্তি ও লজ্জা।

অন্ধকারে কোনো দৃশ্য নেই। চোখের সামনে শুধু পাতলা বা গাঢ়। মাঠের দিকে চেয়ে থাকার কোনোই মানে। শুধু বাড়িটাতেই আমার। বাড়িটা নিস্তব্ধ এবং বাইরের দিকে আলো নেভানো। কতক্ষণ, আর কতক্ষণ এইখানে। এবং কি ভাবে? কি ভাবে আমি অনুরাধাকে? কোনো উপায়ই তো চোখে। অস্বস্তিতে শরীরটা কেন কাঁপার মতন। বুকের মধ্যে ব্যথার মতন, গলার কাছে বাষ্পের মতন।

অস্বস্তি কাটাবার জন্য আমি আরও বেপরোয়া হয়ে। সন্তর্পণে চোরের মতন গেট খুলে বাগান পেরিয়ে। সারা বাড়ি শব্দহীন। এ বাড়ির লোকেরা কি, সন্ধেবেলাতেও কেউ বেড়াতে বেরোয় না?

রীতিমত অন্ধকার, তার মধ্যে আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ির পেছন দিকে। পায়ে কিছু একটা লাগলে আমি নিজেই চমকে। যদি ধরা পড়ি তা হলে কি? আমি অনুরাধার গোপনীয়তার ভাগ নিতে।

দাঁড়িয়ে থাকি, নিঃশ্বাসও প্রায় বন্ধ। সত্যিই এখন গা কাঁপছে। ফিরে যাবো, ফিরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের মত কাজ। আমার পক্ষে এর চেয়ে বেশি সাহস। কিন্তু ঠিক এই সময়েই বিরাট শব্দ করে দরজা খুলে একজন কেউ বাইরে। আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না। কেউ কি কোনো রকম সন্দেহ?

ভারী গলায় একজন বললো, এই, দুটো চেয়ার দিয়ে যা তো বাইরে। জয়ন্ত, জয়ন্ত এদিকে এসো!

—আসছি কাকাবাবু!

—এখানে বসা যাক। বেশ হাওয়া দিয়েছে!

আমি প্রায় মড়ার মতন। লোক দুটো বাইরে দাঁড়িয়ে। এখন আমি কি করে? বাড়িটার চারদিকে পাঁচিল ঘেরা। পাঁচিলে ওঠার চেষ্টা করলে যদি শব্দ-টব্দ।

বাড়ির দেওয়ালে হাত দিলে ঠাণ্ডা লাগে। পুরোনো দিনের নোনাধরা

দেওয়াল। ইচ্ছে করে গালটা ছোঁয়াই এবং কাঁদি। এরকম বোকামি কি কেউ? যদি এ বাড়িতে কুকুর?

লোক দুটি বাইরে বসে সশব্দে গল্প। অপরজন জয়ন্তের কাকা। তারই বাড়ি বোধহয়। তিনি জয়ন্তকে মুর্গি পালন বিষয়ে কিছু। অনেক-দিন পোলট্রি করেছেন মনে হয়। জয়ন্তর হুঁ হাঁ শুনলে বোঝা যায় তার কোনোই আগ্রহ।

যাক, তা হলে এখনো সন্দেহ করেনি কিছু। আমাকে অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না ওরা আবার ভেতরে। সে কতক্ষণে কে জানে।

খানিকটা দূরে একটা জানালায় আলো। আমি পা টিপে টিপে সেই দিকে। জানালার নিচের দিকটা বন্ধ, ওপরের দিকটা খোলা। আমার মাথার চেয়েও উঁচুতে। ডিঙি মেরেও কিছুতেই। অথবা যদি দেওয়াল বেয়ে। না, না, তাতে ঝুঁকি অনেক বেশি। একটা ইঁট জোগাড় করতে পারলেও।

ভাঙা দেওয়ালে অনেক আলগা ইঁট। অন্ধকারের মধ্যে খুব সাব-ধানে একটা। তারপর সেই ইঁটের ওপর পা দিয়ে।

এক পলক দেখেই নিচু করে নিই মাথা। খাটের ওপর সেই মেয়েটি। অনুরাধা। সত্যি? না স্বপ্ন? খুব কাছে গিয়ে, চোখ যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে। তারপরেই আবার সরে। চোখ বুঁজে একটুক্ষণ হৃদয়ঙ্গম। হ্যাঁ, সত্যিই তো অনুরাধা। অসুস্থ কিনা জানি না। বুকের ওপর বই খোলা। আজ ফ্রক নয়, শাড়ি। কী অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে! যেন শাড়িতে মোড়া এক গুচ্ছ চাঁপা ফুল। ওই এক ঝলকেই আমি দেখেছি তার কোমর। বিলিতি ছবির মতন। যতটা সুন্দর ভেবেছিলাম, তার চেয়েও সুন্দর অনুরাধা।

এখানে আমি চোরের মতন। সত্যিই কি চোর? কিছু তো নিতে আসিনি। আমাকে রূপচোর যদি বলে। সেটা কি দোষের? জানি না। ওকে আর একবার দেখার জন্য আমার বুকের মধ্যে সাংঘাতিক।

আকাশ হালকা মেঘে ঢাকা ছিল। হঠাৎ এই সময় তা ভেদ করে বেরিয়ে এলো লক্ষ্মীছাড়া চাঁদ। অন্ধকার ফিকে হতেই আমার ভয়। এতক্ষণ হাত-পাগুলো অন্ধকারের মধ্যে। এখন নিজেকেই নিজে দেখতে পাই।

কোথায় লুকোবো? যদিও এখনো আর কেউ। একটা ব্যাপার

বুঝে গেছি, এ বাড়িতে কুকুর-টুকুর অন্তত। উঃ, যদি কুকুর থাকতো, তাহলে এতক্ষণ আমাকে সাধারণ চোরের মতন।

অদূরে বারান্দায় লোকদুটি এখনো কথাবার্তায়। এখন বিদ্যাসাগর সম্পর্কে। কী করে যে মুর্গিপালন থেকে বিদ্যাসাগরমশাই প্রসঙ্গে? অ্যাট্রোশাস। জয়ন্তর কাকা বোঝাচ্ছেন, কার্মাটারে বিদ্যাসাগরমশাই সাঁওতালদের কাছ থেকে ভুট্টা কিনে আবার তাদেরই সেইগুলো খাওয়ার জন্য। সেই সময় একদিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে···উঃ। কী ভুল! দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একবার কার্মাটারে। আমি চেঁচিয়ে ওঁর ভুল শুধরে? তাহলে হয়েছে আর কি।

আরও কিছুক্ষণ নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে। আলো জ্বালা জানলার ওপাশেই অনুরাধা। ওর সঙ্গেও কোনো কথা। আমার অধিকার নেই! দেখার? আবার পা টিপে টিপে জানলার কাছে। ইঁটের ওপর আঙুলের ভর দিয়ে। জানলার শিক ধরতে সাহস হয় না। দেয়ালে।

অনুরাধার কি অসুখ? নীল শাড়ি, অনাবৃত বাহু, পায়ের দুটি পাতা, কোমরের কাছে খানিকটা নগ্ন। বুকে ঢেকে রাখা দুটি স্থলপদ্ম। আমি চোখ দিয়ে শুধু এই সৌন্দর্য নয়, এর মধ্যে যে বিষাদ। ট্রেনে আমি ওকে শয়ান অবস্থায় কাঁদতে। একটি কিশোরীর চাপা দুঃখের মতন এমন তীব্র, মধুর, স্পর্শকাতর আর কী আছে পৃথিবীতে? কিশোর বয়সে আমারও এরকম কতবার।

দারুণ লোভ হচ্ছে ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে। জানি তা সম্ভব নয়। তবু লোভ। জানলা দিয়ে ওর নাম ধরে? নিশ্চয়ই চমকে উঠে, ভয় পেয়ে। তা ছাড়া আমি ওর কে? ও আমার এত আপন।

নিশ্বাসও বন্ধ করে থাকি। যাতে কোনোরকম শব্দ। দেখে দেখে আশ মেটে না। যদি একবার পাশ ফিরতো, তাহলে মুখখানা আরও ভালো করে। ওর মাথা জানলার দিকে। আঙুলগুলো সোনার মতন, ওই আঙুলে হাজারবার ঠোঁট বুলোলেও।

অনুরাধা বইয়ের একটা পাতা ওল্টালো। অর্থাৎ জেগেই। তাহলে এখন কাঁদছে না। বই পড়তে পড়তে এখনো প্রায়ই আমার চোখ দিয়ে জল। সে অন্যরকম কান্না।

পায়ের তলা থেকে ইঁটটা পিছলে। একটি বিশ্রী শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে আমি মাথা নিচু করে বসে পড়ার জন্য। তারপরই প্রায় উঃ করে

চেঁচিয়ে। কোনো রকমে মুখ চেপে। খানিকটা কাঁটা তার, এমন খোঁচা মেরেছে উরুতে। আস্তে আস্তে তারটা সরিয়ে।

অনুরাধা শব্দ শুনেছে। স্পষ্ট বুঝলাম খাট থেকে ও। তারপর জানলার কাছে। আলোর মাঝখানে ওর সিলুয়েট। সামনের দেওয়ালটা যেন স্ক্রিন। জানলার শিকগুলোর জন্য হঠাৎ মনে হয় কারাগারে এক বন্দিনী। ও কি চিৎকার করে? তা হলেই তো আমি। না. না, অনুরাধা, আমি চোর নই, আমি তোমার শত্রু নই, তুমি আমাকে।

একটুক্ষণ ও স্থিরভাবে দাঁড়িয়েই। চুলগুলো খোলা। হাত দিয়ে কপালের চুল। চিৎকার করে উঠলো না শেষ পর্যন্ত। আসলে রাত তো বেশি হয়নি, এই সময় কেউ সাধারণত চোরের কথা!

আবার সরে গেল জানলা থেকে। আর না। এবার আমাকে পালাতেই। আর বেশি ঝুঁকি নিলে।

কিন্তু কি করে? সামনে এখনো লোকদুটি। সামনে দিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

জয়ন্তর কাকা চেঁচিয়ে উঠলেন, রঘু, জল দিয়ে যা!

জল? সন্ধেবেলা জল? শুধু জল? তাহলে তো আরও কতক্ষণ কে জানে!

সুতরাং পাঁচিল টপকেই। খুব বেশি উঁচু নয়। আমার মাথা-সমান। মাঝে মাঝে আইভি লতা। শব্দ না করে কোনোক্রমে। খুব আস্তে আস্তে অনুরাধার জানলার কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে। পাঁচিলে ধরবার মতন কিছুই নেই।

এক হতে পারে, বাড়ির পেছন দিকে যদি কোনো খালি জায়গা। আমি পাঁচিলের গা ঘেঁষে ঘেঁষে। বাড়ির পেছন দিকেও প্রশস্ত বারান্দা। একপাশে রান্নাঘর। ভাগ্যিস আমার উল্টোদিকে। রান্নাঘরে আলো, সেখানেও এক রমণী। বারান্দায় দুটি জ্বলজ্বলে চোখ। ভয়ের কিছু নেই, একটা বেড়াল। বেড়াল তো আর মানুষ দেখলে কুকুরের মতন।

সেই জায়গাটা দ্রুত পেরিয়ে। এবার পায়ের নিচে মাটি নরম। চটিজোড়া খুলে আগেই হাতে। এখন যদি এক দৌড়ে। সামনের দিকটা ফাঁকা মতন।

একটু দৌড়োতে গিয়েই আবার পায়ে কি যেন। নিচু হয়ে দেখলাম

গোলাপ কাঁটা। এবং অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার আলোয় একটা বাগান। অনেক গোলাপ ও বেলফুলের চারা। অনেক ফুল এখানে। গোলাপের রঙও শাদা। কিংবা জ্যোৎস্নায় রঙ বদলেছে। একটা গন্ধের ঢেউ।

কাঁটাটা না বার করলে। হঠাৎ আমি কিরকম বিহ্বল হয়ে পড়ি। ফুলের বাগানে এক চোর! তার পায়ে কাঁটা। আকাশ থেকে জ্যোৎস্না পড়ছে তার মাথায়। কোন্ নিয়তি আমাকে এখানে? আমি কি এর যোগ্য? আমার চোখ জ্বালা করে ওঠে। আমার জীবনে কত ব্যর্থতা, কত কিছুই পাইনি, তবু কেন এই অপরূপকু সুমগন্ধ!

কাঁটাটা খানিকটা ভেঙে গিয়ে ভেতরে! একটা গোল মুখওয়ালা চাবি পাওয়া গেলে। যাই হোক, এখন আর কি করা! এইভাবে এখানে কতক্ষণ? একটা বেলফুলের গায়ে টোকা দিয়ে তার শিশির। একটা গোলাপের পাপড়িতে হাত বুলিয়ে যেন কারুর ঠোঁট।

উঠে দাঁড়াতেই দেখি উল্টো দিক থেকে একটা লোক। খালি গা, মালকোঁচা ধুতি?

—কে?

এক মুহূর্ত আমি চুপ করে। বাগানের ওপাশে কয়েকটা ছোট ছোট ঘর। এক পাশে একটা বাঁশের গেট। খোলা। ঐখানে আমার মুক্তি।

—কে, কে ওখানে?

উত্তর না দিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়।

—আবার এসেছে। দাদাবাবু! দাদাবাবু!

লোকটাও দৌড়ে গিয়ে গেটের কাছে। আমি ডান দিকে বেঁকে যদি আর কোনো ফাঁকা জায়গা।

—দাদাবাবু, দাদাবাবু। হারামজাদা আবার এসেছে!

আমাকে পালাতেই হবে। একটা ঘরের পাশ দিয়ে যেতেই এক-ঝাঁক মুর্গি একসঙ্গে কঁক্ কঁক্ করে। চমকাবারও সময় নেই। ওদিকে জয়ন্ত আর তার কাকাও। হাতে লাঠি আছে কি?

—ধর, ধর ব্যাটাকে!

খালি-গা লোকটা এর মধ্যে কোথা থেকে একটা ডাণ্ডা। ওদিকে আর কোনো সুবিধে হবে না। আমি একদম মার সহ্য করতে পারি না। ভীষণ খারাপ লাগে। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে।

অতএব সামনের দিক দিয়েই আবার ফুলবাগানের মধ্য দিয়ে।

যত ইচ্ছে কাঁটা ফুটুক। পায়ের নিচে কি দু'একটা গাছের চারা? তোমরা আমাকে ক্ষমা করো।

জয়ন্ত আর কাকা দুদিকে ছড়িয়ে পড়ে আমাকে ধরার জন্য। খালি হাত। ওদের যে-কোনো একজনকে এক ধাক্কা দিয়ে। এখন বারান্দাতে অনুরাধাকে।

যেন একটা ইঁদুরকে তিনটে বিড়াল। আমি এদিক ওদিক ছুটেও ফাঁক পাচ্ছি না। অনুরাধাই একটা দরজার খিল এনে জয়ন্তর দিকে।

আমি হঠাৎ বাগানের মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, আমাকে মারবেন না! আমি চোর নই।

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য ঐ কথাই আবার ইংরেজিতে। আমার শ্রেষ্ঠ উচ্চারণে।

জয়ন্তর কাকাই সাহস করে এগিয়ে এসে আমার কলারে হাত। খুব রাগী মুখ। যদি চড় মারে, সেইজন্য আমি সাবধান হয়ে।

—কে তুমি? এখানে কী করছো?

—বলছি, বলছি।

একটু হাঁপাচ্ছিলাম। দম নেবার জন্য একটু সময়।

—দয়া করে আমাকে ভেতরে নিয়ে চলুন!

—কে তুমি?

—ভেতরে গিয়ে বলবো!

ভেতরে নয় বারান্দা পর্যন্ত। রান্নাঘর থেকে মহিলাটি, ভেতর থেকে আরও একজন মহিলা। খালি-গা লোকটা ডাণ্ডা হাতে আমার পাশে। সে জানালো, এ তো সে হারামজাদা নয়।

আরও একজন নিয়মিত চোর আছে। ওদের বোঝানো দরকার, আমি জীবনে এই প্রথম। জয়ন্ত আমাকে চিনতে পারেনি। অনুরাধা এখনো আমার মুখটা ভালো করে। ও কি চিনতে পারবে না?

চটিজোড়া হাত থেকে নামিয়ে আমি জয়ন্তর কাকাকে খানিকটা হুকুমের সুরেই, জামাটা ছেড়ে দিন।

জয়ন্ত জিজ্ঞেস, কে আপনি?

তুমি থেকে আপনিতে। এটা নিশ্চয়ই ইংরিজির জন্য।

—দয়া করে জোরে কথা বলবেন না। আমি ইচ্ছে করেই আপনাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। একটু বাদে চলে যাবো।

—ইচ্ছে করে? এটা কি বাজার?

—আপনারা বাঙালী বলেই

—বাঙালী তো কি হয়েছে ?

—বলছি, একটু সময় দিন !

—সময় দিতে হবে ? তুমি কোন্ লাটসাহেব ?

জয়ন্তর কাকা আবার মারমুখী। ইনি আমার ইংরিজি শুনেও তেমন গুরুত্ব। ছেলে ছোকরাদের কেউই আজকাল। বয়েসটাই অপরাধ।

—এখানে ঢুকেছো কেন ?

—পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার জন্য। একটু আগে আপনাদের বাড়ির দু'খানা বাড়ি আগে দোতলা বাড়ি থেকে একটা লোককে বেরুতে দেখেছি। আই বি-র লোক। আমাকে দেখলেই ধরবে। তবে আপনাদের আগেই বলে রাখছি, আমি চোর বা ডাকাত নই।

অনুরাধা এবার আমার দিকে খানিকটা এগিয়ে। মুখটা ভালো করে দেখে, ওঃ !

আমি সামান্য হেসে, হ্যাঁ, ট্রেনে দেখা হয়েছিল।

জয়ন্ত অবাক হয়ে, ট্রেনে ! কবে ? রমু, তুই একে চিনিস ?

অনুরাধা ঘাড় নেড়ে এবং মুখে স্পষ্ট উচ্চারণ করে জানালো, না।

আমার শেষ আশাও। চিনতে পারলো না ? অথচ আমি যে ওকে সারা জীবনের মতন। আমার ভয় পাবার কথা ছিল, তার বদলে অভিমান।

জয়ন্ত আমার দিকে ফিরতেই আমি হাত তুলে। তাকে তার কথা বলতে দিই না।

—এক গেলাস জল পেতে পারি ? খুব তেষ্টা পেয়েছে। জয়ন্তর কাকা বললেন, রঘু, জল এনে দে।

—আমি কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছি।

একবার জয়ন্ত যেন একটু চমকে। আবার আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে। তারপর জিজ্ঞেস, আপনার নাম কী ?

—অশেষ মজুমদার।

পায়ে কাঁটাটার ব্যথা। একটু বসতে পারলে। রঘু জল এনে সামনে উঁচু করে। শুধু একটা ঘটি। গেলাস নেই, উঁচু করে আল-

গেছে খেতে হবে নাকি, ভিখিরিরা লোকের বাড়িতে এসে যেমনভাবে ; সেই রকমভাবে খেতে গিয়ে জামা-টামা একেবারে ভিজিয়ে।

খুড়োমশ্যই এবার রঘুকে ধমক, গেলাস আনতে পারিসনি।

—ঠিক আছে, আমার হয়ে গেছে।

তবু খুব তৃষ্ণার্তের মতন অনুরাধার দিকে একবার। ওর চোখে চোখ। কী ঐ চোখের গভীরে? মানুষ এখনো কি শিখেছে চোখের প্রকৃত ভাষা!

—আপনি পালাবার চেষ্টা করছিলেন কেন?

—আমি ভয় পেয়েছিলাম। রাস্তা দিয়ে আসছিলাম, আই বি'র লোকটিকে দেখতে পেয়ে ভয় পেয়ে এ বাড়িতে ঢুকে পড়ি। ভেবেছিলাম খানিকক্ষণ লুকিয়ে থেকে

—কোন দিক দিয়ে এলেন?

আমি বাগানের দিকে গেটের দিকে আঙুল।

—ওদিকে তো রাস্তা নেই, ওদিকে তো মাঠ।

—পাঁচিলের পাশ দিয়ে ঘুরে এসে। সামনের বারান্দায় আপনারা বসেছিলেন তো।

—কতক্ষণ আগে?

—মিনিট পনেরো। পায়ে কাঁটা না ফুটলে এতক্ষণে হয়তো চলেই যেতাম।

কাঁটা ফোটার কথাটা কেউই গ্রাহ্য। জয়ন্ত আর তার কাকা চাখাচোখি। যেন আরও কিছু প্রশ্ন। মহিলাটি এবার সেটা।

—দেখে তো মনে হয় ভদ্রলোক! ভদ্রলোকের ছেলে পুলিশের ভয়ে পালাবে কেন?

কাকা বললেন, আমিও তো সেইটাই বুঝতে পারছি না!

কাকাকে উত্তর না দিয়ে আমি ভদ্রমহিলার দিকেই। তাঁর মুখে খানিকটা রাগ। আমি কণ্ঠস্বরে অভিমান মিশিয়ে, আপনি জানেন না, কেন ছেলেরা পালায়? এটা উনিশ শো সত্তর সাল, তাও একথা জিজ্ঞেস করছেন? কলকাতায় থাকলে আমি এতদিনে মরে যেতাম।

অনুরাধা এবার জিজ্ঞেস, আপনি তপন আচার্যকে চেনেন?

—চিনতাম। সে মারা গেছে।

—কবে?

মনে মনে খানিকটা হিসেব। কবে কলকাতা থেকে ট্রেনে? তার আগের পরশুদিন।

—১৪ই মার্চ। ওর গুলি লেগেছিল।

অনুরাধার চোখ দেখলেই বোঝা যায়, শরীরে জ্বর। এর জন্যই ওষুধ আনতে জয়ন্ত। অনুরাধা এক পায়ের আঙুল দিয়ে আর এক পায়ের আঙুল চেপে ধরেছে।

—তপন আমার চেয়ে বয়সে ছোট হলেও আমার বন্ধুর মতন ছিল। চমৎকার ছেলে। হীরের টুকরো ছেলে—

জয়ন্ত আমাকে থামিয়ে অনুরাধাকে, এই রমু তুই ঘরে যা—।

—না, কেন?

—তোর এখনো গায়ে জ্বর, শুয়ে থাক, উঠে এসেছিস কেন?

—কিছু হবে না।

জয়ন্ত এবার আমাকে, আসুন, ভেতরে এসে বসুন।

ওদের শোওয়ার ঘরের মধ্য দিয়ে ঢুকে তারপর বসবার ঘরে। জয়ন্তর কাকা চাইছিলেন বাইরের বারান্দায়। আমি কৃত্রিম ভয় দেখিয়ে। রাস্তা থেকে বারান্দাটা স্পষ্ট।

অনুরাধা এ-ঘরে আসেনি। তিনজন তিনটে চেয়ারে। জয়ন্তর কাকা বাইরের বারান্দা থেকে তাঁর গেলাসটা। গেলাসে শুধু জল নয়।

—আপনি চা খাবেন!

—খেতে পারি।

—তপন আচার্য আমাদের বিশেষ চেনা ছিল।

এখন আমার পক্ষে নীরব থাকাই। মনে মনে আমি তপন আচার্যর চেহারাটা। হীরের টুকরো হওয়াই স্বাভাবিক। অনুরাধার মতন মেয়ে যখন তার জন্য।

জয়ন্তর কাকা খানিকটা আফসোসের সঙ্গে, কেন যে ছেলেরা এ-রকম পাগলামি শুরু করেছে? এরকমভাবে কি দেশটা বদলানো যায়।

জয়ন্ত, আমারও মনে হয় এটা সম্পূর্ণ ভুল পথ। শুধু শুধু কতক-গুলো ভালো ভালো ছেলে।

আমি তখনও নীরব। আমি অপরাধী। আমি ওরকম পাগলামিও তো। আমাকে পুলিশ কখনো। তবু আমি আন্তরিকভাবে তপনের বন্ধু হয়ে যেতে।

শুধু চা নয়, সঙ্গে মিষ্টি। সেই রাগী মহিলাই।

জয়ন্ত আবার আমাকে, এখানে কোথায় উঠেছেন?

—কোথাও না।

—তাহলে হঠাৎ কীভাবে?

—ডেহরি-অন-শোনে ছিলাম। সেখানে একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, মনে হলো যদি কলকাতায় খবর চলে যায়। আজ বিকেলেই এখানে এসে পৌঁচেছি। তারপরেই আই বি লোকটাকে রাস্তায়—ও যে আই বি'র লোক সে ব্যাপারে আমি ডেফিনিট, কলকাতায় দেখেছি, মুখচেনা।

—আপনি এখানে থাকতে পারেন।

—না, না, ঐ লোকটা যখন এখানে আছে, আমাকে এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতেই হবে।

—আপনি তখন বললেন, ট্রেনে আগে দেখা হয়েছিল।

—হ্যাঁ। আপনারা যখন কলকাতা থেকে আসছিলেন, আমিও সেই কামরায় ছিলাম। আমি ঐ মেয়েটিকে, বোধহয় আপনার বোন, ওকে হঠাৎ কেঁদে উঠতে দেখেছিলাম।

একটা সত্যি কথা বললে অনেক মিথ্যের পাপই। কথাটা বলতে পেরে আমি অনেকটা হালকা। আমি অনুরাধাকে আগে দেখেছিলাম, সেই জন্যই দ্বিতীয়বার। আমার যা পাবার ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি।

যেন পুরোনো পরিচয় বেরিয়ে পড়ল, তাই আড়ষ্টতা অনেকখানি। জলের গেলাস হাতে মহিলা তখনো দাঁড়িয়ে। তিনি, হ্যাঁ মনে পড়েছে, আপনি ওপরের বাঙ্কে ছিলেন। আপনার সঙ্গে আরও যেন কারা।

—ওরা আমার কেউ নয়।

জয়ন্ত এবার ঈষৎ হাস্যে, রঘু আপনার মাথায় এক ঘা ডাণ্ডা বসালেই হয়েছিল আর কি!

জয়ন্তর কাকা ঠোঁট থেকে গেলাস নামিয়ে এক ব্যাটা চোর যে এখানে প্রায়ই আসে। মুর্গি চুরি করে।

—আমাকে দেখে কি মুর্গিচোর।

হাঃ হাঃ হাঃ, না, না, তবে অন্ধকারের মধ্যে তো বোঝা যায় না।

আরও একটু পরে জয়ন্ত, আমার দিকে তাকিয়ে, এখান থেকে আপনি কোথায় যাবেন।

—জানি না

যেন আমি চির-পলাতক। এটা আমার ছদ্মবেশ। তবু মনে মনে আমি সেই রকমই। এক এক দিন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়।

—কিসে যাবেন ?

—ট্রেনে। রাত্তিরে কখন ট্রেন আছে ?

জয়ন্তর কাকা ফতুয়ার পকেট থেকে গোল ঘড়ি বার করে। অনেকদিন আমি এ-রকম ঘড়ি। কাকার বদলে ওঁর ঠাকুর্দা হওয়া উচিত ছিল।

—একটা তো রাত্তির সাড়ে আটটায়। আর মাত্র কুড়ি মিনিট পরেই ! অবশ্য এই ট্রেনটা প্রত্যেক দিন লেট করে ! আর একটা ট্রেন রাত তিনটেয়।

আমি তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে। আর বেশিক্ষণ এদের আতিথেয়তা।

—আমি সাড়ে আটটার ট্রেনেই যাবো।

—কেন, রাতটা থেকে যান এখানে। বাড়ির মধ্যে কেউ আসবে না। এখানে এখনও অতটা—হয়নি। নিরিবিলি জায়গা।

—না, আমার পক্ষে রাত্রে যাওয়াই সুবিধে।

—বসুন, কিছু খাবার-টাবার খেয়ে যাবেন। বললাম তো, ট্রেনটা লেট করে।

—এই তো চা মিষ্টি খেলাম।

—ভাত হয়ে গেছে বোধহয়।

—না, ক্ষমা করুন। আপনাদের যে কী বলে ধন্যবাদ জানাবো ! আমাকে যেতেই হবে।

—তপন দেড় মাস বাড়ি-ছাড়া ছিল। কখন কী যে খেয়েছে না খেয়েছে !

—আমি জানি, তপন মরার সময় একটুও কষ্ট পায়নি। এক সেকেণ্ডেই।

—রমুর খুব বন্ধু ছিল। ওর মনে এমন ধাক্কা লেগেছে

—আমি এখন যাই।

দরজার কাছে অনুরাধা। আগের কথাগুলো কি ও ?

অনুরাধার হাতে খানিকটা তুলো ও একবাটি গরম জল। অন্য

দু'জন অবাক চোখে। অনুরাধা আমাকে, আপনার পায়ের কাঁটাটা বেরিয়েছে?

আর কেউ মনে রাখেনি। শুধু অনুরাধাই।

—না, খানিকটা ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেছে!

—কই দেখি? আমি বার করে দিচ্ছি।

আমি একেবারে আঁতকে। তা হয় কখনো? আমার পায়ে অন্য কারুর হাত।

—না, না, তার কিছু দরকার নেই। পরে আপনি আপনি বেরিয়ে আসবে।

অনুরাধা ততক্ষণে বসে পড়েছে মাটিতে। আমার দিকে চোখ তুলে দেখলো একবার। তারপর আবার মুখ নিচু করে, অনেকটা আপন মনে, গোলাপের কাঁটা আপনি আপনি বেরোয় না।

অন্য পুরুষ দু'জন একটু অস্বস্তিতে। ঠিক কী করা উচিত। তারপর জয়ন্তই উঠে এসে, দেখি, আমাকে দেখান তো, কোথায় কাঁটা ফুটেছে!

যাতে সেটা মিথ্যে না ভাবে, সেই জন্যই আমাকে সেটা তুলে। ঠিক মাঝখানে কাঁটার মুখটা।

জয়ন্তই সেটা তুলে দেবার চেষ্টা করার জন্য। তাকে বাধা দিয়ে অনুরাধা, তুমি সরো ছোড়দা, আমি তুলে দিচ্ছি।

—রমু, তুই ঠাণ্ডার মধ্যে মাটিতে বসলি কেন? এই টুলটা নে না

—কিছু হবে না। দেখি, আপনি এই চেয়ারে বসুন।

এটা আমার প্রতি হুকুম। আমি তখনও দ্বিধাগ্রস্ত। জয়ন্তর কাকা তখন। বসুন না। কাঁটাটা তুলে ফেলাই ভালো। ভেতরে থাকলে নির্ঘাত ঘা হবে।

এবার আমাকে চেয়ারে বসতেই। আমার বাঁ পা থেকে চটি খুলে। অনুরাধা তার নরম-নবনী হাতে আমার বিশ্রী ধুলো মাখা পায়ের পাতা তুলে নেয়। খুব মনোযোগ দিয়ে। গরম তুলো ভিজিয়ে পায়ের তলাটা মুছতে মুছতে জানতে চায়, ব্যথা লাগছে?

এই যদি ব্যথা হয়! তবে সুখ কার নাম?

তবু আমি চোরের চেয়েও বেশি আড়ষ্ট মুখ করে। এবার সত্যিই আমি কিছু চুরি। এ তো আমার পাওনা নয়।

পরম যত্নে অনুরাধা আমার পা-টা রেখেছে ওর কোলে। তারপর

মুখ ঝুঁকিয়ে কাঁটাটা। আমি শুধু ওকে দেখতে এসেছিলাম। তার বদলে এই স্পর্শ। কী মসৃণ চিবুক, গভীর নদীর স্রোতের মতন কাঁধ, পিঠের ওপর লুটানো বর্ষার মেঘের মতন চুল। সম্পূর্ণ দৃশ্যটাই কি অলীক? আমি কি সত্যিই এখানে। এই ঘরে?

কাঁটাটার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব। অনুরাধার মুখ দেখলে মনে হয় ঐ কাঁটা যদি আজ সারা রাতেও না ওঠে, তা হ'লেও।

আমি আত্মা মানি না। তপন আচার্য কি একেবারেই হারিয়ে? কোথাও কি তার আত্মা? তপন, তুমি কি কোথাও আছো? তাহলে এসো, দেখে যাও, এই সেবা। এই সেবা আমার জন্য নয়। তপনের কোনো বন্ধুর জন্য, আসলে তপনের জন্য। অনুরাধা যার পা থেকে কাঁটা তুলছে, সে ঠিক তোমারই মতন আর একজন, আমি নয়, আমি ছদ্মবেশী।

—এই যে উঠেছে!

অনুরাধার মুখে যে হাসি ফুটেছে, তার তুলনা কিসে? ঐ ওষ্ঠের ঐ হাসিটুকু আমাকে চিরকালের জন্য দেবে? আমি ছবির মত বাঁধিয়ে।

ওর চোখে চোখ রেখে আমি নীরব প্রশ্ন, তুকি আমাকে ট্রেনে দেখেছিলে, চিনতে পারো নি? মধ্যরাত্রে তুমি দরজা খুলে।

অনুরাধা নীরব চোখে উত্তর, হ্যাঁ, পেরেছি।

—তখুনি আমি হাত বাড়িয়ে, দাও, কাঁটাটা আমাকে দাও।

সেটা হাতের তালুতে নিয়ে। বেশ ধারালো। একটা কাগজে মুড়ে সেটা বুক পকেটে।

উঠে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ফেলে, বাঃ একটুও ব্যথা নেই। দৌড়তে পারবো। আমি চলি—

ওই রকম সেবা নেওয়ার পর আর বেশিক্ষণ থাকতে আরও লজ্জা। যদি ছদ্মবেশটা হঠাৎ। চিরপলাতক তো এক জায়গায় এতক্ষণ সময় কখনো।

অনুরাধা অবাক হয়ে, এক্ষুনি যাবেন?

—হ্যাঁ, যেতেই হবে।

জয়ন্তর কাকা, যদি অবশ্য সাড়ে আটটার ট্রেন ধরতেই হয়।

—হ্যাঁ যাই।

—সামনের রাস্তা দিয়ে যাবেন?

—যদি পেছনের দিক দিয়ে যাই?

—তাহলে অবশ্য একটা মাঠ পেরুলেই বাজার পেয়ে যাবেন।

দরজার কাছে গিয়ে আবার আমি দাঁড়িয়ে শুধু অনুরাধার দিকে। ওকে যে কথাটা বলার জন্য এসেছিলাম! এই তো সেই মুহূর্ত। আমি অবিচল কণ্ঠে, আপনাদের একটা কথা জানা দরকার। আমি তপন আচার্যকে খুব ভালো করে চিনি। শেষ সময়েও তার খুব কাছাকাছি ছিলাম। মৃত্যুর আগেও সে একটুও ভয় পায়নি। একবারও ভেঙে পড়েনি। সে ছিল বীর। তার পথটা ভুল বা ঠিক যাই হোক। সে ছিল খাঁটি আদর্শবাদী। সে মানুষের ভালো চেয়েছিল। তার জন্য সকলের গর্ব হওয়া উচিত। আমি যখনই তার কথা ভাবি···।

কথা শেষ হলো না, অনুরাধা এর মধ্যেই কান্নায়। শরীরটা কেঁপে কেঁপে। কী অসম্ভব কাতর কণ্ঠস্বর! তবু বোধ হয় এর মধ্যে একটু আনন্দও। আমার এই সামান্য মিথ্যের জন্য যত পাপ হয় হোক। আর না। এবার যেতেই হবে, এক্ষুনি।

ওরা এলো আমাকে এগিয়ে দিতে। আবার ফলবাগান পেরিয়ে। জ্যোৎস্নার আদর খাচ্ছিলো বাগানটা। এবার আমি খুব সাবধানে প্রত্যেকটা গাছ বাঁচিয়ে।

গেটের কাছে এসে জয়ন্তর কাকা মাঠের অন্ধকার একদিকে হাতটা বাড়িয়ে।

—এই কোনাকুনি চলে যান।

—আচ্ছা, চলি—

সত্যিকারের পলাতকের মতন আমি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াতে। অনুরাধার কণ্ঠস্বর আমাকে পেছন দিক থেকে ছুঁলো। সাবধান! সাবধানে যাবেন কিন্তু!

একটু বাদেই আমি অন্ধকারে ওদের চোখের আড়ালে। বেশ কয়েকবার আমি পেছন ফিরে ফিরে ওদের। বাঁশের গেটের কাছে তিনজন। আমি শুধু অনুরাধাকেই। একটু বাদে আর কিছুই।

অন্ধকার মাঠের মধ্যে আমি একসময় আবার একা। এরপর যেন আমি অনবরত ছুটতে ছুটতে। আমি পলাতক। সে কখনো থাকে না। তাকে অন্ধকার মাঠ-ঘাট ভেঙে অনবরত। মাঝখানের এই একটা ঘণ্টা কি স্বপ্ন? পকেট থেকে কাঁটাটা আবার। একটু আগেই কাঁটাটা আমার শরীরের মধ্যে। কাঁটাটি তো সত্যি। ফুলের কাঁটা! কাঁটা আছে, ফুলও ছিল।

সুপ্ত বাসনা

একতলার ঘরেই রাস্তার পাশেই জানালা। জানালা খোলা রাখলেও ঘরের মধ্যে বেশি আলো আসে না। আর জানালা বন্ধ করে রাত্তিরে ঘুমোবার কোন উপায় নেই, দম বন্ধ হয়ে আসে। এদিকে চোর ছ্যাঁচোড়েরও ভয় আছে। তাই বাড়িওয়ালাকে বলে বলে তিন মাস পরেও কিছু হল না দেখে ভাড়ার টাকা থেকে খরচ কেটে নিয়ে রাস্তার ধারের জানালা দুটোতে তারের জাল লাগানো হয়েছিল।

একটা জানালার পাশে রণুর পড়ার টেবিল। রাস্তা দিয়ে যারা যায়, তারা রণুর দিকে এক পলক তাকিয়েই ভাবে, লোহার গরাদ ও জাল দিয়ে ঘেরা একটা অন্ধকার কুঠরিতে ঠিক যেন এক বন্দী কিশোর বসে আছে। এক এক সময় রণু যখন জানালার শিক ধরে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে, তখন নিজেকেও তার বন্দী মনে হয়। অথচ ঘরটাও রণুর খুব প্রিয়। তার নিজের ঘর।

আকাশ একটু মেঘলা থাকলে ঘরটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে যায় দিনের বেলাতেই। তখন আর নিজের হাত পা-ই দেখা যায় না ভাল করে। একদিন এমনি মেঘলা সকালবেলা রণু মোম জ্বেলে পড়াশুনো করছিল। তাই দেখে পাড়ার সানুদা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়াল। তারপর মুচকি হেসে আবৃত্তি করল, যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি। আশু গৃহে তার জ্বলিবে না আর নিশীথে প্রদীপ ভাতি···বুঝলি রণু? দিনের বেলা মোম জ্বেলেছিস কেন?

রণু বলেছিল, কী করব, কিছু দেখা যায় না যে!

সানুরা বলেছিল, আলো জ্বাল। আলো নেই?

রণু উত্তর দিয়েছিল, লোডশেডিং যে।

সানুদা হো হো করে হেসে বলেছিল, তাই তো। ঐ পদ্যটা যে লিখেছে, সে লোডশেডিং-এর কথা জানত না।

রাস্তা মানে গরু গলি। ঠিক উল্টো দিকেই একটা পাঁচিলঘেরা বড় বাড়ি। সেই বাড়ির উঠোন থেকে একটা পেয়ারা গাছ মাথা উঁচিয়ে পাঁচিল ছাড়িয়ে রাস্তার ওপর ঝুঁকে আছে। রণু মাঝে মাঝে সেই পেয়ারা গাছটির দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালবাসে। পাতার ফাঁক দিয়ে একটু একটু আকাশ।

জানালায় জাল লাগানো হয়েছিল, কিন্তু রঙ করা হয়নি। তাই আট ন'মাসের মধ্যেই মর্চে ধরে জালে ফাটল ধরল। রণু নিজেই কটু

করে একটা শব্দ শুনল একদিন। তাকিয়ে দেখল যে তিন চার জায়গায় জাল কেটে গেল একসঙ্গে। আপনি আপনি।

রণুর মাঝে মাঝে ভয় হয়। হঠাৎ সন্ধের দিকে মাথা ব্যথা শুরু হয়। চোখ দুটো ছলছল করে, কিছুই আর ভাল লাগে না। তক্ত-পোশের ওপর বিছানাটা গোটানো থাকে, সেটা না খুলেই রণু শুয়ে পড়ে, একটু বাদেই মা টের পেয়ে যান। তার মানেই ভাত বন্ধ। দু'পিস স্যাঁকা পাঁউরুটি। রণুর বিচ্ছিরি লাগে পাঁউরুটি খেতে। দুদিনের মধ্যেও জ্বর না কমলে বাবা রণুকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবেন গ্রে স্ট্রীটে উপেন ডাক্তারের কাছে। উনি বাবার কাছ থেকে মাত্র দু'টাকা ফি নেন। আর কমলা রঙের মিক্সচার তিন টাকা বারো আনা। প্রত্যেক বারেই উপেন ডাক্তার বাবাকে বলেন, সরোজবাবু, এক-বার ছেলেটার রক্তটা পরীক্ষা করান। আপনাকে তো বলেছি···। বাবা তার উত্তরে বলেন, হ্যাঁ, দেখছি. এই সামনের মাসেই...। বাবা তখন রণুর দিকে বিরক্তভাবে তাকান।

রণুর খুব লজ্জা করে তখন। যেন জ্বর হওয়াটা তারই অপরাধ। শুধু জ্বরের জন্য বাবার পয়সা খরচ। রণু জানে তাদের সংসারে সব সময় একটা টানাটানির ভাব থাকে। তার ওপর জ্বরের জন্য এই রকম বাজে খরচ করার কোন মানে হয় না। আর কোন ছেলের জ্বর হয় না, শুধু রণুরই জ্বর হয় কেন?

জ্বরটা সেরে যাবার মুখে সব সময় একটা খাই খাই ভাব। বিশ্ব সংসারের সব কিছু খেয়ে ফেলেও যেন খিদে মিটবে না। অথচ আটা-নব্বই পয়েণ্ট দুই জ্বর থাকলেও মা ভাত দেবেন না। বিকেলে রণুর জ্বর সাতানব্বই, তবু রাত্রে নয়. ভাত পাওয়া পাবে কাল দুপুরে। সন্ধের সময় বসে রণু সেই ভাতের কথাই ভাবে। কাঁচকলা সেদ্ধ, ডাল, সিঙ্গি মাছের ঝোল আর ভাত। কাল এগারোটা সাড়ে এগারোটার মধ্যেই রণু খেয়ে নেবে। তারপর জেগে থাকতে হবে সারা দুপুর। জ্বর সারার দিন প্রথম ভাত খেয়ে দুপুরে ঘুমোলেই আবার জ্বর।

তখন বাজে পৌনে ছ'টা, পৌনে ন'টার মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়বে। তাহলে হল তিন ঘন্টা। কাল যদি সাতটায় ঘুম থেকে ওঠে তাহলে এগারোটা পর্যন্ত জেগে থাকা। সাত ঘন্টা বাদেই রণু ভাত খাবে।

ঠিক সেই সময় কাঁধে টিনের বাক্স নিয়ে একটা লোক জানালার ধারের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে রণুকে দেখে থমকে দাঁড়াল। তারপর

অবাধ্য ঘোড়ার মতন ঘাড়টা বাঁদিকে বাঁকিয়ে সে শুরু করল একটা গান। ঠিক ওস্তাদি গানের মতন। গানটা এই রকম : আলু দম্ ম্ ম্ ম্ ম, ন-আ-আ-র কোলের-র-র-র ঘুগনি! প্যাঁ-টা-র-র-র-র ঘুগনি।

গানটি শেষ করে, মাকড়সা যেমনভাবে জালে পড়া পোকাকে দেখে, সেই ভাবে সে রণুর দিকে তাকিয়ে রইল।

রণু খুব নম্র লাজুক গলায় জিজ্ঞেস করল, কত করে?

লোকটি আবার ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, পনেরো নয়া, কুড়ি নয়া, পঁচিশ নয়া—

ঘুগনিওয়ালাটি এ পাড়ার নতুন। চোখে নিকেলের চশমা। রণু এর আগে কখনো চশমা-পরা ঘুগনিওয়ালা বা বাদামওয়ালা দেখেনি। একটুক্ষণ চিন্তা করে রণু বলল, দেখি কুড়ি নয়ার, ঐ নারকেলটা....।

—দরজা কোন্ দিকে?

—এই জানালা দিয়েই দিন।

তারের জাল যেখানে কেটে গিয়েছিল, সেখালে আঙুল ঢুকিয়ে চাড় দিতেই আরও কয়েকটা ছিঁড়ে গেল। তারপর টিপে টুপে একটা টেনিস বলের সাইজের গোল গর্ত বানানো হল কোনক্রমে। দরজার কাছে গিয়ে ঘুগনি কিনতে হলে সে ধরা পড়ে যাবে।

রণুর কাছে পয়সা নেই। কিন্তু সে দাদার কাছে আট আনা পয়সা পায়। পুরোনো খবরের কাগজ বিক্রির টাকা দাদাই নেয় সবটা। কিন্তু গতকাল কাগজ বিক্রির সময় রণু তার আগের ক্লাসের সব খাতা-গুলো দিয়েছিল। দাদা বলেছিল এজন্য আট আনা পরে দেবে রণুকে।

রণু দাদার ঘরে গিয়ে দেখল দাদা নেই। একটু আগেই দাদার গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। নিশ্চয় বাথরুমে গেছে। এই রে, ঘুগনিওয়ালাকে এখন পয়সা দেবে কি করে? মা'র কাছে পয়সা চাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সাবধানে সে দাদার টেবিলের ড্রয়ার খুলল। অনেক খুচরো সেখানে, রণু কুড়ি পয়সা তুলে নিয়ে এলো।

কাঠের চামচেতে প্রথম একটু ঘুগনি চেখেই রণুর মুখটা অন্য রকম হয়ে গেল। এ যে অমৃত! এমন চমৎকার স্বাদের ঘুগনি সে জীবনে আর কখনও খায়নি তো! জ্বরের জন্য তার মুখ বিস্বাদ হয়ে ছিল। কিন্তু ঘুগনিতে সঙ্গে সঙ্গে মুখটা বদলে দিল। ঘুগনিওয়ালাটা যেন শুধু তার জন্যই আজ এ পাড়ায় এসেছে। কিন্তু মাত্র এইটুকু! মোটে

চার চামচ ! ঘুগনিওয়ালাটি চলে যাওয়ার আগেই সে বলল, দেখি আরও কুড়ি পয়সার—

দ্বিতীয়বার দাদার ড্রয়ার থেকে পয়সা আনতে গিয়ে সে মায়ের চোখে পড়ে গেল। তক্ষুনি দাদাও বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে। তারপর মায়ের চেঁচামেচি, দাদার বকুনি। ঘুগনিওয়ালাকে ধমকে ধমকে তাড়ানো হল। দাদা বললে, তোর এতখানি নোলা যে পয়সা চুরি করে....।

রণু বলল, আমি তো তোমার কাছে পয়সা পেতাম। চুরি করব কেন ?

কিন্তু এ যুক্তি দাদা মানল না। মুখে মুখে তর্ক করার অভিযোগে একটু বাদেই রণু দাদার হাতে মার খেল, তার দাদার মাথা গরম, যখন তখন হাত তোলে। দাদার তুলনায় রণুর চেহারাটা বড্ড ছোট-খাটো। অন্য সময় মা দাদাকে কিছু বলে না, কিন্তু অসুস্থ ছোট ভাইকে মারবে কেন ? সেইজন্য তখন মা বকল দাদাকে। রণু নিঃশব্দে কেঁদে ফেলে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল বিছানায়। এবং ঘুমের মধ্যেও অনেকক্ষণ কাঁদল।

এর দশ দিনের মধ্যেই জানালার ফুটোটা এত বড় হয়ে গেল যে তার মধ্যে দিয়ে অনায়াসে একটা বেড়াল গলে যায়। সেই ঘুগনিওয়ালাও নিয়মিত আসে।

যখন জ্বর থাকে না, রণু অনেক রাত পর্যন্ত জাগে। আগে যখন দাদার সঙ্গে এক ঘরে থাকত, আলো নেভাতে হত দাদার ইচ্ছেমতন। দাদার কোন মেজাজের ঠিক নেই। কখনো রাত তিনটে পর্যন্ত জেগে থাকবে কখনো সাড়ে ন'টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বে। দাদা ঘুমোলে আর আলো জ্বালা চলবে না।

আগে এটা ছিল চাকরের ঘর। চাকর ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তারপর এসেছিল একজন অল্পবয়েসী রাঁধুনী, সে একদিন রাত্তিরবেলা রাস্তায় টিউবওয়েলের কাছে একজন অচেনা লোকের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিল বলে তাকে বিদায় করে দেওয়া হয় পরের দিনই। এখন যে বুড়ি রাঁধুনী আছে সে রান্নাঘরেই শোয়। তাই রণু এই ঘরটা পেয়েছে। এটা তার একটা মস্ত বড় লাভ। সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা ঘর, ভাবা যায় ! একটা তক্তপোশ আর টেবিল পাতার পর আর একটুও জায়গা নেই। তবু রণু খুব খুশি। দাদাও খুশি হয়েছে নিজের

আলাদা ঘর পেয়ে। মেজদি শোয় মা-বাবার ঘরে। মেজদি এই ঘরটার দাবিদার ছিল, কিন্তু মা রাজি হননি মেয়েকে একলা ঘরে শুতে দিতে। মেজদি স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে ওঠে প্রায়ই।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে বই পড়ে রণু। যখন জ্বরে ভোগে, তখন রণু প্রায় সারাদিনই ঘুমোয়। আর যখন তার জ্বর থাকে না, তখন সে যতক্ষণ সম্ভব জেগে থাকতে চায় জ্বরের সময় পড়তে ইচ্ছে করে না, চোখ জ্বালা করে, তাই পড়াশুনোও পুষিয়ে নিতে হয় অন্য সময়। রাস্তাঘাট যখন সুনসান হয়ে আসে, সব শব্দ থেমে যায় আস্তে আস্তে, সেই সময় পড়ায় মন বসে খুব।

সদর দরজাটা খোলা থাকে দশটা এগারোটা পর্যন্ত। তাসের আড্ডা থেকে প্রায়ই একদম শেষে ফেরে দোতলার রতনদা, সে দরজা বন্ধ করে দেয়। তার আগে দরজা বন্ধ থাকলে কে বারবার খুলে দেবে? একতলায় রণুরা ভাড়াটে, দোতলায় বাড়িওয়ালা, তিনতলায় আরও দুজন ভাড়াটে। দরজা খুলতে হবে তো একতলার লোকদেরই। দাদা বলে দিয়েছে, ও সব হবে না। চোর তো এখনো ঢোকেনি একদিনও! আগে ঢুকুক, তারপর দেখা যাবে।

রাত্তিরে কে কখন বাড়ি ফেরে, তা ঘরে বসে বসেই চটি কিংবা জুতোর আওয়াজ শুনে রণু বুঝতে পারে। টিউশানি সেরে বাবা ফেরেন প্রতিদিন কাঁটায় কাঁটায় পৌনে দশটায়। দাদা যেখানেই যাক, ঠিক এর পাঁচ দশ মিনিট আগে ফিরে আসবেই, আর এমন ভাব দেখাবে যেন সন্ধে থেকেই বাড়িতে আছে। বাবা নিয়ম করে রেখেছেন, রাত্তিরবেলা সবাইকে তাঁর সঙ্গে বসে খেতে হবে। এটুকু সময়েই বাবার সঙ্গে যা দেখা বা কথাবার্তা হয়। বাকি সারাদিন তিনি প্রায় বাড়িতেই থাকেন না।

বাবা ফেরার একটু পরেই ভারী জুতো মশমশিয়ে ফেরেন তিনতলার রমেনবাবু। সিঁড়ি দিয়ে ওঠেন আস্তে আস্তে। ওঁর হার্টের অসুখ আছে, সিঁড়ি ভাঙা বারণ। কোথাও বাড়ি ভাড়া পেলেই উঠে যাবেন এখান থেকে। দোতলার রতনদার ভাই শিবুদার চলাফেরা ঠিক উলটো। হাঁটার বদলে সব সময়ই দৌড়োয়। সিঁড়ি দিয়ে নামে হুড়মুড় করে, তারপরই দরজা পর্যন্ত প্রায় যেন ছুটে যায়। শিবুদা সন্ধে থেকে রাত্তিরের মধ্যে অন্তত চার পাঁচবার বাইরে বেরোয় আর ফিরে আসে।

তারপর চটি ফটফটিয়ে ফেরে আর একজন। ইনি নতুন এসেছেন, তিনতলায় থাকে। নতুন এসেছেন মানে কি, তিনতলায় শান্তিময় কাকার ঘরে কিছুদিন থাকবেন। নীলুবাবু না কি যেন নাম। শান্তিময় কাকা হঠাৎ কিছুদিনের জন্য ট্রান্সফার হয়ে গেছেন নাগপুরে।

রমেনবাবুর মেয়ে শিখাদিও এক একদিন বেশ দেরি করে ফেরেন। সব শেষে রতনদা আসে প্রায় নিঃশব্দে। খুব সাবধানে দরজার ছিটকিনি আর খিল লাগায়। সিঁড়ি দিয়ে ওঠে পা টিপে টিপে। রতনদার কাকা ঘুমিয়ে পড়েন আগেই, তিনি যেন ওর দেরি করে ফেরা টের না পান। কিন্তু যে রোজই দেরি করে ফেরে, তার এই সাবধানতার মানে কি? রতনদার কাকা কি কোন একদিনও জেগে থাকেন না? কিংবা তিনি ঘুমোবার আগে দেখে নেন না রতন ফিরেছে কিনা?

রণুদের সবাই ফিরে গেলেও পাড়ার অন্যান্য বাড়ি শান্ত হতে অনেক দেরি হয়। এক একটা বাড়িতে দরজা জানালা বন্ধ হয় দড়াম দড়াম শব্দে। মান্তুদের বাড়িতে হঠাৎ হঠাৎ ঝগড়া-ঝাঁটি শোনা যায়। ধ্রুবদাদের বাড়িতে একটা বাচ্চা কাঁদে। তারপর বারোটা আন্দাজ সব নিঝুম। রাস্তায় দু একটা লোকের জুতোর শব্দ, টুকরো-টাকরা কথা আর নাইট গার্ডের লাঠির ঠক ঠক।

রণু গভীর মন দিয়ে বই পড়ছিল, এমন সময় তার কানের কাছে বিকট ভাবে হোঁয়াও শব্দ হল। দারুণ চমকে কেঁপে উঠল সে। ঠিক যেন একটা হুলো বেড়াল। কিন্তু তাকিয়ে দেখল, সানুদা। সানুদা ওকে ভয় দেখিয়ে হাসছে। মুখে পান, হাতে সিগারেট, সানুদার চোখে মুখে এমন একটা ঔজ্জ্বল্য যেন রাতটা তার কাছে কিছুই না।

—কি রে রণু, পড়ছিস! এত রাত জেগে পড়ছিস?

সানুদার গলার আওয়াজ জড়ানো। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা অন্য রকম গন্ধ আসছে। সবাই জানে সানুদা মদ খায়। ওদের বাড়ির অনেকেই খায়।

সানুদাদের বাড়িটা বিচ্ছিরি। কতদিন ওদের বাড়িতে রঙ হয় না। একটা জলের পাইপ ফাটা, সেটা দিয়ে ছড়্ছড় করে জল পড়ে রাস্তায়। ও বাড়ির মেয়েরা রাস্তার ফেরিওয়ালাদের সঙ্গে পর্যন্ত ঝগড়া করে চেঁচিয়ে। ঝগড়া করায় ও বাড়ির সবাই দারুণ ওস্তাদ।

সানুদারা পাঁচ ভাই, এর মধ্যে শুধু সানুদাই বিয়ে করেনি। চার বছর আগে সানুদার বাবা মারা যাবার পরেই ভাইয়েদের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে গণ্ডগোল। শুধু ঝগড়া নয়, এ ওকে লাঠি নিয়ে তাড়া করে, বাপ তুলে গালাগাল দেয়, সারা বাড়িতে দাপাদাপি করার পরও বেরিয়ে আসে রাস্তায়। চিৎকারে সারা পাড়া কাঁপায়। ওরা মামলা করে না, পুলিশের কাছে যায় না, শুধু নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। ওদের সবচেয়ে বড় ভাই মাধব সরকার, তিনি দারুণ পণ্ডিত, ডি, এস সি। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। খুব নাম করা লোক। অথচ ঝগড়া করেন তিনিই সবচেয়ে বেশি, বাথরুমে কে বেশিক্ষণ থেকেছে, কে কার বারান্দায় পা দিয়েছে—এই সব ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া। তার ছেলে রঞ্জু তো একটা গুণ্ডা, ছুরি-ছোরাও চালায়। তার ভাইগুলো কেউই লেখাপড়া শেখেনি। সানুদা স্কুল ফাইনালে গাড্ডু খেয়ে পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

মাধব সরকারের মেয়ে মান্তু এক ক্লাসে পড়ে রণুর সঙ্গে। আগে আগে রণু ওদের বাড়িতে যেত, এখন মা বারণ করে দিয়েছেন। ও বাড়িতে সবাই খুব খারাপ ভাষায় কথা বলে। অন্যেরা আড়ালে ঐ বাড়িটার নাম দিয়েছে পচা বাড়ি। ও বাড়ির লোকদের কাছে পাড়ার কেউ পুজোর চাঁদাও চাইতে যায় না।

কিন্তু সানুদার ওপর রাগ করা যায় না কিছুতেই। সানুদার দারুণ সুন্দর চেহারা, চমৎকার স্বাস্থ্য, ফর্সা রঙ, মাথায় বাবরি চুল, ঠিক গল্পের বইয়ের ছবির রাজপুত্রের মতন। আবার লুঙ্গি পরে, খালি গায়ে সানুদা যখন লাঠি নিয়ে তার ভাইপো রঞ্জুকে তেড়ে যায়, তখন তাকে মনে হয় ডাকাত। সানুদা তার দাদাদের বলে শুয়োরের বাচ্চা, বৌদিদের বলে বস্তির মাগী। আরও কত খারাপ খারাপ গালাগাল যে তার মুখ দিয়ে বেরোয় তার ঠিক নেই। অথচ এই সানুদাই পাড়ার ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করে। সবাইকে ভাইটি বলে ডাকে, গলির মধ্যে ক্রিকেট নেট প্র্যাকটিস শুরু হলে সানুদা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে, তারপর অনুনয়-বিনয় করে বলে, আমাকে একবার ব্যাট করতে দিবি ভাইটি? একটু পরে পকেট থেকে দশ টাকার নোট বার করে দিয়ে বলে, লাঞ্চ ব্রেক। যা, মটন চপ কিনে নিয়ে আয়।

সন্ধের দিকে ফুরফুরে মদের নেশা করে এসে সানুদা পাড়ার মোড়ে

দাঁড়ানো ছেলেদের বলে, আয়, আমরা একটা লাইব্রেরি করি, করবি? এ পাড়ায় একটা লাইব্রেরি নেই মাইরি। আমি টাকা দেবো।

রণু সানুদাকে দেখে ভাবল, এই রে!

সানুদা বলল, পাড়ার আর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, শুধু তুই একলা জেগে পড়ছিস! তোর মতন ভাল ছেলে এ পাড়ায় একটাও নেই।

রণু বইটায় হাত চাপা দিল। বইটার নাম 'সাহারার বিভীষিকা'। আর পনেরো পাতা বাকি, শেষ হলেই রণু শুয়ে পড়ত।

—বাঙালরা পড়াশুনোয় ভাল হয়। দ্যাখ না, আমার তো কিছুই হল না। আমাদের ক্লাসে যে কটা বাঙাল ছেলে ছিল, সবাই ভাল রেজাল্ট করত। তুই যদি স্কুল ফাইনালে টেনথের মধ্যে হতে পারিস রণু, তোকে আমি নিজে একটা সোনার মেডেল দেব।

—সানুদা—

—মাইরি বলছি, আমি কথা দিয়ে কথা রাখি। তোদের বাড়ির সবাই কত ভাল। তোর বাবা দেবতার মতন মানুষ...তোর মা, নতুন কাকিমা, আহা এত ভাল লোক, একবার এক গ্লাস জল চেয়েছিলাম, দুটো নারকেল নাড়ু দিয়েছিলেন সঙ্গে—আর সব বাড়িতে শুধুই জল দেয়।

সানুদা এত জোরে জোরে কথা বলছে যে নিশ্চয় অন্য কেউ জেগে উঠবে। সানুদা কথা বলতে শুরু করলে তো থামবেই না। রণু হাই তুলল।

—তুই আর কতক্ষণ পড়বি?

—এই আর একটু বাদেই—

—পড় ভাইটি, তুই মন দিয়ে পড়, আমাদের মতন হতভাগা লোকের উচিত নয় তোর মতন ভাল ছেলেকে ডিসটার্ব করা—

হঠাৎ কথা থামিয়ে সানুদা চলে গেল। নিজের বাড়ির থেকে উল্টো দিকে। এত রাত্রে সানুদা কোথায় যায়?

রণু বইতে চোখ ফেরাল। এমন বই যে শেষ না করে কিছুতেই ছাড়া যায় না।

দু'মিনিট বাদেই আবার ফিরে এলো সানুদা। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, রণু ভাইটি তোর ঘুম কি খুব গাঢ়?

—কেন?

—আমি খানিকটা বাদে এই দু-আড়াই ঘন্টা পর যদি তোর নাম ধরে আস্তে করে ডাকি, তুই জেগে উঠতে পারবি না ?

—কেন বলুন তো সানুদা ?

—তোকে একটা জিনিস রাখতে দেব। আমার বাড়িতে সব তো চোর ছ্যাঁচোড়, কিছু রাখার উপায় নেই। আর যদি সঙ্গে করে নিয়ে যাই, তাহলে সবটাই—

সানুদা পকেট থেকে একটা দুমড়ানো মোচড়ানো খাম বার করল। তারপর ছেঁড়া জালের ফুটো দিয়ে সেটা গলিয়ে দিয়ে বলল, এটা তোর কাছে রাখ না, ভাইটি। কিছু মনে করলি না তো। ফিরে এসে ডাকলে ফেরত দিয়ে দিবি কেমন ?

—এত রাত্রে তুমি কোথায় যাবে, সানুদা ?

—সে আছে একটা জায়গা। তুই ঠিক বুঝবি না।

—কিন্তু এখন তো ট্রাম বাস কিছু চলে না।

—না চলুক, ট্যাক্সি চলে। তুই এটা তোর কাছে রেখে দে, ভাইটি।

আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল সানুদা। খামটা বেশ ভারী, মুখটা খোলা। রণু দেখল, খামের মধ্যে একগাদা দশটাকার নোট। তার গা ছমছম করে উঠল। যদিও দরজা বন্ধ, তবু একবার দরজার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল রণু। সানুদার কাছ থেকে এ রকম ভাবে টাকা রাখা তার অন্যায় হয়েছে নিশ্চয়ই। কিসের টাকা ? সানুদা চাকরি-টাকরি কিছু করে না। তবু সিল্কের পাঞ্জাবি পরে আর যখন তখন টাকা ওড়ায়। এ সব টাকা কোথা থেকে পায় সানুদা ?

রণু জানালাটা বন্ধ করে দিল। তারপর গুনতে লাগল টাকাগুলো। একবার মনে হল সাতাশখানা, আর একবার আটাশখানা। পর পর চারবার গুনে সে নিশ্চিন্ত হল যে আটাশখানা দশটাকার নোট-ই আছে। কিন্তু সানুদা তো গুনে দিয়ে যায়নি! যদি সানুদা এসে বলে এর চেয়ে বেশি টাকা ছিল ?

এত টাকা রণু কখনো চোখেই দেখেনি একসঙ্গে। দু-একদিন সে তার বাবা-মা'র মধ্যে কথাবার্তা শুনে বুঝেছে যে তার বাবা মাইনে পান সাড়ে পাঁচশো টাকা আর টিউশনিতে আড়াইশো। তার জন্য বাবাকে সারা মাস দারুণ খাটতে হয়। আর সানুদা কিছু না করেই···।

সানুদা টাকাটা গুনে দেয়নি। যদি এসে বলে এর চেয়ে বেশি

টাকা ছিল, যদি মাতাল অবস্থায় এসে বলে, তুই আমার টাকা চুরি করেছিস···তাহলে রণুর বাবা, দাদা সবাই মিলে রণুকে···না না, সানুদা সে রকম মানুষই নয়।

আর, যদি রণু এর থেকে একটা দশটাকার নোট সরিয়ে রাখে, সানুদা বুঝতে পারবে? সানুদা টাকা গোনে না। পকেট থেকে যখন তখন দশটাকার নোট বার করে। একটা দশটাকার নোটের সঙ্গে আর ছ'টাকা যোগ করলেই একটা ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেট হয়। বিলুদের ছাদে খেলা হয়, রণুর র‍্যাকেট নেই বলে ও এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মায়ের কাছে একবার র‍্যাকেটের জন্য আবদার করেছিল রণু মা বলেছিল, এ বছর নয়, সামনের বছর।

রণু একটা দশটাকার নোট বার করে আলোর দিকে উঁচিয়ে ধরে অশোকচক্র ছাপটা দেখল। তারপর সেটা আবার যত্ন করে ভরে রাখল খামের মধ্যে। যারা টাকা না গুনে দেয়, তাদের একদম বিশ্বাস নেই। ভিতরে ভিতরে তাদের হয়তো সব টাকা ঠিকঠাক গোনা আছে।

বইটা সম্পর্কে আকর্ষণ কমে গেছে এর মধ্যে। রণুর নিজের জীবনে এত রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আগে হয়নি। তার কাছে এখন অনেক অনেক টাকা। এই টাকা নিয়ে এক্ষুনি সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিরুদ্দেশে চলে যেতে পারে। সোজা আফ্রিকার সাহারায়—

তাড়াতাড়ি বাকি পাতা ক'টা শেষ করে রণু আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। টাকার বাণ্ডিলটা রাখল বালিশের নীচে। শরীরের মধ্যে অদ্ভুত একটা ছটফটানি। টাকার কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না। বালিশের তলায় ঘড়ি রাখলে যেমন টিকটিক শব্দ শোনা যায়, তেমনি টাকাটাও যেন একটা শব্দ করছে।

একটু তন্দ্রা আসতে না আসতেই রণু আবার চমকে জেগে উঠেছে। ক'টা বাজল? সানুদা কখন আসবে? রণুর ঘরে ঘড়ি নেই। একবার তার খেয়াল হল, জানালাটা সে বন্ধ করে রেখেছে, সানুদা এসে ডাকতে পারবে না। রণু উঠে আবার জানালাটা খুলে দিয়ে এলো।

তারপর এক একবার তন্দ্রা, এক একবার জেগে ওঠার পর এক সময় রণু সত্যি সত্যিই তার ঘুমের মধ্যে চলে গেল। কিন্তু প্রথম ভোরের আলো চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠে বসল। ধড়মড় করে হাত চলে গেল বালিশের তলায়। টাকাটা ঠিকই আছে, সানুদা আসেনি।

॥ দুই ॥

নীলাঞ্জন ঘরের তালার মধ্যে চাবি ঢুকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে খুটখাট করছে। তালাটা খুলছে না কিছুতেই। পরের বাড়ির তালা নিয়ে এই এক ঝামেলা। চাবি জিনিসটার যেন বেশ একটা আনুগত্য আছে। যার চাবি তার হাতেই ঠিকঠাক খোলে। কুকুরের মতন চাবিও যেন মানুষের পোষ মানে।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তালাটা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে কে যেন বলল, আপনার কাছে দেশলাই আছে?

নীলাঞ্জন পিছন ফিরে দেখল, উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের রমেনবাবু। অত বড় ভারিক্কি রাসভারী লোকটি যে নীলাঞ্জনের মতন একটি নেহাত ছোকরার কাছে দেশলাই চাইবেন, এটা যেন ঠিক ভাবা যায় না। একটু অবাক হয়ে নীলাঞ্জন পকেটে হাত ভরে তাড়াতাড়ি বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ আছে, এই নিন না—

দেশলাইটা দিয়ে নীলাঞ্জন ঘরের মধ্যে ঢুকে আলো জ্বালল। বিনা আহ্বানেই রমেনবাবু ঢুকে এলেন ঘরের মধ্যে। একটা চেয়ার টেনে বসলেন। নীলাঞ্জনের একটু লজ্জা করতে লাগল। ঘরটা বড্ড অগোছালো হয়ে আছে। সকাল বেলা বেরুবার সময় নীলাঞ্জন নিজের পাজামা, গেঞ্জি, জাঙিয়া ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে রেখেছিল বিছানার ওপর। ঘরের মেঝেতে কাগজপত্র ছড়ানো।

নীলাঞ্জন দ্রুত হাতে গোছাতে লাগল।

রমেনবাবু ষড়যন্ত্র করার মতন ফিসফিস করে বললেন, দরজাটা বন্ধ করে দিন না!

নীলাঞ্জন একটু অবাক হয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

রমেনবাবু পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে নীলাঞ্জনকে বললেন, নিন! এই ব্র্যাণ্ড চলে তো?

রমেনবাবু নীলাঞ্জনের প্রায় বাবার বয়েসী। এখনো এই বয়েসী লোকদের সামনে পড়ে গেলে সে সিগারেট লুকোয়। সে একটু অস্বস্তি বোধ করল। কিন্তু উনি নিজে থেকেই যখন দিচ্ছেন, তখন আর

ন্যাকামি করে লাভ নেই। হাত বাড়িয়ে নীলাঞ্জন একটা সিগারেট নিল।

সিগারেট ধরিয়ে রমেনবাবু একটু হেসে বললেন, আমার সিগারেট খাওয়া বারণ তো, তাই নিজের ঘরে বসে খেতে পারি না। বাড়ির সবাই এখন আমার গার্জেন হয়ে গেছে।

—সিগারেট খাওয়া বারণ কেন? আপনার অসুখের জন্য?

—হ্যাঁ মশাই। আমি হার্টের রুগী। সিগারেট নাকি খুব ক্ষতি করে।

তাহলে রমেনবাবু লুকিয়ে তার ঘরে সিগারেট খেতে এসেছেন। নীলাঞ্জন সেই অন্যায়ের প্রশ্রয় দিচ্ছে! কিন্তু নীলাঞ্জন কী করতে পারে? ঐ রকম একজন বয়স্ক লোককে সে কি করে বারণ করবে, আপনি সিগারেট খাবেন না! ওঁর নিজের ভাল-মন্দ উনি নিজেই তো বোঝেন।

রমেনবাবু বললেন, আপনাকে সিঁড়িতে দেখি মাঝে মাঝে। কিন্তু ভাল করে আলাপ হয়নি। তাই ভাবলাম, আলাপটা করে আসি। শান্তিময়বাবু যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন ওঁর ফ্ল্যাটে ওঁর এক ভাই এসে থাকবে। আপনি শান্তিময়বাবুর নিজের ভাই?

—না। উনি আমার এক মাসতুতো দাদার বন্ধু, খুব ছেলেবেলা থেকে চেনা। অনেকটা নিজের দাদারই মতন।

—উনি তো মাস দুয়েকের মধ্যেই ফিরবেন?

—সেই রকমই তো কথা আছে।

—তা আপনি এখানে একা একা থাকেন, আপনার আর কেউ....

—আমাদের নিজেদের বাড়ি গোয়াবাগানে। নিজেদের বাড়ি মানে অবশ্য সেটাও ভাড়া বাড়ি। আমাদের বাড়িতে অনেক লোক, জায়গা কম। শান্তিময়দা কিছুদিনের জন্য নাগপুরে ট্রান্সফার হয়ে গেলেন, তাই আমাকে বললেন, এই ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিয়ে গেলে ফিরে এসে আবার ফ্ল্যাট খুঁজতে হবে, তাই এটা ছাড়বেন না।

—সে তো ঠিক কথা। একবার ফ্ল্যাট ছাড়লে আবার যদি নতুন একটা পাওয়াও যায়, ডবল ভাড়া—

—শান্তিময়দা বললেন, ওর ফ্ল্যাটটা এই দু'মাস পাহারা দেবার জন্য একজন লোক খুঁজছেন। আমি তাই রাজি হয়ে গেলাম। এই দু'মাস একটু নিরিবিলিতে থাকব।

—একা একা থাকতে ভাল লাগে ?

—আমার লাগে।

—ইয়ংম্যান। এখন আপনাদের সব কিছুই ভাল লাগবে। কিন্তু খাওয়া দাওয়া ?

—দুপুরে বাইরে খাই। রাত্তিরে একবার নিজেদের বাড়ি ঘুরে একদম খেয়ে দেয়ে আসি।

—কিন্তু সকালের চা-টা ?

—সে ব্যবস্থা এখানেই করে নিয়েছি।

—কিছু অসুবিধে হলে বলবেন। এখন এক কাপ চা খাবেন ?

—না না, আমি বেশি চা খাই না।

—আমিও খেতাম না আগে। কিন্তু এই অসুখটা হবার পর থেকে খুব লোভ বেড়েছে ! লুকিয়ে-চুরিয়ে নানা রকম জিনিস খেতে ইচ্ছে করে। এক একদিন সাধ যায়, রাস্তায় পার্কে ঢুকে, ঐ যে ফুচ্‌কা না কী বলে, আমাদের সময় আমরা বলতাম জলকচুরি, সেগুলো খাই। হে-হে-হে !

বাইরে থেকে সরু রিনরিনে গলায় একটা ডাক শোনা গেল, বাবা, বাবা, তুমি কি ছাদে ?

রমেনবাবু একদিকের ভুরু তুলে বললেন, ঐ যে আমার গার্জেনর। আমায় খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে। আমার ছোট মেয়ে রিংকু, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। আলাপ হয়েছে ?

নীলাঞ্জন বলল, না।

—সে কি ! আপনি একজন ইয়াংম্যান, আপনার সঙ্গে এখনো ইয়াং গার্লদের আলাপ হয়নি। আজকাল তো সবাই নিজেরা নিজেরাই আলাপ করে নেয়।

নীলাঞ্জন চুপ করে রইল।

—উঠি তাহলে ?

উঠে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রমেনবাবু একটু ইতস্তত করলেন। তারপর সিগারেটের প্যাকেটটা নীলাঞ্জনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এটা আপনার কাছে রাখুন।

—না না। আমার আছে।

—রাখুন না ! আমার পকেটে সিগারেট পেলে সবাই মিলে আবার

চ্যাঁচামেচি শুরু করবে। সবাই আজকাল আমার পকেট সার্চ করে। অনেকদিনের অভ্যেস, ছাড়তেও পারি না।

নীলাঞ্জন চুপ। তাঁর মেয়ে আরও দুবার ডাকতেই রমেনবাবু দরজাটা একটু খুলে বললেন, ওরে আমি এখানে। দাঁড়া, এক্ষুনি যাচ্ছি।

তারপর নীলাঞ্জনের দিকে আবার ফিরে বললেন, যাক্ আলাপ হল, আসব মাঝে মাঝে। বাড়িউলি যে আপনাকে থাকতে দিয়েছে, সেটাই বড় আশ্চর্যের।

—কেন ?

—সাধারণত কোন ব্যাচিলরকে কেউ এ সব পাড়ায় একা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতে দেয় না।

—কিন্তু আমি তো মাত্র দু'মাসের জন্য—

—তাও দেয় না। ফ্যামিলি ম্যান-ছাড়া ভাড়াই দেয় না। কোন আপত্তি করেনি বাড়িউলি ?

—না। আমাকে তো কিছু বলেননি। আমার সঙ্গে এ পর্যন্ত দেখাই হয়নি !

—তাই তো আশ্চর্য হচ্ছি। লোক ভাল নয়। বড় স্বার্থপর। আমি তো এখানে আছি বিশ বছর। বেলেঘাটায় দু'বছর আগে নিজে একটা বাড়ি কিনেছি। কোম্পানি লীজে ভাড়া আছে এখন। এ বাড়ি ছেড়ে যাই না কেন জানেন ? এ বাড়িতে থেকেই আমার যা কিছু উন্নতি। এখন বাড়ি পালটালে যদি লাক কেটে যায় ?

আর একবার 'বাবা' ডাক উঠতেই রমেনবাবু 'চলি' বলে বেরিয়ে গেলেন।

নীলাঞ্জন দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল। ভদ্রলোক একটু বেশি কথা বলতে ভালবাসেন। সিগারেটটা এখানে রেখে যাবার মানে হল, উনি মাঝে মাঝে লুকিয়ে-চুরিয়ে এখানে এসে সিগারেট খেয়ে যাবেন। এ তো এক ঝামেলা হল। বয়স্ক লোকদের সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতে ভাল লাগে না নীলাঞ্জনের।

এ বাড়ির কারুর সঙ্গেই নীলাঞ্জনের তেমন পরিচয় হয়নি এখনও। সে চুপচাপ নিরিবিলিতেই থাকতে চায়। তবু এই ক'দিনে বাড়ির লোকজনদের সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণা হয়ে গেছে। একতলায় থাকে এক ইস্কুল মাস্টারের পরিবার। সাধারণ নিরীহ লোক। দোতলায়

বাড়িওয়ালা। বাড়িওয়ালা মারা গেছেন কিছুদিন আগে, তাঁর স্ত্রীই এখন মালিক। বাড়িওয়ালার বিপত্নীক ভাইও এ বাড়িতে থাকেন। তিনতলায় রমেনবাবু ভাড়াটে হয়েও বাড়িওয়ালাদের চেয়ে বেশি অবস্থাপন্ন। একমাত্র তাঁরই নিজস্ব গাড়ি আছে। বেলেঘাটায় রমেনবাবুর নিজস্ব বাড়ি থাকতেও এখনো এখানে ভাড়াটে হয়ে রয়েছেন। হার্টের রুগী, তবু তিনতলায় ওঠা-নামা করেন। নিশ্চয়ই লোকটি খুব কঞ্জুস। টাকার জন্য মানুষ নিজের হৃদয়কেও অবহেলা করতে পারে?

রমেনবাবুর ছেলে নেই, তিন মেয়ে। একটি মেয়েরও এখন পর্যন্ত বিয়ে হয়নি। কেন, কে জানে!

নীলাঞ্জন জামা কাপড় ছেড়ে নিল তাড়াতাড়ি। রাত সাড়ে দশটা বাজে। এর মধ্যেই বাড়িটা নিঝুম হয়ে এসেছে। শান্তিময়দার এই ফ্ল্যাটে তিনখানা ঘর। সবই এখন নীলাঞ্জনের এক্তিয়ারে। চিরকাল একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে থাকতে হয়েছে তাকে। এখন সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। শান্তিময়দাকে অজস্র ধন্যবাদ। এই দু'মাসে সে একখানা উপন্যাস লিখে ফেলবে। প্রথম সাতদিনেই কুড়ি পাতা লেখা হয়ে গেছে।

লেখার লম্বা খাতাটা নিয়ে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। বুকে বালিশ দিয়ে লিখতে সে ভালবাসে। কিন্তু এক পাতা লেখার আগেই তার ঘুম এসে গেল। সওয়া বারোটা বাজে। নীলাঞ্জন চোখ কচলালো। একটু গরম চা খেলে আরও ঘন্টা দু-এক জেগে লেখা যেত। রান্নাঘরে স্টোভ, চা, চিনি সবই আছে। কিন্তু উঠে গিয়ে নিজে নিজে বানাতে আলস্য লাগে। কাউকে হুকুম করা গেলে বেশ হত।

গরমও লাগছে খুব। পাখার হাওয়াটাও যেন গায়ে লাগছে না। উত্তর কলকাতায় পুরোনো পাড়ার বাড়ি, চারপাশটা বড় ঘিঞ্জি। এ বাড়িটার তিনতলায় অবশ্য আলো হাওয়া বেশ ভালই আসে। কিন্তু দু'দিন ধরে অসহ্য গুমোট চলছে।

দরজা খোলা রেখে নীলাঞ্জন ফ্ল্যাটের বাইরে চলে এলো। ওপরেই বেশ বড় ছাদ। ছাদে একটুক্ষণ পায়চারি করলে ঘুমটা কেটে যাবে। রাত দুটো পর্যন্ত অন্তত জেগে লিখতে পারলে অনেকটা এগিয়ে যাবে। ফাঁকা ফ্ল্যাটে থাকার সুযোগটা নীলাঞ্জন ঘুমিয়ে নষ্ট করতে চায় না।

আকাশে আজ চাঁদ নিরুদ্দেশ। কোন্ তিথি কে জানে, সারা

আকাশ জোড়া অন্ধকার। তবু সারা পৃথিবী নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নয়। রাস্তাঘাট থেকে আলো উঠে আসছে ওপর দিকে। পৃথিবীর কোথাও নাকি খাঁটি অন্ধকার দেখা যায় না। এ কথা বলেছিল চাঁদের এক অভিযাত্রী। নীল আর্মস্ট্রং বা আর কেউ। চাঁদের এক পিঠে থাকে অন্ধকার। সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে অভিযাত্রী বুঝেছিল, পৃথিবীতে এ রকম নিকষ কালো সে দেখেনি কোনদিন।

আজ থেকে কুড়ি পঁচিশ বছর বাদে মানুষ নিশ্চয়ই নিয়মিত যাতায়াত করবে চাঁদে। কোন একটা সুযোগ পেলেই নিশ্চয়ই সেখান থেকে একবার ঘুরে আসবে নীলাঞ্জন। বিশেষত সেই খাঁটি অন্ধকার দেখে আসার জন্য।

সিগারেট দেশলাইটা আনতে পারলে ভাল হত, পায়চারি করতে করতে এই কথাটা মনে হল নীলাঞ্জনের। সিগারেটের ধোঁওয়ায় বুদ্ধি খোলে। সে তার জীবনের প্রথম উপন্যাস লিখছে। পর পর অনেক ঘটনাই মনে আসে, কিন্তু ঠিক কোন্‌টার পর কোন্‌টা লিখবে, সেটা ঠিক করাই শক্ত।

হঠাৎ নীলাঞ্জন একটা শব্দ শুনে চমকে গেল। মানুষেরই শব্দ। কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। প্রথমে চারিদিকে তাকিয়েও সে কিছু দেখতে পেল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নীলাঞ্জনের গা টা একটু ছম্-ছম্ করে উঠল। মাঝরাত্তিরে অশরীরী কান্না শুনলে এ রকম হবেই। নীলাঞ্জনের কোন রকম অলৌকিকে বিশ্বাস নেই যদিও।

কিন্তু মধ্যরাত্রির কান্নার সঙ্গে ছেলেবেলায় শোনা বহু রূপকথার কাহিনী জড়িত। এই সময় কাঁদে শুধু রাজকন্যারা আর রাক্ষসীরা।

অন্ধকারে খানিকটা চোখ সইয়ে নেবার পর দ্বিতীয়বার সে রকম শব্দ হতেই সে দেখল যে রাস্তার দিকের পাঁচিলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে সে কালো কিংবা নীল শাড়ি পরা।

নীলাঞ্জন থমকে দাঁড়াল। এ বাড়িরই কোন মেয়ে। এত রাত্রে সে যখন একা একা কাঁদছে, নিশ্চয়ই তার দুঃখটা বড় তীব্র। নীলাঞ্জনের কষ্ট হল। মানুষ শুধু শুধু দুঃখ পায় না, একজন আর একজনকে দুঃখ দেয়। কেন মানুষ অন্যকে দুঃখ দেয়? কতখানি ব্যথা পেলে একটি মেয়ে এ রকম একা একা কাঁদতে আসে ছাদে!

এ বাড়ির কোন মেয়ের সঙেগ নীলাঞ্জনের আলাপ হয়নি। সে কি

এখন মেয়েটির পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, জিজ্ঞেস করতে পারে, কী তোমার দুঃখ ? মেয়েটি যদি ভয় পায়, যদি সে ভাবে নীলাঞ্জনের কোন খারাপ উদ্দেশ্য আছে । যদি মেয়েটি হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে ভয় পেয়ে, কেউ আজ নীলাঞ্জনকে বিশ্বাস করবে না ।

নীলাঞ্জনের উচিত এখন চুপি চুপি নিচে চলে যাওয়া । তবু সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল । যেন চুম্বক তার পা আটকে ধরেছে ।

প্রত্যেক কান্নার পিছনেই একটা না একটা গল্প থাকে । মধ্য রাত্রে অন্ধকারে একা একা একটি মেয়ের কান্নার দৃশ্যটি রীতিমত নাটকীয় । সচরাচর কেউ দেখতে পায় না । নীলাঞ্জন একজন লেখক, এই কান্নার কাহিনী জানার জন্য তার দুর্দমনীয় কৌতূহল জেগে উঠল । কিন্তু সে সাহস পাচ্ছে না, সে ঠিক ভীরু না হলেও লাজুক ।

নীলাঞ্জন একবার ভাবল এগিয়ে যাবে । কিন্তু এগোল না । তারপর ভাবল মুখ দিয়ে একটা কিছু শব্দ করে সে তার উপস্থিতি জানান দেবে । তাও করল না । সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল স্থির ভাবে ।

মেয়েরা পিঠ দিয়েও দেখতে পায় । পিছন দিক থেকে কোন পুরুষ তাকিয়ে থাকলেও তারা টের পেয়ে যায় ঠিক । এই মেয়েটিও হঠাৎ ফিরে তাকাল এবং নীলাঞ্জনের লম্বা চেহারাটা দেখতে পেয়ে গেল ।

মেয়েটি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল না । গলা দিয়ে কোন শব্দই বেরুল না । নীলাঞ্জনকে সে চিনতে পেরেছে নিশ্চয়ই, চোর বা ভূত ভাবেনি । মেয়েটি কোন কথাই বলল না, ধীর পায়ে হেঁটে গেল সিঁড়ির দিকে । মুখটা অন্য দিকে ফেরানো । কিন্তু নীলাঞ্জন তাকে চিনতে পারল না ।

।। তিন ।।

—রেডিওটা বন্ধ করুন !

দোতলা থেকে শিবু চিৎকার করে উঠল । রণুর দাদা বরেন সেটা শুনেও শুনল না । শুধু তার ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল । বই নিয়ে সে শুয়ে আছে বিছানায় । টেবিলের ওপর রেডিও বাজছে ।

শিবু আবার চ্যাঁচাল, রেডিওটা একটু বন্ধ করুন !

বরেন এবার উঠে গিয়ে রেডিওর ভল্যুমটা একটু বাড়িয়ে দিল ।

তিন ব্যাণ্ডের রেডিও, জোরে চালালেই একটা খ্যানখেনে আওয়াজ হয়। সেই আওয়াজের মধ্যে সুচিত্রা মিত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছেন।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত শিবু আর বরেন দারুণ বন্ধু ছিল। ছুটির দিনের দুপুরবেলা ওরা ছাদে গিয়ে ট্যাঙ্কের ধারে বসে গল্প করত। গনগনে রোদ, ওরই মধ্যে ট্যাঙ্কের ধারের ছায়াটুকুতে ট্যাঙ্কে হেলান দিয়ে বসলে বেশ আরাম। শিবুই বরেনকে সিগারেট খাওয়া শেখায় প্রথম। নিজের পয়সায় সিগারেট কিনে সে বরেনকে খাইয়েছে। নারী পুরুষ সংক্রান্ত যৌন জ্ঞানের শিবুই শিক্ষাদাতা।

কিন্তু গত ছ'মাস ধরে দুজনের কথা বন্ধ। শিবুরা বাড়িওয়ালা, বরেনরা ভাড়াটে। শিবুর মা কোন কারণে বরেনের ওপর রেগে গেলে এখনও বলেন, ভাড়াটেদের ছেলে! ভাড়াটেদের ছেলের এত আস্পর্ধা! যেন ভাড়াটেরা একটা নিচু জাত।

মাস ছয়েক আগে বাড়িওয়ালারা বরেনদের নামে মামলা করেছে। বছর পাঁছেক আগেও একবার মামলা হয়েছিল, তাতে বাড়িওয়ালারা হেরে যায়। এবার নতুন নতুন শানিত যুক্তি দিয়ে মামলা ঠোকা হয়েছে। এবার জয়ের সম্ভাবনা যথেষ্ট। বরেনরা পনেরো বছর ধরে ভাড়াটে রয়েছে, ওদের ওঠাতে পারলে একতলাটার এখন তিনগুণ ভাড়া হবে।

বরেনের বাবা স্কুলমাস্টার, বরেনরা গরীব। সুতরাং বাড়িওয়ালা পক্ষ ওদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবেই। কিন্তু তিনতলার রমেনবাবুকে নিয়ে আবার অন্য মুশকিল। তিনি ভাড়াটে হয়েও বাড়িওয়ালাদের চেয়ে বেশি বড়লোক। তিনি গাড়ি চড়েন। তাঁর ঘরে টি-ভি আছে। তিনি সিঁড়ি দিয়ে ওঠেন জুতো মশমশিয়ে। বাড়িওয়ালাদের দিকে তিনি অবজ্ঞার চোখে তাকান। রমেনবাবুরা যখন প্রথম এ বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আসেন, তখন তাঁদের অবস্থাও ছিল খুব সাধারণ। কিন্তু গত কয়েক বছরে রমেনবাবু দারুণ উন্নতি করেছেন ব্যবসায়। তিনি তাঁর বেলেঘাটায় নিজের বাড়ি বেশি টাকায় ভাড়া দিয়ে এখানে কম ভাড়ায় থাকেন। তাঁর সঙ্গেও মামলা হয়েছিল, সুবিধে হয়নি।

বাড়িওয়ালা পক্ষের সঙ্গে একমাত্র শান্তিময়দেরই সদ্ভাব আছে। শান্তিময়বাবু মাত্র দু'বছর আগে ভাড়া এসেছেন, তিনি অনেক বেশি ভাড়া দেন।

যখনই মামলা লাগে, তখনই শিবু কথা বন্ধ করে দেয় বরেনের

সঙ্গে। মুখ ফিরিয়ে নেয় চোখাচোখি হলেই। অবশ্য কয়েক মাস বাদে সে নিজে থেকেই এসে আবার ভাব করবে।

শিবু রবীন্দ্রসঙ্গীত একেবারে পছন্দ করে না। তার মতে, রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুধু ঘ্যানঘ্যানানি আর প্যানপ্যানানি। পড়াশুনোর সময় রেডিওতে ঐ গান বাজলে তার খুবই ব্যাঘাত হয়।

বরেন রেডিওটা বন্ধ করল না দেখে শিবু একটা প্রতিশোধ নিল। সে তাদের খাবার ঘরের পাখাটা চালিয়ে দিল তক্ষুনি। এই পাখাটার কিছু দোষ আছে। এটা ডি সি এরিয়া, খারাপ পাখা চালালেই কাছা-কাছি রেডিওগুলোতে বিশ্রী ঘটাং ঘটাং শব্দ হয়। নিচতলায় বরেনের ঘরে সুচিত্রা মিত্রের গানের মধ্যে ঘট ঘটাং ঘট ঘটাং শব্দ হতে লাগল।

শিবু এতেও ক্ষান্ত হল না। পাখাটার রেগুলেটার সে একবার কমাতে একবার বাড়াতে লাগল। সুতরাং ঘট ঘটাং শব্দটা একবার আস্তে একবার জোরে। সুচিত্রা মিত্র এ সব কিছুই বুঝতে পারছেন না। তিনি গেয়েই যাচ্ছেন।

বরেন বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দিল রেডিও। দাঁতে দাঁতে চেপে বলল, শালা!

এবার হার হল বরেনের। অন্য কোন কায়দায় সে শিবুকে আবার ল্যাং মারার চেষ্টা করবে।

শিবুর দিদি অনীতা বলল, এ কি, তুই রেগুলেটার নিয়ে অমন করছিস কেন?

শিবু চোখ মটকে বলল, দ্যাখ না, নিচের বরেনটাকে কেমন টাইট দিচ্ছি।

—পড়াশুনো ছেড়ে এই সব করবি?

—তুমি যাও না দিদি, নিজের কাজ কর। আমার পড়াশুনো নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

অনীতা আর শিবু পিঠোপিঠি ভাই বোন। পাঁচ সাত বছর আগেও শিবু মুখে মুখে কোন কথা বললেই অনীতা তার মাথায় চাঁটি লাগাত। কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। এখন শিবু কথায় কথায় মুখ ঝামটা দেয়, অনীতা চুপ করে থাকে।

বিয়ের মাত্র দেড় বছর পরেই অনীতা রাগ করে তার স্বামীর কাছ থেকে চলে এসেছে। তার স্বামী তাকে নিতেও আসে না। তার স্বামী

একজন দাঁতের ডাক্তার, প্রকাশ্যেই সে অন্য একটি মেয়েকে নিয়ে থাকে।

নিজের বাড়িতেও অনীতা আর আগের মতন সহজ ব্যবহার করতে পারে না। কখনো কখনো অন্যদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতে করতে হঠাৎ থেমে যায়। রেডিওতে কোন গান শুনতে শুনতে আপন মনে কেঁদে ফেলে। অনীতা আর আগের মতন নেই।

রেডিও বন্ধ হবার পর শিবু আবার যেই পড়ার ঘরে গেল, অমনি নিচতলায় বরেন একটি নতুন কাণ্ড শুরু করল। রেডিও বন্ধ হয়েছে তো কী হয়েছে তার গলার জোর নেই? সে আবৃত্তি কমপিটিশনে ফার্স্ট হয়।

সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আবৃত্তি করতে লাগল ;

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে ;
সেইখানে দারুচিনি বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।
এ পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য ; তবু শেষ সত্য নয়।
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।
আজকে অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ......

ওপরতলায় বসে শিবু খানিকক্ষণ শুনল। নিচতলা থেকে কেউ এ রকম গাঁক গাঁক করে চ্যাঁচালে কি পড়াশোনা হয়? শিবু একটুও আওয়াজ সহ্য করতে পারে না। পড়াশুনোয় তার মন বসে না এমনিতেই, তার ওপর বরেনটা যদি এ রকম শত্রুতা করে, তাহলে তো একদমই পড়াশুনো হবে না।

বই মুড়ে রেখে সে চটি ফটফটিয়ে নেমে এলো নিচে। বাইরে বেরিয়ে যাবার আগে সে বরেনের ঘরের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য ছুঁড়ে গেল, একটা গাধা ঢুকে পড়েছে বাড়ির মধ্যে। ধোপারা খুব খোঁজা-খুঁজি করছে।

বরেন যেন উত্তর দেবার জন্য তৈরিই হয়ে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে চেঁচিয়ে বলল, মা, শিবু ধোপা আজ এসেছিল?

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, আঃ, কি হচ্ছে কি, বড় খোকা? দরজা বন্ধ করে দিয়ে পড়াশুনো কর।

বরেন আবার বলল, শিবু ধোপা আসেনি আজ? আমার একটাও শার্ট কাচা নেই!

শিবু রাগের চোটে দড়াম করে বন্ধ করল সদর দরজা। বরেনদের ধোপার নাম সত্যিই শিবু।

শিবু মোড়ের দোকান থেকে দুটো সিগারেট কিনে তক্ষুনি আবার ফিরে এলো। এবার সে পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে সিগারেট খাবে। জানালা দিয়ে সেই ধোঁয়া বেরিয়ে গিয়ে নিচে বরেনের ঘরে ঢুকবে। আর তখন ছটফট করবে বরেন। শিবু যে সিগারেট খায়, তা বাড়ির লোক জানে। একটুখানি আড়াল রাখলেই হল। বরেনের উপায় নেই বাড়িতে বসে সিগারেট খাওয়ার।

বরেন দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিল। সিগারেটের ধোঁয়া নাকে এলে তারও ইচ্ছে করে সিগারেট খেতে। কিন্তু উপায় নেই। শিবুই তাকে সিগারেট খেতে শিখিয়েছে। এখন সে-ই প্রতিশোধ নিচ্ছে! কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করল বরেন। তারপর সে বিড়বিড় করে বলল, হারামির বাচ্চা, দ্যাখ না, আমি তোমাকে কাল কেমন ভাবে টাইট দিই!

বন্ধ ঘরের মধ্যে বরেন প্রাণ খুলে আরও অনেক বাছা বাছা খারাপ গালাগালি দিতে লাগল শিবুকে।

আজকের খেলাটায় জিতে গিয়ে শিবু খুব খুশি। নিজেকে সে এমনই তারিফ করতে লাগল যে পড়াশুনোয় মন বসার আর কোন প্রশ্নই ওঠে না। ঘরের দরজা বন্ধ। সে সন্তর্পণে বার করল আলমারির মাথা থেকে একটা পাতলা ইংরেজি বই। ভিতরে আট-দশখানা ছবি। সেগুলো দেখলেই গা গরম হয়ে ওঠে। আপন মনে উৎফুল্ল ভাবে সে বলল, বরেন শালা একবার বইখানা চেয়েছিল। ওকে বই দেব না আমার ইয়ে দেব!

বরেনের বোন সুতপার সঙ্গে কিন্তু শিবুর দিদি অনীতার ঝগড়া নেই। দুখানা বই কোলে নিয়ে অনীতা নেমে এলো নিচে। ওদের শোওয়ার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকল, সুতপা, সুতপা!

সুতপা তখন রণুর ঘরে। দু'দিন ধরে আবার রণুর খুব জ্বর। সে চোখ বুজে তক্তপোশে শুয়ে আছে, কপালে জলপটি দেওয়া। সুতপা পাশে বসে বসে বই পড়ছে, আর মাঝে মাঝে ছোট ভাইয়ের জলপটি ভিজিয়ে দিচ্ছে।

অনীতার ডাক শুনে সে বেরিয়ে এলো।

অনীতা বলল, এই নে তোর বই দুখানা। তোর কাছে আর বই আছে?

সুতপা শোওয়ার ঘরে ঢুকে বলল, দেখছি। এসো না অনীতাদি, একটু বসো। রণু ঘুমোচ্ছে।

—রণুর বুঝি আবার জ্বর হয়েছে? বড্ড ভোগে ছেলেটা!

—কথা বললে কথা শোনে না। যা-তা জিনিস খাবে—

অনীতা কিন্তু ওদের ঘরে ঢোকেনি, দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বলছে।

—বসবে না অনীতাদি?

—না রে। কাজ আছে একটা, আজ আমি চিংড়ি মাছ দিয়ে মোচার ঘণ্ট রাঁধব বলেছি। কাকাবাবু অনেক দিন ধরে খেতে চেয়েছেন। তাই আজ আমি নিজেই রাঁধছি। এর পর তো আর বেশি সময় পাব না।

—সময় পাবে না? ও, তুমি চলে যাবে বুঝি?

—সামনের মাস থেকে আমি একটা চাকরি পাচ্ছি। একটা মিশনে, সুপারভাইজারের কাজ—

—বাঃ, কি করে পেলে?

—চেনাশুনো একজনের থ্রু দিয়ে।

—তখন তুমি এখানেই থাকবে, না চলে যাবে?

—বোধহয় চলেই যাব...মিশনে আমার থাকবার জন্যে ঘর পাওয়া যাবে—

সুতপা একদৃষ্টে চেয়ে রইল অনীতার দিকে। অনীতাদি তাহলে স্বামীর কাছে ফিরে যাবেন না? অনীতাদি স্বামীর কথা উচ্চারণ করেন না। নিজে থেকে কিছু না বললে যে অনীতাদিকে স্বামীর কথা জিজ্ঞেস করতে নেই, সে কথা সুতপা বোঝে।

অনীতার চেহারা মোটামুটি ভালই। হিস্ট্রি অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেছিল। নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করে বিমলদাকে। বাড়ির অমত ছিল সেই বিয়েতে, তবু অনীতাদি জোর করে বিয়ে করেছে। সেই বিমলের সঙ্গে তার বনিবনা হল না, বাপের বাড়িতে ফিরে আসতে হল। এই নিয়ে তার মনের মধ্যে একটা ঘোর লজ্জা আছে। তার

মা কিংবা ভাইরা যখন খোঁটা দিয়ে বলে, আমরা মানুষ চিনি না? তখন অত বারণ করেছিলাম। তখন লজ্জাসরম খুইয়ে নিজে নিজেই...

রতনদা একবার তার ভগিনীপতি বিমলদার কাছে গিয়ে মামলার ভয় দেখিয়েছিল। বিমলদা যেন কিছুই জানেন না। অবাক হবার ভান করে বলেছিলেন, মামলা? কেন? তোমার বোনকে কি আমি তাড়িয়ে দিয়েছি? কোনদিন কম আদর-যত্ন করিনি, খাওয়া পরার অভাব নেই। তবু সে রাগ করে চলে গেলে আমি কি করব? এখনো আমার দরজা খোলা আছে, সে ফিরে এলে আবার যেমন ছিল তেমনি থাকবে। আসলে তোমার বোনের মেজাজ বড় সাংঘাতিক। পান থেকে চুন খসলেই দপ করে জ্বলে ওঠে। আমি কোনদিন কারুর সঙ্গে ঝগড়া করি না, কিন্তু সে তবু প্রত্যেক দিন আমি বাড়ি ফিরলেই....

রতন বলেছিল, কিন্তু আপনি...

—কি আমি?

—আপনি......

—আপনি আপনি করছ কেন? কি বলতে চাও বল না!

না, সে কথাটা শেষ পর্যন্ত বলতে পারেনি রতন। বিমলদার সঙ্গে অন্য কোন মেয়ের কি সম্পর্ক আছে, সে কথা চট করে সে উচ্চারণ করতে পারল না। সে মেয়েটিকে তো বাড়িতে এনে রাখেননি বিমলদা। বাড়ির বাইরে অনেকেই অনেক কিছু করে।

বিমলদা দারুণ চালু লোক। তাঁর সঙ্গে কথায় পারা খুব শক্ত। মামলা করলেই বা কী লাভ হবে। সত্যিই তো বিমলদা স্ত্রীকে কোন রকম অযত্নে রাখেননি। বাড়িতে ঝি-চাকর আছে। সংসার খরচ ছাড়াও শুধু শুধু হাত খরচ হিসেবে প্রতি মাসে তিনি পাঁচশো টাকা দিতেন নিজের স্ত্রীকে। এর ওপর কারো কিছু বলার থাকতে পারে? তিনি তাঁর চেম্বারের নার্সকে শয্যাসঙ্গিনী করেন মাঝে মাঝে, এ ব্যাপারটা অনেকে জানলেও কোর্টে কি প্রমাণ করা যাবে?

রতন বাড়ি ফিরে এসে বলেছিল বিমলদা মানুষটি তো খারাপ নয়। এখনো চান অনীতাকে ফেরত নিতে, ও যদি যায়...

এই নিয়ে রতনের সঙ্গে অনীতার হয়ে গেল তুমুল ঝগড়া। অনীতা চায় না, তার স্বামীর কাছে কেউ বোঝাপড়ার জন্য যায়। সে নিজেই নিজের ভার নিতে পারবে।

সুতপা আর দুটো-তিনটে গল্পের বই এনে দিল। সবই অনীতার পড়া। শেষ পর্যন্ত সে একটা মাসিক পত্রিকা নিয়ে উঠে গেল ওপরে।

দোতলার সিঁড়ির ঠিক পাশের ঘরেই থাকেন অনীতার কাকা। দারুণ রাশভারী লোক। ষাটের কাছাকাছি বয়েস, বিয়ে করেননি। চাকরি-বাকরিও করেননি কখনো। এক সময় দেশের কাজ করতে গিয়ে জেল খেটেছিলেন। কাকাবাবু বাড়ির কোন সাতে-পাঁচে থাকেন না। সকাল বিকেল দু'বার বেরিয়ে তিন তিন ছ' মাইল রাস্তা হেঁটে আসেন শরীর সুস্থ রাখবার জন্য। বাকি সময়টা ঘরে বসেই কাটান। তবু পরিবারের সবাই ভয় পায় কাকাবাবুকে।

কাকাবাবু এক সময় হাতিবাগান বাজারের কাছে খুব চালু একটা ইলেকট্রিকের দোকান কিনে নিয়েছিলেন, সেটা আবার লীজ দিয়েছেন এক বন্ধুকে। প্রতি মাসে তিনি দেড় হাজার টাকা করে পান। তার থেকে বিশেষ কিছু খরচ হয় না। এ বাড়িটারও অর্ধেক অংশের মালিক তিনি, কিন্তু কোনদিন সে নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি, ভাড়ার টাকার অংশও চান না।

সেই জন্যই কাকাবাবুর বিশেষ খাতির এ বাড়িতে। ঠিক ঘড়ি ধরে তাঁর স্নানের জল দেওয়া হয়, কক্ষনো তাঁকে ঠাণ্ডা খাবার দেওয়া হয় না। তিনি যখন বাড়িতে থাকেন, তখন জোরে কথা বলে না কেউ। পানের সঙ্গে জর্দা খেতে ভালবাসেন কাকাবাবু, তাই রতন বড়বাজার থেকে ওঁর জন্য বিশেষ রকমের জর্দা এনে দেয়। শিবু অতি ভক্তিতে কাকাবাবুকে বলে 'ক্যাঁকাবাবু'। ওরা সবাই আশায় আশায় আছে। উনি চোখ বুজলেই ওঁর জমানো টাকাগুলো নিজেরা ভাগ করে নিতে পারবে।

অবশ্য খুব নিয়মে আর যত্নে থাকার ফলে কাকাবাবুর স্বাস্থ্য দিন দিনই যেন ভাল হচ্ছে। হঠাৎ চলে যাবার কোন লক্ষণ নেই।

অনীতা কাকাবাবুর ওপর খুব কৃতজ্ঞ। বিমলের সঙ্গে বিয়ে হবার সময় একমাত্র তিনিই কোন বাধা দেননি। কাকাবাবুর ভরসাতেই অনীতা জোরের সঙ্গে অতখানি এগোতে পেরেছিল। বিমলের হৃদয় বলে কিছুই নেই। আছে শুধু কথা। কথার চাকচিক্যে সে এক ঘণ্টার মধ্যে যে-কোন মেয়েকে অভিভূত করে ফেলতে পারে। দাঁতের ডাক্তার না হয়ে বিমল যদি অভিনেতা হত তাহলে আরও অনেক বেশি

নাম করতে পারত। বিমলের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে আসবার পরও কাকাবাবু অনীতাকে কোন গঞ্জনা দেননি। সেইজন্য কাকাবাবুর সঙ্গেই অনীতা মন খুলে কথা বলতে পারে।

অনীতা কাকাবাবুর ঘরে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কাকামণি, তুমি চা খেয়েছ? চা দিয়েছে তোমাকে?

কাকাবাবু একটা মোটা বই পড়ছিলেন। চোখ তুলে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, হ্যাঁ, দিয়েছে। আয় বোস।

কাকাবাবুর ঘর জোড়া একটা পুরোনো আমলের পালঙ্ক। জানালার ধারে একটা ছোট্ট শ্বেতপাথরের টেবিল আর একটা চেয়ার। আর এক আলমারি বই, অন্য আলমারিতে জামাকাপড়। অনীতা পালঙ্কের পাশে এসে দাঁড়াল।

কাকাবাবু আধশোওয়া হয়ে ছিলেন। পালঙ্কের ভিতরে একটু সরে গিয়ে জায়গা করে দিয়ে বললেন, এখানে বোস। তোর হাতে ওটা কি?

অনীতা বলল, একটা সিনেমার পত্রিকা।

কাকাবাবু বললেন, দেখি, দে তো একটু দেখি!

কোল থেকে গীতাভাষ্যখানি সরিয়ে রেখে তিনি আগ্রহের সঙ্গে সিনেমা পত্রিকাটি নিলেন অনীতার হাত থেকে। পাতা উল্টে উল্টে ছবি দেখতে লাগলেন। গত দশ-পনেরো বছরের মধ্যে তিনি একটিও ফিল্ম দেখেননি। কিন্তু সব পত্র-পত্রিকা দেখতে তিনি খুব ভালবাসেন। একটা ছবির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, এই তো নার্গিস, না রে?

অনীতা হেসে বলল, নার্গিস তো কবে বুড়ি হয়ে গেছে। ও হচ্ছে হেমামালিনী।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, তাই তো। এ মেয়েটিকেও দেখতে খুব সুন্দর। হ্যাঁ রে, ওর বিয়ে হয়ে গেছে?

একই পত্রিকা থেকে ছবি দেখার জন্য দুজনে খুব কাছাকাছি সরে এসেছে। এক সময় কাকাবাবু তাঁর মাথাটা অনীতার বুকের ওপর রাখলেন। তারপর বললেন, আমাদের বুড়ি কিন্তু এই মেয়েটার চেয়ে কম সুন্দর নয়!

বুড়ি অর্থাৎ অনীতা। অনীতা হেসে বলল, কম কেন, আমি ওর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। তাই না?

কাকাবাবু অনীতার গালে আর ঠোঁটে আঙুল বুলিয়ে বললেন, সুন্দরই তো। তোর মতন সুন্দর তো আমি আর একটাও দেখি না রে, বুড়ি!

কাকাবাবু একবার আড় চোখে তাকালেন দরজার দিকে। ঘরে ঢোকার সময় দরজা চেপে বন্ধ করে দিয়েছে অনীতা। যেমন সে রোজই দেয়। এই সময় অন্য কেউ হঠাৎ ঘরে ঢোকে না।

অনীতা কাকাবাবুর চুলে একটা হাত ডুবিয়ে দিল। কাকাবাবু একটা হাত অনীতার যৌবনময় উরুতে বোলাতে লাগলেন খুব আস্তে আস্তে। আর একটা হাত বেষ্টন করল অনীতার কোমর। ঠিক শিশুর মতন তিনি তাঁর মুখখানা চেপে রাখলেন অনীতার এক স্তনের ওপর। এক কালের জেলখাটা দেশসেবক যেন ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম চাইছেন। যেন বহুকালের অবরুদ্ধ কাতরতাকে মুক্তি দিয়ে বললেন, আঃ!

ব্যাস, এই পর্যন্ত। কাকাবাবু এর বেশি আর এগোননি কোনদিন। অসীম সংযম তাঁর। এই জন্যই কাকাবাবুকে এত ভাল লাগে অনীতার।

কাকাবাবু আস্তে আস্তে বললেন, তুই বিমলের কথা ভেবে দুঃখ করিস না। আমি যতদিন আছি, তোর কোন কষ্ট হবে না। আজকাল তো মেয়েদের দু'বার বিয়ে হয়। আমি একটা ছেলে দেখে তোর আবার বিয়ে দেব!

বিমলের জন্য দুঃখ করতে বয়েই গেছে অনীতার। হঠাৎ সে বুঝতে পারল, বিমলকে সে কোনদিনই ভালোবাসেনি। সে কাকাবাবুকেই ভালবাসে।

॥ চার ॥

দু'দিন ধরে রণুর আবার জ্বর ছেড়েছে। সে ঘুড়ি ওড়াতে ছাদে এসেছে। যখন হাওয়া থাকে সামনের দিকে, তখন এ ছাদ থেকে ঘুড়ি ওড়াবার বেশ অসুবিধে হয়। একটু পরেই সানুদাদের বাড়ির ছাদ, সেখানে মস্ত বড় এরিয়াল। একটু এদিক-ওদিক হলেই ঐ এরিয়ালে ঘুড়ি আটকে যায়। পুরোনো আমলের রেডিওর জন্য ছাদে ও রকম

এরিয়াল টাঙাবার দরকার হত। আজকালকার ট্রানজিস্টার রেডিওতে ও সব লাগে না। তবু সানুদাদের বাড়িতে এরিয়াল রয়ে গেছে। বোধহয় ওটা খুলে ফেলার কথাই কেউ ভাবে না।

খানিকটা দূরে রায়বাড়ির ছাদ থেকে তিন-চারজন ছেলে একসঙ্গে ঘুড়ি ওড়ায়। ও বাড়ির ঘুড়িগুলো ঠিক বাঘের মতন। অন্য ঘুড়ি দেখলেই এক লাফে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কুচ করে কেটে দিয়ে যায়। ওদের নিজস্ব মাঞ্জা। রণু ওদের ঘুড়ি দেখলেই পালাবার চেষ্টা করে।

সেদিন রণু দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল। এ পর্যন্ত কোনদিন সে যা পারেনি, সে রকম একটা জিনিস পেরে গেছে। একটা ঘুড়ি লটকেছে। একটা লাল রঙের ঘুড়ি কেটে আসছিল অনেক দূর থেকে, রণুর পেটকাটাটা তার কাছে যেতেই দুটোর সুতোয় জড়িয়ে গেল। এখন খুব সাবধানে টেনে নামাতে হবে। তাড়াতাড়ি করতে গেলে দুটোই একসঙ্গে ছিঁড়ে উড়ে যাবে। উত্তেজনায় রণুর বুক ধক ধক করছে। সে আস্তে আস্তে টেনে ঘুড়ি দুটোকে নামাচ্ছে। এই সময় তেড়ে এলো রায়বাড়ির একটা কালো চাঁদিয়াল। আকাশে অনেক উঁচুতে, যেখানে শকুনরা ওড়ে, সেইখানে বুঝি লুকিয়ে ছিল কালো চাঁদিয়ালটা, এবার হঠাৎ সাঁ করে নেমে এলো। একসঙ্গে রণুর ঘুড়ি আর লটকানো ঘুড়ি দুটোই কেটে দেবে। রায়বাড়ির ঘুড়ির কাছে নিস্তার নেই। তাড়াতাড়ি ওদের কাছ থেকে পালাবার জন্য রণু নিজের ঘুড়িকে গোঁত খাওয়াল, অমনি দুটোই আটকে গেল সানুদাদের বাড়ির এরিয়ালে।

রণুর কান্না পেয়ে গেল। এরিয়ালে এমন ভাবে দুটো ঘুড়ি জট পাকিয়েছে যে খোলবার আর উপায় নেই। সানুদাদের বাড়ির ছাদে কেউ থাকে না। একমাত্র উপায়, রণু যদি ও বাড়িতে চলে গিয়ে ঘুড়ি দুটো খুলে নিয়ে আসে। ওদের চিলেকোঠার ওপরে উঠলে এরিয়ালটায় হাত পাওয়া যায়। রণু জানে, এরিয়াল ছুঁলে কারেণ্ট মারে না। কিন্তু মা ও বাড়িতে যেতে বারণ করেছেন। মাকে না জানিয়ে যদি যাওয়া যায়? ও বাড়িতে ঢোকার অবশ্য কোন অসুবিধে নেই। বাড়ির দরজা সব সময় হাট করে খোলা থাকে—সিঁড়ি দিয়ে যে যখন খুশি ওপরে ওঠে। একদিন চারতলার ওপরে একটা ছিঁচকে

চোর ধরা পড়েছিল বিকেলবেলা। সে এমনিই ছাদের ওপর উঠে লুকিয়ে বসে ছিল। রণুকে ওরা চেনে, কেউ চোর ভাববে না।

লাটাইটা নামিয়ে রেখে রণু নিচে নেমে গেল। মা বাথরুমে গা ধুচ্ছেন। এই সুযোগ। পা টিপে টিপে রণু বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

সানুদাদের বাড়ির সিঁড়িটা অন্ধকার। দেয়াল ভেঙে ভেঙে পড়ছে। কেউ সারায় না। দোতলায় মান্তুরা থাকে। রণু মান্তুকে ডাকল না। তিনতলায় দারুণ ঝগড়া চলছে সানুদার দুই দাদার মধ্যে। সানুদার ঘরে তালা বন্ধ। দুটো তালা ঝুলছে। দুই দাদা ঐ দুটো তালা ঝুলিয়েছে। কয়েক দিন ধরে সানুদার পাত্তা নেই। তাই অন্য কোন ভাই যাতে আগে থেকে ঘরটা দখল করে না নিতে পারে, তাই দুজনেই আলাদা আলাদা তালা লাগিয়েছে। এই নিয়ে আবার ঝগড়া। সানুদা কয়েক দিন না ফিরলেই ওরা ধরে নেয় যে সানুদা মরে গেছে। যারা সব সময় বাড়ির বাইরে থাকে, রাতে বাড়ি ফেরে না, তারা বেঘোরেই মরে। সানুদা বাঁচুক বা মরুক তাতে অন্য ভাইদের কিছু যায় আসে না, সবাই চায় সানুদার ঘরটা। এর মধ্যে আবার সানুদার বড়দা এসে গম্ভীর ভাবে বললেন, যে-ই তালা লাগাক, সানু যদি আর না ফেরে, তাহলে ঐ ঘর হবে আমার। ব্যাস, ঝগড়া আরও জমে উঠল। এর ফাঁক দিয়ে রণু উঠে গেল ছাদে।

চিলেকোঠার ওপরে উঠবার কোন উপায় নেই। অন্য সময় রণু সানুদাদের ছাদে একটা বাঁশের মই দেখেছে, এখন সেটা নেই। কিন্তু এরিয়ালে এখনো ঘুড়ি দুটো টাটকা অবস্থায় ঝুলছে, সে দুটো না নিয়ে রণুকে চলে যেতে হবে? অসম্ভব!

জানালার শিক ধরে কোন রকমে রণু ওপরে উঠে গেল। ন্যাড়া ছাদ, তার ভয় করছে। এখন রাস্তা থেকেও দেখা যাচ্ছে তাকে। যদি দাদা বা বাবা কেউ দেখে ফেলে, তাহলেই সর্বনাশ। সবেমাত্র আজই ভাত খেয়েছে রণু। তার শরীর দুর্বল, এত উঁচুতে উঠে তার মাথা ঘুরছে। খুব সাবধানে রণু এরিয়ালটা ধরে নিচু করল। পটাং পটাং করে ছিঁড়ে নিল ঘুড়ি দুটো। নামবার সময় তাকে লাফিয়ে নামতে হল। ঘুড়ি দুটো ছেঁড়েনি। কিন্তু বাঁ পায়ের গোড়ালিতে খুব লেগেছে। তবু ঘুড়ি দুটো পাওয়ার আনন্দ এতই বেশি যে ব্যথাটা সে গ্রাহ্যই করল না।

নেমে আসার সময় দেখল যে ঝগড়াটা এখন খুব ঘোরালো হয়ে এসেছে। এর পরই মারামারি শুরু হয়ে যাবে। রণু পাশ কাটিয়ে সুড়ুত করে নিচে আসতে গেল, কিন্তু তাকে দেখে ফেলল রঞ্জু।

রঞ্জু চেঁচিয়ে উঠল, এই, আমাদের ছাদ থেকে ঘুড়ি নিয়ে পালাচ্ছিস যে?

রণু বলল, আমার ঘুড়ি, এ দুটোই আমার।

—কার হুকুমে ছাদে উঠেছিলি?

রণু পালাতে গিয়েও পারল না। রঞ্জু বাঘের মতন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। হাত থেকে ঘুড়ি দুটো কেড়ে নিয়ে মাথায় এক চাঁটি মেরে বলল, যা ভাগ!

রণু বলল, ওর মধ্যে একটা ঘুড়ি আমার। সত্যি আমার। বিশ্বাস কর।

—যা ভাগ এখনো, নইলে আরও মার খাবি!

রণুর চোখে জল এসে গেল। তার সাধের ঘুড়ি এতদূর এসেও ফস্কে গেল। সে দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কাঙালীর মতন।

কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারল না। ঝগড়ার দাপট ক্রমশ বাড়ছে। এমন সব কুৎসিত গালাগাল দিতে লাগল তারা যে লজ্জায় কান লাল হয়ে গেল রণুর। সে নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে।

এবার দেখা হল মান্তুর সঙ্গে। সে বলল, কী রে রণু, তুই কোথায় গিয়েছিলি? আয়, আমাদের ঘরে আয়।

রণু বলল, না। আমার সময় নেই।

মান্তু বলল, তুই আজকাল আর আমার সঙ্গে কথা বলিস না কেন রে?

রণু কোন উত্তর দিল না।

রাগে তার গা জ্বলছে। এ বাড়ির সঙ্গে সে আর কোন সম্পর্ক রাখবে না। একমাত্র সানুদা ছাড়া। তার যদি গায়ে খুব জোর থাকত তাহলে সে রঞ্জুর হাত ভেঙে দিত। রঞ্জু ঘুড়ি নিয়ে কী করবে? সে তো একমাত্র বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ছাড়া অন্য কোন দিন ঘুড়ি ওড়ায় না। সব সময় তো গুণ্ডামি করে বেড়াচ্ছে, সময় কোথায় ঘুড়ি ওড়াবার?

আবার রণু নিজের ছাদে উঠে এলো। চোখ ফেটে কান্না আসছে।

ঘুড়ি ওড়াবার ব্যাপারে এত দুঃখ সে আর কখনো পায়নি। জীবনে প্রথম একটা ঘুড়ি লটকে সেটাকেও হাতে পেল না! সানুদা থাকলে নিশ্চয়ই রণুকে ঘুড়ি দুটো দিয়ে দিতেন। সানুদা বড্ড ভাল। সানুদার গায়ের জোর রঞ্জুর চেয়ে অনেক বেশি। আহিরিটোলার হেবো গুণ্ডা এ পাড়ায় একদিন রুস্তমি করতে এসেছিল, সানুদা বিকেলবেলা রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে সেই হেবো গুণ্ডাকে এমন তিন রদ্দা মারলেন যে তার মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গেল!

সে একটা দৃশ্য বটে। হেবো গুণ্ডার চেহারা ঠিক গুণ্ডার মতন। কালো কুচকুচে গায়ের রং; তার মধ্যে পান খাওয়া ঠোঁট টকটকে লাল। একটা হলদে রঙের চাপা প্যাণ্টের সঙ্গে চেন দেওয়া নীল লাল ডোরা-কাটা গেঞ্জি। গলায় একটা রুমাল বাঁধা। পানের দোকান থেকে একটা সোডার বোতল নিয়ে ছুঁড়ে রাস্তায় ভাঙতেই সবাই ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। শুধু সানুদা খালি হাতে গটগট করে এগিয়ে গিয়ে হেবোর কলার চেপে ধরে বলেছিলেন, এ পাড়ায় মাস্তানি? যা ভাগ!

মার খাওয়া কুকুরের মতন পালাতে পালাতে হেবো গুণ্ডা চেঁচিয়ে বলেছিল, ঠিক আছে, এর বদলা নেব আমি। তোকে আমি দেখে নেব ছানু!

হা হা করে হেসে সানুদা বলেছিলেন, আরে যা যা, তোর মতন অনেক মাস্তান আমার দেখা আছে।

সানুদার সবই ভাল, কিন্তু কেন যে এত বেশি মদ খান! প্রায়ই রাত্তিরে বাড়ি ফেরেন না। কোথায় থাকেন রাত্তিরবেলা? সানুদা রাত্রে কোথায় যান, সে সম্পর্কে রণুর একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে। কিন্তু সে কথা ভাবলেই তার শরীর শিরশির করে।

সেদিন রাত্তিরে রণুর কাছে এতগুলো টাকা রেখে যাবার পর কয়েকদিন আর সানুদা খোঁজই নেননি। রণু ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকত। যদি টাকাগুলো কোনভাবে হারিয়ে যায় কিংবা চুরি হয়? তারপর একদিন রাত্তিবেলা সানুদা এলেন টাকাটা চাইতে।

রণু তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। সানুদা বেশ কয়েকবার ফিসফিস করে ডেকেছিলেন, তবু রণু জাগেনি। তখন সানুদা জানালার জালের ফুটো দিয়ে একটা ছোট্ট ইঁটের টুকরো ছুঁড়ে মেরেছিলেন ওর দিকে। সেটা এসে পড়েছিল রণুর ডান চোখের ওপর। রণু যন্ত্রণায় উঃ করে

চেঁচিয়ে উঠেছিল। ভাগ্যিস সেই চিৎকার বাবা-মা কেউ শুনতে পাননি। হঠাৎ ঘুম-ভাঙা আচ্ছন্ন অবস্থায় জানালার কাছে সানুদাকে দাঁড়ানো দেখে চিনতে পারেনি রণু। আবার বেশ জোর বলে উঠেছিল, কে?

সানুদা দারুণ লজ্জিত ভাবে বলেছিলেন। আহা রে. তোর লেগেছে ভাইটি? আহা রে, আমি বুঝতে পারিনি, ইস, আমার বড্ড দরকার, তাই এসেছি...

রণু তখন চিনতে পেরেছে সানুদাকে। কিন্তু টাকার কথাটা তার মনের মধ্যে নেই। যে-টাকার জন্য সে সব সময় চিন্তিত থাকত, ঠিক আসল সময়েই সে টাকাটার কথা ভুলে গেল। সে জানলার কাছে উঠে এসে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে সানুদা?

সানুদা বললেন, আমার সেই জিনিসটা—

রণু বলল, কোন জিনিস?

সানুদা একটু অবাক হলেন। ভুরু দুটো কুঁচকে গেল সামান্য। খুব আস্তে আস্তে বললেন, সেই যেটা তোর কাছে সেদিন রাখতে দিয়েছিলাম?

রণুর সঙ্গে সঙ্গে খামটার কথা মনে পড়ল। সে বলল, ওঃ! সেটা! এই তো!

রণু খামটা জানালা গলিয়ে দিতেই সানুদা একবারও খুলে দেখলেন না, পকেটে ভরে নিলেন। তখন রণুর মনে হল, টাকাটা নিশ্চয়ই গোনা ছিল না সানুদার। তাহলে ওর থেকে দশটা টাকা সরিয়ে নিলে সানুদা ধরতেও পারতেন না। কেন রণু নেয়নি! আর তখন আফশোস করে লাভ নেই।

সানুদা হঠাৎ তার মনে পড়ে গেছে এই ভাবে খামটা আবার পকেট থেকে বার করেছিলেন। এইবার বোধহয় গুনবেন। কিন্তু তা করলেন না। দুটো দশটাকার নোট বার করে বললেন, এই নে ভাইটি!

তখন কিন্তু রণু লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল, না। না।

—কেন রে। আমি দিচ্ছি, নিবি না?

—না সানুদা। আমি......আমি টাকা নিয়ে কী করব?

—তোর যা খুশি কিনবি।

—অন্য কারুর কাছ থেকে টাকা নিলে আমার মা বাবা রাগ করবেন।

—আরে আমি কি তোর পর? তুই তো আমার ছোট ভাইয়ের মতন।

—না, সানুদা থাক্.......

সানুদা থমকে গেলেন। জোর করলেন না আর। রণুর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, তুই কত ভাল ছেলে রে? হীরের টুকরো ছেলে। আচ্ছা, তোকে টাকা দেব না, তোকে একটা কিছু জিনিস কিনে দেব, নিবি তো—তখন কিন্তু না বলতে পারবি না! এখন চলি রে, একটা জরুরি কাজ আছে—

সেই যে সানুদা চলে গিয়েছিলেন তারপর থেকে তাঁকে আর রণু দেখেনি। সানুদা একটা জিনিস কিনে দেবে বলেছেন। কী জিনিস? ভেতরে ভেতরে রণু উত্তেজনা বোধ করে। উপহার পেতে কার না ভাল লাগে?

অন্ধকার হয়ে এসেছে, নিচের তলা থেকে মা ডাকছেন। এবার গিয়ে পড়তে বসতে হবে। রণু লাটাইতে সুতো গুটিয়ে নিল। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় সে দেখল, শান্তিময় কাকাদের দরজাটা খোলা। সেখানে যে নতুন ভদ্রলোক এসেছেন, তিনি শুয়ে শুয়ে একটা মোটা খাতায় কী সব যেন লিখছেন। রণু যতবার ওপরে এসেছে সে ঐ লোকটিকে সব সময় লিখতেই দেখেছে। কী লেখেন উনি এত? ভদ্রলোক এ বাড়ির কারুর সঙ্গে বেশি কথা বলেন না। এখানে একলা একলা থাকেন। একলা থাকতে কারুর ভাল লাগে?

ভদ্রলোক কোন দেশের গুপ্তচর নন তো! হয়তো এখানে লুকিয়ে থেকে গোপনে গোপনে সব রিপোর্ট লিখছেন। কিন্তু শান্তিময় কাকা কোন গুপ্তচরকে তাঁর ফ্ল্যাটে জায়গা দেবেন কেন? এমনও হতে পারে, শান্তিময় কাকা নিজেও ওর আসল পরিচয় জানেন না! রণুর দৃঢ় বিশ্বাস হল, ঐ নতুন লোকটি গুপ্তচরই। ওর চাউনিটাও যেন কেমন কেমন। চোখে চোখ পড়লেই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এ বাড়িতে একজন গুপ্তচর লুকিয়ে আছে, এ কথাটা ভেবেই রোমাঞ্চ হয় রণুর।

রণু ঠিক করল, এই লোকটার আসল রহস্য সে একদিন ঠিক

ধরে ফেলবে। গুপ্তচরের ওপর গুপ্তচরগিরি করবার জন্য সে ঘুরে গিয়ে চুপি চুপি দাঁড়াল জানালার পাশে। ঘরের ভেতরের সব কিছুর ওপর তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে নিল একবার। সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ে না। শুধু ঘরের মেঝেতে অনেকগুলো কাগজের টুকরো দলা পাকানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এতগুলো কাগজ ছড়ানোর মানে কী?

লোকটির গতিবিধির ওপর লক্ষ রাখতে হবে! রণু সরে এলো জানালার কাছ থেকে।

দোতলায় দেখা হল অনীতাদির সঙ্গে। সেজেগুজে কোথায় যেন বেরোচ্ছেন। দোতলার কেউ আর এখন রণুদের সঙ্গে কথা বলে না। একমাত্র অনীতাদি ছাড়া। অনীতাদি কী দারুণ সুন্দর। ঠিক সরস্বতী প্রতিমার মতন।

অনীতাদি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার জ্বর কমে গেছে, রণু?

রণু ঘাড় হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ।

—তুমি এত ভোগো কেন? প্রায়ই জ্বর হয়!

রণু লাজুকভাবে চুপ করে রইল।

অনীতাদি রণুর পাশে পাশে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন, গত শনিবার আমি তোমার ঘরে গিয়েছিলাম। সুতপার কাছ থেকে বই আনতে। তুমি তখন জ্বরে বেহুঁশ হয়ে ছিলে। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম, তুমি টেরও পেলে না।

রণু চমকে উঠল। সে একদিন স্বপ্ন দেখেছিল, অনীতাদি তার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। তাহলে সেটা কি স্বপ্ন নয়, সত্যি! আঃ, রণু কেন চোখ মেলে দেখেনি!

—আজও তো তোমার চোখ দুটো ছলছল করছে রণু। আবার জ্বর আসেনি তো?

—না না।

—দেখি। অনীতাদি রণুর কপালে হাতটা রাখলেন।

কী চমৎকার ঠাণ্ডা স্পর্শ। অনীতাদির গা থেকে দারুণ সুন্দর একটা গন্ধ বেরুচ্ছে। রণু আরামে চোখ বুজল। তার ইচ্ছে হল, সে এক্ষুনি একটা এক বছরের শিশু হয়ে যায়, আর অনীতাদির বুকে মুখ লুকোয়। কেন তার এমন ইচ্ছে হল, তা সে নিজে জানে না।

এ পৃথিবীতে রণু তার মায়ের পরেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসে অনীতাদিকে।

অনীতাদি আবার বললেন, রণু, তুমি বুঝি অনেক রাত জেগে পড়াশুনো কর?

রণু বলল, না তো।

—আমি যে প্রায়ই দেখি তোমার ঘরে আলো জ্বলে। রাত্তির একটা দুটো—

রণু একটু লাজুকভাবে হাসল, তারপর বলল, আপনিও বুঝি অত রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন? নইলে দেখলেন কী করে?

—হ্যাঁ, আমার ঘুম আসে না। আমি জেগেই থাকি। কিন্তু আমি তো তোমার মতন অত পড়াশুনো করি না! কিন্তু তুমি এখন অত রাত অবধি জেগো না রণু, লক্ষ্মীটি, এখন তো তোমার শরীর ভাল নয়।

অনীতাদি আবার রণুর কাঁধে হাত রাখলেন সস্নেহে।

রণুর সারা শরীর কেঁপে উঠল।

একতলায় পৌঁছে রণু চলে গেল নিজের ঘরে আর অনীতাদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর বাথরুমে হাত-মুখ ধুয়ে এসেও রণু অনেকক্ষণ অনীতাদির কথা ভাবল। অনীতাদি বড্ড ভাল, অথচ এই অনীতাদিকেও রতনদা শিবুদা পর্যন্ত মাঝে মাঝে বকাবকি করে।

রণুর যদি এক বছর বয়েস হত, তাহলে অনীতাদি নিশ্চয়ই তাকে বুকে তুলে নিয়ে আদর করতেন। রণুর এখন চোদ্দ বছর বয়েস। এখন যদি রণু হঠাৎ বলে ফেলে, অনীতাদি, আমাকে একটু বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করবেন? তা হলে কি খুব রাগ করবেন অনীতাদি? কথাটা ভেবেই লজ্জায় রণুর শরীরটা গরম হয়ে গেল।

রাত্তিরবেলা শুয়ে শুয়ে রণু ভাবছিল সানুদার কথা। সানুদার দাদারা কী অদ্ভুত। সানুদা ক'দিন ধরে বাড়ি ফেরে না, সে জন্য তার দাদারা কোথাও খোঁজ খবর নিচ্ছে না—শুধু এরই মধ্যে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে যে সানুদা না ফিরলে তার ঘরটা কে নেবে। মানুষ এ

রকম হয় কী করে? ওরা সবাই এক মায়ের পেটের ভাই। সানুদার বাবা বেঁচে থাকতে ও বাড়িতে কেউ কোনদিন টুঁ শব্দটিও করেনি। সানুদার মা মরে গেছেন অনেক আগে।

সানুদার বাবাকে রণু খুব ছোটবেলায় দেখেছে। ভাল করে মনে নেই। উনি ছিলেন একজন বেশ নামকরা উকিল। সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন খুব। যেমন রোজগার করতেন প্রচুর টাকা, তেমনি খরচও করতেন। পাড়ার দুর্গাপুজোর সময় সবচেয়ে বেশি চাঁদা দিতেন তিনি। আর সব ভলান্টিয়ারকে নাকি একটা করে নতুন জামা উপহার দিতেন।

সেই সানুদার বাবা একদিন ভাত খাওয়ার পর জলের গেলাসে চুমুক দিয়েই হঠাৎ হেঁচকি তুলে মরে গেলেন। অমনি সমস্ত সংসারটা ছত্রাখান হয়ে গেল। সানুদা তখনও স্কুলের ছাত্র। দাদারা সবাই টপাটপ বিয়ে করে আলাদা সংসার পেতে ফেলল। সানুদার দিকে কেউ নজর দিল না। সানুদা বখে গেল আস্তে আস্তে। পড়াশুনোই করল না আর।

এ পৃথিবীতে সানুদাকে আর কেউ ভালোবাসে না। অথচ সানুদারও চেহারা কত সুন্দর, ব্যবহারও কত ভাল। কেউ ভালবাসলেই সানুদা নিশ্চয় অন্য রকম মানুষ হয়ে যেত।

ঠিক সেই সময় আচম্বিতে সানুদার আবির্ভাব হল বাড়ির সামনে। সানুদা একদম বদ্ধ মাতাল অবস্থায় এসেছে। দমাদ্দম করে লাথি মারছে নিজেদের বাড়ির দরজায়। ও বাড়ির দরজা আজ ভেতর থেকে তালাবন্ধ।

জড়িত গলার সানুদা বাড়ির চাকরের নাম ধরে চ্যাঁচাচ্ছে, কেষ্টা, এই শুয়োরের বাচ্চা কেষ্টা, দরজা খোল!

দু'দিন ধরে অল্প অল্প শীত পড়েছে। পাড়াটা এর মধ্যেই নিঝুম হয়ে পড়েছে। সবাই ঘুমোতে গেছে তাড়াতাড়ি। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে সানুদার চিৎকারে সারা পাড়া গমগম করে ওঠে। এ পাড়ায় শুধু এই একটি বাড়িতেই রাত দুপুরে চ্যাঁচামেচি হয়।

একটু পরে ওপর থেকে সানুদার বড়দা বললেন, না, দরজা খোলা হবে না। যেখান থেকে এসেছিস সেখানে যা। মাঝরাত্তিরে এসে বেলেল্লাপনা! এটা ভদ্দরলোকের বাড়ি!

সানুদা বলল, এঃ। ভদ্দরলোক! কে কত ভদ্দরলোক আমার

জানা আছে! দরজা খুলবে না মানে, আলবৎ খুলবে! কেষ্টো...এই হারামজাদা কেষ্টো...

—না, কেষ্টো খুলবে না, দরজায় তালা—

—কার হুকুমে তালা দিয়েছে, অ্যাঁ?

—আমার হুকুমে।

—তুমি হুকুম দেবার কে? এটা তোমার একলার বাপের বাড়ি? এটা আমারও বাপের বাড়ি।

—দূর হয়ে যা হতভাগা। এত রাত্রে এখানে মাতলামি করতে এসেছিস!

—বেশ করেছি। কারুর বাপের টাকায় খাইনি। নিজের টাকায় মাল খেয়েছি। কেষ্টো—

—দরজা খোলা হবে না, যেখানে অ্যাদ্দিন ছিলি সেখানেই যা, হারামজাদা!

—কে আমায় হারামজাদা বললে? কে? তোমরা হারামজাদা নও? আমি একলা? শিগগির দরজা খোল বলছি!

—না! এ বাড়িতে তোর আর জায়গা হবে না।

—এঃ! জায়গা হবে না! আমার ভাগের ঘর তোমরা দখল করে নেবে? মামদোবাজি!

আবার দরজায় দড়াম দড়াম লাথি।

এবার ওপর থেকে রঞ্জু বলল, সানুকাকা, এত রাতে ঝামেলা কর না। কেটে পড়।

—তুই আবার কে রে? কোন্ হারামির বাচ্চা আমাকে কেটে পড়তে বলছে? আমার নিজের বাড়ি—

মুখ খারাপ করো না বলছি সানুকাকা। তাহলে একদম মুখ ভেঙে দেব।

—কোন্ বাপের ব্যাটা আমার মুখ ভাঙবে! দেখি, আয়। দরজা খোল্।

—না, দরজা খোলা হবে না!

—দরজা ভেঙে ফেলব শালা!

দড়াম দড়াম করে দরজায় এবার খুব জোরে লাথি পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকেও ছচ্ছড় করে কিছু পড়ার আওয়াজ হল, বোধহয় এক বালতি জল ঢেলে দিয়েছে রঞ্জু।

সানুদা অমনি চেঁচিয়ে উঠল, ওরে বাবা রে, মেরে ফেলল রে !

রঞ্জু বলল, আর টেঁটিয়াবাজি করবে ?

সানুদা খানিকক্ষণ মুখ দিয়ে কাতর শব্দ করল, উঃ উঃ ! তারপর খানিকটা সামলে নিয়ে রঞ্জুর উদ্দেশে বলল, দাঁড়া, তোকে একবার হাতের কাছে পাই ! তোর বাপের নাম যদি ভুলিয়ে না দিই আমি——

আবার ওপর থেকে ছচ্ছড় করে গরম জল পড়ার আওয়াজ।

পাড়ার অন্য কোন বাড়ির জানালা খুলে হঠাৎ কেউ বলল, এত রাতে এটা কী হচ্ছে ! আমরা কি ঘুমোতে পারব না ? পুলিসে খবর দেব ?

সানুদা বলল, দাও না, দেখি কত বড় মুরোদ। আসুক, দেখি কোন্ পুলিসের বাচ্চা আমাকে কী করে। আমি নিজের বাড়িতে ঢুকতে পারব না ?

আরও কিছুক্ষণ চেঁচামেচি চলল। কিন্তু দরজা খোলা হল না সানুদাকে। তারপর সানুদা বলল, ঠিক আছে, আমি কাল সকালে আসব। দেখে নেব সব শালাদের ! এ কি বাবা মগের মুল্লুক ! আমাকে আমার বাড়ি ঢুকতে দেবে না ! নিজের বাড়িতে আমি যখন খুশি, যেদিন খুশি আসব, কার বাবার কী ? অ্যাঁ ? কার বাবার কী ? দেখাব এসে কাল সকালে। এখন যাচ্ছি। আমার কি শোবার জায়গার অভাব ? কত বাড়ির দরজা খোলা আছে আমার জন্য ! আদর করে ডেকে নেবে !

রণু ঘর অন্ধকার করে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। তার কষ্ট হচ্ছিল ভীষণ। এত সব খারাপ খারাপ কথা শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। সানুদা তার নিজের দাদাদের এমন বিশ্রী ভাষায় গালাগাল দিতে পারে ? আজ পাড়ার সকলেই সানুদাকেই দোষ দেবে। সানুদাই চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করেছে। সানুদা দিন দিন এখন এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন ? তবু, রণুর মনে হল, সানুদাকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া উচিত ছিল। এত রাতে সানুদা অসুস্থ শরীর নিয়ে কোথায় থাকবে ?

রাস্তায় সানুদার পায়ের চটি ঘসটানোর আওয়াজ পাওয়া গেল। সানুদা চলে যাচ্ছে।

মিনিট দশেক বাদেই রণুর ঘরের জানালায় এসে ফিসফিস করে ডাকল সানুদা—রণু ! ভাইটি ঘুমিয়েছিস ?

রণু ধড়মড় করে উঠে পড়ে আলো জ্বালল। সানুদার মাথার চুল উস্কোখুস্কো, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। ভাল করে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। দেয়াল ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে যেন হাঁপাচ্ছে। রণুর ভয় হল, এক্ষুনি বুঝি সানুদা রাস্তায় পড়ে যাবে! একবার তার ইচ্ছে হল সদর দরজা খুলে সানুদাকে ভেতরে নিয়ে আসে। কিন্তু বাবা-মা আর রক্ষে রাখবেন না।

সানুদা বলল, তুই উঠে পড়লি আমার ডাক শুনে? কেন, মট্‌কা মেরে পড়ে থাকতে তো পারতিস! এমন ভান করতিস, যেন শুনতেই পাচ্ছিস না কিছু। তা না করে তুই উঠে পড়লি কেন ভাইটি? আমি তোর কে? আমি তো একটা বাজে লোক?

রণু তার কিশোর বয়েসের অবাক ডাগর চোখ মেলে তাকিয়ে রইল সানুদার দিকে। কোন কথা বলল না।

—তুই কেমন আছিস ভাইটি? তোর আর জ্বর হয়নি তো?

—না, সানুদা।

—তুই ছাড়া আমাকে আর কেউ ভালোবাসে না রণু! কেউ না। তুই কেন এত ভাল রে? আমি তো বাজে! যা-তা। এক গেলাস জল দিতে পারিস?

রণুর খালি ভয় হচ্ছে, পাশের ঘর থেকে তার দাদা না কিছু শুনতে পায়। তা হলেই দাদা রাগারাগি করবে। এত রাত্রে একজন মাতালের সঙ্গে রণুর কথা বলা কেউ পছন্দ করবে না। কিন্তু কেউ জল চাইলে কি না বলা যায়?

রণুর ঘরে ছোট কুঁজোয় জল থাকে। সে এক গ্লাস জল গড়িয়ে আনল। জানালার তারের জালের ফুটোটা এখন এত বড় হয়ে গেছে যে গেলাসটা একটু কাত করে অনায়াসে গলিয়ে দেওয়া যায়। রণু গেলাসটা বাড়িয়ে দিল।

সানুদা জলটা নিয়ে চোখে মুখে ছেটাল ভাল করে। তারপর বলল, আর এক গেলাস।

দ্বিতীয় গেলাস জল নিয়ে সানুদা এমনভাবে খেল যেন বহুকালের একজন তৃষ্ণার্ত মানুষ। তারপর গেলাসটা ফেরত দিয়ে সানুদা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। গুঙিয়ে গুঙিয়ে বলতে লাগল, আমায় কেউ ভালবাসে না রে রণু! শুধু তুই! তুই কেন এত ভাল রে? বাঙালরা

বড্ড ভাল হয়। আমি কত খারাপ....আমি তোর জন্য একটা জিনিস আনব বলেছিলাম...আমি নিমকহারাম, সে কথা ভুলে গেছি....রণু, আমি এত খারাপ কেন হলাম রে?

কান্নার চোটে নাকে সর্দি এসে গেল। সানুদা রুমাল বার করে নাক আর চোখ মুছল। আঙুলগুলো চিরুনির মত চালিয়ে দিয়ে চুলগুলো ঠিক করল একটু। এত অত্যাচার করলেও সানুদাকে এখনো রাজপুত্রের মত দেখায়।

সানুদা বলল, আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে। ওরা আমায় বাড়িতে ঢুকতে দিল না। এটা কি উচিত হল? তুই বল? আমার নিজের ঘর—

—তুমি এতদিন কোথায় ছিলে, সানুদা?

—জাহান্নমে। কিন্তু জানিস তো, পয়সা না থাকলে জাহান্নমেও জায়গা হয় না। আজকাল শালা দুনিয়াটা এই রকম। কিন্তু আজ আমি আবার টাকা পেয়েছি। আজ ভেবেছিলাম নিজের বাড়িতে শুয়ে ঘুমোব...

রণু ভয় পাচ্ছে। কথার নেশায় পেয়ে বসেছে সানুদাকে। দাদা কিংবা বাবা জেগে উঠতে পারেন আওয়াজ শুনে। অথচ সে কী করে সানুদাকে চুপ করাবে?

—রণু, ওরা আমার মাথায় গরম জল ঢেলে দিয়েছে। আমার মাথায় ফোস্কা পড়ে গেছে। তোর কাছে ডেটল আছে?

—আমার কাছে তো নেই। ও হ্যাঁ, একটু দাঁড়ান—

রণুর মনে পড়ে গেছে। দাদা দাড়ি কামায়। তারপর গালে ডেটল মাখে। বাথরুমে রয়েছে সেই শিশিটা। রণু খুব সাবধানে দরজা খুলে বাইরে বেরুল। পা টিপে টিপে বাথরুম থেকে নিয়ে এলো ডেটলের শিশিটা। তারপর জানালা গলিয়ে সেটা বাড়িয়ে দিল সানুদাকে।

কিন্তু কোন লাভ হল না। সানুদা শিশিটার ছিপি খুলতে গিয়ে সব শুদ্ধ ফেলে দিল হাত থেকে। রাস্তায় পড়েই শিশিটা ভেঙে গেল। সানুদা আবার কেঁদে ফেলে বলল, দেখলি তো, আমার ভাগ্যে নেই। তুই আর কী করবি।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সানুদা বলল, চলি। তোর কাছে কেন যেন এলাম? ও হ্যাঁ, আমার একটু উপকার করবি ভাইটি,

আমার দুটো একটা জিনিস রাখবি তোর কাছে? দুনিয়ায় তোকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করি না আমি। রাখবি?

—কী রাখব সানুদা?

—আজ শনিবার রেস ছিল তো? সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা জিতেছি আজ। জ্যাকপট মেরেছি, বুঝলি? এর মধ্যেই সাতশো টাকা খরচ হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম বাড়িতে গিয়ে এখন ঘুমোব। দরজাই খুলল না। দেখি কাল সকালে এসে, কেমন দরজা বন্ধ করে রাখে। আমিও পুলিস নিয়ে আসব। আমিও বাপের ব্যাটা। এখন যদি সব টাকাগুলো সঙ্গে নিয়ে যাই, তাহলে সব উড়ে যাবে। ওরা নিয়ে নেবে, ছাড়বে না।

—কারা নিয়ে নেবে?

—সে তুই বুঝবি না। তোর বুঝেও দরকার নেই। তুই ভাল হয়ে থাক। আজ যদি এই টাকাগুলো আমি না জিততাম তাহলে একদম খতম হয়ে যেতাম। আর একটাও টাকা ছিল না! তুই রাখবি এগুলো ভাইটি? আমি কাল এসে নেবো। ঠিক কাল সকালবেলা আসব। রাখতে পারবি, ভাইটি? আমার জন্য এইটুকুনি করবি?

রণু ঘাড় হেলাল।

আজ আর খাম নেই। তাড়া তাড়া নোট সানুদা গলিয়ে দিল জানালা দিয়ে। দোমড়ানো মোচড়ানো সব একশো টাকার নোট। টাকাগুলো দেবার পর চলে যাবার চেষ্টা করে সানুদা শরীরটাকে কয়েকবার দোলাল, তারপর কী যেন মনে পড়ল আবার।

সানুদার গায়ে একটা পুরনো আমলের দামী শাল। সেটা গা থেকে খুলে বলল, এটাকেও রাখ। এটা নিয়ে গেলে আজ আমি নির্ঘাত হারাব। হাঁটতে পারছি না, দেখছিস না? রণু, তুই যেন কোনদিন মাল খাসনি। বড় পাজি জিনিস। চলি, অ্যাঁ? বড্ড উপকার করলি রে ভাইটি। আমার এখন বড্ড টাকার দরকার, যদি এ টাকাগুলো হারাতাম, তাহলে সব কেলো হয়ে যেত। তুই আমার যা উপকার করলি—

তারপর দেওয়াল ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সানুদা একটা বড় নিশ্বাস নিল। গলার স্বর বদলে গেল। মাতালদের মাথায় এক এক সময় বিশেষ রকম প্রজ্ঞা এসে ভর করে। সেই রকম কিছু একটা

পেয়েই যেন সানুদা বলল, জানিস রণু, যারা গরীব দুঃখীদের দয়া করে, ভগবান তাদের ভালবাসে। আমি ভীষণ গরীব আর ভীষণ দুঃখী, তবু তুই যে আমাকে ঘেন্না করিস না....সে জন্য তোকে···কী বলব, তোরাও গরীব, আমি জানি....কিন্তু কিছু গরীব হয় হ্যাংলা আর ভীতু, আর কিছু গরীবের, আমি জানি, জানি রে, সব জানি, কিছু গরীবের থাকে আত্মসম্মান। যাদের আত্মসম্মান থাকে, তারাই হচ্ছে আসল বাপের ব্যাটা, তারা সব শালা বড়লোকদের চেয়েও ঢের বড়। তুই একদিন সে রকম....আমি জানি···ওহ্···আবার চোখে জল আসছিল, সানুদা আর দাঁড়াল না। হঠাৎ একেবারে সুস্থ লোকের মতন সোজা হয়ে চলে গেল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে শোনা গেল তার জুতোর শব্দ...।

সানুর বুকটা ব্যথা ব্যথা করতে লাগল। সানুদাকে এত বেশি কথা বলতে সে কখনো শোনেনি। তা ছাড়া একটু আগে যে লোক অত বিশ্রী ভাষায় নিজের দাদার সঙ্গে গালাগালি দিয়ে কথা বলছিল, সেই মানুষটাই এখানে এসে একেবারে অন্য রকম ভাবে কথা বলতে আরম্ভ করল কী করে? মানুষ কি অমন ভাবে বদলাতে পারে? নাকি একটা মানুষের মধ্যেই দুটো মানুষ থাকে? বাবা একদিন বলেছিলেন, মৃত্যুর ঠিক আগে মানুষ একদম বদলে যায়। তখন সম্পূর্ণ অন্য রকম কথাবার্তা বলে।

হঠাৎ এ কথাটা মনে হল কেন রণুর? সানুদার কি আজ রাত্রেই কিছু হবে? এত রাতে রাস্তায় কত গুণ্ডা বদমাশ থাকে····না, না! রণুর শরীরটা কেঁপে উঠল একবার।

রণুর খাটের নিচে একটা লোহার ট্রাঙ্ক আছে। তাতে রাজ্যের অকেজো জিনিস জমা থাকে। খুব সাবধানে রণু ট্রাঙ্কটা টেনে বার করল। এটা সহজে কেউ দেখে না। এর মধ্যে শালটা রেখে দিলে কারুর চোখে পড়বে না।

টাকাগুলোও এর মধ্যে রাখা যায়। সানুদা যখন গোনেননি তখন তো আর গোনবার দরকার নেই। তবু টাকা একটু বেশিক্ষণ ধরে ছুঁয়ে দেখতেও ভাল লাগে।

রণু মাটিতে পা ছড়িয়ে টাকাগুলো গুনতে বসল। মাঝে মাঝে কিছু টাকা এদিক ওদিক উড়ে যাচ্ছে, রণু আবার খপ করে ধরছে। একটাকেও পালাতে দেবে না।

টাকাগুলোকে মনে হয় এমনিই কাগজের টুকরো। তাছাড়া তো আর কিছুই না। তবু এই টাকার জন্যই যে পৃথিবী ওলোট-পালোট হয়ে যায়, রণু তা বুঝতে শিখেছে। টাকার জন্য বাবা মায়ের মধ্যেও ঝগড়া হয়।

তিনবার গুনে রণু দেখল সবশুদ্ধ চার হাজার দুশো পঁচিশ টাকা রয়েছে। সানুদা বলেছিল, আজই সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা জিতেছে। এর মধ্যে এত টাকা খরচ হয়ে গেল? একদিন--তাও পুরো একদিন নয়, সন্ধে থেকে রাত বারোটার মধ্যে সানুদা এক হাজার টাকারও বেশি খরচ করে ফেলল! অথচ এই টাকা সারা মাস পরিশ্রম করেও রণুর বাবা রোজগার করতে পারে না। মাত্র পনেরো টাকার জন্য রণু একটা ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেট কিনতে পারেনি। পৃথিবীটা এমন অদ্ভুত জায়গা!

সানুদা পকেট থেকে এমন ভাবে দলা মোচা করে টাকাগুলো বার করছিল যে দু-একটা রাস্তায় পড়ে যেতে পারে। যদি একশো টাকার নোট পড়ে যায়, তাহলেই তো সর্বনাশ। রণু জানালার বাইরে উঁকি মেরে দেখল। ঠিক বোঝা যায় না। মনে হয় যেন সাদা সাদা কিছু পড়ে আছে ভাঙা শিশিটার পাশে। এক্ষুনি একবার বাইরে গিয়ে দেখে আসা উচিত। কিন্তু সদর দরজাটায় বিরাট লোহার খিল আর ওপরে ছিটকিনি। খুলতে গেলে শব্দ হবেই। দরজা খুলতে গেলে সে ঠিক ধরা পড়ে যাবে। অথচ সত্যিই যদি রাস্তায় টাকা পড়ে থাকে···সানুদা বলল সাতশো টাকা খরচ হয়েছে...তা হলে বাকি টাকা...সানুদা গুনে দিয়ে গেল না, কিন্তু আগের বার যদিও গুনে ফেরত নেয়নি, কিন্তু এবার যদি—

সেই টাকার স্তূপের সামনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল রণু। এতগুলো টাকা দিয়ে কত কিছু করা যায়। অথচ এই টাকার কোন দামই নেই তার কাছে। টাকাগুলো সব গুছিয়ে তুলে লোহার ট্রাঙ্কে রাখার পর অকারণেই যেন খুব মন খারাপ হয়ে গেল রণুর।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রণু শুয়ে পড়ল।

যথারীতি পরের দিন সকালে সানুদা এলো না। তার পরের দিনও না। মঙ্গলবার দিন বিকেল বেলা স্কুল থেকে ফিরছে রণু তখন পাড়ার মোড়ে একটা রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতে পেল। আহিরিটোলার হেবো গুণ্ডার সঙ্গে দারুণ মারামারি করেছে সানুদা। কোন্ একটা মেয়ের

জন্যে নাকি ঝগড়া হয়েছিল। সানুদা ওকে এমন মেরেছে যে একদিন পর হাসপাতালে মরে গেছে হেবো। সানুদা কোথায় উধাও হয়ে গেছে তারপর। পুলিশ খুঁজছে সানুদাকে, ধরতে পারলেই ফাঁসি দেবে।

॥ পাঁচ ॥

আপনি চা খাবেন ?

নীলাঞ্জন একটু চমকে উঠে খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে, ষোল সতেরো বছর বয়স হবে। ফ্রক পরা, কিন্তু মেয়েটির স্বাস্থ্য এমন ভাল যে এখন ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরলেই তাকে মানায়। রমেনবাবুর ছোট মেয়ে নিশ্চয়ই।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি চা খাবেন ?

নীলাঞ্জন বলল, চা ? না—মানে—আমার তো চা খাওয়া হয়ে গেছে।

—আর খাবেন না ?

—হ্যাঁ, তা খেতে পারি।

—এখানে এনে দেব, না আমাদের ফ্ল্যাটে আসবেন ? বাবা আপনাকে বলতে বললেন, আপনি যদি চা খেতে চান, তাহলে আমাদের ফ্ল্যাটে আসতে। বাবা এখন চা খাচ্ছেন।

মেয়েটিকে দেখার পর থেকেই নীলাঞ্জন খুব অস্বস্তি বোধ করছিল। তার পাজামার দড়ি আলগা। এই ফ্ল্যাটে সে একলা থাকে, কেউ তাকে দেখতে আসে না। সে একটু এলোমেলো অবস্থায় থাকলেও ক্ষতি নেই। মেয়েটিকে দেখেই সে তার কোমরের কাছে খবরের কাগজ চাপা দিয়েছে। এখন উঠে দাঁড়াতে গেলে তাকে পাজামার দড়ি বাঁধতে হবে। মেয়েটির সামনে তা কেমন করে হয় !

—আচ্ছা আমি যাচ্ছি, এই দু' মিনিটের মধ্যে—

এ কথা শোনার পরেও মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকে এলো। তারপর বলল, শান্তিময় কাকার মেয়ে শম্পা, ওকে আপনি চেনেন ?

নীলাঞ্জন বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চিনি। একদম ছোটবেলা থেকে ওকে চিনি।

মেয়েটি বলল, শম্পা আমার বন্ধু। ওরা কবে আসবে?

—ঠিক নেই, বোধহয় আরও মাস দুয়েক দেরি হবে।

—আচ্ছা, শম্পা বইয়ের আলমারিতে কি তালা দিয়ে গেছে?

— বোধহয়, মানে—আমি ঠিক জানি না।

—একটু দেখব?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই মেয়েটি চলে গেল পাশের ঘরে। তক্ষুনি নীলাঞ্জন খবরের কাগজটা সরিয়ে পাজামার দড়িটা বেঁধে ফেলল। গত রাত্রে ছেড়ে রাখা হাওয়াই শার্টটা সে ফেলে রেখেছিল টেবিলের ওপরে। সেটা গায়ে জড়িয়ে নিল চট করে। মেয়েদের সামনে খালি গায়ে থাকতে চায় না সে।

সকাল সাড়ে আটটা বাজে। নীলাঞ্জন উদ্যোগ করছিল বাথরুমে যাবার।

মেয়েটি ফিরে এসে বলল, হ্যাঁ, তালা দেওয়া। শম্পা আমার দুটো গানের খাতা নিয়েছিল, ফেরত দিয়ে যেতে ভুলে গেছে। আপনার কাছে চাবি নেই?

—আছে কয়েকটা চাবি। কিন্তু বইয়ের আলমারির চাবি কিনা জানি না।

—ঠিক আছে, পরে এসে দেখব। চলুন, চা খাবেন তো চলুন।

—তোমার নাম কী ভাই?

মেয়েটি ফিক করে হেসে বলল, আমার নামও শম্পা। এমন মুশকিল জানেন তো, সামনাসামনি দুটো ফ্ল্যাটে আমরা দুজনেই শম্পা। আবার দুজনেরই প্রায় এক বয়েস। ওরা অবশ্য চৌধুরী আমরা মুখার্জি। আমার ডাক নাম টুলটুল। আর ওর ডাক নাম—

—বুবু!

—হ্যাঁ। তাই আমাদের সবাই ডাকনামেই ডাকে। আপনিও আমায় টুলটুল বলেই ডাকবেন। চলুন চলুন চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে!

রমেনবাবুদের বসবার ঘরটা নানান্ জিনিসপত্রে বোঝাই। শোফা-সেট, টুল, মোড়া, টি-ভি, রেডিও, বইয়ের আলমারি। তার মধ্যে আবার পুরোনো আমলের একটা বিরাট আরামকেদারা। তার ওপর পা ছড়িয়ে বসে লম্বা করে খবরের কাগজ মেলে পড়ছেন রমেনবাবু।

নীলাঞ্জনকে দেখেই বললেন, আসুন আসুন। সকালবেলা চা খাওয়ার জন্য কি দোকানে যাওয়া পশায়! আমি ভাবলাম সেই

কথাটা। এবার থেকে রোজ আমার এখানে এসে চা খাবেন।

নীলাঞ্জন বলল, না, আমাকে দোকানে যেতে হয় না। আমি নিজেই চা তৈরি করার ব্যবস্থা করে নিয়েছি।

—তবুও, সকালবেলার চা একা একা খেতে ভাল লাগে? আরে মশাই, সোজা কথা বলতে কি, নিজের হাতের তৈরি চা কক্ষনো ভাল হয় না। সকালবেলা আরাম করে বসে থাকব, কেউ এসে হাতে গরম চায়ের কাপ তুলে দেবে—

রমেনবাবুর স্ত্রীকে দেখে নীলাঞ্জন বিস্মিত হয়ে গেল। ভদ্রমহিলার বয়েস অন্তত বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ হতে বাধ্য। কারণ আগের দিন কথায় কথায় রমেনবাবু বলেছিলেন তাঁর ছেলে শিবপুরে হস্টেলে থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। তাঁর বড় মেয়ে শিখার বয়েস পঁচিশ ছাব্বিশ হবেই। অথচ রমেনবাবুর স্ত্রীকে দেখলে মনে হয় শিখার বয়েসী। পাশাপাশি দাঁড়ালে কেউ বিশ্বাস করবে না, ওরা মা আর মেয়ে। শিখার মায়ের নাম সুজাতা।

এমনও হতে পারে উনি শিখার মা নন। উনি হয়তো রমেনবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।

তিনি নীলাঞ্জনকে নমস্কার করে একটা চেয়ারে বসে প্রথমেই বললেন, আপনি একজন লেখক?

নীলাঞ্জন লজ্জা পেয়ে গেল। মেয়েদের কাছে লেখক মানেই তো যার অনেক বই, যার দু-একখানা বই বাংলা সিনেমা হয়েছে তেমন একজন মানুষ। কিন্তু নীলাঞ্জনের একটাও বই বেরোয়নি।

সে মুখ নিচু করে বলল, না না। লেখক ঠিক নই, মাঝে মাঝে একটু আধটু—

সুজাতা বললেন, এই তো এ মাসের একটা সিনেমা পত্রিকায় আপনার একটা গল্প বেরিয়েছে। আমি তো জানতুম না। শিখাই আমাকে বললে, মা দেখ, আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে যে ভদ্রলোক নতুন এসেছেন, এটা তাঁর লেখা।

নীলাঞ্জনের বুকটা ধক করে উঠল। যে সিনেমা পত্রিকার নাম উনি করলেন, সেখানে নীলাঞ্জন এক বছর আগে একটা গল্প পাঠিয়েছিল ঠিকই। ছাপা হবে কিনা সে জানত না, তাহলে সেটা শেষ পর্যন্ত ছাপা হয়েছে! সে দেখেনি তো এখনো! পত্রিকাটা দেখবার জন্য তার মন আকুলি বিকুলি করতে লাগল।

রমেনবাবু বললেন, তাই নাকি, আপনি লেখেন বুঝি! বলেননি তো কিছু!

নীলাঞ্জন মাথা নিচু করে উত্তর দিল, সে রকম কিছু বলবার মতন নয়। এই টুকটাক; একটু আধটু!

চা নিয়ে এলো শিখা। রমেনবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন। সিঁড়িতে যাওয়া-আসার পথে এই মেয়েটিকে নীলাঞ্জন দেখেছে কয়েক-বার। কথা হয়নি, কিন্তু চেনা হয়ে গেছে। শিখা কী করে তার নাম জানল, তার কী করেই বা বুঝল যে ঐ পত্রিকার গল্পটা তারই লেখা? মেয়েদের আশ্চর্য ক্ষমতা থাকে!

শিখা বলল, আপনার গল্পটা আমার বেশ ভাল লেগেছে।

নীলাঞ্জন কৃতজ্ঞ হয়ে গেল শিখার কাছে। তার গল্পের প্রথম পাঠিকা। এখন শিখা চাইলে তার জন্য নীলাঞ্জন নিজের বুকের রক্তও বার করে দিতে পারে।

সুজাতা বললেন, আপনি বুঝি নিজের বাড়ি-ঘর ছেড়ে এখানে একা একা থাকতে এসেছেন লেখবার জন্য?

নীলাঞ্জন হেসে বলল, না, আমি এসেছি শান্তিময়দার ফ্ল্যাট পাহারা দিতে।

—ভালই হল, একজন লেখককে আমরা চাক্ষুষ দেখলাম। এক সময় আমার বাপের বাড়ির কাছেই একটা বাড়িতে আসতেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—তখন তাঁকে দেখেছি। ওঁর অবশ্য অনেক বয়েস। সেই একজন লেখককে দেখেছি আর আপনাকে দেখলাম।

তারাশঙ্করের সঙ্গে যে-কোন সূত্রে তার নাম জড়িয়ে দেওয়ায় নীলাঞ্জন খুব লজ্জা পেল, আবার খুশিও হল। আজ সকালবেলাটা ভারি চমৎকার।

—আপনাকে আমরা অনেক প্লট দিতে পারি! আপনি আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখবেন? তাহলে আপনাকে আমি একদিন সব বলব। আপনি যে সুখের পাখি নামে গল্পটা লিখেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি ইয়ে, মানে যাকে বলে রোমাঞ্চকর।

রমেনবাবু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার জীবনের আবার কী গল্প আছে! যা তা একটা কিছু লিখলেই লোকে পড়বে নাকি?

সুজাতা স্বামীর প্রতি ভ্রূ-ভঙ্গি করে বললেন, আছে, আমার জীবনেও অনেক কিছু আছে। সব তুমি জানো নাকি?

শিখা বলল, মা, আজকালকার লেখকরা শুনে শুনে গল্প লেখেন না। তাঁরা নিজেরা যা দেখেন, নিজেদের যা কিছু অভিজ্ঞতা—

সুজাতা বললেন, তুই দেখছি লেখকদের সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে গেছিস।

রমেনবাবু সরু চোখে নীলাঞ্জনের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। তাঁর হাসিটা যেন রহস্যময়। নীলাঞ্জন ঠিক মানে বুঝতে পারল না। তার বারবার মনে পড়ে, প্রথম আলাপে রমেনবাবু বলেছিলেন, ব্যাচেলারদের একা ফ্ল্যাটে কেউ থাকতে দেয় না। রমেনবাবু কি তাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন সেদিন?

চা খাবার পর একটা অজুহাত দেখিয়ে উঠে পড়ল নীলাঞ্জন। নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এসে তার মনটা দারুণ খুশি খুশি লাগল! একটা বড় কাগজে তার গল্প ছাপা হয়েছে। একটা মেয়ে প্রশংসা করেছে সেই গল্পের। পত্রিকার সম্পাদককে যদি শিখা একটা চিঠি লিখত।

আজ আর লেখায় মন বসল না নীলাঞ্জনের। সেই পত্রিকাটা দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে খুব। ছাপার অক্ষরে নিজের লেখা দেখার মধ্যে একটা দারুণ রোমাঞ্চ আছে। পত্রিকার একটা কপি নিশ্চয়ই দিয়ে গেছে তার নিজের বাড়িতে। আর একটা কপি আজই সে দোকান থেকে কিনে নেবে।

রমেনবাবুরা চমৎকার লোক। সবাই খুব ফ্রী, কথাবার্তায় কোন রকম আড়ষ্টতা নেই। সুজাতা কি রমেনবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। কিন্তু শিখা তো ওকেই মা বলে ডাকল, ভদ্রমহিলা সত্যিই যৌবনকে চমৎকার ধরে রেখেছেন। রমেনবাবু রীতিমত বুড়ো হয়ে গেছেন এর মধ্যে।

আর একটা কথা মনে পড়ল নীলাঞ্জনের। সেদিন গভীর রাতে ছাদে দাঁড়িয়ে কাকে সে কাঁদতে দেখেছিল? শিখা? কিংবা টুলটুল? অল্প-বয়েসী মেয়েরাই এমনভাবে কাঁদে। কিংবা সুজাতাই নয় তো? অথচ ওদের তিনজনকে দেখেই তো খুব হাসিখুশি মনে হয়! দোতলায় একটি মেয়ে আছে, একতলাতেও আছে একজন। তাদেরও কেউ হতে পারে। কিন্তু তারা কি মাঝরাত্রে ছাদে উঠে আসবে? তবে আসতেও পারে। কে? কে কেঁদেছিল সেদিন! জানতেই হবে, না জানলে চলবে না।

....মাঝরাত্রে নীলাঞ্জন আবার ছাদে উঠে এসেছে। শীতের হাওয়া বইছে, আজ আকাশ পরিষ্কার। চাঁদের আলোয় প্রতিটি তারাকে আলাদাভাবে দেখা যায়। পায়চারি করতে করতে একটা সিগারেট যখন শেষ হয়েছে সেই সময় খুট করে একটা শব্দ হল। ছাদের দরজা ঠেলে এলো কালো শাড়ি পরা একটি মেয়ে। সোজা নীলাঞ্জনের কাছে এসে দাঁড়াল। ফিসফিস করে খানিকটা অভিমানের সঙ্গে বলল, আমি রোজ রোজ এখানে এসে তোমার জন্য অপেক্ষা করি, তুমি আগে আসনি কেন?

নীলাঞ্জন থতমত খেয়ে বলল, আমি....আমি, মানে....আমি তো ঠিক—

মেয়েটি বলল, তুমি বুঝতে পারোনি? আমি তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে ইশারা করেছিলাম....

নীলাঞ্জন উত্তেজনায় কাঁপছে। কে মেয়েটি? এখনো সে ভাল করে মুখটা দেখতে পায়নি। নিশ্চয়ই শিখা। তার গল্প পড়েই শিখা প্রেমে পড়ে গেছে। একজন লেখকের কাছে এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী আছে? শিখাকে সে সব কিছু দিতে পারে।

মেয়েটি মুখ তুলল।

দারুণ চমকে উঠল নীলাঞ্জন! শিখা তো নয়! তার মা সুজাতা! কিন্তু কী অসম্ভব রূপ এই নারীর! চোখ দুটি আকাশের যে কোন তারার চেয়ে উজ্জ্বল। ঠোঁট দুটি ভিজে ভিজে। শরীরে স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য সমান সমান ভাবে মিলে আছে। বুক দুটো কী সম্পূর্ণ নিটোল! কালো রঙের শাড়িতে তাকে মনে হয় স্বয়ং জ্যোৎস্নার রাতই যেন মূর্তিমতী হয়ে এসেছে।

নীলাঞ্জন আস্তে করে তার হাত ছোঁয়াল সুজাতার গালে। কী দারুণ তাপ! রাত্রি নয়, সুজাতা যেন অগ্নিকন্যা! কে বলবে যে এই নারী তিন সন্তানের মা! এবং চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটি মেয়ে আছে এঁর।

সুজাতা মুখ তুলে ব্যগ্রভাবে চেয়ে আছে নীলাঞ্জনের দিকে। নীলাঞ্জন নিজের মুখখানা নিচু করে আনল আস্তে আস্তে। ফিসফিস করে বলল, আমি আমি···

—কী বলছ নীলাঞ্জন? বল—

—আমি তোমাকে একবার দেখেই—

—বল, নীলাঞ্জন বল—

—একবার দেখেই আমি তো-তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি—

—কী বললে? আবার বল নীলাঞ্জন—

—আমি তোমাকে ভালবাসি।

—আবার বল, আবার বল—

নীলাঞ্জন আর সামলাতে পারল না নিজেকে। নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দিল সুজাতার ঠোঁটে। সুজাতা জড়িয়ে ধরল তাকে, তার বুক মিশে গেল নীলাঞ্জনের বুকে।

নীলাঞ্জন এর আগে দুটি মেয়েকে চুমু খেয়েছে। কিন্তু আজকে এই চুম্বনের তুলনায় সে সব অভিজ্ঞতা কিছুই না। তার শরীরে যেন আগুনের হল্‌কা বইছে। তাকে শক্তভাবে জড়িয়ে আছে সুজাতা। সে নীলাঞ্জনের কানে ঠোঁট নিয়ে বললে, আমায় কক্ষনো কেউ ভালবাসেনি, আমার বড় দুঃখ নীলাঞ্জন, কেউ তা বোঝে না।

—আমি তোমার সব দুঃখ মুছে দেবো।

—পারবে? সত্যি পারবে, নীলাঞ্জন?

নীলাঞ্জন সুজাতার বুকে মুখ ডুবিয়ে দিল। সুজাতার কোমরে তার হাত, অসম্ভব এক তীব্র আনন্দ তার শরীরে।

সুজাতা বলল, এখানে নয়, তোমার ঘরে চল, তোমার বিছানায় আমরা অনেক গল্প করব চল নীলাঞ্জন—

নীলাঞ্জন সুজাতাকে প্রায় কোলে তুলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে....

না, এ ঘটনাটা সত্যি নয়! সকাল সাড়ে ন'টার সময় খাটে শুয়ে লিখতে লিখতে নীলাঞ্জনের তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। হঠাৎ চট্‌কা ভেঙে যেতেই সে ধড়মড় করে উঠে বসল। তার ভুরু কুঁচকে গেল। এ কী অদ্ভুত স্বপ্ন! সুজাতার সঙ্গে অবৈধ প্রেম! সুজাতাকে যতই তরুণী লাগুক, তিনি তিন সন্তানের জননী, একজন গিন্নীবান্নী মহিলা। মাত্র এক ঘন্টার আলাপ। তার সম্পর্কে নীলাঞ্জন মনে মনে এই ভাবে! সে তো শিখার সঙ্গেও স্বপ্নে এ রকম একটা কিছু ঘটাতে পারত। কিন্তু স্বপ্ন তো মানুষ ইচ্ছে মতন তৈরি করতে পারে না। মনের মধ্যে কী এক জটিল ব্যাপার থাকে—যাতে এ রকম একটা অদ্ভুত স্বপ্ন তৈরি হয়ে যায়! সুজাতা সম্পর্কে এ রকম কিছু তো সে সজ্ঞানে চিন্তাও করেনি।

এরপর নীলাঞ্জনের অন্য একটা চিন্তা মনে এলো। যে উপন্যাসটা

সে লিখছিল, সেটাকে বন্ধ রেখে এ বাড়িটা নিয়েই একটা নতুন উপন্যাস লিখলে কেমন হয় ?

॥ ছয় ॥

চারজন ছেলে একটা ট্যাক্সি থেকে ধরণীবাবুকে নামিয়ে ধরাধরি করে পৌঁছে দিয়ে গেল বাড়িতে। যুবকগুলি খুবই সহৃদয়, কিছুতেই তারা ট্যাক্সি ভাড়া নিল না। বরেন অনেক পেড়াপিড়ি করেছিল, ওরা কিছুতেই রাজি হল না। বলে গেল, মানুষের জন্য মানুষ তো এটুকু করেই।

রাত সাড়ে ন'টার সময় ধরণীবাবু দাঁড়িয়েছিলেন বিডন স্ট্রীটের কাছে একটা বাস স্টপে। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান মাটিতে। এই যুবকের দল কাছেই দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। তারা ধরণীবাবুকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যায় একটি ডাক্তারখানায়। ডাক্তার কোরামিন দিয়ে দিয়েছেন। ধরণীবাবু একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাননি, সামান্য জ্ঞান ছিল, তাই নিজের বাড়ির ঠিকানা বলতে পেরেছিলেন।

মা একেবারে অস্থির হয়ে পড়লেন। সুতপা মাকে এক ধমক দিয়ে বলল, মা, তুমি কী করছ ? এখন তোমাকে সামলাব না তুমি বাবাকে দেখবে !

বরেন ছুটে চলে গেল চেনা ডাক্তারকে ডেকে আনতে। সেই সময় শিবুও বেরুচ্ছিল বাড়ি থেকে। কিন্তু ধরণীবাবুর ঐ অবস্থা দেখেও একটা কথা বলল না। কিছুদিন আগে বরেনের সঙ্গে যখন শিবুর বন্ধুত্ব ছিল, তখন বরেনের বাবার এই রকম অবস্থা দেখলে সে নিশ্চয়ই বরেনের সঙ্গে ডাক্তার ডাকতে যেত। বরেন মনে মনে বলল, চশমখোর !

রণুর আবার জ্বর এসেছিল। তবু সে উঠে এসে বাবার কাছে বসল। বাবার সারা মুখে দারুণ যন্ত্রণার চিহ্ন। রণু এর আগে তার বাবাকে কখনো অসুস্থ হতে দেখেনি।

ডাক্তারবাবু এসে পরীক্ষা করে দেখলেন। মাথা নাড়লেন চিন্তিত-ভাবে। তারপর বললেন, হার্ট অ্যাটাকের সমস্ত লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তবে ঠিক হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার—

মা একেবারে আর্তনাদ করে উঠলেন।—হাসপাতাল? তাঁর স্বামী চিরকাল হাসপাতালকে ভয় পান। আত্মীয়-স্বজনের খুব গুরুতর অসুখ-বিসুখ হলে হাসপাতালে দেখতে যান না পর্যন্ত! সেই মানুষটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে!

ডাক্তারবাবু বললেন, আজকের রাতটা থাক তাহলে। কাল একবার এখানেই ই সি জি করার ব্যবস্থা করব। আসলে মানুষটার ভেতরটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফল। খাওয়া দাওয়া হয় না ঠিক মতন। আমি জানি তো, উনি কত খাটেন।

ডাক্তারের ফি ষোল টাকা। কিন্তু উনি বরেনকে বললেন, তোমার বাবার কাছ থেকে আমি দশ টাকার বেশি নিই না কখনো!

মায়ের কাছে একটা কুড়ি টাকার নোট ছিল। ডাক্তারের কাছে ভাঙানি নেই, তিনি বললেন, কাল সকালে গিয়ে আমার কাছ থেকে দশটা টাকা নিয়ে এসো···কিংবা ওষুধপত্তরও কিছু লাগবে।

যাবার সময় তিনি রণুকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন আছ?

রণু ঘাড় নাড়ল।

ডাক্তার রণুর কপাল ছুঁয়ে বললেন, উঁহু, গা ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে... তোমার রক্তটা একটু পরীক্ষা করা দরকার। তোমার বাবাকে অনেকবার বলেছি...

ডাক্তারবাবু কুড়ি টাকার নোটটি নিয়ে যাবার পর মায়ের কোষাগারে আর রইল মাত্র সাত টাকা। মাস ফুরোতে আর চারদিন মাত্র বাকি। বাবা মাইনে পান মাসের দু' তারিখে। এই ক'টা দিন সাতাশ টাকায় অনায়াসে চলে যেত।

মাসের শেষ ক'টা দিন প্রত্যেকটা টাকা হিসেব করে চালাতে হয়। সব টাকারই আলাদা আলাদা নিয়তি নির্দিষ্ট আছে। যেমন রেশন তোলার টাকা দিয়ে কিছুতেই মাছ কেনা যাবে না। সর্ষের তেল ফুরিয়ে গেলেও আর কেনার উপায় নেই, তাতে বরেনের ইউনিভার্সিটিতে যাবার ভাড়ায় টান পড়বে। সব একদম মাপা মাপা। একবার মাসের এক তারিখে রাত্তিরবেলা অনেকক্ষণ লোডশেডিং, সেদিন ওদের মোমও ছিল না, মোম কেনার পয়সাও ছিল না, সেদিন সারাক্ষণ অন্ধকারে থাকতে হয়েছিল।

কিন্তু এত বড় বিপর্যয় আর আগে কখনো আসেনি। পরদিনই ডাক্তারবাবু বাবার জন্য অনেকগুলো ওষুধের নাম লিখে দিলেন। ছাপ্পান্ন

টাকা লাগবে। বরেন ফিরে এসে মাকে জিজ্ঞেস করল, মা, তোমার কাছে টাকা আছে?

মা বললেন, আমি কোথায় টাকা পাবো?

বরেন গম্ভীরভাবে বলল, টাকার জোগাড় না করলে তো চলবে না। এখন আরও অনেক টাকা লাগবে। বড়মামার কাছে গিয়ে চাইব?

মা কড়াভাবে বললেন, না!

রণু পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল। তার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ঝিম ঝিম করছে মাথার মধ্যে। যেন সে একজন অপরাধী।

বরেন বলল, আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার করতে পারি।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, থাক, এক্ষুনি দরকার নেই ধার করার।

কাঠের আলমারি খুলে মা একটা মাটির ভাঁড় এনে দিলেন। আস্তে আস্তে বললেন, সিকি, আধুলি জমিয়েছিলাম। এটা ভেঙে দ্যাখ, দেড়শো দুশো টাকা হতে পারে!

দু'দিনের মধ্যে বাবার শরীরটা আধখানা হয়ে গেল। ভাল করে হাঁটতে পারেন না। সব সময় ঘুমোন। মাঝে মাঝে যখন উঠে বসেন, তখনও কথা বলতে গেলে গলার আওয়াজটা চিঁ চিঁ মতন হয়ে যায়।

প্রায় জন্ম থেকেই রণু তার বাবাকে দেখেছে একজন দারুণ পরিশ্রমী মানুষ হিসাবে। তিনি যেন এই সংসারের জন্য টাকা উপার্জনের একটি যন্ত্র। ভোরবেলা বেরিয়ে যান মর্নিং স্কুলে। সেখান থেকে ফিরেই আধঘণ্টার মধ্যে স্নান করে, নাকে-মুখে কিছুটা ভাত গুঁজে আবার বেরিয়ে যান। বিকেলে আর বাড়ি না ফিরেই সোজা টিউশানি। ফেরেন ঠিক পৌনে দশটায়। এই ভাবেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলছিল। এই টাকা রোজ-গারের যন্ত্রটি যে হঠাৎ বিকল হয়ে যেতে পারে, সে-কথা কেউ ভাবেনি।

ডাক্তার বলেছিলেন, দু-তিন মাস সম্পূর্ণ বিশ্রাম চাই। বাইরে কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় নিয়ে যেতে পারলে ভাল হয়। তাঁর তীব্র ধরনের অ্যানিমিয়া। নিয়মিত ওষুধ-পত্র আর ভাল খাবার-দাবারের দরকার।

চিকিৎসার জন্য বাবার এক মাসের মাইনের টাকা দশ দিনে খরচ

হয়ে গেল। দুটো টিউশানির টাকা এখনও আনা হয়নি। ছাত্রদের সামনেই পরীক্ষা, টিউশানি দুটো এ মাসেই যাবে।

জমা টাকা বলতে কিছু নেই। মাত্র মাস ছয়েক আগেই ব্যাঙ্কে যে হাজার দুয়েক টাকা ছিল, সেটা তুলে এনে দাঁওতে পাওয়া ভরি ছয়েক সোনা কিনে রাখা হয়েছে। সোনার দাম দিন দিন বাড়ছে, সুতরাং বিয়ের সময় তো কিছু সোনা লাগবেই, তখন আরও বেশি দামে সোনা কিনে লাভ কী? এক মাসের মধ্যেই সুতপার পার্ট টু পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবে। এর মধ্যেই তার জন্য পাত্র দেখা চলছিল। বরেন এম কম পড়ছে, কিন্তু নিজের পড়ার খরচ সে নিজে চালাতে পারে না।

আগামীকাল মামলার তারিখ। বাবার বদলে বরেনকে যেতে হবে কোর্টে। বরেন এ সব ঝামেলা মোটে পছন্দ করে না। কিন্তু উপায় তো নেই। বাড়িওয়ালারা এই সময় উঠে পড়ে লেগেছে। একবার এই মাস্টার পরিবারটাকে তাড়াতে পারলে তাদের কত লাভ। বরেনরা বাড়িভাড়া দেয় পৌনে দুশো টাকা, তারা উঠে গেলেই এই নিচতলাটা অন্তত সাড়ে তিনশো চারশো টাকায় ভাড়া হবে। হোক না আড়াইখানা ঘর, কিন্তু কত বড় বাথরুম। বরেনের সবচেয়ে বেশি রাগ হয় শিবুর ওপর।

॥ সাত ॥

কফি হাউসে ঢুকতেই নীলাঞ্জন দেখতে পেল ডান পাশের একটি টেবিলে তিন চারজন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসে আছে শিখা। নীলাঞ্জন কয়েক পলক তাকিয়ে রইল শিখার দিকে। নীলাঞ্জন ঠিক বুঝতে পারল না কথা বলবে কিনা। রমেনবাবুর মেয়ে, তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে বটে, কিন্তু এমন কিছু বেশি আলাপ হয়নি যে বাইরে দেখা হলে কথা বলতে পারে। তাছাড়া শিখা রয়েছে তার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে। মেয়েরা আগে কথা না বললে নীলাঞ্জন নিজে থেকে কিছু বলতে সাহস পায় না। সে চলে গেল ভেতরের দিকে।

আর কোন টেবিলেই নীলাঞ্জনের চেনা কেউ নেই। আশ্চর্য ব্যাপার, এক সময় কফি হাউসের প্রায় প্রত্যেক টেবিলেই নীলাঞ্জনের

চেনা কেউ না কেউ থাকত, ছাত্রজীবনে। এখন সব বন্ধুরাই নানা দিকে ছড়িয়ে গেছে। নীলাঞ্জনও অনেকদিন কফি হাউসে আসেনি। সে ভেবেছিল, পুরোনোকালের মতন, সে ভেতরে ঢুকলেই বিভিন্ন টেবিল থেকে তার নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু হবে।

একটা ফাঁকা টেবিল দেখে নীলাঞ্জন বসে পড়ল। তার লজ্জা লাগছে। একা একা কোনদিন সে এখানে বসেনি। বেয়ারারা সবাই তার মুখ চেনে। নিশ্চয়ই বেয়ারারা ভাবছে, হায়, হায়, এই লোকটার এখন আর একজনও বন্ধু নেই। আগে কত বন্ধু ছিল!

এক কাপ কফি নিয়ে, সিগারেট ধরিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল নীলাঞ্জন, এই সময় শিখা কখন এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে, সে টেরও পায়নি। হঠাৎ চমকে উঠল।

শিখা জিজ্ঞেস করল, আপনি কারুর জন্য অপেক্ষা করছেন?

নীলাঞ্জন আমতা আমতা করে বলল, হ্যাঁ, না, মানে, আপনি বসবেন? বসুন না।

শিখা দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, আপনাকে তো এখানে দেখি না!

—অনেকদিন পর এলাম।

—আপনি আমাদের টেবিলে একটু আসবেন?

—আমি? কেন?

—আমার বন্ধুরা আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চায়, ওরা আপনার লেখা পড়েছে।

নীলাঞ্জন লজ্জা পেয়ে যেন প্রায় কুঁকড়ে গেল। তার লেখা সত্যিই এরা পড়েছে? মাত্র সাত আটটা গল্প ছাপা হয়েছে তার। দু-চারজন বন্ধু ছাড়া আর কেউ কখনো তার লেখার বিষয়ে কোন কথা বলেনি।

নীলাঞ্জন বলল, আচ্ছা, কফিটা শেষ করে নি।

শিখা নিজেই নীলাঞ্জনের কাপটা তুলে নিয়ে বলল, ওখানে বসে খাবেন। এটা আমি নিয়ে যাচ্ছি।

শিখার বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে আলাপ হল। দুটি ছেলে, আর দুটি মেয়ে। ছেলে দুটি নীলাঞ্জনের কোন লেখা পড়েছে কিনা বোঝা গেল না, কারণ মন্তব্য করল না কিছুই। মেয়ে দুটি নীলাঞ্জনের একটি মাত্র গল্প পড়েছে, যেটা সবেমাত্র একটি সিনেমার পত্রিকায় বেরিয়েছে। নীলাঞ্জনকে ডেকে আনায় অন্য ছেলে দুটি খুব সম্ভবত খুশি হয়নি, তারা, গম্ভীর হয়ে গেল। শিখা আর অন্য দুটি মেয়ে কথা

বলতে লাগল তার সঙ্গে। নীলাঞ্জন কিছুতেই লাজুকতা কাটিয়ে চোখে চোখে কথা বলতে পারল না। এক সময় হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজ আমি চলি।

এর পরদিনই রাত্তির নটার সময় এসপ্ল্যানেডের বাসস্টপে শিখার সঙ্গে আবার দেখা হল নীলাঞ্জনের। একটু আগে সিনেমা ভেঙেছে, তাই বাসগুলোতে দারুণ ভিড়। শিখা কথা বলছিল দুটি ছেলের সঙ্গে, কালকের সেই ছেলে দুটি নয়, অন্য। নীলাঞ্জন ওদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। মনে মনে সে কৌতুক বোধ করল খানিকটা। শিখার সঙ্গে আগে তো কোনদিন তার দেখা হয়নি, অথচ পর পর দু'দিন··· ! এই রকম অনেক মজার ঘটনা হয়!

অন্য একটা বাস ধরে নীলাঞ্জন বাড়ির কাছে নামল। পকেটে হাত দিয়ে দেখল সিগারেট নেই। দোকান থেকে সিগারেট-দেশলাই কিনে মুখ ফিরিয়েই দেখল সামনে দাঁড়িয়ে আছে শিখা। সে হাসছে।

শিখাই প্রথমে বলল, আপনি একটা অদ্ভুত মানুষ!

নীলাঞ্জন বলল, তাই নাকি?

—চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলে সবাই কথা বলে। আপনি এড়িয়ে যান কেন? এই তো খানিকটা আগে এসপ্ল্যানেডে আপনাকে দেখলাম, আমরা তো একসঙ্গেই ফিরতে পারতাম। আপনি চোরের মতন চুপি চুপি পাশ কাটিয়ে—

—তাই নাকি? আমাকে তখন চোরের মতন দেখাচ্ছিল?

—হ্যাঁ অবিকল। আপনি বুঝি ভেবেছিলেন আমি আপনাকে দেখতে পাইনি? মেয়েরা সব দেখতে পায়।

—আপনি অন্যদের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

—কালও কফি হাউসে আপনি প্রথমে আমাকে দেখেও না দেখার ভান করেছিলেন।

—না, ঠিক তা নয়।

—দেখুন, আমরা একই বাড়িতে থাকি, অথচ বাইরে দেখা হলেও কথা বলি না! মানুষের সভ্যতাটা কী অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে।

নীলাঞ্জন মনে মনে স্বীকার করল শিখা মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। কোন ন্যাকামি নেই, পরিষ্কারভাবে কথা বলে!

বড় রাস্তা থেকে খানিকটা হাঁটতে হয়। দুজনে পাশাপাশি এগুলো। শিখার কথার ছোট ছোট উত্তর দিতে দিতে নীলাঞ্জন একটা

কথা না ভেবে পারল না। সে আর শিখা একসঙ্গে ফিরবে। বাড়ির সব লোক যদি ভাবে ওরা একসঙ্গে কোন জায়গা থেকে এলো? নীলাঞ্জন কিছুতেই অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে পারবে না। শিখার বাবা রমেনবাবু বলেছিলেন, ব্যাচেলারদের থাকতে দেয় না এসব বাড়িতে। কী ইঙ্গিত করেছিলেন তিনি?

আর একটা কারণেও নীলাঞ্জন নিজেকে একটু অপরাধী ভাবে। সে শিখার মায়ের সঙ্গে প্রেম করেছে। স্বপ্নে অথবা কল্পনায়। কেউ জানে না সে কথা, শিখার মা তো জানেনই না, তবু তারপর থেকে নীলাঞ্জন আর ওঁর দিকে স্পষ্ট চোখে তাকাতে লজ্জা পায়।

তিনতলায় পৌঁছে শিখা বলল, সকালবেলা আপনি ক'টার সময় বেরোন?

—সাড়ে দশটা এগারোটা।

—কাল ন'টা আন্দাজ আপনার কাছে আমি একবার আসব, একটা দরকার আছে। আপনার অসুবিধে হবে?

—না না, অসুবিধে কী?

পরদিন সকালে আগে থেকেই নীলাঞ্জন জামা-টামা পরে তৈরি হয়েছিল। রাত্রে সে অনেকক্ষণ ভেবেছে, তার সঙ্গে শিখার কী দরকার? শিখাকে মোটামুটি সুন্দরীই বলা যায়। এ রকম একটি মেয়ের সাহচর্যে নীলাঞ্জনের খুব ভালই লাগবার কথা। কিন্তু একই বাড়ি বলে তার অস্বস্তি লাগছে। যদি এই নিয়ে আবার কোন গোলমাল হয়—

ঠিক ন'টার সময় এক কাপ চা হাতে নিয়ে শিখা এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। জিজ্ঞেস করল, আসব?

নীলাঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ, আসুন।

চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে শিখা বলল, বাবা বলছিলেন, আপনাকে আমাদের ঘরে ডাকতে। আমি বললাম আমি চা নিয়ে যাচ্ছি। দাঁড়ান, আমার চা-টাও নিয়ে আসি। আপনি কিছু খাবেন? খাবেন না? শুধু দুখানা এগ-টোস্ট।

চা আর খাবারের প্লেট ছাড়াও শিখা নিয়ে এলো একটা চামড়া বাঁধানো খাতা। উল্টো দিকের চেয়ারে বসে বলল, একটা ব্যাপারে

আমি আপনার সাহায্য চাই। আমি মাঝে মাঝে এলে কি আপনি বিরক্ত হবেন?

নীলাঞ্জন বলল, বিরক্ত হব কেন? আপনার মতন একটি সুন্দরী মেয়ে—

শিখা এমনভাবে হাসল যার স্পষ্ট অর্থ, যাক, মুখে কথা ফুটেছে তাহলে। এবার সে বলল, যদি আপনার বিশেষ কিছু আপত্তি না থাকে তাহলে আমায় আপনির বদলে তুমি বলতে পারেন।

নীলাঞ্জন বলল, সেটার জন্য বোধহয় কয়েকদিন সময় লাগবে।

—ক'দিন?

—তার কি কোন ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, চেষ্টা করব আজ থেকেই···কিন্তু আমি আপনাকে কী সাহায্য করব?

—বলছি, আগে চা-টা খেয়ে নিন।

নীলাঞ্জন মুখ তুলে দেখল, দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন রমেনবাবু, ভুরু দুটো কুঁচকে আছেন, অথচ ঠোঁটে হাসি।

নীলাঞ্জন বলল, আসুন রমেনবাবু, ভেতরে আসুন।

—না, থাক।

সেই রকমভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রমেনবাবু সরে গেলেন। নীলাঞ্জন ব্যাপারটা বুঝতে পারল না।

শিখা এবার কালো খাতাটি হাতে নিয়ে বলল, আমি কিছু কবিতা লিখেছি। অনেকদিন ধরেই লিখি, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারি না কিছু হচ্ছে কিনা। আপনি একটু দেখে দেবেন?

—এই সাহায্য?

—হ্যাঁ। আপনার সময় নষ্ট হবে?

নীলাঞ্জনের বুকটা হালকা হয়ে গেল। কবিতা দেখে দেওয়া? এটা আবার একটা সাহায্য?

—কোথাও ছাপা হয়েছে কবিতা?

—না।

নীলাঞ্জন আরও বেশি মনের জোর ফিরে পেল। শিখার কোন কবিতা ছাপা হয়নি। সেই তুলনায় নীলাঞ্জন মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত তরুণ লেখক। এখন সে শিখার সঙ্গে অনেক বেশি আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কথা বলতে পারে।

—দেখি খাতাটা।

—আমি কয়েকটা পড়ে শোনাচ্ছি।

খাতাটা খুলেও খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল শিখা। নীলাঞ্জনও চুপ। সারা বাড়ির গোলমাল তাদের কানে আসছে। দোতলায় কী একটা ব্যাপার নিয়ে খুব চ্যাঁচামেচি করছে শিবু, একতলা থেকে কেউ উত্তর দিচ্ছে মাঝে মাঝে।

শিখা হঠাৎ উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে বলল, কবিতা পড়ার সময় কেউ ডিস্টার্ব করলে আমার একদম ভাল লাগে না।

আবার সচকিত হয়ে উঠল নীলাঞ্জন। শিখা দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়েছে। একটু আগে রমেনবাবু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রহস্যময়ভাবে হেসে গেলেন। এ সব কী ব্যাপার? এর মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র নেই তো?

সে একটু কড়া গলায় বলল, দরজা বন্ধ করার কোন দরকার ছিল না।

শিখা বিস্মিতভাবে মুখ তুলে বলল, কেন?

—তুমি আর আমি এ ভাবে দরজা বন্ধ করে বসলে তার অন্য মানে হতে পারে।

—কী অন্য মানে?

—তোমার বাবা একটু আগে দেখে গেলেন।

—তাতে কী হয়েছে?

—তাতে কিছু হয়নি?

হঠাৎ শিখা হাসিতে ভেঙে পড়ল। থামেই না হাসি। নীলাঞ্জন দারুণ অপ্রস্তুত।

শিখা হাসি মুছে বলল, আপনি কি ভাবছেন আপনার সঙ্গে আমি প্রেম করতে এসেছি? জোর করে?

—না, তা নয়, তোমার অনেক বন্ধু আছে আমি জানি।

—কোন পুরুষের সঙ্গে কোন মেয়ে একভাবে থাকলেই প্রেম করতে হবে? অন্য কোন কথা থাকতে পারে না? মেয়েরা বুঝি সব সময় প্রেম করে? তাদের আর অন্য কোন চিন্তা নেই?

—কিন্তু বাড়ির লোকজন—

—বাড়ির লোকজন কী ভাবে তা আমি গ্রাহ্য করি না। আমার বাড়ির লোকজন আমাকে জানে। সকাল ন'টার সময় সকলের চোখের

সামনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমি প্রেম করতে বসব? আপনি এত ভীতু?

—তোমার বাবা একটু আগে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অদ্ভুতভাবে হাসছিলেন।

--কেন হাসছিলেন বুঝতে পারলেন না? বাবার সিগারেট খাওয়া বারণ, আপনার কাছ থেকে সিগারেট নিতে এসে আমাকে দেখে ধরা পড়ে গেলেন।

—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ। দরজা না খুলে রাখলে আপনি কবিতা শুনবেন না?

—শিখা, তুমি বেশ সাহসী মেয়ে।

—সবাই চায় মেয়েরা ভীতু হয়ে থাকুক, পুরুষদের তৈরি সব নিয়মকানুন মেনে চলুক।

—আমি তা বলিনি।

—এবার তা হলে কবিতাগুলো পড়ি?

নীলাঞ্জন হেলান দিয়ে বসে সিগারেট ধরাল একটা। শিখা বলল, আরও একটা কোন্ কারণে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম জানেন? আমিও একটা সিগারেট খাব। আপত্তি আছে?

—এই তো! ছেলেরা দরজা খুলে রেখে সিগারেট খায়, কিন্তু মেয়েদের দরজা বন্ধ করে দিতে হয়।

—অনেক ছেলেও মা বাবাকে দেখে সিগারেট লুকোয়। সেটা খারাপ কিছু নয়। কিন্তু আমরা কি তর্ক করব শুধু?

—না, কবিতা শুনব।

শিখা নিজেই হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে রাখল। কিন্তু দেশলাইটা স্পর্শ করল না। অর্থাৎ সে অপেক্ষা করছে নীলাঞ্জন তাকে ধরিয়ে দেবে। নীলাঞ্জন তার জ্বলন্ত সিগারেটটা বাড়িয়ে দিল।

প্রথম টান দিয়েই খুক খুক করে কাশল শিখা। অর্থাৎ তার অভ্যেস নেই। কিন্তু সিগারেটটা ধরে আছে ঠিক মেমসাহেবদের মতন কায়দা করে। হঠাৎ লাজুক লাজুক হেসে সে বলল, এবার পড়তে শুরু করি?

—হ্যাঁ।

শিখা পর পর পাঁচ ছ'টা কবিতা পড়ে গেল। শুনতে শুনতে নীলাঞ্জন ক্রমশই বেশ অবাক হচ্ছিল। মেয়েদের লেখা সম্পর্কে

নীলাঞ্জনের খুব একটা উঁচু ধারণা নেই। সে দেখেছে, বেশির ভাগ মেয়েই কিছু লিখতে পারে না। কিন্তু শিখার কবিতাগুলি বেশ ভাল। শুধু ভাল নয়, নতুন ধরনের।

নীলাঞ্জন বলল, বাঃ, চমৎকার। খুব ভাল লিখেছ।

শিখা বলল, আপনার কাছ থেকে আমি প্রশংসা শুনতে চাইনি। মেয়েরা কবিতা পড়লেই ছেলেরা প্রশংসা করে। অনেকে খুব উচ্ছ্বাস দেখায়। যেন মেয়েদের পক্ষে কবিতা লেখাটাই একটা দারুণ ব্যাপার। যা লিখেছে, তাই যথেষ্ট! তাই না?

—আমার কাছ থেকে তুমি কী শুনতে চাও?

—সত্যি কথা।

—সত্যিই তোমার কবিতাগুলো আমার ভাল লেগেছে। দাও তো, একবার আমি নিজে পড়ি।

—আমি চাই, আপনি আমার ভুলগুলো দেখিয়ে দেবেন।

—ভুল তো কিছু নেই। এগুলো ছাপা হওয়া উচিত। আমি চেষ্টা করব কোথাও ছাপিয়ে দেবার।

—না না, আমি ছাপাতে চাই না। এখনো অনেক কিছু শেখার বাকি।

—তুমি কবিতা লিখতে শুরু করেছ কবে থেকে?

—এই তো, গত বছর।

—এমনি এমনি হঠাৎ কবিতা লেখার ইচ্ছে হল?

—আগে পড়তাম খুব। কবিতা পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। তারপর একদিন মনে হল, আমার কিছু কথা আছে, যা কারুকে মুখে বলা যায় না, চিঠিতেও জানানো যায় না। শুধু কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা যায়।

—বাঃ!

—তারপর হঠাৎ একদিন লিখে ফেললাম একটা!

লাজুকভাবে হেসে ফেলল শিখা। নীলাঞ্জনও হাসতে লাগল। এমনিতে এত স্মার্ট, কিন্তু কবিতার প্রসঙ্গে তার মুখে লজ্জার লালচে আভা পড়েছে, চোখ মাটির দিকে। এটাই খাঁটি কবির লক্ষণ।

—দিদি, দিদি! বলে দু'বার ডাক শোনা গেল। শিখার ছোট বোনের গলা। শিখা যেন সেটা শুনতেই পেল না।

নীলাঞ্জন বলল, তোমায় ডাকছে বোধহয়।

—ডাকুক ! আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো ?

নীলাঞ্জন আস্তে আস্তে দু'দিকে মাথা নাড়াল।

হঠাৎ একটা কথা মনে এসেছে তার। শিখা কি কোন কারণে তার প্রেমে পড়ে গেছে ? মুখে মুখে চটপটে কথা বললেও ভেতরে হয়তো মেয়েটি খুবই নরম। প্রেমে না পড়লে কোন মেয়ে এ রকম দরজা বন্ধ করে কোন ছেলের সঙ্গে কথা বলে ? শিখা কোন ভয় পাচ্ছে না, তবু সে ভয় পাচ্ছে কেন ? সে তো পুরুষ।

নীলাঞ্জন বলল, না আমার কোন কাজ নেই, আমি সারাদিন তোমার সঙ্গে গল্প করতে পারি।

শিখা বলল, কিন্তু আপনি তো রোজ দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

—তা যাই। কিন্তু তুমি যদি চাও, আমি সারাক্ষণ থাকতে পারি।

—না, আপনাকে আমি আটকে রাখব কেন ? তা ছাড়া, আমারও কলেজ আছে।

—শিখা, তোমাকে একটা কথা বলব ? অনুমতি দেবে ?

—বলুন !

—তুমি যে খুব সুন্দর, তুমি জানো ?

—শিখা এ কথা শুনে লজ্জা পেল না, একটুও গুরুত্ব দিল না। খাতা গুছিয়ে উঠে দাঁড়াল।

—তোমাকে বুঝি আগেও অনেকে এই কথা বলেছে ?

—না। অনেকে শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলতে যাবে কেন ?

—মিথ্যে ? সত্যিই তো তুমি খুব সুন্দর !

শিখা মাথা দুলিয়ে স্বাভাবিক ভাবে হেসে বলল, না, সত্যি নয়। আমি জানি, আমি খুব সুন্দরী নই, আবার খুব খারাপ দেখতেও নই। এই, মাঝারি ধরনের।

নীলাঞ্জন হাত বাড়িয়ে শিখার কাঁধ ছুঁয়ে বলল, চলে যাচ্ছ কেন ? আর একটু বসো !

—আচ্ছা বসছি।

নীলাঞ্জন বুঝতে পারছে না তার কী করা উচিত। সে কি বোকার মতন ব্যবহার করছে ? শিখা কি তার কাছ থেকে কিছু আশা করছে ? মনে মনে হাসছে, অন্য কোন পুরুষ মানুষ এরকম অবস্থায় কী রকম ব্যবহার করত ? উত্তেজনায় নীলাঞ্জনের শরীরটা একটু একটু কাঁপছে।

সে হঠাৎ শিখার গালে হাত ছুঁইয়ে বলল, তোমাকে একটু আদর করব ?

—কী ?

—তোমাকে একটু আদর—

—ঘরের দরজা বন্ধ আছে বলেই বুঝি এ কথা বলছেন ?

—না না, তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে।

—আগে তো কখনো এ কথা বলেননি ! আপনাকে আমি কিন্তু এ রকম ভাবিনি। ভেবেছিলাম, আপনি অন্যদের চেয়ে আলাদা !

নীলাঞ্জনের গালে যেন ঠাস করে একটা থাপ্পড় পড়ল। সে কি তাহলে চোখের ভাষা জানে না ? শিখার দৃষ্টিতে সে তো স্পষ্ট আহ্বান দেখেছিল।

অপমানিত মুখে সে বলল, তুমি বুঝি দরজা বন্ধ করে আমায় পরীক্ষা করতে চেয়েছিলে ?

—না তো....দরজা বন্ধ করেছিলাম...নিরিবিলিতে পড়ার জন্য.... আপনি রাগ করবেন না আমার ওপরে···আমি চাই, আপনার কাছে মাঝে মাঝে আসব, অনেক কিছু জিজ্ঞেস করব।

—শিখা, আমি ভাল লোক নই।

—যাঃ, মোটেই না।

—তোমার অনেক বন্ধু আছে, তাই না ?

—হ্যাঁ।

—বিশেষ একজন কোন বন্ধু নেই ?

—হ্যাঁ, তাও আছে।

—ও, আমি দুঃখিত। আমি ভেবেছিলাম...যাক, কিছু মনে করো না।

—কী ভেবেছিলেন ?

—ভেবেছিলাম, আমি তোমার বন্ধু হব....তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছিল।

—সেই জন্যে আপনি আমাকে দেখলেই এড়িয়ে যেতেন ?

—সেটা অন্য ব্যাপার।

—আপনি যদি আমার বন্ধু হতে চান, তাহলে আমি খুব গর্বিত হব। আপনি এত ভাল লেখেন···তাহলে আমি আবার আসব তো ?

হ্যাঁ, তোমার যখন ইচ্ছে,...কিন্তু তখন দরজা খোলা রাখতে হবে, নইলে আমি আবার খারাপ হয়ে যেতে পারি !

শিখা কোনো কথা না বলে ভ্রূভঙ্গি করে রহস্যময়ভাবে হাসল। তারপর এগিয়ে গেল দরজার দিকে। সে যখন দরজার ছিটকিনিতে হাত দিয়েছে, তখন নীলাঞ্জন বলল, তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব ? তুমি কি একদিন রাত্তিরবেলা ছাদে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলে ?

শিখা ভুরু তুলে বলল, সে কী ! আমি ছাদে কাঁদতে যাব কেন ?

॥ আট ॥

রণুর আবার জ্বর আসছে। কিন্তু কারুকে বলে না সে কথা ! মায়ের চোখ এড়িয়ে থাকে। বাবার এ রকম অসুখের মধ্যে রণুর নিজের আবার অসুখ হওয়াটা দারুণ স্বার্থপরতা নয় ? কেন যে তার জ্বর হয় ! আর কারুর হয় না ! শুধু তার কেন হবে ? একদম ভাল লাগে না।

এতকাল সংসারটা টেনে এসে বাবা যেন হাল ছেড়ে দিয়েছেন। যখন জেগে থাকেন, একটাও কথা বলেন না, চোখের সামনে একটা যে-কোনো বই খুলে নিয়ে বসেন, কিন্তু বোঝাই যায়, পড়ায় মন নেই। একটু বাদেই চোখ ঢুলে আসে ঘুমে। বহুদিন বাবার বই পড়ার অভ্যাস নেই। পড়বেন কখন ? সময় ছিল কোথায় ? ইস্কুল মাস্টারের বই পড়ার সময় থাকে না।

দ্বিতীয় মাসেই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে ধার করতে হল। মা সেই কথাটা তুলতেই বাবা কোনো রকম উচ্চবাচ্য না করে প্রয়োজনীয় কাগজে সই করে দিলেন। ডাক্তার বলেছেন বাবাকে মাঝে মাঝে একটু বাইরে বেরিয়ে হাঁটা চলা করতে। বাবা যেতে চান না। আবার ভাল হয়ে উঠে আগের মতন কাজকর্ম শুরু করার ইচ্ছেটাই যেন চলে গেছে তার। শরীর দুর্বল হয়ে গেলে মানুষের মনও দুর্বল হয়ে যায়।

মাঝখানে একটু যেন ভাল হয়ে উঠলেন বাবা। স্কুলের ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। এবার জয়েন না করলে মাইনে কাটা যাবে। বাবা বললেন, সামনের সোমবার থেকে তিনি স্কুলে যাবেন। তার দু' দিন

আগে, শনিবার সকালে বাবা বললেন, আজ আমিই বাজারটা করে নিয়ে আসি।

বাবাকে তো একলা পাঠানো যায় না, তাই রণু গেল সঙ্গে। থলি হাতে নিয়ে। আগে রণু দেখেছে, বাবা রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন হন হন করে। কিন্তু এখন হাঁটছেন খুব আস্তে আস্তে। আগে প্রত্যেকটা তরকারির দোকানে দারুণ দরদাম করতেন, কিন্তু এখন আর সেদিকে মনই নেই। প্রত্যেক দোকানের সামনে গিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকছেন, তারপর যেন ঘুম ভেঙে বলে উঠছেন, ও হ্যাঁ, দাও তো।

হঠাৎ বাবা বললেন, রণু, আমার মাথা ঘুরছে, আমাকে ধর! রণু বাবার হাত চেপে ধরল, কিন্তু বাবা তবু ধড়াম করে পড়ে গেলেন মাটিতে। বহু লোক ছুটে এলো হৈ হৈ করে।

বাবা আবার শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন।

মাঝরাত্রে শীতের জন্য রণুর ঘুম ভেঙে গেল। কম্বল রয়েছে গায়ে। তবু এমন শীত করছে কেন? রীতিমত কাঁপুনি লাগছে। গত বছর ছিঁড়ে গিয়েছিল লেপটা। এ বছর নতুন লেপ তৈরি করার কথা ছিল, তা আর হয়ে ওঠেনি। আর হবেও না।

কিন্তু এমন তো বেশি কিছু শীত নয়, তবু শীত করছে এত? রণু নিজের কপালে হাত দিল। হুঁ, আবার জ্বর আসছে। আসছে মানে কি, এসে গেছে। দূর ছাই, ভাল্লাগে না!

রণুকে উঠে পড়তেই হল। জানালার একটা পাল্লা বন্ধ আছে। আর একটা পাল্লাও বন্ধ করে দেবে? তাহলে আর একটুও হাওয়া আসবে না।

খাটের তলা থেকে সে পুরোনো ট্রাঙ্কটা টেনে বার করল। তার ভেতর রয়েছে সানুদার সেই শালটা। টেনে গায়ে জড়াতেই তার দারুণ আরাম হল। পুরোনো আমলের শাল, খুব গরম হয়। এটা গায়ে দিয়েই রণু আজ শুয়ে থাকবে। সকালবেলা আবার ট্রাঙ্কের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেই হবে।

টাকাগুলোও সাবধানে বার করে গুনে দেখল সে। ঠিকই আছে। চার হাজার দুশো পঁচিশ। টাকাগুলো ছুঁতেই রণুর গাটা আরও গরম হয়ে যায়। তার কাছে এত টাকা আছে, কেউ জানে না।

রণু একবার চমকে জানালাটার দিকে তাকাল। ঠিক যেন মনে হল, সানুদা এসে দাঁড়িয়ে আছে। রোজই এ রকম মনে হয়।

সানুদা আসেনি একদিনও। সানুদা সম্পর্কে সে প্রায়ই পাড়ার মোড়ে নানান্ রকম উল্টো-পাল্টা কথা শোনে। কেউ বলে সানুদা সেই মারামারির পর নিজেও মরে গেছে। কেউ বলে সানুদা পালিয়ে গেছে মধ্যপ্রদেশে। আবার কেউ বলে সানুদাকে পরশু দিনও একজন মৌলালির মোড়ে ট্রাম থেকে নামতে দেখেছে। রণুর দাদাই তো এক-দিন বলল, সানুদাকে নাকি পুলিশ একদিন একটুর জন্য ধরতে পারেনি। সানুদাকে একটা ট্যাক্সির মধ্যে দেখে পুলিশ ফলো করেছিল। তারপর ট্যাক্সি হাওড়া ব্রীজ পেরোবার আগেই পুলিশ সেটাকে ধরে ফেলল। তখন দেখা গেল ট্যাক্সিটা খালি। সানুদা চলন্ত ট্যাক্সি থেকেই মাঝপথে নেমে পড়ে পালিয়েছে। অবশ্য দাদাটা বড্ড মিথ্যে কথা বলে।

সানুদার সম্পর্কে যদি আরও কিছু খবর পাওয়া যায়, এই জন্য রণু একদিন গেল ওদের বাড়িতে। দোতলায় মান্তুদের ঘরের সামনে মান্তুর মাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, মাসীমা, মান্তু কোথায়?

মান্তুর মা সব সময় একটা না একটা অসুখে ভোগেন। যত অসুখে ভুগছেন, ততই তিনি খিটখিটে হয়ে যাচ্ছেন। অথচ এক সময় বেশ হাসিখুশি ছিলেন।

তিনি গোমড়া মুখে বললেন, কেন, মান্তুকে কী দরকার?

রণু বলল, ও আমার একটা বই নিয়েছিল অনেকদিন আগে, ফেরত দেয়নি।

মান্তুর মা বললেন, কে জানে, সে কোথায়! সারাদিন তো ধিঙ্গি-পনা করে বেড়ায়! পড়াশুনো সব গোল্লায় গেছে।

রণু জানে, এ বাড়িতে এলেই কারো না কারো কাছ থেকে খারাপ কথা শুনতে হবে। কেউ সোজা সরলভাবে কিছু বলে না। যেন একটা অভিশপ্ত বাড়ি।

রণু উঠে এলো তিনতলায়।

সানুদার ঘরের দরজাটা খোলা দেখেই রণুর বুকটা ধক্ করে উঠল। সানুদা ফিরে এসেছে? না, তা হতেই পারে না, পুলিশ খুঁজছে সানুদাকে। নিশ্চয়ই অন্য কোন ভাই দখল করে নিয়েছে সানুদার ঘরটা। সানুদা ফিরে এলে আবার একচোট ঝগড়া শুরু হবে। রণু ঘরে উঁকি দেবার সাহস পেল না।

মান্তুকে পাওয়া গেল ছাদে। জলের ট্যাঙ্কের পাশে পা ছড়িয়ে বসে একটা খাতায় কী যেন লিখছে।

রণুকে দেখে সে একটু চমকে উঠে তাড়াতাড়ি খাতাটা বন্ধ করে ফেলল। বলল, কী রে রণু?

রণু বলল, তোর কাছে আমার একটা বই ছিল....'আশ্চর্য দ্বীপ' ....সেই বইটা নিতে এসেছি।

—সেটা তো ফেরত দিয়ে দিয়েছি।

—না তো, ফেরত দিসনি, আমার দরকার এখন।

মান্তু ব্যাপারটায় একটুও গুরুত্ব না দিয়ে বলল, কে জানে, তাহলে সেটা কে নিয়ে গেছে! আমার কাছে নেই। তুই এতদিন বাদে চাইতে এসেছিস কেন? আগে মনে ছিল না?

অনেক ছেলেবেলা থেকেই রণুর সঙ্গে মান্তুর ভাব। কিন্তু কিছুদিন হল মান্তু যেন কী রকম বদলে গেছে। এ পাড়ার সবচেয়ে বখাটে ছেলে সুখেন্দু একদিন বলেছিল, মান্তু ওকে চিঠি লেখে। একই পাড়ার ছেলে সুখেন্দুকে চিঠিতে কী লেখে মান্তু? এখনও কি মান্তু চিঠি লিখছিল? তাকে দেখে লুকিয়ে ফেলল?

—সানুদার খবর কী রে, মান্তু?

—সানুকাকা? কেন, সানুকাকার খবর দিয়ে কী দরকার?

—এমনি জিজ্ঞেস করছি।

—সানুকাকাকে তো পুলিশ দেখলেই মেরে ফেলবে! সানুকাকা একটা খুনী!

—সানুদা তো একটা গুণ্ডাকে মেরেছে। নইলে সে-ই সানুদাকে মেরে ফেলত! এটা মোটেই দোষের কাজ না!

—কী জানি বাবা! সানুকাকা বাবাকে চিঠি লিখেছিল মুঙ্গের থেকে। টাকা চেয়েছিল। আমার বাবা কেন টাকা দেবে?

রণুর শরীরটা কেঁপে ওঠে। সানুদার নিশ্চয়ই এখন খুব টাকার

দরকার। লুকিয়ে থাকতে গেলে তো অনেক টাকা লাগবেই। যদি সানুদার বাড়ির লোকেরা জানতে পারে যে রণুর কাছে সানুদার টাকা জমা আছে...। রণু বলল, আমি চলি।

—আয় না, বোস না আমার কাছে।

—না। তুই সুখেন্দুকে কিস করেছিস, মান্তু?

—কে বলল?

—সুখেন্দুই বলছিল।

মান্তু হঠাৎ হি হি করে অসভ্যের মতন হেসে বলল, বেশ করেছি! তোর বুঝি হিংসে হয়েছে তাতে?

আর কথা না বাড়িয়ে রণু বাড়ি ফিরে এলো। কিন্তু তার মনের মধ্যে একটা চিন্তার বোঝা চেপে রইল। সানুদার টাকার দরকার। যে কোন সময় এসে টাকা চাইতে পারে!

টাকাগুলো পুরোনো কাগজপত্রের তলায় আবার খুব সাবধানে লুকিয়ে রাখে রণু। তার বুকে ব্যথা করে।

সে জানে, তাদের পরিবারের ওপর একটা অভাবের কালো ছায়া পড়েছে। সব সময় টাকা নেই, টাকা নেই ভাব। তার মা, দাদা, দিদির মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে। শুধু টাকা থাকা না থাকার ওপর মানুষ কত বদলে যায়! সবাই ধরে নিয়েছে, বাবা আর কোনদিন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন না।

কেউ জানে না, একমাত্র রণুই পারে সব সমস্যার সমাধান করে দিতে। পাড়ার ডাক্তার বলেছিলেন, একজন স্পেশালিস্টকে এনে দেখাতে। কত ফি লাগে একজন স্পেশালিস্টের? একশো, দুশো, পাঁচশো টাকা? রণু পারে। অনায়াসেই দিতে পারে সেই টাকা। মা আর দাদা একদিন ফিসফিস করে পরামর্শ করছিল, মধুপুরে মায়ের বড় মামার একটা বাড়ি আছে, সেখানে গিয়ে যদি একমাস থাকা যায় —কিন্তু কত খরচ হবে, অন্তত হাজার দেড়েক, বাড়ি ভাড়া না লাগলেও ট্রেন ভাড়া, খাবার খরচ, হঠাৎ যদি সেখানে বাবার শরীর খারাপ হয়ে যায়, তাহলে ডাক্তার ডাকতে হবে...সেইজন্য আর মধুপুর যাবার কথাটা বেশি গুরুত্ব পায়নি। যে মানুষটা বছরের পর বছর কপালের ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার করে এই সংসারটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে আজ তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য হাজার দেড়েক টাকা খরচ করা যায় না।

কিন্তু রণু পারে। সে কালই মা আর দাদাকে বলতে পারে —যাও, মধুপুরের টিকিট কিনে আনো, এই নাও ট্রেনের ভাড়া। সেখানকার খরচ চালাবার জন্য ভয় পাচ্ছ? এই নাও দু' হাজার। রণু বাবাকে একদম সুস্থ করে ফিরিয়ে আনবে মধুপুর থেকে।

রণু আর একবার তাকাল জানালার দিকে। সানুদা যে কোনো মুহূর্তে এসে বলতে পারে—দে, আমার টাকা দে!

সানুদা এখন খুনী আসামী, তার এখন বেশি টাকার দরকার। সানুদা বিশ্বাস করে রণুর কাছে টাকা রেখে গেছে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সানুদা কোনো না কোনো সময় এসে হাজির হবেই। তখন যদি রণু বলে টাকাটা খরচ হয়ে গেছে, তাহলে সানুদা কি তাকে ক্ষমা করতে পারবে? যদি হঠাৎ খুব রেগে যায়? কিংবা খুব দুঃখ পেয়ে বলে, রণু, শেষ পর্যন্ত তুই-ই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলি?

সানুদা খুনী, তার মানে কি সানুদার কাছে রিভলবার আছে?

আসলে রণুর নিজেরই চাই একটা রিভলবার! রণু তার ডান হাতটা রিভলবারের মতন করে চারপাশে ঘোরাতে লাগল। সত্যি সত্যি একটা রিভলবার পেলে সে সকলকে ঠাণ্ডা করে দিতে পারে। একটা রিভলবারের দাম কত টাকা? চার হাজার দুশো পঁচিশ টাকা দিয়ে সে একটা রিভলবার কিনতে পারবে না?

বরেন আজকাল আর পড়তেই বসে না। রাত্তিরবেলা বাড়িতেও ফেরে অনেক রাত্রে। আগে বাবার ভয়ে সে বাবার থেকে আগে ফিরে আসত। এখন বাবা বাড়িতেই থাকেন। কিন্তু বাবাকে ভয় পাবার কিছু নেই আর।

মা একদিন বরেনকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই এত রাত্ত পর্যন্ত কোথায় থাকিস রে?

বরেনের ভাবভঙ্গি অনেকটা হেড অব দা ফ্যামিলির মতন হয়ে গেছে এরই মধ্যে। গম্ভীরভাবে বলল, আমি একটা টিউশানি পেয়েছি এ মাস থেকে। সেই নিউ আলিপুরে, সেখান থেকে ফিরতে দেরি হয়ে যায়!

মা অবাক হয়ে বললেন, তুই সন্ধেবেলা টিউশানি করবি? সে কি! আর মাস দেড়েক পরেই তো তোর ফাইন্যাল পরীক্ষা!

—পরীক্ষা আমি দেব না ভাবছি!

—কী বললি ? পরীক্ষা দিবি না ? এত দূর পর্যন্ত পড়েও পরীক্ষা দিবি না ?

—কী হবে পরীক্ষা দিয়ে ? আমি চাকরি খুঁজছি। অনেককে বলে রেখেছি।

—তুই যে বলেছিলি, আরও পড়বি, রিসার্চ করবি।

—মা, তুমি এত অবুঝ কেন ? বুঝতে পারো না যে বাবার পক্ষে আর কাজ করা সম্ভব হবে না ? এখন থেকে আমাকেই সংসার চালাতে হবে !

—ডাক্তার যে বলেছেন, কিছু দিন বিশ্রাম নিলেই উনি ভাল হয়ে যাবেন ?

—হ্যাঁ, মানে, তা হবেন, কিন্তু অত পরিশ্রম আর বাবাকে করতে দেব কেন ! আমি দায়িত্ব না নিলে...

—তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু তুই এই পরীক্ষাটা অন্তত দিয়ে নে !

—কোন লাভ নেই, এই পরীক্ষায় বসলে আমি ফেল করব। সব সময় টাকার চিন্তা নিয়ে পড়া হয় না।

রণু সব শুনল আড়াল থেকে। টাকা, টাকা, টাকা ! টাকা ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই !

পরদিন রণুর ঘুম ভাঙল বেশ বেলায়। মা এসে দরজা ধাক্কাতেই সে ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলে দিল। তার অন্য কোন কথা মনে ছিল না।

মা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এই চাদরটা কার ?

রণুর তখন খেয়াল হল। তার গায়ে সানুদার চাদর। ধরা পড়া চোরের মতন সে কুঁকড়ে গেল। একবার তার মনে হল, সব সত্যি কথা বলে দেয়। কিন্তু পারল না।

সে আমতা আমতা করে বলল, কোন্‌টা ? এটা তো—মানে—এটা সন্দীপের।

—সন্দীপের চাদর ? তুই এনেছিস কেন ? কখন এনেছিস ?

—কাল ইস্কুল থেকে···খেলার সময় সন্দীপ আমার কাছে রাখতে দিয়েছিল, তারপর আমি সঙ্গে নিয়ে চলে এসেছি····

—কই, কাল যখন ইস্কুল থেকে ফিরলি, তখন দেখলাম না তো !

একবার একটা মিথ্যে কথা বললে, তার জের টেনে যেতে হয়। রণুর স্কুলের বন্ধুদের মধ্যে সন্দীপরাই বেশ বড়লোক, তার এ রকম চাদর থাকতে পারে। যদিও আজকাল কোন স্কুলের ছেলেই এ রকম শাল গায়ে দিয়ে স্কুলে যায় না। কিন্তু মাকে বোঝাতেই হবে। সে জোর দিয়ে বলল, ছিল, তুমি লক্ষ করনি।

মা তবু ভুরু কুঁচকে রইলেন। বললেন, সন্দীপ জানে না তুই এটা এনেছিস?

—হ্যাঁ জানে।

—তাহলে এনেছিস কেন? খেলা হয়ে যাবার পর ওকে ফেরত দিসনি কেন?

—মানে সন্দীপ রাখতে দিয়েছিল, তারপর নিজেই কখন বাড়ি চলে গেল...

সন্দীপের বাড়ি বেশি দূর নয়। এক একদিন সকালে সন্দীপ রণুকে ডাকতে আসে সকালবেলা, যদি আজই চলে আসে সন্দীপ? এতগুলো মিথ্যে কথা রণু একসঙ্গে আর কখনো বলেনি। ভেতরে ভেতরে সে কাঁপছে।

—আজই ফেরত দিয়ে দিবি। দামী জিনিস।

সুতরাং সেদিন স্কুলে যাবার সময় রণুকে শালটা নিয়ে বেরুতে হল। বাড়ি থেকে বেরিয়েই শালটা খুব ছোট করে ভাঁজ করে লুকিয়ে রাখতে হল তাকে। সানুদাদের বাড়ির কেউ দেখলে চিনে ফেলতে পারে। সানুদা যে কী বিপদেই ফেলে গেল তাকে! মাকে সব কথা খুলে বললে নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়ে যেতেন। সানুদা এখন একজন খুনী আসামী, তার শাল লুকিয়ে রাখা কি সোজা কথা! তা ছাড়া টাকাটা? সানুদা যদি টাকার কথা সবাইকে বলে দেয়, তাহলে কী হবে? টাকাটা কি সানুদার কাছে দিয়ে আসা হবে? কিন্তু যারা সানুদাকে একটুও ভালবাসে না, তারা ঐ টাকা পাবে কেন? তাদের তো কোন অধিকার নেই। টাকাটা পুলিশের কাছে জমা দিয়ে আসা উচিত? কিন্তু পুলিশ যদি বিশ্বাস না করে? পুলিশ যদি বলে, হেবোকে খুন করার পর সানুদা লুকিয়ে এসে এই টাকাটা তার কাছে রেখে গেছে! এটা কোন চুরি-ডাকাতির টাকা! তাহলে?

কিংবা টাকাটা বাবার চিকিৎসার জন্য খরচ করা হবে? তারপর,

লুকিয়ে লুকিয়ে সানুদা একদিন আসবে। তার ভীষণ টাকার দরকার। তাকে পালাতে হবে এ দেশ ছেড়ে, একটুও সময় নেই। সানুদা বলবে, দে রণু, টাকাটা দিয়ে দে ঝটপট!

একটা রিভলবার, একটা রিভলবার না থাকলে রণু কিছুই সামলাতে পারবে না।

কিংবা, যদি আর একটা কাজ করা যায়....। সানুদা যেদিন টাকাটা চাইতে আসবে, মানে, যদি আসে, রণু বলবে, টাকা! কিসের টাকা! আমি আপনার টাকার কথা কী জানি! আমার কাছে আপনি টাকা চাইছেন কেন?

সানুদা রেগে উঠবে, চ্যাঁচামেচি করবে, তখন রণু চেঁচিয়ে উঠবে, পুলিশ! পুলিশ!

তক্ষুনি পুলিশ না হোক, অনেক লোক নিশ্চয়ই ছুটে আসবে সেই চ্যাঁচামেচি শুনে। পাড়ার সবাই সানুদাকে খুনী বলে জানে। তারা সবাই জাপটে ধরবে সানুদাকে, অত লোকের হাত এড়িয়ে সানুদা নিশ্চয়ই পালাতে পারবে না। সানুদাকে দেওয়া হবে থানায়। তারপর বিচারে যদি সানুদার ফাঁসি হয়, ব্যস, আর কেউ কোন দিন রণুর কাছ থেকে চাইতে আসবে না টাকা!

বিচারের সময় সানুদা যদি বলেও যে রণুর কাছে তার টাকা জমা আছে, তখনও রণু স্রেফ অস্বীকার করবে সে কথা। রণু বলবে, ধর্মাবতার, উনি আমার আত্মীয় হন না, কিছু হন না, শুধু শুধু উনি কেন আমার কাছে টাকা রাখতে যাবেন!

বিচারক নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন রণুর কথাই। সানুদার ফাঁসি-টাঁসি হয়ে গেলে সে বলবে যে ঐ টাকাটা সে রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছে ...ভাবতে ভাবতে রণুর চোখে জল এসে যায়! না না, সে চায় না সানুদা মরে যাক! সানুদাকে কেউ ভাল না বাসলেও সে ভালবাসে!

এখন কথা হচ্ছে, এই শালটা রাখা হবে কোথায়? রণুর গায়ে বেশ জ্বর, তার আজ ইস্কুলে আসা উচিত ছিল না। কিন্তু মাকে এ কথাটা বললেই মা আরও বেশি ভয় পেয়ে যেতেন। তা ছাড়া শালটার কথা চেঁচামেচি করে শুনিয়ে দিতেন বাবাকে, দাদাকে। রণুর কান্না পেয়ে যাচ্ছে।

ইস্কুলের কোন বন্ধুর কাছে...দারোয়ানের কাছে....কিংবা বাগ-

বাজারে পিসেমশাইদের বাড়িতে শালটা রেখে আসবে? যেখানেই রাখুক, জানাজানি হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

তারপর রণুর মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। সে শালটাকে ফেলে দিল মাটিতে। বেশ ধুলো লাগল সেটাতে। আবার মাটিতে ফেলে ভাল করে ধুলো লাগাল। এবার ঠিক হয়েছে।

ইস্কুল পেরিয়ে সে চলে গেল শ্যামবাজারে। সেখানে একটা শাল-করের দোকানে শালটা কাচতে দিয়ে রসিদটা যত্ন করে রেখে দিল পকেটে। সানুদা শাল চাইতে এলে সে রসিদটা দিয়ে দেবে।

বাবাঃ বাঁচা গেল। মস্ত বড় একটা ঝামেলা চুকল। এখন একমাত্র কাজ বাকি রইল, কোনো ছুতোয় সন্দীপের সঙ্গে ঝগড়া করা। যাতে সে অন্তত এক মাসের মধ্যে আর তাদের বাড়িতে না যায়। সে পরে দেখা যাবে।

যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে, এখন আর ইস্কুলে যাওয়া যায় না। তা ছাড়া জ্বরে তার মাথা ঝিমঝিম করছে! সে হাঁটতে হাঁটতে শ্যাম পার্কে গিয়ে খানিকটা ছায়ামাখা ঘাসের ওপর শুয়ে রইল।

রণুর ঘুম ভাঙল বিকেলে। মাথায় অসহ্য ব্যথা। তবু তাকে তো বাড়ি ফিরতেই হবে। সবাই চিন্তা করবে। খিদেও পেয়েছে খুব। হাঁটতে ইচ্ছেই করছে না। রণু রিক্‌শা করে বাড়ি যেতে পারে। ভাড়া কে দেবে? রণু নিজেই দিতে পারে—সানুদার টাকা থেকে পাঁচটা টাকা বার করে নিয়ে···রণু কোনদিন ইস্কুল থেকে রিক্‌শা করে বাড়ি ফেরেনি। আজও ফিরবে না। সে পা টেনে টেনে চলতে লাগল।

রণুকে দেখে মা প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, চাদরটা সন্দীপকে দিয়ে এসেছিস?

রণু ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

সে এর মধ্যেই পাকা মিথ্যেবাদী হয়ে উঠেছে।

সেদিন সন্ধেবেলা রণুর দুটো বিশ্রী অভিজ্ঞতা হল। শুধু বিশ্রী নয়, ভয়েরও।

মাঝে মাঝে দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনরা দেখতে আসে বাবাকে। কেউ কোন উপকার করে না, শুধু উপদেশ দেয়। এদের জন্য আবার চা তৈরি করে দিতে হয় মাকে। শুধু শুধু পয়সা খরচ। সেদিন এসেছিলেন এক মেসোমশাই। তিনি বেশ বড়লোক আর অহঙ্কারী। শুধু দুটো কমলালেবু নিয়ে এসেছেন। খুব ভারিক্কি চালে বললেন,

কই, দেখে তো মনে হচ্ছে না খুব অসুখ! জোর করে মনের জোর আনলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—

বাবা একটাও কথা বললেন না তাঁর সঙ্গে।

মেসোমশাই বললেন, কই, উঠে দাঁড়ান তো একবার। দেখি।

বাবা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

মেসোমশাই মাকে বললেন, দিদি আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন। আজকাল মনের জোরটাই আসল।

মা বললেন, কী জানি! শরীরে একদম শক্তি নেই। একটুও হাঁটতে পারেন না। ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে যেতে হয়...

—জোর করে বেরিয়ে পড়লেই হয়। এই রণু, বাবাকে নিয়ে পার্কে যাবি সকালবেলা, বেশ খানিকটা হাঁটিয়ে আনবি।

রণু বলল, বাবা বাজারে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন।

মেসোমশাই গুরুত্বই দিলেন না সে কথায়। সারাক্ষণ বকবক করে গেলেন। বাবা সারাক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর বাবাকে যখন চা দেওয়া হয়েছে সেই সময় বাবা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, বুলা দেখ! আমার গায়ে পোকা!

মা বললেন, কই?

সুতপাও বলল, পোকা! কোথায় বাবা?

বাবা বললেন, দেখতে পাচ্ছিস না? আমার সারা গায়ে পোকা কিলবিল করছে! দেখতে পাচ্ছিস না?

মা বললেন, কোথায় পোকা? আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না।

বাবা বললেন, তোমাদের চোখ নেই? এটা কী? এই যে ভাল করে দ্যাখ! বাবা নিজের গা থেকে খুঁটে তুললেন সত্যিই একটা পোকা। ছারপোকার চেয়েও ছোট। কিন্তু জ্যান্ত!

সুতপা বলল, ও একটা পোকা, কোথা থেকে এসে বসেছে।

বাবা বললেন, একটা নয়, অনেক। এই দ্যাখ, আমার সারা গায়ে ছোট ছোট তিলের মতন আটকে বসে আছে। আমার শরীর পচে গেছে। আমার চামড়া খসে খসে পড়বে! হে ভগবান, আমি কী পাপ করেছিলাম—

বাবা খুব জোরে জোরে কাঁদতে লাগলেন। রণু কোনদিন তার বাবাকে কাঁদতে শোনেনি। তার জাঁদরেল বাবা, স্কুলে সবাই যাকে

ভয় করত, সেই তিনি একটা শিশুর মতন কিংবা একটা পাগলের মতন কাঁদছেন।

রণু দাঁড়িয়ে ছিল দরজার বাইরে। লোকলজ্জার ভয়ে মা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলেন। নিজের ঘরে রণু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সে জানত না সে বাবাকে এত ভালবাসে। জ্যান্ত মানুষের গায়ে সত্যিই পোকা হয়? বাবার সব কিছু সেরে যাবে, যদি এক মাসের জন্য মধুপুরে নিয়ে যাওয়া যায়। মাত্র দেড় হাজার টাকা! রণুর কাছে আছে, অনেক টাকা—

রাত আটটার সময় বাড়িওয়ালাদের সঙ্গে দারুণ ঝগড়া লাগল বরেনের, ওরা আজকাল খুবই বাড়াবাড়ি করছে। যখন তখন জল বন্ধ করে দেয়। সেদিন বরেন টিউশানি করতে যায়নি। বরেনের সন্ধের পর স্নান করা অভ্যেস। বাথরুমে ঢোকবার পর মাঝপথে জল বন্ধ হয়ে গেছে। গামছা পরে বেরিয়ে এসে বরেন বলল, জল কে বন্ধ করেছে? আমি পুলিশ কেস করব।

ওপর থেকে শিবু ভেংচিয়ে বলল, যাও না, কে বারণ করেছে?

বরেন বলল, যাবই তো। এক্ষুনি যাব।

—যা না, শুধু তড়পাচ্ছিস কেন? তোর কত মুরোদ আমার জানা আছে—

—মুখ সামলে কথা বলবি।

—এক্ষুনি চলে যা। ঐ গামছা পরেই চলে যা।

—মুখ ভেঙে দেব শুয়োরের বাচ্চা!

—আরে যা, যা মানুকে! একবার নেমে এলে চালতাবাগানের ছাতুওয়ালার ছাতু বানিয়ে দেবো!

—নেমে আয় না শালা!

শিবুর দাদা রতন বলল, এই শিবু, তুই চুপ কর। ছোটলোকদের সঙ্গে শুধু ঝগড়া করে লাভ নেই। দ্যাখ না, ওদের আমি কীরকম টাইট দিচ্ছি—

বরেন আরও তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। রতনদা তাকে ছোটলোক বলল! সে আরও গলা চড়িয়ে বলল, এঃ, ভারি ভদ্দরলোক! অশিক্ষিত বাপের টাকায় বারফট্টাই মারে, ভারি একখানা বাড়ি আছে বলে, জাতের ঠিক নেই—

—এই হারামির বাচ্চা, চুপ কর, নইলে তোর থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব—

—তোদের বাপ হারামির বাচ্চা···তোদের চোদ্দগুষ্ঠি হারামি··· বেজন্মার জাত···

ওপরে ওরা দুজন, নিচে বরেন একা। সে একাই লড়ে যাবে। ক্রমে খিস্তিখাস্তা আরও চরমে উঠল। নিজের ঘরের মধ্যে বসে রণু শিউরে শিউরে উঠছে। তার দাদা যে এত খারাপ খারাপ কথা উচ্চারণ করতে পারে, সে জানতই না। বাবা মা শুনছে, তবু দাদার ভ্রূক্ষেপ নেই। অন্যদিন দাদা একটুও চ্যাঁচামেচি করলেই মা এসে বারণ করেন, আজ এক সময় মা-ও এসে দাদার সঙ্গে যোগ দিলেন। মা বলতে লাগলেন, টাকা আছে বলে ওরা যা খুশি করবে, যখন তখন জল বন্ধ করে দেবে, দেশে আইন-কানুন নেই, ছি ছি, নিচু জাত কি আর সাধে বলে···

রণু ভাবল, শেষকালে কি তার দাদাও সানুদাদের বাড়ির লোকদের মতন কুৎসিত ভাষায় ঝগড়া করবে রোজ রোজ? মা দাদাকে উৎসাহ দেবেন? তারা এত নিচে নেমে যাবে? এ বাড়িতে তাদের আর থাকা উচিত নয়। বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করে টেঁকা যায় না। অন্য বাড়ি দেখে উঠে গেলেই হয়। কিন্তু অন্য বাড়িতে গেলেই বেশি ভাড়া লাগবে। অন্তত ডবল। আবার সেই টাকা! শুধু টাকার জন্য তারা খারাপ হয়ে যাবে!

একটা রিভলবার, একটা রিভলবার থাকলে রণু সবাইকে ঠাণ্ডা করে দিত।

বরেন আজকাল সব সময় খিটখিট করে। একটুও হাসে না! সে এ রকম ছিল না মোটেই। রণু তার দাদার দুঃখটা বোঝে। বরেনের খুব শখ ছিল সে এম, এ, পাশ করে রিসার্চ করবে। তারপর বিদেশ যাবে। কিন্তু এখন তাকে পড়াশুনো ছেড়ে চাকরি খুঁজতে হচ্ছে। রণু একদিন শুনেছিল, দাদা তার এক বন্ধুকে খুব তেতো গলায় বলছিল, একটা দুশো-আড়াইশো টাকার কেরানিগিরি পেলেও এখন নিয়ে নিতাম। অথচ আগে দাদা সব সময় বলত, আর যা-ই হই, কেরানি কিংবা মাস্টার হব না কক্ষনো! কিন্তু চাকরি করতে হবে বলেই কি দাদাকে এত খারাপ হয়ে যেতে হবে? কত লোক তো চাকরি করে! কই, সবাই তো রিসার্চ করে না!

রণু আর থাকতে না পেরে দৌড়ে গিয়ে দাদার হাত চেপে ধরে বলল, দাদা, দাদা, ঘরে চলে এসো!

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বরেন বলল, তুই যা! ওরা আসুক না, দেখি ওদের কত মুরোদ!

রণু বললে, মা, দাদাকে বারণ কর!

মা সে কথা গ্রাহ্য না করে দাদার সঙ্গে যোগ দিয়ে বললেন, সব সময় গায়ের জোর দেখাবে? কেন, দেশে থানা-পুলিশ নেই? আমরা কি বিনা ভাড়ায় থাকি?

শেষ পর্যন্ত রতন-শিবুর সঙ্গে বরেনের মারামারিই লেগে যেত, এই সময় রমেনবাবু আর নীলাঞ্জন এসে পাড়ায় ঝগড়াটা তখনকার মতন থামিয়ে দিলেন। নীলাঞ্জনবাবুকে গুপ্তচর ভেবেছিল রণু, কিন্তু মানুষটা ভাল। বাবার অসুখ শুনে একদিন দেখতে এসেছিলেন।

যত রাত হতে লাগল, তত বাড়তে লাগল রণুর মাথার যন্ত্রণা। সে কারুকে কিছু বলেনি। মা-ও আজকাল তেমন লক্ষ করেন না। সব কিছু ছন্নছাড়া হয়ে গেল কেমন। সবই টাকার জন্য। অথচ রণুর কাছে টাকা আছে, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। রণুর কাছে টাকা না থাকলে তার এত যন্ত্রণা হত না। দিদিকে যেমন কিছুই মাথা ঘামাতে হচ্ছে না। দিদি তো বাবার অসুখের পরেও প্রায়ই সেজে-গুজে বেড়াতে যায়।

একটা যদি কোন মন্ত্র পাওয়া যেত! এমন একটা মন্ত্র, যেটা উচ্চারণ করলেই সকলে বলত, না না, আমরা আর খারাপ হব না। আমরা সবাই সবাইকে ভালবাসব। সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে সে রতনদা আর শিবুদাকে বলত, তোমরা আর খারাপ ব্যবহার করবে? তোমরা অনীতাদিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ। কেন অনীতাদি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন! অনীতাদিকে ফিরিয়ে আনবে বল? নইলে তোমাদের নরকে পাঠাব। সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে সে সানুদাকে বলত, আপনি আর কোনদিন মারামারি করবেন না বলুন। আপনার টাকা আমরা খরচ করেছি, রাগ করবেন না বলুন! সেই মন্ত্র দিয়ে রণু তার বাবাকেও সরিয়ে তুলবে। বাবাকে নিয়ে যাবে মধুপুরে, মাত্র দেড় হাজার টাকা...

সেরকম মন্ত্র কেউ রণুকে দেবে না। একটা রিভলবার, মন্ত্রের বদলে একটা রিভলবার পেলেও রণু সবাইকে ঠাণ্ডা করে দিতে পারে।

সকলের কপালের সামনে রিভলবার উঁচিয়ে ধরে বলবে, তোমরা সব ভাল হও।

এই পৃথিবীতে সবাই সবাইকে যদি ভালবাসে, তাহলে সব কিছু কত সরল হয়ে যায়। তবু মানুষ কেন এত ঝগড়া করে।

দুটো রুটি, খানিকটা আলু পোস্তর তরকারি আর খানিকটা গুড় দেওয়া হয়েছিল রাত্রির খাবার হিসেবে। এখন আর রোজ মাছ হয় না। রণুর খাবার ইচ্ছে ছিল না। খানিকটা নাড়াচাড়া করে উঠে পড়ল। তারপর আর বই পড়তেও ইচ্ছে করল না। শুয়ে পড়ল, তবু ঘুম আসে না। কেউ যদি মাথায় হাত বুলিয়ে দিত! কে দেবে? মা আসতে পারবেন না, থাকবেন বাবার পাশে। দিদিও আসবে না। দিদি আজ বেশ রাত করে ফিরেছে, তাই মা'র সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে, দিদি রাগ করে শুয়ে পড়েছে। দিদি নাকি সোনা বিক্রি করতে গিয়েছিল।

ব্যাপারটা সত্যি অদ্ভুত।

সেদিন দিদি বাড়ি ফিরেছিল তিনতলার সেই নীলাঞ্জনবাবুর সঙ্গে। দিদির শাড়িতে ধুলো কাদা লেগে আছে, চুলগুলো উস্কোখুস্কো। মা তো সেই অবস্থায় দিদিকে দেখে আঁতকে উঠেছিলেন।

নীলাঞ্জনবাবু মাকে বললেন, ভয় পাবেন না, বিশেষ কিছু হয়নি, তবে অনেক কিছু হতে পারত...।

নীলাঞ্জনবাবু কিসফিস করে পুরো ঘটনাটা বলেছিলেন, ভবানীপুরের কাছে যেখানে সারি সারি অনেকগুলো গয়নার দোকান, সেখানে দিদি গিয়েছিল সোনা বিক্রি করতে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দিদি দোকানে ঢুকতে সাহস করেনি। কীভাবে সোনা বিক্রি করতে হয় দিদি তো জানে না! কয়েকবার এগিয়ে গেছে দোকানের দিকে, আবার ফিরে এসে দাঁড়িয়ে থেকেছে ফুটপাথে। এই সময় একটা লোক, অনেকটা ভদ্রগোছের চেহারা, দিদির হাতের ব্যাগটা ধরে এক টান দেয়। লোকটা ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়েই পালাত। কিন্তু দিদি দারুণ শক্ত করে ধরেছিল ব্যাগটা। টানের চোটে দিদি পড়ে যায় রাস্তার ওপরে। তখনও কিন্তু ব্যাগটা ছাড়েনি। ইতিমধ্যে রাস্তার লোকজন এসে ওদের ঘিরে ফেলে। তখন সেই লোকটা বলে যে দিদি তারই বোন, কিন্তু মাথা খারাপ, সেইজন্য লোকটা ওকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। দিদি

শুধু কাঁদতে কাঁদতে বলছিল—মিথ্যে কথা, সব মিথ্যে কথা—। কান্নার চোটে দিদি কথা বলতে পারছিল না। এর মধ্যে আবার দিদির ব্যাগটা খুলে গিয়ে সোনা বেরিয়ে পড়ে।

ভিড়ের লোকজন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিল না। এদিকে সেই লোকটা দিদিকে বাড়িতে নিয়ে যাবার নাম করে তখনও টানাটানি করছিল।

এই সময় হঠাৎ নীলাঞ্জনবাবু রাস্তা দিয়ে যাবার সময় ভিড় দেখে উঁকি মারেন। তিনি দিদিকে চিনতে পারেন। ছিনতাইবাজটা কিন্তু তখনও দিদির নামে বানিয়ে বানিয়ে যা-তা কথা বলছিল। নীলাঞ্জনবাবু ভিড়ের লোকদের বললেন, বেশ তো, সবাই মিলে থানায় চলুন তাহলে! থানার নাম শুনেই লোকটা পালিয়ে গেল।

নীলাঞ্জনবাবু সত্যি ভাল লোক। ওর জন্যই দিদি আজ খুব জোর বেঁচে গেছে।

সব কথা শুনে মা তো প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন। কোনো রকমে সামলে নিয়ে বললেন, সোনা! তুই সোনা পেলি কোথায়?

দিদি সোনা চুরি করেছিল। নিজের বাড়ি থেকেই।

দিদির বিয়ের জন্য এই সোনা কিনে রেখেছিলেন বাবা। দিদি গোপনে সেই সোনা বিক্রি করতে গিয়েছিল।

নীলাঞ্জনবাবু ওপরে চলে যাবার পর দিদি বলেছিল, আমার বিয়ের জন্য তোমাদের ভাবতে হবে না। যদি আমি কখনো বিয়ে করি, তা হলে শুধু একটা শাঁখা পরে শ্বশুরবাড়ি যাব। আর যদি সে রকম-ভাবে আমায় কেউ বিয়ে করতে রাজি না হয়, তাহলে আমি বিয়েই করব না। তা বলে বাবার চিকিৎসা হবে না?

দিদির বিয়ে একজনের সঙ্গে ঠিক করাই আছে। সামনের শীতকালে বিয়ে হবার কথা। সেই প্রসঙ্গ নিয়ে আবার দিদির সঙ্গে মায়ের তুমুল ঝগড়া লেগে গেল।

ঝগড়া আর ঝগড়া! শুধু ঝগড়া! যদি অনীতাদি একটু হাত বুলিয়ে দিত মাথায়! অনীতাদি নেই। অনীতাদি, তুমি কোথায়। আমার কথা তোমার একটুও মনে পড়ে না!

জানালার কাছে কে? সানুদা এলো নাকি? না, কেউ নয় তো। সানুদা, তুমি কেন আসছ না? সানুদা, তুমি এসো, তোমার

টাকাগুলো সব নিয়ে যাও, আমাকে মুক্তি দাও! সানুদা, আমি আর পারছি না—

রাত দুটোর সময় রণু উঠে বসল বিছানায়। আবার খুব শীত করছে তার। কাল তবু সানুদার শালটা ছিল। নিজেরই বোকামিতে রণু ধরা পড়ে গেছে।

রণু একটা উপায় ঠিক করে ফেলেছে। আর কোন রাস্তা নেই। জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে। শিগ্‌গিরই তার কঠিন একটা অসুখ হবে বোধহয়। তাহলে বাড়ির লোক তাকে নিয়ে খুব বিব্রত হয়ে পড়বে। একেই তো বাবার অসুখ, তার ওপর সেও যদি অসুখে পড়ে, দাদা আর মা কী করবে? টাকা পয়সা আসবে কোথা থেকে? রণুর কাছে টাকা আছে, সে টাকা সে কিছুতেই খরচ করতে পারবে না। বাবা-মা-ই তো তাকে শিখিয়েছিলেন কক্ষনো পরের টাকা না নিতে। বিশেষ করে একজন খুনী আসামীর টাকা। সানুদা, তোমাকে যে যা-ই ভাবুক, আমি তোমাকে খারাপ ভাবব না।

বাক্স খুলে সে আবার টাকাগুলো গুনে দেখল। সব ঠিক আছে। সে একটা টাকাও খরচ করেনি। সানুদা বিশ্বাস করে রাখতে দিয়েছিলেন, সে বিশ্বাস সে ভাঙেনি। সে একবার মনে মনে ভেবেছিল, সানুদা মরে গেলে ভাল হয়। সে জন্য সে অনুতপ্ত। না, সে সানুদার মৃত্যু চায় না। সানুদা বেঁচে থাকুক। পুলিশ সানুদাকে ক্ষমা করে দিক। সানুদা আবার ভাল হয়ে যাক।

রণু অন্য কারুরই মৃত্যু চায় না। সে চায় পৃথিবীতে সবাই সুখী হোক। কেউ যেন আর কারুকে কখনো না মারে, কেউ যেন আর খারাপ ভাষায় গালাগালি না দেয়। যদি তারা এ বাড়ি থেকে উঠে গিয়ে অন্য কোথাও একটা ভাল বাড়ি নেয়···দিদির বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে যায় যদি....দাদা পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করে রিসার্চ শুরু করে, বাবা ভাল হয়ে উঠে আবার কাজ শুরু করেন, মায়ের খুব শখ একবার পুরীতে যাওয়ার, মা কখনো সমুদ্র দেখেননি....অনীতাদির সঙ্গে তাঁর বরের ঝগড়া মিটে গেলে অনীতাদি আবার হাসতে হাসতে বেড়াতে আসবেন এ বাড়িতে....।

এমন কোন মন্ত্র হয় না, যাতে এই সব ঠিকঠাক হয়ে যেতে পারে। এমন কি একটা রিভলবার পেলেও সব কিছু ঠিক হবে না। কিন্তু তবু রণু পারে। সে সব ঠিক করে দেবে।

রণুর কত জ্বর এখন ? একশো চার পাঁচ হবে বোধহয়। সে চোখ খুলে রাখতে পারছে না। তবু তার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠেছে অদ্ভুত রকমের। সে আর পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট দেখবে না। সে সব ঠিক করে দেবে।

একটা মাত্র উপায় আছে। রণু বিছানার চাদরটা তুলে নিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে একটা দড়ির মতন করল। বিছানার ওপর চেয়ারটা তুলে তার ওপর দাঁড়িয়ে ঘরের ছাদের যে হুকটায় পাখা ঝোলার কথা অথচ পাখা নেই, সেটার মধ্যে দিয়ে গলিয়ে দিল চাদরের দড়িটা। তার-পর একটা ফাঁস বাঁধল, বাঃ চমৎকার। এবার নিচে নেমে এসে সে তার রাফ খাতা থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিল। কী লিখবে সে ঠিক করে ফেলেছে। কিন্তু লিখতে গিয়ে তার হাত কাঁপছে অসম্ভব। কেন এমন হচ্ছে, সে তো ভয় পায়নি। নিশ্চয় জ্বরের ঘোরে সে তার হাত ঠিক রাখতে পারছে না। মনে জোর এনে সে চিঠিখানা শেষ করল। খুবই ছোট চিঠি ঃ

সকলের উদ্দেশে ঃ

এ পৃথিবীতে কেউ কাউকে ভালবাসে না। আমি এ পৃথিবীতে আর বাঁচতে চাই না। ইতি—রণেন।

পুনশ্চঃ আমার নাম রণেন, কিন্তু আমি জীবনযুদ্ধে হেরে গেলাম।

পুনশ্চ পুনশ্চঃ মা, বিদায়। ইতি তোমার রণু।

চিঠিখানা লিখে যেন সন্তুষ্ট হল রণেন। এটাই সবচেয়ে ভাল হবে। সে মরে গেলে, তার জন্যে আর কারুকে কিছু খরচ করতে হবে না। সে মরে গেলে, একদিন না একদিন তার ঘরের সব জিনিস-পত্র খোঁজাখুঁজি হবেই। তখন টাকাটা পেয়ে যাবে মা কিংবা দাদা। যতই অবাক হোক, টাকাটা ঠিকই কাজে লেগে যাবে। সানুদাও আর টাকা চাইতে পারবে না! সে মরে গেল, আর কার কাছে চাইবে? অন্য কেউ তো সানুদার টাকার কথা জানে না!

চিঠিটা টেবিলে চাপা দিয়ে রণু আবার বিছানার ওপরে উঠে দাড়াল। ফাঁসটা গলায় পরে শান্তভাবে দাড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। না, সে ভয় পায়নি। পায়ের ধাক্কা দিয়ে চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে দিল সে।

গলায় প্রথম চাপ লাগবার মুহূর্তে সে একবার মাত্র ডেকে উঠল, মা—

রণুর জ্ঞান ফিরল পরদিন সকাল এগারোটায়। হাসপাতালে!

প্রথমে রণু বুঝতেই পারল না সে কোথায় আছে। তারপর সে দেখল কতকগুলো মুখ। সবাই তার খাট ঘিরে দাড়িয়ে আছে। দিদি রতনদা, শিবুদা। শিখাদি, নীলাঞ্জনবাবু, আর কে? অনীতাদি না! অনীতাদি কোথা থেকে এলো? এরা সবাই এক জায়গায় এক সঙ্গে কী করে এলো? রতনদা ফিসফিস করে তার দাদার সঙ্গে কথা বলছে।

রণু ভাবল, সে কি স্বপ্ন দেখছে? না সত্যি? সে একবার চোখ বুজে আবার চোখ মেলল। সেই সব মুখ তখন তার দিকে চেয়ে আছে। সবাই একসঙ্গে কী করে এলো এখানে? এটা কোন্ জায়গা? তবে কি রণু মন্ত্রটা পেয়ে গেছে?

রণু বেশি ভাবতে পারছে না। তার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে খুব। তবু খুব একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে রণু পাশ ফিরে শুলো। কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। রণু এখন সাড়া দেবে না। যদি ঘোর ভেঙে যায়! যদি মনে হয় এ সবই স্বপ্ন!

হীরকদীপ্তি

পৃথিবীতে সব কিছুই নিয়মে চলে। ফুল ফোটে, গাছের পাতা ঝরে যায়, খেতে না পেয়ে মানুষ কষ্ট পায়, ভালোবাসায় স্বর্গ নেমে আসে, শরীরে আঘাত পেলে ব্যথা লাগে, মানুষ জন্মায় ও মরে—এই সব।

মাঝে মাঝে এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটে যায়। যেমন ঘটে গেল দীপ্তিময়ীর ক্ষেত্রে।

দীপ্তিময়ী তার বাবা মায়ের সাত পুত্র-কন্যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট। পর পর তিন বোনের পর দুটি ভাই, তারপর আবার দুটি বোন। দীপ্তিময়ীর বাবা রেল কোম্পানিতে ছোট চাকরি করতেন, শেষ জীবনে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার হয়েছিলেন বিহারের একটি ছোট জায়গায়। মাইনে সামান্য, তবে উপরি ছিল মন্দ না। সেই সব টাকা মেয়েদের বিয়ে দিতে দিতেই শেষ হয়েছে।

বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন বেশ ধুমধাম করেই—কিন্তু বছর তিনেক পরেই সে মেয়ে বিধবা হয়ে বাপের সংসারে ফিরে আসে। পরের দু' মেয়ের বিয়ে দিতে হয়েছে বেশ কষ্ট করে। ছেলে দুটি সেরকম মানুষ হয়নি—এক ছেলে কোনোক্রমে আই-এ পাস করে রেল কোম্পানিতে ঢুকলেও আর এক ছেলে গুণ্ডামি-বখামি করে বেড়ায়।

এই সব পরিবারের জীবনযাত্রার মধ্যে একটা এক-ঘেয়েমি আছে। প্রতিদিনের ছোট-খাটো হাসি-কান্না যে নেই, তা নয়। কিন্তু সব মিলিয়ে একটাই সুর ধ্বনিত হয়, টাকা নেই, টাকা নেই! টাকা কোথা থেকে আসবে!

মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতেই টাকার চিন্তা সবচেয়ে বেশি। বাড়ির বাইরে বেরুবার সময় তাদের ফর্সা জামা কাপড় পরতে হয়। বাড়িতে চাল বাড়ন্ত হলেও পেটে খিদের চেয়ে বাইরের লোকের কাছে সেটা গোপন করাই প্রধান চিন্তা হয়ে ওঠে। অথচ, কাছেই যে মেথরদের বস্তি, তাদের দুবেলা পুরোপুরি খাওয়া জোটে না প্রায় কোনোদিনই, গায়ে একটা গেঞ্জি পর্যন্ত নেই—তবু অনেক রাত পর্যন্ত তারা ঢোল বাজিয়ে হৈ চৈ করে গান করে।

দীপ্তিময়ীদের সংসারটা খুবই মধ্যবিত্ত। শুধু টাকা পয়সার জন্য নয়, চিন্তার দিক থেকেও। জীবন সম্পর্কে কারুর কোনো উচ্চাশা নেই, শুধু খেয়ে পরে চাকরি বাকরি নিয়ে বেঁচে থাকা। এবং বাড়িতে সোমথ মেয়ে থাকলে তার বিয়ে দেওয়ার চিন্তা জীবন-মরণ সমস্যার চেয়েও বেশি।

শেষ দুটি মেয়ের বিয়ের চিন্তায় বাবা মায়ের পাগল হবার অবস্থা। এমন সময় হঠাৎ সাত দিনের অসুখে দীপ্তিময়ীর ঠিক আগের বোন মারা গেল। যেন আকাশ থেকে একটা বজ্র নেমে এসে মেয়েটিকে কেড়ে নিয়ে গেল। সাত দিন আগেও যে মেয়ে রান্না করেছে, ঝগড়া করেছে, বকুনি খেয়ে কেঁদেছে. সে আজ নেই? এ কি সহজে বিশ্বাস করা যায়? কত লোকেরই তো জ্বর হয়। ছোট খাটো জ্বরে—সব বাড়িতে ডাক্তারও ডাকা হয় না—মেয়েটির জ্বর হঠাৎ এক লাফে একশো পাঁচে উঠে গেল, তখন এলো ডাক্তার এবং ডাক্তারের ওষুধ মুখে নিয়েই সে মরলো।

বিনা চিকিৎসায় সে মরেনি। সুতরাং নিয়তির ওপরেই বরাত দিতে হবে। আর, সত্যি কথা বলতে কি, মরে গিয়ে সে অনেককে নিষ্কৃতি দিয়ে গেল। বাবা-মা ডাক ছেড়ে কাঁদলেন বটে কিন্তু ভেতরে ভেতরে কিছুটা হাঁপ ছেড়েও বাঁচলেন বোধহয়। সেই মেয়েটির শরীরে রূপ ছিল না, গুণও ছিল না তেমন; বিয়ের বাজারে ও মেয়ে একেবারে অচল টাকা।

দীপ্তিময়ীর শরীরে রূপ ছিল। ছেলেবেলা থেকেই তার স্বাস্থ্য ভালো, বারো তেরো বছরেই সে ধাঁ ধাঁ করে লম্বা হয়ে গেল। মাথা ভর্তি কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, টানা টানা চোখ, টিকলো নাক। গায়ের রংও বেশ ফর্সা। এ মেয়ে রাস্তায় বেরুলে সবাই তাকিয়ে দেখে, ছোকরারা মন্তব্য করে, বয়স্ক লোকেরা তার পিঠে হাত দিয়ে কথা বলতে চায়।

দীপ্তিময়ীর চেহারাটা যেমন তার অনেক ভাই-বোনের থেকে আলাদা, তার স্বভাবটাও তেমনি আলাদা। সাত ভাই-বোনের সকলের চেহারায় কোন মিল নেই, তবে দীপ্তিময়ীর বড় দাদার সঙ্গে তার মুখের যেমন মিল আছে—গায়ের রংও এই দু'জনেরই একটু ফর্সা। অথচ, তার দাদা অত্যন্ত নিরীহ, সাধারণ মানুষ। অল্প বয়সেই বুড়োটে হয়ে গেছে—পাঁজি মানে, ঠাকুর-দেবতা মানে। বৃহস্পতিবারে চুল কাটে না, নোখ কাটে না। দীপ্তিময়ী কিন্তু কখনো ব্রত করেনি, ঠাকুর-পুজো করেনি, পুতুল খেলেনি। অল্প বয়েস থেকেই তার বই পড়ার শখ। এই ছোট জায়গায় কোনো লাইব্রেরি নেই, বই কেনারও সাধ্য নেই। তাই এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে যে বই-ই পায় নিয়ে আসে। এমনকি অল্প বয়েস থেকেই বড়দের নভেল পড়তে শুরু করে দাদা-

দিদির কাছে মার খেয়েছে। তবে তার স্বাস্থ্য ভালো, মার খেলেও কাঁদে না।

দীপ্তিময়ীর কৈশোর থেকেই তাকে নিয়ে তার বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তা। এ মেয়েকে বেশিদিন ঘরে রাখা যায় না। মধ্যবিত্ত পরিবারে ভাত কাপড়ের সমস্যার চেয়েও বড় সমস্যা, মেয়েদের সতীত্ব। দীপ্তিময়ী ষোলো বছরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বাপ-মা বিয়ের সম্বন্ধ খুঁজতে লাগলেন।

দীপ্তিময়ীর পড়াশুনোতেও বেশ মাথা। বাড়ির কারুর কাছ থেকে সে কোনো সাহায্য পায় না, তবু সে ইস্কুলের শেষ পরীক্ষা বেশ ভালোভাবে পাশ করে গেল। তারপর সে বায়না ধরলো কলেজে পড়ার।

এ বাড়িতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে কোনো আগ্রহ থাকার কথা নয়। মফস্বলের মধ্যবিত্ত পরিবার এখনও বাড়ির মেয়েদের চাকরি করতে পাঠাবার কথা ভাবে না। আর চাকরি করতে না হলে লেখাপড়া শেখার দরকার কী? কোনক্রমে চিঠি লিখতে পারলেই হলো।

বাড়ির আর কোনো মেয়ে ক্লাস থ্রি-ফোরের বেশি পড়েনি। যে ছেলে দু'জন লেখাপড়া শিখে চাকরি করে বাবা মায়ের দুঃখ ঘোচাবে, তাদেরই বিশেষ কিছু লেখাপড়া হলো না। দীপ্তিময়ী বাড়ির একেবারে ছোট মেয়ে। সে কী লেখাপড়া করছে না করছে বাবা-মা খেয়ালই করেননি! সে-ও কোনদিন কিছু চায়নি। হঠাৎ যেদিন সে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় বসলো, সবাই একেবারে অবাক। তারপর যখন সে পাশও করলো, তখন সবাই একটু খুশি না হয়েও পারলো না। বাবা আফশোস করে বললেন, ইস, আমার এই মেয়েটা মেয়ে না হয়ে যদি ছেলে হতো!

দীপ্তিময়ী জেদ ধরলো সে কলেজে পড়বে।

এ আবদার রক্ষা করা বাবা-মায়ের পক্ষে অসম্ভব। প্রথম কথা, যে ছোট শহরে তা'দর বাস, তার ধারে কাছে পনেরো কুড়ি মাইলের মধ্যে মেয়েদের পড়ার উপযোগী কোনো কলেজ নেই। পাঠাতে হবে পাটনায় কিংবা রাঁচিতে। সেখানে কলেজ ও হোস্টেলে রাখার খরচ টানা অসম্ভব। তা ছাড়া, মেয়ে একটু ডানপিটে ধরনের, হুটহাট করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। এখনো সে গাছে উঠে পেয়ারা পাড়ে, পুকুরে

সাঁতার কাটতে নামলে এক ঘণ্টার আগে উঠতে চায় না। লজ্জা-শরম একটু কম, মার খেলেও কাঁদে না। মেয়েকে চোখের আড়ালে রাখাও বিপদ।

দীপ্তিময়ী কলেজে পড়ার জন্য রীতিমতন কান্নাকাটি করতে লাগলো। মফস্বলের ছোট জায়গায় আটকে থাকতে তার মন চায় না। কিন্তু টাকা পয়সার ব্যাপারটাও বোঝে না সে। তাকে হোস্টেলে রেখে পড়াতে গেলে যে সংসার খরচে দারুণ টান পড়বে, বাড়ির সকলের অসুবিধে হবে—এ কথা বললেও সে শোনে না। কলকাতায় ওদের দু'একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় আছে—তাদের বাড়িতে রেখে পড়ানো যায় কিনা, এরকম একটা ক্ষীণ চেষ্টা করা হলো। তাতে কাজ হলো না কিছুই। আজকালকার দিনে কেউ ঘাড় পেতে ওরকম দায়িত্ব নিতে চায় না।

বাবা মা উঠে পড়ে দীপ্তিময়ীর বিয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। একেবারে কনিষ্ঠ সন্তান—মনের কোণে এর জন্যে একটু অতিরিক্ত স্নেহ জমা হয়ে থাকেই, সুতরাং তাড়াহুড়ো করে যা-তা কোনো জায়গায় বিয়ে দেওয়া যায় না! দীপ্তিময়ীর বাবার রিটায়ার করার সময় এসে গেছে, সব সময় সেই দুশ্চিন্তা!

পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে দাঁড়ালো যখন দীপ্তিময়ী একদিন বাড়ি থেকে পালাবার একটা এলোপাথাড়ি চেষ্টা করলো। ধরাও পড়লো—কেননা ট্রেন ছাড়া যাবার আর কোনো উপায় নেই। এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টারের ছোট মেয়েকে কে না চেনে—যার রূপ সবার চোখ টানে।

অল্পবয়েসী ছেলেরা মাঝে মাঝে রাগ করে বাড়ি থেকে পালায় বটে, কিন্তু বাঙালী মেয়েদের মধ্যে এ রেওয়াজ নেই তেমন। সুতরাং তারা পালাবার নিয়ম-কানুন ঠিক জানে না। হুট করে পালাবো বললেই কি আর পালানো যায়? বাড়ি থেকে পালানো জেল থেকে পালানোর চেয়েও কম শক্ত নয়।

তা ছাড়া সুশ্রী কুমারী মেয়েরা বাড়ি থেকে পালাবার চেষ্টা করলেই সকলে ধরে নেয় সে অন্য কোনো ছেলের সঙ্গে পালাচ্ছে কিংবা মেয়েটির পালাবার ইচ্ছে ছিল না; দুষ্ট প্রকৃতির কোনো লোক তাকে ফুসলে বাড়ির বার করছে। দীপ্তির ক্ষেত্রেও সবাই তাই ভাবলো, কিন্তু

সেই ছেলেটিকে পাওয়া গেল না। তাকে মারধোর করে হাতের সুখ করা থেকে বঞ্চিত হলো অনেকে।

দীপ্তিময়ী পালাবার চেষ্টা করেছিল একা। ঐ বয়েসী মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবার মতন ছেলের অভাব ছিল না, কিন্তু দীপ্তিময়ী সেইসব ছেলেদের কখনো পাত্তা দেয়নি। আড়ালে আবডালে চুমো খাওয়া কিংবা জড়াজড়ি করার দিকেও তার মন ছিল না। সে বাড়ি থেকে পালাতে চেয়েছিল শারীরিক উন্মাদনায় কিংবা রোমান্টিক প্রেমের আকর্ষণে নয়, বৃহত্তর জীবনের স্বাদ পাবার জন্য। তার স্বপ্ন ছিল, সে আরও পড়াশুনো করবে, ডাক্তার হবে। সারা জীবন বিয়ে না করে সে ডাক্তার হয়ে রোগীর সেবা করবে, দেশ বিদেশে যাবে, যুদ্ধের সময় আহত সৈনিকদের ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেবে। তার বয়েস তখন সদ্য ষোলো পেরিয়েছে, সে একজন স্বপ্ন-মশগুল নিষ্পাপ কিশোরী।

ধরা পড়ার পর দীপ্তিময়ীর বাবা অত বড় মেয়ের গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা করলেন না। তার বিধবা দিদি চেঁচিয়ে গলা ফাটাতে লাগলো। মা কাঁদতে থাকলেন সারাদিন। তারপর বাড়িতে একটা থমথমে অবস্থা।

দীপ্তিময়ীকে হাজার বার জেরা করেও তার মুখ দিয়ে একবারও বার করা যায়নি, কেন সে পালাতে চেয়েছিল। কোনো রকম সঙ্গতি নেই, ব্যবস্থা নেই, অথচ শুধু পড়াশুনো করার লোভেই একটা মেয়ে বাড়ি থেকে পালাতে গিয়েছিল, এই অবাস্তব ব্যাপারটা অন্যরা বিশ্বাস করবেই বা কী করে? সে যে মার খেয়েও কাঁদে না, মুখ দিয়ে একটাও কথা উচ্চারণ করে না, এইটাই সব চেয়ে ভয়ের ব্যাপার। এ মেয়েকে তো আর বিশ্বাস করা যায় না। এ যদি সুযোগ পেলেই আবার পালাবার চেষ্টা করে?

কুমারী মেয়ে বাড়ি থেকে চলে গেলে চতুর্দিকে কলঙ্ক রটে যায়। বরং একবার নমো নমো করে বিয়ে দিলে তারপর আপদ বালাই যেখানে ইচ্ছে হয় যাক।

তখন যে-পাত্রটিকে মোটামুটি পছন্দ করা হয়েছিল তার সঙ্গেই দ্রুত ব্যবস্থা করে বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

ছেলেটির নাম রাজেন। বি-এ পাশ, বয়েস আঠাশ ঊনত্রিশের মতন, কলকাতায় একটি মার্চেণ্ট অফিসে চাকরি করে। চাকরিটা এখন এমন কিছু না—কিন্তু পরে উন্নতির আশা আছে। বেশ শান্ত-

শিষ্ট ভদ্র ধরনের ছেলে। একটাই তার খুঁত, ছেলেটির তিন কুলে কেউ নেই। মেসে-হোস্টেলে মানুষ, বরাখর ঠাকুরের হাতে রান্না খেয়ে খেয়ে পেটের রোগ বাধিয়েছে—এখন তাই বিয়ে করে সংসারী হতে চায়। তার এক দূর সম্পর্কের কাকা থাকেন বরাকরে, সেই সূত্রেই যোগাযোগ। দীপ্তিময়ীর বাবা দু'তিনবার কলকাতায় গিয়ে ছেলেটির সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলেন। ছেলেটির অফিসের সহকর্মীদের কাছেও জিজ্ঞেসবাদ করে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হলেন। ছেলেরও দাবি-দাওয়া বিশেষ কিছু নেই, মেয়ে দেখতেও এলো না, ছবি দেখেই পছন্দ হয়ে গেল।

যখন স্কুল থেকে পাশ করে অন্য অনেক মেয়ে কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়ে সারা শরীরে আনন্দ-হিল্লোল ছড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিংবা কোমরে আঁচল গুঁজে কলেজ কম্পাউণ্ডে ব্যাডমিণ্টন খেলছে, সেই বয়েসে বিয়ে হয়ে গেল দীপ্তিময়ীর। মফস্বল ছেড়ে সে কল-কাতায় চলে এলো।

রাজেন ঘর ভাড়া নিয়েছে মানিকতলার কাছে। একটি বড় ঘর, এক চিলতে বারান্দা ও রান্নাঘর, ভাড়া পঁচাশি টাকা। এই ঘটনা ঘটছে উনিশশো পঞ্চান্ন ছাপান্ন-সালে। তখন রাজেন তার মাইনের থেকে সব কিছু কেটে কুটে হাতে পায় দুশো দশ টাকা। টানাটানি করে সংসার চালাতে হয়। অবিবাহিত জীবনে রাজেন বারোশো টাকার মতন জমিয়েছিল, সে টাকাও আস্তে আস্তে খরচ হয়ে গেল নতুন সংসার পাতার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর কিনতে। চাকরি ছাড়া আলাদা কিছু টাকা উপার্জনের উৎসাহও নেই রাজেনের, সে একটু অলস স্বভাবের, অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে এসেই শুয়ে থাকে। বারবার চা খায় ও বাথরুমে যায়। তবে রাজেন সত্যিই ভালোমানুষ, স্ত্রীকে সে কষ্ট দেয় না।

কলকাতা শহরটা দীপ্তিময়ীর পক্ষে নতুন জগৎ। তবে কলকাতার বিশেষ কিছু এখনো দেখেনি সে। রাজেন তাকে মাসে দু'একবার নাইট শো তে সিনেমায় নিয়ে যায়, তা ছাড়া আর কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয় না। শোবার ঘর, এক চিলতে বারন্দা আর রান্নাঘরেই দীপ্তিময়ীর অধিকাংশ সময় কাটে। ঠিক কাটতে চায় না, ছটফটে স্বভাবের মেয়ে সে, কোনক্রমে দিন চলে যায়। বাথরুমটা একতলার অন্য ভাড়াটেদের সঙ্গে এক—সেখানে দেখতে পায় বাড়ির অন্য

বাসিন্দাদের। বাড়িটা বেশ বড়, সব মিলিয়ে সাত ঘর ভাড়াটে, সব সময় ভিড় লেগেই আছে। আস্তে আস্তে দু'একজনের সঙ্গে ভাব হলো দীপ্তিময়ীর, কেউ কেউ তাকে হিংসে করে—কোনো কোনো পুরুষ তার রূপের জন্য আড়চোখে চায়। রাজেন অবশ্য অন্যদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা পছন্দ করে না।

এর আগে দীপ্তিময়ী ঘর সংসারের কাজ কিছুই শেখেনি। বাড়ির সবচেয়ে ছোট মেয়ে ছিল বলে কোনোদিন রান্নাঘরেও ঢুকতে হয়নি তাকে। হঠাৎ এই অচেনা জায়গায়, অচেনা পরিবেশে একটা নতুন সংসারের সে কর্ত্রী হয়ে গেল। কিন্তু নতুন কিছু চট করে শিখে নেওয়ার একটা সহজাত গুণ আছে তার মধ্যে। সে ঘাবড়ে গেল না।

টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনে সে নিজের মনের মতন করে ঘর সাজালো। দু'চারদিন নুন আর ঝালের পরিমাণ নিয়ে গোলমাল হলেও মোটামুটি রান্না শিখে গেল সে। রাজেন খেতে ভালোবাসে। দীপ্তি এর মধ্যেই বুঝে গেছে, এই লোকটিকে খুশি করার প্রথম উপায় ভালো করে রেঁধে খাওয়ানো। রাজেনের কাছে তার লজ্জা বা আড়ষ্টতা এখনো সম্পূর্ণ কাটেনি, তবু এত মানুষজন-ভর্তি শহরে রাজেনই তো তার সবচেয়ে আপন।

বিকেলবেলা হলেই সে গা ধুয়ে শাড়ি বদলে ফিটফাট হয়ে প্রতীক্ষা করে, কখন রাজেন অফিস থেকে বাড়ি ফিরবে। রাজেন অবশ্য প্রত্যেকদিনই প্রায় ঠিক সময় ফেরে। তার কোন বন্ধুবান্ধব নেই, কোন বাজে নেশাও নেই। বাড়ি ফেরার পর থেকে রাজেন নিজেই বকবক করে দীপ্তির সমস্ত শরীরটা ভরিয়ে রাখে।

প্রথম প্রথম এসে দীপ্তি অন্য কারুর সঙ্গে ভালো করে কথাই বলতে পারেনি। তাদের ছোট শহরে সে যতই ডানপিটে থাকুক, এ শহরে সবই যে অন্যরকম। এর আগে সে কলকাতায় কখনো আসেনি, শুধু গল্পই শুনেছে আর কল্পনা করেছে। এখন দেখছে, কল্পনার চেয়েও কলকাতা অনেক বেশি বড় জায়গা। এখানকার মেয়েদের কথা বলার ধরন থেকে শাড়ি পরার ধরন সবই অন্যরকম। তাই দীপ্তি বেশি কথা বলে নিজের গ্রাম্যতার পরিচয় না দিয়ে দূর থেকে সব দেখে শুনে শিখে নিতে চেয়েছে।

দীপ্তিময়ী তার রূপ সম্পর্কে সচেতন নয়। এখন তার যৌবন পূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে। ও বাড়ির দোতলায় একজন ভাড়াটে বউ

যখন তাকে বলে, দীপ্তির মতন সুন্দরী সে পাড়ায় আর কেউ নেই, তখন লজ্জায় তার চোখ মুখ লাল হয়ে যায়।

বিয়ের তিন চার মাসের মধ্যেও রাজেনের সঙ্গে দীপ্তির সত্যি-কারের কোনো শারীরিক সম্পর্ক হলো না। রাত্তিরবেলা আলো নেভাবার পর রাজেন বিছানায় তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খায় আদর করে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে—তারপর দীপ্তির অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়ে সে। রাজেনের শরীরটা দুর্বল, তা ছাড়াও মেয়েদের সম্পর্কে একটা ভয়-ভয় ভাব আছে তার। বিয়ের আগে কোনো মেয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়নি—বিয়ের পরেও স্ত্রীর হাতের রান্না ও সেবা পেয়েই সে সন্তুষ্ট—আর বেশি কিছু যেন তার চাইবার নেই। দীপ্তিও কোনো অভাব বোধ করে না—রাজেনের আদরে তার শরীর শিরশির করে, অদ্ভুত ধরনের ভালো লাগা ও লজ্জা সারা গায়ে মিশিয়ে সে শুয়ে থাকে। জোর করে বিয়ে দেবার জন্য বাবা মা'র ওপর তার খুব রাগ হয়েছিল, কিন্তু রাজেনকে তার অপছন্দ হয়নি। রাজেন তাকে একটিও কড়া কথা বলে না। তার আনাড়ি হাতের রান্না খেয়েও আহামরি ভাব করে। অফিসে যাবার সময় রাজেন থুতনিতে আঙুল দিয়ে বলে, ইস, ঠিক যেন গোলাপ ফুল। চুরি হয়ে যেন না যায়!

প্রকৃতির নিয়মেই রাজেন এক সময় স্ত্রী-সম্ভোগ শিখে গেল। বিয়ের দু'বছর পর একটি বাচ্চা হলো দীপ্তির। ছেলে। নাম রাখা হলো কল্যাণ। এখন আর তার সময় কাটাবার সমস্যা নেই। ছেলেকে নিয়েই দীপ্তির সারাদিন কেটে যায়।

এই সময় হঠাৎ ওদের জীবনে একটা সাময়িক ঝড় এলো। পশ্চিম বাংলায় তখন পঞ্চাশ দশকের ডিপ্রেশান চলছে। বলা নেই, কওয়া নেই, চাকরি গেল রাজেনের। তার চাকরি একটা ব্রিটিশ ফার্মে, হঠাৎ সেই কোম্পানি ব্যবসা গুটিয়ে চলে গেল এ দেশ ছেড়ে। রাজেনের হাতে তিন মাসের মাইনে ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সামান্য কিছু টাকা—এই সম্বল নিয়েই পরবর্তী এক বছর দশ মাস তাকে বেকার থাকতে হয়েছিল। তারপর অবশ্য সে আবার একটা মোটামুটি ভালো চাকরিই পেয়ে যায়—এবার সরকারী, আর চাকরি হারাবার ভয় নেই।

কিন্তু এই এক বছর দশ মাস তাদের চরম দুঃসময় গিয়েছিল। যেহেতু রাজেনের কোনো আত্মীয়স্বজন নেই, তাই কোনোদিক থেকে কোনো সাহায্য পাবারও উপায় ছিল না। এই দুঃসময় কাটিয়ে উঠবার

জন্য নিজেই যে একটা পথ খুঁজে বার করবে, সে রকম মনের জোর তার নেই। সব সময় হাতের জমা টাকা ফুরিয়ে যাবার আতঙ্ক। টিপেটুপে খরচ করেও তা ফুরিয়ে গেল এক সময়। তারপর বাড়ি ভাড়া বাকি এবং ধার। অপমানিত জীবন।

এই দুঃসময়টা পুরোপুরি সামলে নিয়েছিল দীপ্তি। তখন তার বয়েস মাত্র উনিশ, তবু ঐটুকু বয়সেই সে সবদিকে মাথা ঠাণ্ডা করে চলেছে। তার স্বাস্থ্য ভালো, সে খাটতে পারে। ঠিকে ঝি রাখা হয়েছিল বাসন মাজার জন্য, ছাড়িয়ে দেওয়া হলো। একই সঙ্গে ছেলে সামলাতে ও সংসার সামলাতে তার কষ্ট হয়নি। কোনোদিন রাজেনের কাছে সে কোনো বিষয়ে অভিযোগ করেনি। বেকার হলেও রাজেনকে ময়লা জামা কাপড় সে পরতে দেয়নি—রোজ রাত্তিরে নিজে সে কাপড় কেচেছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ তারা এক টুকরো মাছ খায়নি। দীপ্তিময়ীর একমাত্র চিন্তা ছিল ছেলে সম্পর্কে। কলকাতা শহরের মায়েরা বাচ্চাদের কত কী খাওয়ায়—কিন্তু দীপ্তির ছেলে বুকের দুধ ছাড়াবার পর আর কী খেতে পেল? বেবিফুড তো দূরের কথা, গয়লার দুধও রাখা যায় না। শুধু ফ্যান ভাত খাইয়ে ছেলের পেট ফুলে গেল।

দোতলার একটি মেয়ে বেলেঘাটার এক স্কুলে পড়ায়। সে দীপ্তিকে বলেছিল, তাদের স্কুলের প্রাইমারি বিভাগে একটা কাজ দিতে পারে। দীপ্তি তো ম্যাট্রিক পাশ আছেই, তারপর যদি আস্তে আস্তে বি-এ পরীক্ষাটা দিয়ে দেয়—। দীপ্তি এক কথাতেই রাজি। কিন্তু রাজেন এ প্রস্তাব শুনেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। চাকরি করতে যাবে, আর আমি বাড়িতে বসে বসে ছেলে সামলাবো? এরপর কি আমাকে শাড়ি পরে রাঁধতে বসতে হবে?

বেকার হবার পর থেকে রাজেনের মেজাজ বেড়েছে। তার সেই শান্তশিষ্ট ভাবটি আর নেই।

দীপ্তি রাজেনকে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলো। একটা চাকরি যখন হাতের কাছেই রয়েছে, একশো দশ টাকা মাইনে—সেটা ছেড়ে দেবার কি কোনো মানে হয়?

শুধু সংসারের অভাবের জন্যই নয়, স্কুলে চাকরি করতে গেলে একটা বাইরের জীবন দেখা হবে। পাঁচ জনের সঙ্গে মিশতে পারবে। এই ব্যাপারেও দীপ্তির লোভ ছিল। কিন্তু রাজেন একেবারে জেদ

ধরে রইলো। দীপ্তি চাকরি করতে গেলে রাজেনকেই সেইটুকু সময় ছেলের দেখাশুনো করতে হবে। তাহলেই বাড়িতে সকলে জেনে যাবে, সে বেকার—সে এখন তার বৌয়ের রোজগার করা টাকায় খাচ্ছে। তাহলে কি তার কোনো আত্মসম্মান থাকবে? তার চেয়ে যে না খেয়ে মরে যাওয়াও ভালো।

রাজেন হচ্ছে সেই ধরনের বাঙালী, যাদের জীবনে তেমন কোনো উচ্চাকাঙক্ষা থাকে না। সে চায় সারাজীবনে মোটামুটি খেয়ে পরে নির্ঝঞ্ঝাটে বেঁচে থাকতে। একটা বাঁধা মাইনের চাকরি, বাড়িতে বাধ্য স্ত্রী, দু'একটি ছেলেপুলে—এই সব নিয়ে এবং কোনোক্রমে চোর-পকেটমার, গুণ্ডা এবং অসুখবিসুখ এড়িয়ে বেঁচে থাকা। এর মধ্যে বিঘ্ন ঘটায় তার সব কিছু ওলোট পালোট হয়ে গেল। নিজের উদ্যোগে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মতন জোর তার নেই। সেই জোর নেই বলেই তার স্বভাবটা খিটখিটে হয়ে গেল, স্ত্রীকে গালাগালি দিতে শুরু করলো এবং লোকের কাছ থেকে নানা রকম মিথ্যে কথা বলে টাকা ধার করতে লাগলো। সবচেয়ে বেশি ধার জমতে লাগলো বাড়িওয়ালার ছেলে হীরকের কাছে।

এখন রাজেন তার ছেলেকেও আদর করে না, একটু দুষ্টুমি দেখলেই মারতে যায়। রাত্তিরবেলা দীপ্তিময়ীর সঙ্গে কথাই বলে না, উল্টোদিকে ফিরে শুয়ে থাকে।

এই সময় আবার বিপদের ওপর বিপদ, দীপ্তিময়ীর মা-বাবা এলেন বেড়াতে। তার মা এ পর্যন্ত নাতির মুখ দেখেননি। এখন ওদের দুর্দশা একেবারে মধ্যসীমায় এসে পৌঁছেছে। হাতের টাকা ফুরিয়েছে—ধারও সহজে জোটে না। অথচ শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে রাজেন এসব কথা বলবে কী করে? আর দীপ্তির কাছেও এই দু'-তিন বছরের মধ্যে তার মা-বাবার চেয়ে স্বামী বেশি আপন হয়ে গেছে। স্বামীর লজ্জা, তারও লজ্জা! দীপ্তিময়ী নিঃশব্দে দুটি গয়না বিক্রি করবার জন্য তুলে দিল রাজেনের হাতে। বাবা-মাকে প্রায় সাত দিন কাছে রেখে যত্ন করে খাওয়ালো—ঘুনাক্ষরেও বুঝতে দিল না তাদের সংসারের অভাব অভিযোগের কথা।

বাবা-মা সেবার না এলে সারা জীবন আফশোস থেকে যেত দীপ্তিময়ীর। মায়ের সঙ্গে সেই তার শেষ দেখা। কলকাতা থেকে

ফিরে যাবার এক মাস বাদেই মা মারা যান। মা তাঁর শেষ সম্বল দুটি বালা রেখে গেছেন ছোট মেয়ের নাম করে।

তখন দীপ্তি তার গয়না বিক্রি করেই সংসার চালাচ্ছে। মায়ের দেওয়া গয়নাও সে বেশি দিন রাখতে পারলো না। মেয়েদের কাছে এক একটা গয়না প্রায় বুকের পাঁজরার সমান! কিন্তু ছেলে কিংবা স্বামীর প্রাণ বাঁচাবার জন্য তো মেয়েরা বুকের পাঁজরাও খুলে দিতে পারে।

ঝড় ওঠে, আবার ঝড় থেমেও যায়। সরকারী অফিসে চাকরিটা জোটাবার পর রাজেন আবার তার পূর্ব স্বরূপ ফিরে পেলো। আবার তার মেজাজ বেশ শান্ত, সহৃদয়। প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই দীপ্তির জন্য কিনে আনলো একজোড়া শাড়ি, ছেলের জন্য জামা। আস্তে আস্তে ধার শোধ করতে লাগলো। আবার রাজেন ফিরে পেয়েছে তার অভীষ্ট সুখের সংসার—মাত্র একটি চাকরির অভাবে যা ডুবতে বসেছিল হাল-ভাঙা নৌকোর মতন।

এত ঝড়ঝাপটার মধ্যেও দীপ্তিময়ীর রূপ নষ্ট হয়নি। সাজ-গোজের বহর নেই, তবু তার দিকে এখনও মানুষ তাকিয়ে থাকে। কেউ কেউ আড়ালে বলে, অমন সুন্দরী আর গুণবতী মেয়েকে রাজেনের মতন মিনমিনে স্বভাবের পুরুষের সঙ্গে একটুও মানায় না।

দীপ্তি প্রকৃতপক্ষে রূপসী নয়। কলকাতার খাঁটি সব সুন্দরীদের সভায় সে কোনো পাত্তা পাবে না। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকাতে ভালো লাগে। এত দুঃখ-দারিদ্র্য তার মুখে কোনো ছাপ ফেলেনি। তা ছাড়া, একটা সরল আত্মবিশ্বাস তার মুখে লেগে থাকে।

দীপ্তি এর মধ্যে বাপের বাড়ি গেছে দু'বার মাত্র। বিয়ের কয়েক-মাস বাদেই একবার এসেছিল। তখন তার গায়ে নতুন গয়না, কপালে সিঁদুর দেখলেই মনে হয় নতুন, শাড়িগুলোও নতুন, মুখখানা লাজুক লাজুক। বাড়ির সবাই তাকে নিয়ে খুব আনন্দ করলো, পাড়াপ্রতি-বেশীরা ডেকে নিয়ে খাওয়ালো।

কিন্তু কদিন বাদেই দীপ্তির মন ছটফট করতে লাগলো কলকাতায় ফেরার জন্য। তার বাল্যসখীরা সবাই ঠাট্টা করলো যে, বরের জন্য তার মন কেমন করছে, তাকে ছেড়ে আর থাকতে পারছে না। এই বলে চোখ নাচিয়ে ইঙ্গিত করলো তারা।

আসল কারণ কিন্তু ঠিক তা নয়। মাত্র তিন মাস আগে যার

সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, সেই পুরুষটিকে তো এখনো সে ভালো চেনেই না—তার জন্য মন কেমন করবে কি !

কিন্তু দীপ্তির নতুন সাজানো সংসারের জন্য মন উতলা হয়ে থাকে। মেয়েদের এ দুর্বলতা থাকবেই। নতুন কেনা থালা-বাটি আলনা, জানলার পর্দা, টিফিন কেরিয়ার, জনতা স্টোভ-এর একটাও যদি হারায় কিংবা নষ্ট হয়—তা হলে তার বুকের মধ্যে টনটন করে। রাজেন আলাভোলা স্বভাবের মানুষ, সে কি সব কিছুর যত্ন করতে পারবে? অফিস যাবার সময় সে যদি তালা দিতে ভুলে যায়, তাহলেই সব কিছু চুরি হয়ে যাবে যে! রাজেন কোথায় খাচ্ছে কে জানে। যদি সে নিজে রান্না করে খাবার চেষ্টা করে তাহলে নির্ঘাত হাত পোড়াবে।

একমাস থাকার নাম করে এসেছিল, কুড়ি দিন বাদেই সে জোর করে ফিরে গেল।

দ্বিতীয়বার সে এলো মায়ের মৃত্যুর পর। এখন এ সংসারের চেহারা একেবারে বদলে গেছে। বাবা রিটায়ার করেছেন, দাদার ঘাড়ে সংসার—বৌদির মেজাজ সুবিধের নয়। সব সময় একটা অভাব আর নেই নেই রব। দু'চারদিন থেকেই দীপ্তিময়ী হাঁপিয়ে উঠলো। সে বুঝলো, এ সংসারে সে অবাঞ্ছিত। সে একথাও বুঝলো, তার আর বাপের বাড়ি বলে কিছু রইলো না! আর এখানে ফিরে আসা যাবে না। কলকাতার ঐ ভাড়াবাড়ির দু'খানা ঘরই তার একমাত্র আশ্রয়। একদিন সে এ বাড়ি থেকে পালাতে চেয়েছিল, আজ এসে দেখছে, এখানে তার জায়গা নেই। সেদিন সবাই তাকে ফেরাতে চেয়েছিল, আজ সে চলে গেলে সকলেই মনে মনে খুশি হয়। এটাও নিয়মের মধ্যেই পড়ে। অস্বাভাবিক কিছু নয়। দীপ্তিময়ী একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে খুব কাঁদলো, তারপর কলকাতায় ফিরে এলো।

॥ দুই ॥

প্রাকৃতিক নিয়মে যা ঘটে, দীপ্তিময়ী হঠাৎ তার উল্টো কিছু করে বসেছিল। কিন্তু তার আগে দীপ্তিময়ীর ভেতরের জীবনটা কী

রকম ছিল দেখা যাক। এতক্ষণ আমরা শুধু তার বাইরের জীবনটাই দেখেছি।

দীপ্তিময়ীর যে জীবন, তা তো এক হিসেবে অতি সাধারণ। হাজার হাজার মেয়ের জীবন এই রকমই সুখে দুঃখে কাটে। রেল কোম্পানির এক ক্ষুদে কর্মচারীর সপ্তম সন্তানের ভাগ্যে আর এর চেয়ে বেশি কী জুটবে? এর থেকে বেশি কিছু হওয়া তো প্রায় লটারির টাকা পাওয়ার মতন। কিংবা বস্তির মেয়ে হঠাৎ ফিল্ম স্টার হয়ে যেমন সব সময় গাড়ি চেপে ঘুরে বেড়ায়। সেসব তো রূপকথার মতন। দীপ্তির জীবন রূপকথা নয়। মোটামুটি একটি ভাল ছেলের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে, তার স্বামী শান্ত ও সজ্জন, একটি স্বাস্থ্যবান সন্তান আছে তার। এবং একটি নিজস্ব সংসার পেয়েছে। আফশোস করার তো কিছুই নেই।

কিন্তু দীপ্তিময়ীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, যা অনেক মেয়ের মধ্যেই থাকে না। সে চেয়েছিল অন্য কিছু হতে। সেই অন্য কিছুটা যে কী, তা সে নিজেই স্পষ্ট জানে না। ছেলেবেলা থেকেই বই-টই পড়ে সে নানারকম স্বপ্ন দেখেছে। যে জীবনের কথা সে ভেবেছে, তা শুধু সারাদিন ধরে রান্না করা, ঘর গোছানো, ছেলে সামলানো আর স্বামীর সেবা করা নয়। সে ভেবেছিল সে আরও অনেক লেখাপড়া শিখবে, দেশবিদেশে ঘুরবে, যুদ্ধের সময় আহত সৈনিকদের সেবা করবে, এই সব।

বিয়ের পর কঠোর বাস্তব অবস্থাটা তাকে মেনে নিতে হলো। সে বুঝতে পারলো, ইচ্ছে থাকলেও মেয়েদের পক্ষে এই সামাজিক ব্যবস্থায় অন্য রকম হওয়া সম্ভব নয়! এই দু'খানা ঘরের সংসারে বন্ধ হয়ে থাকাই তার নিয়তি। রাজেনের কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, সে অন্যরকম কিছুই হতে চায় না। কোনো রকমে চাকরি বজায় রেখে বাড়িতে এসে শুয়ে থাকাই তার চরম বিলাসিতা। কোনোরকম বই-পত্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। বাড়িতে সে খবরের কাগজও রাখে না পয়সা বাঁচাবার জন্য।

এই সীমাবদ্ধ জীবনই যে তার নিয়তি—এই কথাটা উপলব্ধি করে দীপ্তিময়ী মনে মনে দুঃখ পেত। বাইরে কখনো তা প্রকাশ করেনি। এই সীমা ভেঙে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করলেও সেটা প্রাকৃতিক নিয়মে

স্বাভাবিকই মনে হতে পারতো, কিন্তু দীপ্তি পরবর্তী কালে এই সীমাকে আরও ছোট করে এনে প্রায় একটা খাঁচায় ঢুকে পড়েছিল।

রাজেন যে এক বছর দশ মাস বেকার ছিল, সেই সময় সব কিছুই উল্টে পাল্টে যায়। আগেই বলেছি, তখন অন্য কিছু ভুলে সংসারটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দীপ্তি প্রাণ পণ করেছিল। রাজেনকে কষ্ট সহ্য করতে দেয়নি—নিজে সব কষ্ট গায়ে পেতে নিয়েছে।

রাজেন যখন বেকার হয়, তখন তার ছেলে কল্যাণের মাত্র সাত মাস বয়েস। নবদম্পতির একটি মাত্র সন্তান, কত তার আদর পাবার কথা। কিন্তু দীপ্তির পক্ষে তাকে বাঁচিয়ে রাখাই ছিল প্রধান সমস্যা। পাখির মতন সন্তানকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছে। টাকা পয়সার অভাবে রাজেনের মেজাজ তখন খিটখিটে, স্ত্রীকে সে কোনো প্রকার সুখ দিতে পারে না, শুধু বকাবকি করে, একদিন সে রাগের মাথায় ছেলেকে তুলে আছাড় মারতে চেয়েছিল। দীপ্তিময়ী স্কুলে চাকরি নেবার প্রস্তাব করলে। যুক্তিহীন রাগে রাজেন আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। দীপ্তিময়ী তবু মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে।

টাকা পয়সার অভাবের চেয়েও বড় বিপদ স্বামী-স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝি। বেকার অবস্থায় শান্ত স্বভাবের রাজেন এমন বদলে গিয়েছিল যে পদে পদে সে দীপ্তিকে ভুল বুঝতে শুরু করেছিল। দীপ্তির চাকরি করার চেষ্টাকে তো সে ভুল বুঝেইছিল, তা ছাড়া, দীপ্তির সেবা-যত্নকে সে সন্দেহের চোখে দেখেছে। তার মতন অপদার্থ স্বামীকে এত বেশি খাতির যত্ন করা কি তাকে অপমান করা নয়? এর বদলে দীপ্তি যদি চেঁচিয়ে ঝগড়া করতো, নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করতো, তা হলে সেটাই হতো স্বাভাবিক!

কিন্তু দীপ্তি কোনোদিনই ঝগড়া করেনি, কিংবা অভাব অভিযোগ নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করেনি। সে শুধু ছেলেটাকে বাঁচাতে পারবে কিনা—এই চিন্তায় ভয় পেয়েছিল।

এই সময় তাদের সংসারে হীরকের একটা ভূমিকা দেখা দেয়। হীরক একটি লম্পট। কিন্তু সাধারণ লম্পট নয়। তার পুরো নাম ডঃ হীরক মজুমদার—কলকাতার একটি নামজাদা কলেজের সে অর্থনীতির অধ্যাপক, রীতিমতন সুনাম আছে, প্রায়ই ভারতের নানা প্রান্তে সেমিনার করতে যায়, একবার বিদেশ ঘুরে এসেছে।

এই ধরনের মানুষকে সাধারণত মনে হয় জাগতিক বিষয়ে উদাসীন,

শুধু জ্ঞানচর্চা নিয়েই মগ্ন থাকে। হীরক সে রকম মানুষ নয়। সে দিনের অধিকাংশ সময়ই পড়াশুনো করে কাটায় বটে কিন্তু সে অত্যন্ত নারীলোলুপ। এবং এ সম্পর্কে সে তেমন লজ্জিতও নয়। সে এমনকি একথাও বলেছে যে বিভিন্ন নারীর সঙ্গে সহবাস না করলে তার মাথা পরিষ্কার হয় না, জ্ঞানচর্চার প্রেরণা পায় না। এ সম্পর্কে সে বার্টণ্ড রাসেল-এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে।

টাকা পয়সার ব্যাপারেও হীরক অত্যন্ত সজাগ। এই বাড়ির বাড়িওয়ালার ছেলে সে, তার বাবা ইদানীং বিভিন্ন তীর্থস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বাড়িভাড়া আদায়ের ভার তার ওপর। এ ব্যাপারেও সে গাফিলতি করে না।

হীরকের বয়েস বছর পঁয়তিরিশের কাছাকাছি, এখনো সে বিয়ে করেনি। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, ইচ্ছেও নেই। বরং আকাঙ্ক্ষা কলেজ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়, তারপর বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য হওয়া। তারও পরে রাষ্ট্রসংঘের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদ। এই উচ্চাশা চরিতার্থ করার জন্য সে খাটছে রাত জেগে নোট তৈরি করে, বিভিন্ন সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখে। দিন দশেক একটানা কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তখন সে তীব্র-ভাবে নারীসঙ্গ চায়। শারীরিক উৎসবে ডুবে যায়। অনেক সময় সাধারণ কোনো নারীকে না পেলে সে বেশ্যাপল্লীতে যেতেও দ্বিধা করে না।

তবে, ভাড়াটেদের কোনো মেয়ের দিকে সে কখনো নজর দেয়নি। সে তো সাধারণ লম্পট নয়, যে মেয়েদের দেখলেই লালায়িত হবে। অনেক সময় সে মেয়েদের দিকে ফিরেই চায় না। কোনো কোনো সভা–সমিতিতে বা নেমন্তন্ন বাড়িতে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হলে, তার ব্যবহার অত্যন্ত সম্ভ্রমপূর্ণ। ভাড়াটেদের ঘরের মেয়েদের দিকে কুদৃষ্টি দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না হীরকের। ভাড়াটেদের সঙ্গে সে কথাবার্তাই কম বলে। সে থাকে তিনতলার ফ্ল্যাটে, মাসের প্রথমে চাকরের হাত দিয়ে বিল পাঠিয়ে দেয়, চাকরই টাকা নিয়ে আসে। কোনো ভাড়াটে বেশি দিন টাকা ফেলে রাখলে সে নিজে কিছু বলে না, পারিবারিক উকিল ঠিক করাই আছে, সেই উকিলকে লাগিয়ে দেয়। ভাড়াটেদের সঙ্গে সিঁড়িতে কিংবা সদর দরজায় দেখা হয়ে গেলে সে গম্ভীরভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় না, সৌজন্যমূলক দু'চারটে কথা সব সময়েই বলে।

রাজেন হল সেই ধরনের মানুষ, বিনা ভাড়ায় ভাড়াবাড়িতে থাকার মতন জোর যার নেই। কত লোক তো মাসের পর মাস ভাড়া না দিয়েও বুক ফুলিয়ে হাঁটে। এক মাস ভাড়া বাকি পড়তেই রাজেন কাবু হয়ে পড়লো। তার স্বভাব হচ্ছে মাসের মাইনে পেয়েই বাড়িওয়ালা, দুধওয়ালা, ধোপা, ঝি ইত্যাদিদের যার যা পাওনা মিটিয়ে দেওয়া, তারপর হাতে যে কটি টাকা থাকবে তা দিয়ে যেভাবে সংসার চলে চালুক।

কিন্তু চাকরি যাবার পর তো এই নিয়ম খাটে না। প্রথম দু'তিনটে মাস কোনোক্রমে চললেও, তারপর আর চলে না। এক মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি পড়ায় রাজেন সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে। বাড়ির অন্যান্য লোকেদের চোখের দিকে সে তাকাতে পারে না, যেন সবাই বুঝে গেছে যে সে এখন বেকার। যদিও কারুকে সে একথা বুঝতে দিতে চায় না। দুপুরবেলা অকারণে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

হীরক বাড়িভাড়ার জন্য তাড়া দেবার আগেই রাজেন নিজে গিয়ে একদিন তার সঙ্গে দেখা করলো। সকালবেলা, হীরক তখন সবেমাত্র ঘুম থেকে ওঠে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছে। রাজেন প্রথমেই মুখ ফুটে ভাড়ার কথা বলতে পারে না। একথা সেকথা বলে অনাবশ্যক হীরকের প্রশংসা করতে লাগলো। তারপর হাত কচলে আমতা আমতা করে বললো, আমার এ মাসের ভাড়াটা, মানে হঠাৎ একটা অসুবিধে, ছেলের মুখেভাত দেবো ভাবছি, যদি আগামী মাসে—

হীরক মোটেই নিষ্ঠুর নয়। সে টাকা পয়সার হিসেব ঠিক বোঝে, কিন্তু সেজন্য তো অভদ্র হবার দরকার নেই। তৎক্ষণাৎ বললো, ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাতে কী হয়েছে, সামনের মাসে দিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই, অসুবিধে তো হতেই পারে—

চাকরকে ডেকে হীরক রাজেনকে চা খাওয়ালো। খানিকক্ষণ একথা সেকথার পরই সে বুঝতে পারলো যে রাজেন একটি অত্যন্ত কাঁচা মিথ্যেবাদী। নানারকম মিথ্যে কথা সে গড়গড় করে বলে যাচ্ছে বটে কিন্তু কোনোটাই বিশ্বাসযোগ্য করতে পারছে না। হীরক বিরক্ত হয়ে গেল। দুর্বল চরিত্রের মানুষ সে পছন্দ করে না, বুদ্ধিমান শত্রুদের সংসর্গে এসেও সে আনন্দ পায়।

পরের মাসেও রাজেন নিজে থেকে এসেই দেখা করলো এবং আবার আর এক মাস সময় চাইলো। হীরক এবারেও আপত্তি

করলো না। সেই সময় সে একটি বিদেশী পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখবার জন্য খুব ব্যস্ত ছিল, সেইজন্য এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে পারেনি। এতে রাজেনের সাহস বেড়ে যাওয়ায় তৃতীয় মাসেও সে একই কায়দায় আরও বেশি তোসামোদ করতে লাগলো হীরকের।

হীরক এবার আর তাকে পাত্তা দিল না। নীরস গলায় হাসলো, রাজেনবাবু, আপনি আমার উকিলের সঙ্গে দেখা করুন। এ সম্পর্কে কথা বলার সময় নেই আমার।

রাজেন এটা কিছুতেই এক কথায় মেনে নিতে পারে না। উকিলের সঙ্গে দেখা করে কি কোন লাভ আছে? হীরকের উকিল তো তার মক্কেলের স্বার্থ দেখবেই।

হীরকের কাছ থেকে পরপর দু'মাস প্রশ্রয় পেয়ে সে ধরেই নিয়েছিল, তোসামোদ করে হীরকের মন ভেজাতে পারবেই।

সে কাঁচুমাচু হয়ে বললো, আপনি দয়া করে অন্তত আর একটা মাস সময় দিন।

—আর এক মাস সময় পেলে কী করবেন?

—তার মধ্যে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করে ফেলবো।

—আগের দু'মাসে পারেননি কেন?

—আগের দু' মাসে, মানে, মানে, একটু অসুবিধেয় পড়ে গেছি।

হীরক ধমক দিয়ে বললো, দেখুন, রাজেনবাবু, আমি ব্যস্ত লোক, এই সব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। আপনার সঙ্গে আমি যথেষ্ট ভদ্রতা করিনি কি? প্রত্যেক মাসেই যদি আপনাকে আমি ছেড়ে দিই, তা হলে অন্য ভাড়াটেরাই বা কী দোষ করেছে, তারা ভাড়া দেবে কেন? এখন আমার উকিল যা ব্যবস্থা হয় করবে।

রাজেন একেবারে মুষড়ে পড়লো। মামলা মকর্দমা চালাবার সামর্থ্য তার নেই। কয়েক মাসের ভাড়া ফাঁকি দিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার মতন মনের জোরও সে সংগ্রহ করতে পারবে না। প্রায় কাঁদো-কাঁদো মুখে বললো, আমাকে দয়া করুন, আমাকে দয়া করুন, আমার চাকরি নেই—

অর্থনীতির গবেষক হিসেবে চাকরি না থাকার ব্যাপারটাতে কৌতূহলী হয়ে উঠলো হীরক। বললো, তাই বলুন! আপনাদের অফিসে ছাঁটাই হয়েছে, কেন?

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করলো হীরক। আসলে রাজেনের সম্পর্কে কোন উৎসাহই নেই তার, সে একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত ব্যক্তির হঠাৎ চাকরি যাওয়ার ফলাফল জানতে চায়। জিজ্ঞেস করলো, রাজেন কোনো কম্পেনসেশন পেয়েছে কিনা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে কত পেয়েছে, নিজে সে কিছু টাকা জমাতে পেরেছিল কিনা। উত্তর শুনে সে সন্তুষ্ট হলো। লোকটি একেবারে নিঃস্ব যাকে বলে। দেশের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে হীরকের ধারণার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

এরপর সে এলো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে, বললো, আমি না হয় আপনার বাড়ি ভাড়া কয়েক মাসের জন্য ছেড়ে দিলাম কিন্তু আপনার সংসার চলবে কী করে?

রাজেন নকল উৎসাহে বললো, শিগগিরই সে আর একটা চাকরি পেয়ে যাবে।

—কী করে পাবেন? কোন্ কোন্ বড়লোকের সঙ্গে আপনার চেনা আছে? আছে সেরকম কেউ?

—না সেরকম কেউ নেই তবে চেষ্টা করছি খুব।

—কিন্তু উঁচু মহলে জানাশুনো না থাকলে এই বাজারে চাকরি হয়? নিছক দরখাস্ত করে এখন কেউ চাকরি পাচ্ছে?

রাজেন এ কথার কোনো উত্তর দিতে পারলো না। এটা যে মর্মে মর্মে সত্য—সে জানে।

—আপনার সংসারে আর কে কে আছে?

—আমার স্ত্রী আর একটা বাচ্চা।

—ঠিক আছে, দেখুন কী করতে পারেন?

হীরকের শেষ কথাটার ঠিক মানে বুঝতে পারলো না রাজেন। খানিকটা দ্বিধা নিয়েই ফিরে এলো। হীরক কি বাড়িভাড়াটা সত্যিই ছেড়ে দিচ্ছে?

দু'দিন বাদে হীরক যখন দুপুরবেলা কলেজ থেকে ফিরছে সেই সময় দীপ্তি ছাদে এসেছিল কাপড় জামা তুলতে। হঠাৎ বৃষ্টি নেমেছে বলে হুটোপুটি করে কাপড় তুলতে এলো সারা ছাদ দৌড়ে। ছেলেকে একলা নিচে রেখে আসা যায় না বলে তাকেও নিয়ে এসেছিল, বসিয়ে রেখেছে সিঁড়ির দরজার কাছে।

কল্যাণের বয়স তখন এক বছর। স্বাস্থ্য খুব খারাপ, বাঁচবে কিনা ঠিক নেই।

হীরক প্রথম ছেলেটিকেই দেখল। ঐটুকু বাচ্চার দৌড়াদৌড়ি দুষ্টুমি করার কথা, কিন্তু সে নির্জীব হয়ে বসে আছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে। হীরক ছেলেটিকে লক্ষ করছিল।

হীরক উবু হয়ে বসেছে ছেলেটার সামনে। হাততালি দিয়ে বলছে, এই, এই—।

অন্য বাচ্চারা এই সময় হাসে। কিংবা অচেনা লোক দেখলে অনেক সময় ভয় পেয়ে কাঁদে। এর হাসি বা কান্না কোনোটাতেই উৎসাহ নেই।

হীরক জিজ্ঞেস করলো, ছেলেটি কার?

বুকের কাছে জড়ো করা কাচা জামা-কাপড়, দীপ্তি এসে দাঁড়ালো। হীরক তার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বললো, এইটি কি রাজেনবাবুর ছেলে?

দীপ্তিকে সে আগে কখনো ভাল করে দেখেনি, কথাও বলেনি।

দীপ্তি মাথা ঝাঁকিয়ে বললে হ্যাঁ।

হীরক ছেলেটিকে দু'হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি কেঁদে উঠলো ভ্যাঁ করে। হীরক সেই কান্না গ্রাহ্যই করলো না, সে দেখছে একজন বেকারের এক বছরের সন্তান কেমন হয়। হাত দুটো কাঠি কাঠি, পেটটা মোটা। এটাই তো স্বাভাবিক। অবশ্য, রাস্তায় ভিখিরি কিংবা ভবঘুরেদের স্বাস্থ্য এত খারাপ হয় না।

যদিও ডাক্তার নয়, তবু হীরক ছেলেটির পেট টিপে দেখলো। ছেলেটি চ্যাঁচাচ্ছে অবিশ্রান্তভাবে। কিন্তু হীরকের ভাবখানা এই, যেন কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফিল্ড রিসার্চে মত্ত।

দীপ্তির দিকে তাকিয়ে বললো, এ তো ম্যালনিউট্রিশানে ভুগছে। এমনি করলে বেশিদিন বাঁচবে না।

দীপ্তির বুকের মধ্যে কেঁপে উঠলো শুধু! কিন্তু মুখে কিছু বললো না।

দীপ্তির মনে হলো, এই লোকটি কী অদ্ভুত। কোনো মায়ের সামনে কেউ তার সন্তানের মৃত্যু-সম্ভাবনার কথা উচ্চারণ করে!

হীরক জিজ্ঞেস করলো, এ কী খায়?

দীপ্তি কোনো উত্তর দিল না।

হীরকের মনে পড়ল, রাজেন বলেছিল, তার ছেলে মাত্র একটি। সুতরাং ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর আওতাতেও পড়ে না। একটি মাত্র

বাচ্চাকেও যদি মানুষ না করতে পারে—শহুরে মধ্যবিত্তের এখন এই অবস্থা?

সে জিজ্ঞেস করলো, বাচ্চাটা বুকের দুধ খায় না?

দীপ্তি মুখ নিচু করে বললো, না।

—কত বয়েস?

—এক বছরে পড়েছে।

হীরক অস্ফুট গলায় বললো, বেবিফুডও তো বাজারে পাওয়া যায় না। তারপর আর বিনা বাক্যব্যয়ে ছেলেকে দীপ্তির হাতে তুলে দিয়ে হীরক নিজের ঘরে ফিরে গেল। দীপ্তির দিকে সে একবারও পূর্ণ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেনি।

দুদিন বাদে সন্ধের পর বাড়ি ফেরার সময় হীরক রাজেনের ফ্ল্যাটের দরজায় ধাক্কা দিল। রাজেন ছিল ভেতরে কিন্তু দরজা খুললো দীপ্তি। হীরক তার হাতে বেবিফুডের একটা টিন তুলে দিয়ে বিড়-বিড় করে বললো, আমার একটা চেনা দোকানে পাওয়া গেল।

এর পর আর সে দাঁড়ালো না।

হীরকের চরিত্রে এটা অভূতপূর্ব। এর আগে কোনো ভাড়াটের কোনো উপকার করার চেষ্টা সে করেনি। সে নির্লিপ্ত ধরনের লোক। এবং নিজের কাজ ও ভবিষ্যতের উন্নতির চেষ্টাতেই এত ব্যস্ত যে, আশেপাশের অপ্রয়োজনীয় মানুষদের সম্পর্কে মাথা ঘামাবারই সময় পায় না। সে নিজের হাতে করে কারুর জন্য বেবিফুড নিয়ে আসবে—এটা সত্যিই বিস্ময়কর ঘটনা। দীপ্তিকে দেখে এবং তার দুর্বল সন্তানকে দেখে তার মনে কী ভাবান্তর হয়েছিল কে জানে।

তা বলে একথা ভাবাও ভুল হবে যে, হীরক কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে এরকম ব্যবহার করছে। হীরক সাধারণ লম্পট নয়, মেয়েদের জন্য সে চক্রান্ত করে না। সে পণ্ডিত, বিচক্ষণ, কিছুটা দয়ালুও বটে—তার নারী-প্রীতি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। তখনও দীপ্তির দিকে সে মনোযোগ দেয়নি। সে বেকার রাজেন আর তার রুগ্ণ শিশুর কথাই শুধু ভেবেছে।

এবং দু'একদিন বাদে নিশ্চয়ই এসব কথা ভুলেও গেছে। কারণ, এর পরে সে আর ওদের কোনোরকম খোঁজ খবরও নেয়নি। বাড়ির সদর দরজার কাছেই দীপ্তিদের ঘর—যাওয়া আসার পথেও সেদিকে

চোখ পড়তে পারে—তবু হীরক একবারও মুখের কথাটিও জিজ্ঞেস করেনি যে ছেলেটি কেমন আছে।

দিন পনেরো বাদে হীরককে একদিন দুপুরে কলেজ থেকে ফিরতে দেখে দীপ্তি নিজেই তরতর করে ওপরে উঠে এলো। তার ছেলে ঘুমোচ্ছে, রাজেন বেরিয়ে গেছে। হীরক দরজার তালা খুলছিল, পায়ের শব্দ পেয়ে পেছনে তাকালো।

দীপ্তি মৃদু গলায় বললো, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

হীরক একবার ভুরু কুঁচকে তাকালো। যেন মনে করার চেষ্টা করলো, এই স্ত্রীলোকটি কে? তবে, হীরক নিজের কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন অন্যমনস্ক হলেও তার স্মৃতিশক্তি ভালো। একটু মনোযোগ দিতেই তার মনে পড়লো।

হীরক সোজাসুজি দীপ্তির দিকে তাকিয়ে বললো, বলুন? কী ব্যাপার?

দীপ্তি চট করে কিছু বলতে পারলো না। অনেক সাহস নিয়ে সে একা উঠে এসেছে, কিন্তু হীরকের ব্যক্তিত্বের কাছে সে এতই দুর্বল হয়ে পড়ে যে, কীভাবে কথা বলতে হবে, বুঝতে পারে না।

হীরক তাকিয়ে রইলো দীপ্তির দিকে। সে বুদ্ধিমান, সে বুঝতে পারলো, মেয়েটি কিছু একটা দরকারী কথাই বলতে এসেছে, কিন্তু বলতে পারছে না। নরম গলায় সে বললো, কী বলবেন, বলুন না।

দীপ্তি তখনও চুপ।

দরজা খুলে হীরক বললে, ভেতরে আসুন। বসুন ঐ চেয়ারে।

দীপ্তিকে বসিয়ে রেখে হীরক তার টেবিলে বইপত্র রাখলো, জুতো খুলে চটি পরলো, ফ্রিজ থেকে বার করে ঠাণ্ডা জল পান করলো। তারপর দীপ্তির মুখোমুখি অন্য চেয়ারে বসে বললো, আপনার ছেলে কেমন আছে?

দীপ্তি বসে আছে আড়ষ্টভাবে। এমন ভাবে সে কখনো কোনো পুরুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে আসেনি। কিন্তু আজ সে এসেছে নারী হিসেবে নয়, মা হিসেবে। একমাত্র সন্তানকে বাঁচাবার জন্য মায়েরা যেমন সব কিছু করতে পারে। হীরকের দেওয়া সেই বেবি-ফুড খাইয়ে সে তার সন্তানের আশাতীত উন্নতি দেখেছে এই ক'দিনে।

সে বুঝেছে, এখন এছাড়া তার ছেলেকে আর বাঁচানো যাবে না।

কিন্তু বাজারের কোনো দোকানে বেবিফুড পাওয়া যায় না। একমাত্র হীরকই পারে জোগাড় করতে।

দীপ্তি বললো, এখন একটু ভালো আছে।

হীরক বললো, বড্ড কাঁদে। আমি মাঝে মাঝে শুনতে পাই।

—ভাত ওর পেটে সহ্য হয় না।

—ডাক্তার দেখিয়েছেন ?

—হ্যাঁ, একবার।

—ডাক্তার দেখিয়েই বা কী হবে ? শুধু ওষুধ খেয়ে তো কেউ বাঁচে না। ভালো খাবার দাবার দরকার। ভালো করে খাওয়ান, ছেলের স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যাবে, কান্নাও বন্ধ হবে।

দীপ্তির একটা হাত মুঠো করা ছিল, এবার সে মুঠো খুললো। এক জোড়া সোনার দুল। খুবই ছোট এবং সাধারণ। হীরকের দিকে তাকিয়ে বললো আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি। কিন্তু আমার উপায় নেই। আপনাকে ওরকম টিন আরও দু'একটা জোগাড় করে দিতে হবে। সেদিন আপনি দাম নেননি। এই সামান্য জিনিস দুটো নিয়ে যদি—

হীরক হাসলো। নিজের হাতে তুলে নিল দুল দুটো। অভিজ্ঞ জহুরির মতন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আপন মনেই বললো, পঞ্চাশ ষাট টাকা দাম হবে। তার বেশি না।

তারপর দীপ্তির দিকে তাকিয়ে বললো, মেয়েদের তো গয়না বিক্রি করে দিতে খুব কষ্ট হয়, তাই না!

দীপ্তি বললো, আমার হবে না।

—এই কি শেষ গয়না, না আরও কিছু আছে ?

দীপ্তি উত্তর না দিয়ে মুখ নিচু করে রইলো।

দুল দুটো টেবিলে রেখে হীরক কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো দীপ্তির দিকে। তার মনে কোনপ্রকার কুচিন্তা জাগেনি। বস্তুত সে দীপ্তিকে দেখছে না, দেখছে একজন বেকারের স্ত্রীকে। হীরক নিজে কখনো অর্থকষ্ট ভোগ করেনি, সে সচ্ছল পরিবারের সন্তান, কিন্তু একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে দেশের সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। এবং সাধারণ মানুষের অবস্থা যে এখন কোন ভয়ঙ্কর স্তরে এসে গেছে—সে সম্পর্কেও তার কোনো ভুল ধারণা নেই। তবে সে তো সমাজসংস্কারক নয়, গবেষক।

তার কাজ মানুষের নিত্ত-নৈমিত্তিক উপকার করা নয়—এই দুর্দশার কারণগুলো দেখিয়ে দেওয়া।

সে নির্লিপ্তভাবে বললো, আমি তো নানা কাজে ব্যস্ত থাকি, আমার পক্ষে তো বারবার দোকানে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি যদি একটা চিঠি লিখে দিই, আপনার স্বামী নিয়ে আসতে পারবে না? প্রথমে দিতে চাইবে না অবশ্য, বাজারে মাল প্রায় নেই বলতে গেলে, তবে যদি লেগে থাকতে পারে—

দীপ্তি বললো, ও এসব ঠিক পারে না।

—না পারলে চলবে কেন? নিজের ছেলেকে বাঁচাবার দায়িত্ব কি অন্য লোক নেবে?

—আরও অনেকেই তো দোকান থেকে ফিরে আসে। আমি জানি ওকেও ফিরে আসতে হবে, ও পারবে না।

—তাহলে আপনি নিজেই চলে যান—দোকানের ঠিকানা বলে দিচ্ছি।

—আমি তো কলকাতায় একলা কখনো বেরোইনি। রাস্তাঘাট চিনতে পারি না।

—বিপদে পড়লে অনেক কিছুই করতে হয়।

দীপ্তি চুপ করে রইলো। হীরক টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে টক্ টক্ শব্দ করলো কিছুক্ষণ, তারপর উঠে গিয়ে সিগারেট ধরালো। সে ভাবলো, দেশে যদি এখন আঠারো লক্ষ বেকার থাকে, তার মধ্যে আট লক্ষও যদি বিবাহিত হয়, তাহলে সেই আট লক্ষ পরিবারে কি এখন এই মুহূর্তে ঠিক একই অবস্থা চলছে?

বেকারের স্ত্রীদের সাধারণত রোগা হওয়ার কথা। শাড়িও ময়লা ও ছেঁড়া হওয়া উচিত—বিশেষত করুণা চাইতে আসবার সময়ে। এ মেয়েটি কিন্তু তা নয়। এর চেহারায় এখনো চাকচিক্য আছে, বয়েস তো খুবই কম—শাড়িটিও মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। কিন্তু কতদিন এরকম থাকবে? বাড়িভাড়া না দেওয়ার অপরাধে হীরক যদি ওদের তাড়িয়ে দেয়, তাহলে কি ওরা বস্তিতে গিয়ে উঠবে?

হীরকের একবার খুব ইচ্ছে হলো, সামনের মাসেই ওদের তাড়িয়ে দিয়ে তারপর ফলাফলটা কী হয় দেখে। বস্তিতে গিয়ে ওদের জীবন কীরকম হয়ে যায়—সেটাও জানা দরকার। ছেলেটা নিশ্চয়ই মারা

যাবে দু'এক মাসের মধ্যে। এই বৌটা কি পরের বাড়িতে ঝি বা রাঁধুনির কাজ করতে রাজি হবে? রাজি না হয়েই বা কী করবে তখন। হীরকের নিশ্চয়ই উচিত ওদের তাড়িয়ে দিয়ে এই সব অবস্থার ফলাফল পরীক্ষা করে দেখা। এই রকম অনেক শিশুই বিনা ওষুধ-পথ্যে মারা যায়—অনেক স্ত্রীলোককেই অভাবে পড়ে ঝিগিরি বা বেশ্যাগিরি করতে হয়। আট লক্ষ বেকার পরিবারের প্রতি তো সারা দেশের লোক দয়া দেখাচ্ছে না, সে একাই বা কেন দয়া দেখাবে? কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই, ওদের তাড়িয়ে দিয়ে তারপর তো আর সে ওদের পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাবে না।

হীরক বললো, দিনকাল খুব খারাপ, সেটা আপনি বুঝতে পারেন?

দীপ্তি কোনো উত্তর দিল না।

হীরক আবার বললো, যুদ্ধের সময় যে সব কোম্পানিগুলি ফেঁপে উঠেছিল, এখন তাদের অবস্থা খারাপ, তাই স্টাফ ছাঁটাই হচ্ছে। রেশনিং তুলে দেবার জন্য ফুড ডিপার্টমেণ্টেও হাজার হাজার বেকার। চাকরির বাজার অসম্ভব খারাপ। আপনার স্বামী শিগগিরই যে চাকরি পাবেন তার কোনো আশা নেই। কতদিন এভাবে চালাতে পারবেন?

—জানি না।

—এই রকম দুঃসময়ে মেয়েদেরও উচিত স্বামীদের সাহায্য করা। শুধু বাড়ি বসে কান্নাকাটি করলে কোনো সমাধান নেই। আপনি কতদূর লেখাপড়া শিখেছেন? স্কুল ফাইনাল পাশ করেছেন? বাঃ! লেখাপড়া যখন শিখেছেনই—তখন সেটা কাজে লাগাবার চেষ্টা করুন। শুধু গয়নাই তো অ্যাসেট নয়, লেখাপড়াও একটা অ্যাসেট। মেয়েরা এখনো স্কুলে চাকরি-টাকরি পায়। কিংবা প্রাইভেট টিউশানি করা যেতে পারে। সেজন্য কিছু চেষ্টা করেছেন?

—না।

—কেন?

—আমি এখনো এখানকার কিছুই চিনি না।

—চেনবার দরকার কী? খবরের কাগজ দেখুন—এখনো মেয়ে ইস্কুলের টিচারের ভ্যাকেন্সি থাকে—সেইসব দেখে দরখাস্ত করুন।

—আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

—কেন, দরখাস্ত লিখতে জানেন না?

—আমার স্বামী আমার চাকরি করা পছন্দ করেন না।

হীরক ভরাট গলায় হাসলো। ব্যাপারটা খুব উপভোগ করে সে বললো, বাঃ! বাঃ! অভাব যত বাড়ে কুসংস্কার ইত্যাদিও তত জেঁকে বসে। দেখবেন, আমাদের এখানকার মধ্যবিত্ত পরিবার, যাদের ব্যাঙ্কে একটাও টাকা জমা নেই—তারাই কী ভীষণ নীতিবাগীশ। ওদিকে রাশিয়াতে মেয়েরা এখন ট্রেন চালায়।

হীরক খুব গম্ভীর ভারিক্কি চালে কথা বলছিল। যেন সে ছাত্র-ছাত্রীদের উপদেশ দিচ্ছে। দীপ্তি তৃষ্ণার্তের মতন শুনছিল। এইসব মুক্তির কথা কেউ তাকে আগে বলেনি। তার মনের সঙ্গে মিলে যায়—কিন্তু তার বন্ধন ভাঙার সামর্থ্য যে তার নেই।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে হীরক তাকে সামাজিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, নারীর মুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে বোঝালো। তারপর বললো, এই সব বিষয়ে অনেক বই আছে, নিজে কয়েকবার পড়ে দেখুন। ইংরেজি পড়তে পারবেন? বাংলাতেও কিছু কিছু আছে—আচ্ছা, পরে খুঁজে রাখবো এখন।

হীরকের ঘর বইতে ভর্তি। তিনদিকের দেয়াল-ভরা বইয়ের আলমারি। দীপ্তি ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলো সব বই। তার ভীষণ বই পড়তে ভালো লাগে অথচ কতদিন সে একটাও বই পড়েনি।

দীপ্তি বললো, আমাদের দেশের মেয়েরা এসব বুঝলেও কাজে কিছু করতে পারবে কি?

—কেন পারবে না? আমাদের দেশেরও কয়েকটি মেয়ে এখন প্লেন চালাচ্ছে।

—আমি বলছি আমার মতন সাধারণ মেয়েদের কথা।

—এরাও এমন কিছু অসাধারণ নয়। অনেকেই সাধারণ পরিবার থেকে এসেছে। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নাম শুনেছেন? সেও তো অতি সাধারণ পরিবারের মেয়েই ছিল—সে কী করে বাপ মায়ের কথা অগ্রাহ্য করে দেশের জন্য প্রাণ দিতে গিয়েছিল, বলতে পারেন? মনের জোরটাই আসল। অবশ্য বিয়ের পর বাচ্চা টাচ্চা হয়ে গেলে মেয়েদের একটু অসুবিধেয় পড়তে হয়। কিন্তু সে অসুবিধেও দূর করতে হবে, একটা কিছু উপায় বার করতেই হবে। নইলে, বিপদে পড়লেই যদি অন্যের কাছ থেকে দয়া চাইবার জন্য ছুটতে হয়, তা হলে সেই নিচু জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে লাভ কী?

যদি ছেলের ঘুম ভেঙে যায়, এই চিন্তায় চঞ্চল হয়ে উঠলো দীপ্তি। এবার তাকে যেতে হবে। অথচ বেবিফুড সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত হলো না। ওটা যে তার ভীষণ দরকার।

হীরক বললো, এবার কাজের কথা বলা যাক। আপনার ছেলের যা স্বাস্থ্য, তাতে হয় ওর পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ কিংবা বেবিফুড খাওয়া দরকার। আমার পক্ষে এসব জোগাড় করে দেওয়া নিয়মিতভাবে সম্ভব নয়—তার কারণ, আমার নিজস্ব অনেক কাজ থাকে। দ্বিতীয়ত আমি এতটা পরোপকারী ধরনের মানুষ নই। এসব ব্যবস্থা আপনাদের নিজেদেরই করে নিতে হবে। আমি একসঙ্গে দু'তিনটে টিন জোগাড় করে দেবার চেষ্টা করবো।

দুল দুটো টেবিল থেকে তুলে দীপ্তির কোলে ছুঁড়ে দিয়ে হীরক বললো, এগুলো রাখুন। আমি বন্ধকির ব্যবসা করি না। কিংবা এগুলো আমার পক্ষে কোনো গয়নার দোকানে বিক্রি করাও সম্ভব নয়। আমার কাছে ঋণ রাখতে আপনার আত্মসম্মানে লাগা উচিত। গরিবদের বেশি আত্মসম্মান বোধ থাকা ভালো। আপনার স্বামীর চাকরি হলে আমাকে আস্তে আস্তে শোধ করে দেবেন।

—আপনার ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারবো না।

—ওসব বাজে কথা। ওটা একটা কথার কথা। নেহাত বেবি-ফুডের একজন ডিলার আমার বাল্যবন্ধু, তাই আমি এটা জোগাড় করে দিতে পারছি। চেনাশুনো না থাকলে পারতাম না। টাকার ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। যাই হোক, সেটা পরে হিসেব করে আমাকে শোধ করে দিলেই চলবে। আর একটা কথা, আপনার ছেলের জন্য না হয় আমি খাবার জোগাড় করে দিলাম, আপনাদের নিজেদের খাবারের কী অবস্থা? অন্য কোনো কারণে জিজ্ঞেস করছি না। বলছি এই জন্য যে, মা কিংবা বাবা অসুখে পড়লে তো ছেলের আরও অযত্ন হবে।

—উনি একটা চাকরি পেয়ে যাবেন নিশ্চয়ই।

—সে জন্য কালীঘাটে পুজো দিয়েছেন? স্বয়ং ভগবানও আজ-কাল চাকরি দিতে পারেন না। একমাত্র রাইটার্স বিল্ডিংস-এর কয়েকজন ঠাকুর দেবতা ছাড়া চাকরি দেবার ক্ষমতা কারুর নেই।

—আমি তো এসব জানি না।

—সে কথাই তো বলছি, এ সবও জানতে হবে। বাচ্চাকে বাঁচাবার

জন্য অন্যদের কাছে সাহায্য চাওয়া যায়, নিজের জন্য চাওয়া কি এত সহজ। যে লোক চাকরি ছাড়া আর কিছু জানে না, তাকে বাঁচতে হলে চাকরি পেতেই হবে, তাই না?

—কিছুতেই কি ও চাকরি পাবে না?

—একদিন না একদিন হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু কথা হচ্ছে, কবে তার চাকরি হবে? আমিই বা কতদিন আপনাদের সাহায্য করবো? একমাত্র উপায় হচ্ছে আপনার স্বামীর একটা চাকরি জোগাড় করে দেওয়া। আমার কিছু কিছু চেনাশুনো আছে। আপনার স্বামীর সমস্ত কোয়ালিফিকেশন আর অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে একটা দরখাস্ত লিখে আমার কাছে দিয়ে রাখতে বলবেন, চেষ্টা করবো! হবেই কথা দিতে পারছি না, চেষ্টা করবো। উনি নিজেও চেষ্টা করুন।

এইটুকু বলেই হীরক চেয়ার থেকে এমন ভাবে উঠে দাঁড়ালো যেন সব কথা বলা হয়ে গেছে। এবার দীপ্তিকে যেতে হবে। যেন দীপ্তির সঙ্গে তার একটা ইণ্টারভিউ ছিল, সেটা শেষ হয়ে গেছে, আর সময় নষ্ট করা যায় না।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতে কৃতজ্ঞতায় দীপ্তির মন ভরে গেল। হীরকের কথাগুলো একটু চাঁছাছোলা, কিন্তু তার হৃদয়টা যে মহৎ তা বোঝা যায়। মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা সে বোঝে। এতক্ষণ দীপ্তি তার ঘরে ছিল, একটুও অশোভন ব্যবহার সে করেনি, অঙ্গবিশেষের দিকে চোখ আটকে রাখেনি, পুরুষ মানুষরা সাধারণত যা করে।

কয়েকদিনের মধ্যেই হীরক চাকরের হাত দিয়ে তিন টিন বেবি-ফুড পাঠিয়ে দিল, তারপরই সে সিমলায় চলে গেল একটা মিটিং-এ যোগ দিতে। ফিরে এসে নিজেই সে রাজেনের কাছ থেকে চাকরির দরখাস্ত চেয়ে নিল। রাজেনের একেবারে গদগদ অবস্থা, সব সময় সে হীরকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

দীপ্তিরও খুব ভাল লাগে হীরককে। যে বাইরের জীবনের স্বপ্ন সে দেখেছে, হীরকই তার কাছে একমাত্র সেই বাইরের জগতের প্রতিনিধি। সে সংসারে শুধু আটকে থাকেনি, পড়াশুনার মধ্য দিয়ে সে সারা পৃথিবীকে ছুঁয়ে আছে। প্রায়ই কলকাতা ছেড়ে অন্য কত জায়গায় যায়। দীপ্তি এখন হীরকের সঙ্গে অনেকখানি স্বাভাবিক

হয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই তার কাছে যায়, দু'একটা বই পড়তে আনে।

এই সময় অবস্থা আরও জটিল হয়ে দাঁড়ালো, রাজেন অসুখে পড়লো। তখন রাজেনের বেকারত্বের দেড় বছর পূর্ণ হয়েছে। ঘড়ি আংটি গয়না কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। নানা লোকের কাছে ধার। রাজেন অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার চিকিৎসা তো দূরের কথা, খাওয়া জোটানোই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। সে বাড়ি থেকে বেরুলে তবু যে করেই হোক দু' পাঁচ টাকা নিয়ে আসতো। এবার রাজেন মৃত্যু-ভয় পেল। আর বুঝি উপায় নেই।

রাজেন দীপ্তিকে বললো, হীরকবাবুর কাছ থেকে একশো টাকা ধার করে নিয়ে আসতে।

সব যায়, তবু লজ্জা যায় না, সঙ্কোচ যায় না। স্বামী রুগ্ণ, ছোট ছেলেটি ক্ষিদেয় কাঁদছে—তবু দীপ্তি হীরকের কাছে গিয়ে হাত পাততে চায় না। রাজেন একটা বিশ্রী ধরনের গালাগালি দিল দীপ্তিকে।

হীরক কখন বাড়ি থাকে, কখন থাকে না, ঠিক নেই কিছু। কখনো সে সারাদিন বাড়িতে বসে পড়াশুনো করে, কোনদিন বা ভোরে বেরিয়ে যায়। দু'তিন দিন ধরে তাকে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না। সেদিন হীরক ফিরলো রাত ন'টায়। সদর দরজায় তার গলার আওয়াজ পেয়েই রাজেন দীপ্তিকে তাড়া দিল, ঐ তো এসেছে, এবার যাও!

দীপ্তি কাতরভাবে জিজ্ঞেস করলো, আমি ওঁর কাছে গিয়ে কী বলবো বলো তো!

রাজেন বললো, কী আর বলবে একশোটা টাকা ধার চাইবে।

কিন্তু একজন অনাত্মীয় পুরুষের কাছে কোনো গৃহস্থ ঘরের বউ টাকা চাইতে যেতে পারে? রাজেন কিছুতেই এ কথাটা এখন বুঝবে না। রাজেনের চরিত্রে এমন জোর নেই যে মৃত্যুভয় পেয়েও সে আত্ম-সম্মানের কথা চিন্তা করতে পারে।

দীপ্তি যত ইতস্তত করে, রাজেন ততই তাকে তাড়া দেয়। রাজেনের ভাষায় আর কোনো শালীনতা থাকে না।

আধ ঘণ্টা খানেক দেরি করে তারপর দীপ্তি ওপরে গেল। হীরক বাড়িতে ফিরে জামা কাপড় ছেড়েই আবার বই নিয়ে বসেছে। দীপ্তিকে দেখে বই নামিয়ে রেখে বললো, কী খবর?

দীপ্তি টাকা ধার চাওয়ার কথাটা মুখে বলতে পারবে না বলে একটা কাগজে লিখে এনেছে। সেটা দেবার সময় পেল না।

হীরক ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আজ তার চোখ-মুখ উত্তেজিত। সে বললো আজ একটা ভাল খবর পেলাম। সামনের মাস থেকে আমি ইউনিভারসিঁটিতে একটা লেকচারারশিপ পাচ্ছি! আজ খুব আনন্দ করতে ইচ্ছে করছে।

দীপ্তি চট করে বুঝতেই পারলো না। ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার-শিপ পাওয়ার আনন্দটা ঠিক কী রকম। তা ছাড়া, সে এমন একটা সাংসারিক অশান্তির মধ্যে রয়েছে যে অন্য কারুর দুঃখ বা আনন্দের কথা বুঝবারই তার সময় নেই।

হীরক বললো, বাড়ি ফিরে একা একা বই পড়তে খুব খারাপ লাগছিল। ভাগ্যিস আপনি এলেন!

তারপর সে দীপ্তির দিকে অন্য রকম চোখে তাকালো। যেন এই প্রথম সে আবিষ্কার করলো, দীপ্তি একটি স্বাস্থ্যবতী নারী, একে নিয়েও আনন্দ করা যেতে পারে। এর আগে এরকম কোনো পরিকল্পনাই ছিল না তার। এখন এই কথাটা মনে পড়ায় সে আর দীপ্তির মতামত নেবারও প্রয়োজন বোধ করলো না। সোজা এসে দরজা বন্ধ করে দীপ্তির কাঁধের ওপর দুটো হাত রাখলো সে।

দীপ্তি প্রতিরোধ করারও সুযোগও পেল না। সে বিমূঢ় হয়ে গেছে। হীরকের ব্যবহারে কোনদিন শৈথিল্য দেখেনি সে, সে মনে মনে ভেবেছিল—মেয়েদের সম্পর্কে হীরকের বুঝি কোনো আকর্ষণই নেই। কিংবা সে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়ায়—কতরকম মেয়েদের সঙ্গে মেশে—দীপ্তির মতন সামান্য নারীর দিকে মনোযোগ দেবেই বা কেন?

হীরক দীপ্তিকে জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করতেই দীপ্তি ভয় পেয়ে বললো, এ কী করছেন?

হীরক সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, ও আপনার আপত্তি আছে? তা হলে আমার ভুল হয়েছে। আপনাকে আটকাতে চাই না।

দীপ্তি মুখ নিচু করে আছে। তার সারা শরীর কাঁপছে। হীরকের ছোঁয়াতে তার শরীরে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে যেন। সে বললো, আপনার কাছে একটা দরকারে এসেছিলাম।

—বলুন।

দীপ্তি তবু চুপ করে রইলো।

হীরক এবার এক ধমক দিয়ে বললো, অকারণে আমার সময় নষ্ট করার কি কোনো মানে হয় ? সারাদিন আমার অনেক পরিশ্রম গেছে—এখন অন্য কারুর ঘ্যানঘ্যানানি শোনার ইচ্ছে আমার নেই। আমি এখন একটু আনন্দ করতে চাই।

একটু থেমে হীরক বললো, ইচ্ছে করলে আপনি ঘরের দরজা খুলে চলে যেতে পারেন। আমি আটকাবো না।

কিন্তু দীপ্তি যাবে কী করে ? সে একটা মূর্তির মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

হীরক আপন মনেই বললো, তোমার শরীরে একটা সৌন্দর্য আছে, আমি আগে লক্ষ করিনি। তারপর আর একটিও কথা না বলে সে দীপ্তির কাঁধ দুটো জোর করে চেপে ধরে তার ঠোঁটে চুমু খেল। সে কী সাঙ্ঘাতিক চুম্বন—যেন সে দীপ্তির ভেতরের সবকিছু শুষে নেবে। হীরক তখন উন্মাদ। সেই বিদ্বান হৃদয়বান মানুষটিকে এখন চেনাই যায় না। কয়েক সপ্তাহ সে পড়াশুনো নিয়ে অনেক পরিশ্রম করেছে—এখন সে আনন্দ করবে।

দীপ্তিকে সে টানতে টানতে নিয়ে এলো পাশের ঘরে। দীপ্তি শুধু একবার কান্না জমানো গলায় বললো, আমায় ছেড়ে দিন, আমায় ছেড়ে দিন।

হীরক বললো, এতে কোনো দোষ নেই, এতে কোন দোষ নেই।

দীপ্তিকে বিছানায় শুইয়ে ফেলে হীরক নিজে আগে তার সব জামা কাপড় খুলে ফেললো। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো দীপ্তির সামনে। কোন রকম লজ্জা নেই। একটি নরম কথা সে বললো না, একবার শুধু হাসলো। তারপর ঠিক পশুর মতন ভঙ্গিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো দীপ্তির ওপর।

শেষ হয়ে যাবার পর দীপ্তি একটুক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো। হীরক তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, এতে কোনো দোষ নেই, এতে কোনো দোষ নেই।

দীপ্তি জলভেজা মুখখানা তুলে ধরলো হীরকের দিকে। হীরক তার চিবুকে হাত দিয়ে বললো, আমার ওপর খুব রাগ হচ্ছে বুঝি !

দীপ্তি কোনো কথা না বলে একদৃষ্টে তাকিয়েই রইলো।

হীরক একটা তোয়ালে এনে বললে আর কান্নাকাটির দরকার নেই। মুখটা মুছে ফেলো।

দীপ্তি তবু কান্না সামলাতে পারছে না।

সিগারেট ধরিয়ে হীরক বললো, চমৎকার, তুমি খুব চমৎকার।

দীপ্তি আসলে কাঁদছিল একটা অদ্ভুত ধরনের আনন্দে। লজ্জা কিংবা অপমান ছাড়িয়েও যে আনন্দ তার সারা শরীর কাঁপিয়ে দিচ্ছে। এতদিন তার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু শরীরের মধ্যে যে এত আনন্দের উপকরণ আছে—সে আগেও টের পায়নি। রাজেন নিরীহ মানুষ, সে বেশি কিছু চায় না। কিন্তু হীরকই যেন সত্যিকারের পুরুষ, সে তার শরীরটা নিয়ে যুদ্ধ করেছে। দীপ্তি প্রথমদিকে অনেক বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, হঠাৎ বাধা দেবার শক্তিই কী করে যেন তার হারিয়ে গেল। একজন পুরুষ একজন নারীকে যে কতখানি দিতে পারে—দীপ্তি তা এই প্রথম জানলো।

সেই মুহূর্তে গ্লানির বদলে কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল দীপ্তির। হীরক খাটের পাশে বসে সিগারেট টানছিল। দীপ্তি খাট থেকে নেমে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে হীরকের পা জড়িয়ে ধরলো।

হীরক যেন এখন এক অন্য ধরনের মহানুভব দেবতা। করুণার হাসি দিয়ে বললো, কোন কিছুর বিনিময়ে নয়, এমনিই আজ হঠাৎ তোমাকে পেতে ইচ্ছে করলো। মাঝে মাঝে এরকম না করলে আমার মাথা ঠিক থাকে না।

তারপর সে তার সবল দু'হাতে দীপ্তিকে মেঝে থেকে তুলে বুকের কাছে এনে আবার মুখ চুম্বন করলো।

দীপ্তি নিচে নেমে আসার পর রাজেন গলায় অনেকখানি বিষ মিশিয়ে জিজ্ঞেস করলো, দিয়েছে টাকা? এতক্ষণ লাগলো? এতক্ষণ ধরে কী কথা হচ্ছিল, অ্যাঁ?

দীপ্তি শান্ত গলায় বললো, হীরকবাবু বললেন তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে নাও। সামনের সপ্তাহে তোমার চাকরির জন্য ইণ্টারভিউ দিতে যেতে হবে। উনি সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

॥ ৩ ॥

এক বছর দশ মাস পরে রাজেন আবার একটি চাকরি পেয়ে সব

কিছুই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। সৌভাগ্যের বিষয়, এই চাকরিটা আগের থেকেও ভালো। এবং পাকা চাকরি, আর হারাবার ভয় নেই। চাকরিটা হীরকই জোগাড় করে দিয়েছে।

রাজেনের স্বভাব আবার শান্ত হয়ে এসেছে। আর সে দীপ্তিকে বকাবকি করে না, ছেলেকেও আদর করে। ছেলেটার স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে, সারাবাড়ি দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ায়।

একটা চাকরি একটা সংসারকে সমূলে বিনষ্ট করে দিতে বসে-ছিল। এবং এ ক্ষেত্রে হীরকই যেন বিধাতাপুরুষ, সে এই তিনটি প্রাণীকে বাঁচিয়েছে। তার বিনিময়ে সে যা নিয়েছে তা কি খুব বেশি। দীপ্তি একা থাকলেই সেই কথা ভাবে!

রাজেনের চোখে হীরক সত্যিই বিধাতা। দীপ্তি যখন রান্না করে তখন রাজেন রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে তার সঙ্গে গল্প করে। সে বলে অসময়েই বন্ধু চেনা যায়। কলকাতা শহরে আমার এতো চেনা-শুনো বন্ধু ছিল। কেউ কোনোরকম সাহায্য করেনি, আর হীরকবাবু আমাদের আত্মীয় না, কেউ না, শুধু বাড়িওয়ালা, উনি যা করলেন সে রকম কেউ করে?

রাজেন এ কথা দীপ্তিকেই বেশি করে বলে, কারণ আর তো শোনাবার লোক নেই। সে হীরকের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়েছিল, কিন্তু হীরক তাকে আর পাত্তাই দেয়নি। আর যাই হোক, তোশামোদ কিংবা গদগদ স্তুতিবাক্য শুনে নষ্ট করার মতন সময় হীরকের সত্যিই নেই।

সেই এক বছর দশ মাসের দুঃসহ দুঃস্বপ্নের স্মৃতি আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে যায়। রাজেন এখন আবার দীপ্তিকে নিয়ে নাইট শো-তে সিনেমায় যায়, কোন কোন দিন অফিস থেকে ফেরার পথে পাঞ্জাবী রেস্টুরেণ্ট থেকে মাংস কিনে আনে। আগেরই মতন সে বিছানায় বহুক্ষণ শুয়ে থেকে আলস্য উপভোগ করে, মাসের গোড়ায় ঠিকঠাক ভাড়া পাঠিয়ে দেয়।

হীরক এখন আবার দূরের মানুষ হয়ে গেছে। তাছাড়া হীরক এখন আরও বেশি রকম কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বেশির ভাগ সময়েই বাড়ি থাকে না, কখনো বা এক দঙ্গল লোক সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফেরে।

দীপ্তি তারপর আর বেশ কিছুদিন হীরকের সঙ্গে দেখা করেনি।

এই নিয়ে সে অনেক ভেবেছে এটা কি তার পক্ষে অকৃতজ্ঞতা ? একবার অন্তত যাওয়া উচিত ? কিন্তু সেদিনকার সেই ঘটনার পর সে যদি আবার নিজে থেকে যায়—তাহলে সেটা কি নির্লজ্জতা হবে না ? হাজার হোক, সে তো মেয়ে ! হীরক একবারও নিজে থেকে তাকে আবার আসতে বলেনি। আশ্চর্য এই মানুষটি, একই সঙ্গে দারুণ উদাসীন এবং লোভী।

এবং হীরক যে রাজেনের চাকরির বিনিময়েই তার শরীর স্পর্শ করেছিল, একথাও দীপ্তি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। এরকম নীচ সুযোগসন্ধানী সে নয়। এরকম কথা সে কখনো উচ্চারণ করেনি।

অনেক ভেবে-চিন্তে দীপ্তি নিজে থেকেই একদিন গেল। মাস দু'এক বাদে। তখন দুপুরবেলা, সারা বাড়ি নিঝুম। ছেলেকে ঘুম পাড়ানো হয়ে গেছে। হীরকের একখানা বই অনেকদিন ধরে দীপ্তির কাছে পড়েছিল, সেটা ফেরত দেবার অজুহাতে বইখানা হাতে নিয়ে গেল।

হীরকের ঘরের দরজা খোলাই ছিল। খালি গায়ে টেবিলে বসে সে গভীর মনোযোগ দিয়ে কী সব লেখালিখি করছিল, টেবিলের ওপর অনেক বইপত্তর ছড়ানো। দীপ্তিকে দেখে বললো, একটু বসো। এই একটুখানি শেষ করে নিই।

দীপ্তি শান্ত হয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো। হীরক ভুরু কুঁচকে খসখস করে লিখে যাচ্ছে। যখন সে কাজ করে, গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাজ করে। এরকম মনোযোগ দেখতেও ভালো লাগে। হীরক সুপুরুষ নয়, তার শরীর খুব সুগঠিতও নয়, কিন্তু এমন এক ধরনের ব্যক্তিত্ব আছে তার উপস্থিতিতে, যা আকৃষ্ট না করে পারে না।

একটা পাতা শেষ করে সেটা চাপা দিয়ে হীরক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। আয়েস করে সিগারেট ধরিয়ে সে বললে, তারপর, কী খবর ?

দীপ্তি বললো, বইটা ফেরত দিতে এলাম।

—ঠিক আছে। অন্য কোনো বই যদি থাকে, যেটা খুশি নিজে দেখে নিয়ে যাও।

হীরক সেদিন থেকেই তুমি বলতে শুরু করেছে। কোনো রকম অনুমতিই নেয়নি।

দীপ্তি বললো, আপনি যে রাত-দিন এত পরিশ্রম করেন, কিসের

জন্য ? আপনার তো কিছুর অভাব নেই। তবু মানুষ এত পরিশ্রম করে কেন ?

হীরক লঘুভাবে হেসে বললো, যার যা ভালো লাগে। আমার এইসবই ভালো লাগে। আমি আমাদের দেশের বেকার সমস্যার ওপর একটা বই লিখছি। পড়ে দেখবে ?

হীরক লিখছে ইংরেজিতে। কয়েকখানা টাইপ করা পৃষ্ঠা টেবিলে ছড়ানো। সেদিকে তাকিয়ে দীপ্তি বললো, আমি এর কিই বা বুঝবো।

—হুঁ, যারা দারিদ্র্য কিংবা বেকারত্বের কষ্ট ভোগ করে, তারা কেউ সে সম্পর্কে লিখতেও জানে না, পড়তেও চায় না। এসব লেখে কিংবা পড়ে অন্যরা। এটাই মজার।

দীপ্তি লাজুকভাবে বললো, আমার ইচ্ছে করে পড়াশুনা করতে। আপনি একটু ব্যবস্থা করে দেবেন ?

হীরক বললো, আমি ? আমি কী ব্যবস্থা করবো ? কলেজে ভর্তি হয়ে যাও।

—আমার কলেজে ভর্তি হওয়া হবে না।

—কেন ?

—সংসারের কাজকর্ম করতে হয়। তা ছাড়া, আমার স্বামী এসব পছন্দ করেন না—

হীরক হাসতে হাসতে বললো, 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেহ নাহি দিবে অধিকার! হে বিধাতা, আমি তোমাকে কী সাহায্য করবো বলো ?

লজ্জার মাথা খেয়ে দীপ্তি বললো, আপনি আমাকে বাড়িতে একটু একটু পড়াবেন ?

হীরক বললো, আমার তো সময় নেই। আমার নিজের অনেক কাজ। তা ছাড়া, ম্যাট্রিক পাশ ছেলেমেয়েদের কী করে পড়াতে হয় ভুলে গেছি।

হীরক ওপরে দু'হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলো। তারপর বললো এই যাঃ! খালি গায়েআছি। কোনো ভদ্রমহিলার সামনে তো খালি গায়ে থাকা উচিত না। দরজাটা বন্ধ করে দেবে ?

দীপ্তি চমকে উঠলো।

হীরক বললো, সারাদিন আজ অনেক কাজ করেছি, এখন খানিকটা

বিশ্রাম নেওয়া যায়। লিখে লিখে আঙুল ব্যথা হয়ে গেছে। আঙুল-গুলো একটু টিপে দাও না।

দীপ্তি দ্বিধা করতে লাগলো। যদিও তার মনে হলো হীরকের একটু সেবা করা তার অত্যন্ত উচিত। আঙুল টিপে দেওয়া তো কিছুই না। তবু তার দ্বিধা কাটে না।

হীরক এবার হুকুম করলো উঠে এসো। এদিকে এসো।

তারপর নিজেই সে উঠে দরজা ও জানলা বন্ধ করে দিয়ে এসে দাঁড়ালো দীপ্তির চেয়ারের পাশে। উৎফুল্ল গলায় বললো বাঃ স্বাস্থ্য তো এই ক'দিনে আরও ভালো হয়েছে দেখছি। কী খুকি, মনে আনন্দ আছে তো এখন?

হীরক তাকে স্পর্শ করামাত্র দীপ্তি একেবারে কেঁপে উঠলো। অসহ্য সুখ উপছে উঠলো শরীরে। সে তা নিজের কাছে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবে না যে, এই স্পর্শটার জন্যই সে অপেক্ষা করে ছিল গত দু'মাস।

তবু দীপ্তি বললো, আমাকে এক্ষুনি নিচে যেতে হবে।

হীরক রুক্ষভাবে বললো, কেন?

—অনেক কাজ পড়ে আছে।

—ঠিক আছে যাও।

প্রথম দিনেও হীরক ঠিক এই রকম ব্যবহার করেছিল। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে এসে সে গায়ে হাত রাখে, কিন্তু একটু আপত্তি করলেই সে হাত সরিয়ে নিয়ে বলে, চলে যাও।

চলে যাও বললেই কি কোনো মেয়ে যেতে পারে? দীপ্তি ইতস্তত করে বলে, আপনার কাছে আমার খুব আসতে ইচ্ছে করে। কিন্তু—

হীরক বললো, ইচ্ছে করে? বাঃ, এসো তা হলে, ইচ্ছে থাকলে সেটা চেপে রেখে লাভ কী?

দীপ্তি মুখ ফিরিয়েই দেখলো হীরক তার পাজামার দড়ির গিঁট খুলতে শুরু করেছে। তারপর নিচু হয়ে দীপ্তির ঘাড়ের কাছে কামড়ে ধরলো। দু'হাত দিয়ে তাকে চেয়ার থেকে টেনে তুলে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলো যেন সে দীপ্তির হাড়পাঁজরা ভেঙে ফেলবে। সেই রকম আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই দু'জনে শুয়ে পড়লো মেঝেতে।

অসহ্য সুখের মুহূর্তে দীপ্তি বলতে লাগলো, আমাকে মেরে ফেল! আমাকে মেরে ফেল। আমি আর পারছি না।

সেইদিনই দীপ্তি বুঝতে পারলো, এই মহৎ বর্বরটিই তার জীবন-সর্বস্ব। এর কাছেই তার নিয়তি বাঁধা।

একটু বাদেই হীরক যেন আবার অন্য মানুষ। ঘরের সব দরজা জানলা খুলে দিয়ে বললো, এবার আবার কাজে বসবো। তুমি কী বই নেবে, নিয়েছ?

দীপ্তি আবিষ্ট গলায় বললো, আমার এক্ষুনি যেতে ইচ্ছে করছে না।

—তাহলে বসে থাকতে পারো।

—আপনি কাজ করবেন, আর আমি এমনি এমনি বসে থাকবো?

—ইচ্ছে হলে কোনো বই-টই পড়ো। আর শোনো, এখন থেকে আমাকে আর আপনি আপনি বলতে হবে না। বড্ড সেকেলে শোনায়।

—আপনার মতন এত বড় একজন মানুষকে কি আমি তুমি বলতে পারি?

—আমি কেউকেটা নই। তাছাড়া মেয়েদের কাছে কোনো পুরুষই তেমন বড় নয়। এটা যেদিন বুঝতে পারবে, সেদিন আর কোনো ভয় থাকবে না।

—আমি বসে থাকলে তোমার অসুবিধা হবে?

—কিছু না!

—আজ না হয় আর কাজ না করলে।

—মাথার মধ্যে দু'একটা পয়েণ্ট ঘুরছে। সেটা না লিখলে চলবে না। আর একটা কথা শোনো, এরপর কয়েকদিন আমি আরও বেশি ব্যস্ত থাকবো। হঠাৎ যখন তখন কিন্তু এসো না।

এই আকস্মিক অপমানে দীপ্তির মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। হীরক নরমভাবে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে জানে না, কিন্তু এই সময় সে এরকমভাবে অপমান করবে!

হীরক মুখ তুলে তাকিয়ে বললো, রাগ করলে? আচ্ছা বসো, কয়েকটা কথা বুঝিয়ে বলি। আমার কাছ থেকে বেশি কিছু আশা করো না, তাহলে নিরাশও হতে হবে না। আমি মেয়েদের ভালো-বাসতে জানি না। আমি কাজ ভালোবাসি। পরিষ্কার মাথায় সেই সব কাজ করার সুবিধের জন্যই কখনো কখনো মেয়েদের দরকার হয় আমার। সব সময় নয়। বুঝলে? আমি তোমাকে যখন ডাকবো, তখন আসবে।

—তখন যদি আমার আসবার সুবিধে না থাকে ?

—তাতে চিন্তা করার কিছু নেই। আমি অন্য কোনো মেয়ের কাছে—।

—আমার কোনো মূল্যই নেই তোমার কাছে ?

—নিশ্চয়ই আছে। তুমি চমৎকার মেয়ে। কিন্তু তোমার চেয়েও আমার কাজ বড়।

—সবটাই তোমার নিজের প্রয়োজনে! তুমি অন্য কারুর কথা ভাবো না ?

—শোনো দীপ্তি, তুমি যদি আমার কাছ থেকে প্রেম ভালোবাসার কথা আশা করে থাকো, তবে খুব ভুল করেছো। পৃথিবীতে কিছু কিছু লোক থাকে প্রেমিক হবার যোগ্য। সবাই পারে না। আমিও পারি না।

—তা হলে আমি এই পাপ করলাম কেন ?

—আঃ, জ্বালালে দেখছি! এর মধ্যে আবার পাপের কী দেখলে ?

—তুমি এত বিদ্বান–বুদ্ধিমান, তুমি বুঝতে পারো না যে এটা পাপ ?

—লেখাপড়া শিখেছি বলেই তো পাপ মনে করি না। এ রাজ্যেই অর্ধশিক্ষিত নিম্ন মধ্যবিত্তরাই এসব পাপপুণ্য দিয়ে মাথা ঘামায়। পাপ পুণ্য-টুন্য কিছু নয়—সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য এই সব ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সমাজ যেমন যেমন বদলায়, তেমন এইসব নিয়মও বদলানো দরকার, তাই না ?

—নিয়ম তো এখনো বদলায়নি!

—সহজে কি বদলায়, জোর করে ভেঙে দিতে হয়। আমার মতন কয়েকজন লোকই প্রথমে ভাঙে। সমাজের সব ব্যবস্থাই যে মানুষের ভালোর জন্য, তাও তো নয়। যেমন ধরো না, আমার বাবার অনেক টাকা ছিল, তাই আমি বসে বসে খেতে পারি—আর তোমার স্বামীর সামান্য একটা চাকরি গেলেই তোমাদের জগৎ-সংসার অন্ধকার হয়ে যায়—এটা কি ভালো ব্যবস্থা ? এই ব্যবস্থাও অনেক দেশ ভেঙে ফেলছে। এক কাজ করো, তোমার ছেলে তো একটু বড় হয়েছে, এখন একটা কলেজে ভর্তি হয়ে যাও। লেখাপড়া শেখো, নিজে সব কিছু বুঝতে শেখো—

—আরও তো অনেকে লেখা পড়া শেখে, তারাও কি এটাকে পাপ মনে করে না ?

—লেখাপড়া শিখেও অনেকে গণ্ডমূর্খ থাকে। সে রকম আমি অনেক দেখেছি।

—কিন্তু যেখানে ভালোবাসা নেই, মায়ামমতা নেই—সেখানে এই রকম সম্পর্ক কি—

—ভালোবাসা না থাকুক, আনন্দ আছে। অন্তত আমি তো আনন্দ পাই।

—তুমি শুধু নিজের আনন্দের কথাই ভাবো?

—কে না ভাবে? তুমি তো বেশ কথা বলতে পারো দেখছি।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? সত্যি উত্তর দেবে?

—বলো। মেয়েদের কাছে আমার মিথ্যে কথা বলার দরকার হয় না।

—আমার স্বামীর জন্য চাকরি জোগাড় করে দিলে কেন? তোমার তো কিছু যায় আসে না।

—হুঁ। এটা বেশ ভালো প্রশ্ন। সত্যিই কিছু যায় আসে না। এরকম বেকার হাজার হাজার আছে। অনেকেই না খেয়ে থাকছে, সবাইকে চাকরি দেবার ক্ষমতা তো আমার নেই। আমার উচিত ছিল, তোমাদের এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। বাড়িতে ভাড়া না দেওয়া বেকার পুষে রাখা অন্য বেকারদের পক্ষে ব্যাড ইনফ্লুয়েন্স। তাছাড়া, আমি এ দেশের বেকারদের অবস্থা নিয়ে বই লিখছি, তোমার স্বামী যতক্ষণ বেকার, ততক্ষণই সে আমার পক্ষে কৌতূহলজনক, সে চাকরি পেয়ে গেলে, আমার লেখার সাবজেক্ট হিসেবে তার আর কোনো মূল্য নেই, রাইট? তবু রাজেনের জন্য চাকরির চেষ্টা করলাম কেন? কারণটা হলো তুমি।

—আমি?

—হ্যাঁ। যে বেকারের স্ত্রী রোগা, কুৎসিত, সবসময় খিটখিট করে, তার তুলনায় যে বেকারের স্ত্রী শান্ত, ধৈর্যশিলা, দেখতেও মোটা-মুটি মন্দ না—এর একটা অ্যাডভ্যানটেজ থাকা উচিত। ভালো স্ত্রী থাকাও তো একটা যোগ্যতা—রাজেনের সেই অতিরিক্ত যোগ্যতা ছিল। অর্থাৎ যে-বেকার শুধুই আর পাঁচজনের মত বেকার, আর যার ঘরে একটি সুন্দরী স্ত্রী আছে, এদের অবস্থা আলাদা হতে বাধ্য। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, স্ত্রীর রূপ-যৌবনের বিনিময়ে তাকে চাকরি

জোগাড় করতে হবে। রাজেনের মতন লোক তাতে কখনো রাজিও হতো না। কিংবা হয়তো রাজি হতো, সেটা আমার বিবেচ্য বিষয় নয়। আমি বলতে চাই, এটা তার প্রাপ্য। রাজেনের একটা উপকার করে দিয়ে তার স্ত্রীকে আমি ভোগ করতে চাইনি মোটেই। আমি সেসব কথা ভাবিইনি।

—বুঝলাম।

—আর একটা কথাও জেনে রাখো। রাজেনের স্ত্রী হিসেবে তোমাকে আমি একরকম ভাবে দেখেছি। আবার নারী হিসেবে তোমাকে আমি আর একরকম ভাবে দেখেছি। নারী হিসেবেই তুমি আমার কাছে বেশি আকর্ষণীয়া।

—কী আমার আকর্ষণ? আমি তো একটা সামান্য মেয়ে।

—সেটা এখন আলোচনা করার সময় নয়। কোনরকম আকর্ষণ না থাকলে, সে সব মেয়েদের দিকে আমি ফিরেও তাকাই না।

—তুমি বুঝি এরকম আরও মেয়ের—!

—সে কথা স্বীকার করতে আমার একটুও লজ্জা নেই।

—ও, আচ্ছা—

—বুঝেছো তো? আচ্ছা, এবার তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করি?

—বলো।

—প্রথমবার যখন আমি তোমাকে ভোগ করি, তখন তুমি আমাকে বাধা দাওনি কেন? তুমি যখন এটাকে পাপ মনে করো—

—বাধা দেবার ক্ষমতা আমার ছিল না।

—অর্থাৎ সাহস পাওনি। আমি তোমাদের কিছু উপকার টুপকার করেছি, সেই সময় বাধা দিলে সব ভেস্তে যেতে পারতো, কিংবা তোমার অসুস্থ স্বামীর প্রাণ বাঁচানোর জন্যই তুমি আত্মত্যাগ করেছো। অস্বাভাবিক কিছু না। মরা স্বামীকে বাঁচাবার জন্য বেহুলাকেও স্বর্গে গিয়ে বাইজির মতন নাচ দেখাতে হয়েছিল। কিন্তু এখন তো সেরকম কোনো দায় নেই তোমার। তবে আজ কেন এলে? পাপ জেনেও কেন এলে?

—জানি না।

—জানো না?

—যদি বলি, তুমি আমায় চুম্বকের মতন টানছিলে, তাহলে বিশ্বাস করবে ?

—ওসব চুম্বক টুম্বক ধোঁয়াটে ব্যাপার। রক্তমাংসের কথা বলো।

—আর কী রকমভাবে বলতে হয়, আমি জানি না।

—আসলে তুমি একটু আগে যাকে পাপ বললে, সেই পাপের স্বাদ পেয়েছো। এই পাপের স্বাদ বড় মধুর।

—না !

—হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলে যে ?

—আমি পাপ করতে চাই না।

হাওয়ায় টেবিল থেকে হীরকের পাণ্ডুলিপির কয়েকটা পাতা উড়ে পড়েছিল মাটিতে, হীরক ব্যস্তভাবে সেগুলো গুছিয়ে তুললো ! অন্যমনস্কভাবে কয়েকটা পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললো, এইখানটায় তোমাদের সম্পর্কে লিখেছি, একটি টিপিক্যাল বেকার পরিবারের দৃষ্টান্ত হিসাবে। শুনবে ? একটুখানি পড়ে শোনাবো ?

—আমি বুঝতে পারবো না।

—ইংরেজিতেই লিখতে হলো, অল ইণ্ডিয়া মার্কেটের জন্য—

—আমি যাচ্ছি। আর কখনো বিরক্ত করতে আসবো না।

হীরক হাসলো একগাল। দীপ্তির কাছে এসে তার হাতে হাত রেখে বললো, তুমি খুবই ছেলেমানুষ, বয়েস কম, তোমার সামনে একটা লম্বা জীবন পড়ে আছে, অনেক কিছু শেখার আছে জীবন সম্পর্কে। আমার যদি সময় থাকতো, তোমাকে শেখাতাম। কিন্তু আমার যে সময় নেই—

—আমি আর কখনো সময় নষ্ট করতে আসবো না।

হীরক স্নেহের ভঙ্গিতে আলতোভাবে দীপ্তির গালে ঠোঁট ছুঁইয়ে বললো, তোমার সঙ্গে যখন যেটুকু সময় পেয়েছি, সে সময় মোটেই নষ্ট হয়নি। আমি আনন্দ পেয়েছি। তুমি পাওনি ?

দীপ্তি আর উত্তর দিল না। কান্না চেপে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সে যখন নিচে নেমে এলো, সে যেন অন্য মানুষ।

॥ ৪ ॥

দীপ্তি এখন আবার মন দিয়ে ঘর সংসার করে, ছেলেকে স্নান করায়,

খাওয়ায়, স্বামীকে খুশি রাখে। তার বাইরের জগতকে জানবার বাসনা কিংবা জ্ঞান-তৃষ্ণা এখন গিয়ে ঠেকেছে গল্পের বইতে। পাড়ার লাইব্রেরিতে মেম্বার হয়েছে, দোতলায় ভাড়াটেদের একটি ছেলে তার বই এনে দেয়। যত রাজ্যের কৃত্রিম রোমান্টিক উপন্যাস নিয়ে তার দুপুরবেলাগুলো কাটে। মাঝে মাঝে স্বামীর সঙ্গে সিনেমায় যাওয়া ছাড়া বাড়ির বাইরে বেরুনোই হয় না। এবং ঘরের একটা জানলা সব সময় বন্ধ রাখতে হয়—কেন না রাজেনের একদিন চোখে পড়েছিল, উল্টোদিকের বাড়ির একটি নটবর ছেলে সব সময় দীপ্তিকে দেখার চেষ্টা করে। রাজেন এ ব্যাপারে বড়ো স্পর্শকাতর।

উপন্যাস না থাকলে দীপ্তি শেলাই-ফোঁড়াই নিয়ে সময় কাটায়। তা ছাড়া ছেলে তো আছেই। ছেলে যতক্ষণ জেগে থাকে—সে এক মুহূর্ত তাকে চোখের আড়াল করে না।

হীরকের কাছে সে আর কখনো যায়নি। হীরক তার নারীত্বের অতি গভীর জায়গায় অপমানের ঘা দিয়েছে। সে উপযাচিকা হয়ে গিয়েছিল হীরকের কাছে, এই সত্যটা স্পষ্ট হয়ে পড়ায় তার এত লজ্জা। হীরক এই নিয়ে আবার উপহাস করেছে।

সেই ঘটনার মাসদেড়েক বাদে হীরক নিজেই আর একদিন এসেছিল দীপ্তির কাছে। অকস্মাৎ এক দুপুরবেলা হীরক এসে দীপ্তির ঘরে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। তার আগে কয়েকদিন সে কলকাতায় ছিল না, খুবই ক্লান্ত তার চেহারা, চোখ দুটো ভেতরে বসা। নিচু গলায় বলেছিল, একবার ওপরে আসবে ? তোমার সঙ্গে কথা আছে।

এরকম ভাবে হীরক কখনো এ ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়নি। এরকম ভাবে ডাকেনি দীপ্তিকে। বাইরে থেকে এসে সে ওপরেও ওঠেনি। তার মুখের চেহারাই এখন অন্যরকম।

হীরককে দেখে দীপ্তির বুক কেঁপে উঠেছিল ঠিকই। তবু নিজেকে সে শান্ত করলো। তুমির বদলে আপনি সম্বোধন করে বলছিল, কি বলবেন, বলুন।

—ওপরে এসো একবার।

—এখানেই বলুন।

—এখানে যদি বলবার হতো, তা হলে এখানেই বলতাম। একটু ওপরে এসো।

—না।

দীপ্তি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছে, সে তার মুখের ভাব হীরককে দেখাতে চায় না। হীরকের চোখে-মুখে কোনো অস্বস্তি বা গ্লানি নেই। সে তাকিয়ে আছে স্পষ্টভাবে।

সে আবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি আর নিজে থেকেও কোনোদিন আসবে না আমার কাছে?

দীপ্তি একই রকম ভাবে উত্তর দিল, না।

হীরক হাসলো। হাতের সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হীরক বললো, আসবে না? তোমার সঙ্গে আমার একটা দরকার ছিল।

—আমার কোনো দরকার নেই।

—দুপুরে ঘুমিয়েছিলে বুঝি? বেশ দেখাচ্ছে মুখখানা!

—আপনি আর কিছু বলবেন?

—তুমি কি চাও, আমি এক্ষুনি চলে যাই?

—আপনার যদি বিশেষ কিছু বলার না থাকে—

—না, ঠিক আছে চলি—

হীরক আর ওপরে উঠলো না। বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। দীপ্তির কোনো দুঃখ হলো না, বরং হীরককে নিজের ঘরের দরজা থেকে ফিরিয়ে দিতে পেরেছে বলে বেশ এক ধরনের তৃপ্তি পেল। এ যেন এক ধরনের শোধ বোধ।

কিন্তু এই তৃপ্তি তার বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। দরজা বন্ধ করে আবার এসে বিছানায় শুতেই তরে শরীর অস্থির করতে লাগলো। মন নয়, শরীর। দীপ্তি বিছানায় এপাশ ওপাশ গড়াতে গড়াতে তার মন দিয়ে শরীরকে বোঝাবার চেষ্টা করলো, না, আর কোনো প্রশ্রয় নয়।

কিন্তু এত সহজে নিজেকে বোঝানো যায় না। শরীরের মধ্যে অসহ্য জ্বালা। এমনকি একবার একথাও মনে হলো, দৌড়ে গিয়ে আবার এক্ষুনি হীরককে ডেকে আনে।

খাট থেকে নেমে দরজার কাছে গিয়েও সে থেমে গেল। হীরক তো ওপরে নিজের ঘরে যায়নি। সদর দরজা থেকেই সে আবার ফিরে গেছে। এ রকম সময় হীরক কি শুধু দীপ্তির কথা ভেবেই বাড়িতে এসেছিল? দীপ্তি তাকে উপেক্ষা করেছে বলেই সে এই রোদ্দুরের মধ্যে আবার রাস্তায় বেরিয়ে গেল?

বুকের মধ্যে তোলপাড় হতে লাগলো দীপ্তির। হীরককে সে একটুও বোঝে না। হীরকের তো অনেক কিছুই আছে—দীপ্তির

কতটুকু মূল্য তার কাছে? তবু দীপ্তি ভিখারিনীর মতন হীরকের কাছে আর কখনো যাবে না।

হীরক যদি আবার এরকম ভাবে কখনো এসে ডাকে, দীপ্তি কি তাকে ফেরাতে পারবে? ফেরাতেই হবে, ফেরাতেই হবে।

হীরক আর আসেনি। বাড়ি থেকে ঢুকবার বা বেরুবার সময় যদি কখনো হীরকের সঙ্গে দীপ্তির চোখাচোখি হয়েছে, দীপ্তি চোখ নামিয়ে নিয়েছে। হীরক মুচকি হেসেছে প্রত্যেকবার, যেন দীপ্তির এই অভিমানটাও সে উপভোগ করছে, কিন্তু তাকে ডাকেনি আর কখনো।

দু'এক মাসের মধ্যে সবকিছুই স্বাভাবিক হয়ে এলো। দীপ্তি একজন সাধারণ গৃহস্থ ঘরের বউ, সে ছেলে মানুষ করে, স্বামীর মেজাজ বুঝে সেবা করে। তার ছেলেবেলার সব উচ্চাকাঙ্ক্ষা নষ্ট হয়ে গেছে। সে বুঝে গেছে, এইভাবেই তাকে জীবন কাটাতে হবে। মাঝখানে কয়েকটা দিনের জন্য তার জীবনে একটা গোপন অবৈধ ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। এরকম ঘটনা অনেকের জীবনেই ঘটে, চিরকাল গোপন থাকে, বাইরের কেউ জানতে পারে না। সেই হিসেবে দীপ্তি জগৎ-সংসারের নিয়ম মেনেই চলছিল, হঠাৎ সে নিয়ম ভেঙে ফেললো।

কয়েকদিন ধরেই দীপ্তির শরীরটা খারাপ খারাপ যাচ্ছিল, কিছু খেলেই বমি পায়। মনে মনে সে কিছু একটা টের পাচ্ছিল। কিন্তু মেনে নিতে পারছিল না। কিন্তু আর না মেনে উপায় রইলো না যে দীপ্তির গর্ভে আবার সন্তান আসছে।

প্রথম কিছুদিন দীপ্তি রাজেনকে জানালো না কিছুই। তার বার-বার মনে হতে লাগলো, এই সন্তান রাজেনের নয়, হীরকের। যদি সত্যিই তাই হয়? সারা জীবন সে হীরকের সন্তানকে নিয়ে সংসার করবে? যে হীরক তাকে আর চায় না, যে হীরককে সে নিজেই ফিরিয়ে দিয়েছে।

দীপ্তি অত্যন্তই সাধারণ ঘরের মেয়ে। তার এতটা মনের জোর নেই যে এইরকম একটা ব্যাপার সে সহজে মেনে নিতে পারবে। সে বুঝতেই পারে না, এখন তার কী করা উচিত। সে কি আত্মহত্যা করবে? সে পাপ করেছে, সেই পাপের স্পর্শ তার শরীরে। কিন্তু নিজের জীবন নষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে তার গর্ভের নিষ্পাপ শিশুটির প্রাণ নষ্ট করাও কি পাপ নয়? দীপ্তি যখন তখন লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। এখন সে সত্যিই অসহায়।

রাজেনকে বলার আগে সে হীরককে বলার সুযোগ খুঁজতে লাগলো। কিন্তু সুযোগ আর পাওয়াই যায় না। হীরক বাড়িতে থাকে না প্রায়ই, অনেক সময় খুব রাত করে ফেরে। তারপর সে সিকিম সরকারের আমন্ত্রণে সিকিমের এক প্রতিষ্ঠানে দু'মাসের জন্য বক্তৃতা দিতে চলে গেল।

কাগজে একটা ছবি বেরিয়েছে হীরকের। অস্পষ্ট ছাপা, আরও অনেকের সঙ্গে। দীপ্তি সেই কাগজটা চোখের সামনে রেখে মনে মনে কথা বলে হীরকের সঙ্গে। কাঁদে। তার নির্জন দুপুরগুলো এখন আরও অসহ্য।

তাদের বাড়িতে খবরের কাগজ আসে না। রাজেনই অফিস থেকে কাগজখানা নিয়ে এসেছিল দীপ্তিকে হীরকের ছবি দেখাবার জন্য। রাজেনের কাছে হীরক প্রায় দেবতার সমান। হীরকের যে কোনো উন্নতিতে যেন তারই গর্ব। তার জীবনের চরমতম দুঃসময়ে হীরক তাকে উদ্ধার করেছে, এরকম সাহায্য তাকে কেউ কখনো করেনি। রাজেন সরল মানুষ, সে জানে, যে দয়া করে সেই মহৎ। রাজেন জানে না, অবজ্ঞা কিংবা কৌতূহল থেকেও দয়া আসতে পারে। শয়তান ও কখনো কখনো দয়ালু হয়।

নির্জন দুপুরে হীরকের ছবিটা সামনে নিয়ে দীপ্তি ফিসফিস করে বলে, কেন তুমি আমার এই সর্বনাশ করলে।

পরক্ষণেই তার মনে হয়, হীরকের তো দোষ নয়। সে যদি বাধা দিত প্রথম থেকেই, হীরক কি জোর করতো। হীরকের চরিত্র সেরকম নয়। তাহলে পুরো ব্যাপারটাই বোধহয় মিথ্যে কিংবা স্বপ্ন। দীপ্তি কোনোদিন যায়নি হীরকের কাছে, এ সন্তান তো রাজেনেরই।

তখন দীপ্তি আপন মনে ফিকফিক করে হাসে।

এর মধ্যে রাজেন জেনে গেল। সে খুব একটা আনন্দিতও হলো না। বিরক্তও হলো না। সে বললো যাক, এবার যদি মেয়ে হয়, তা হলেই ল্যাটা চুকে গেল। আর নয়! এরপর আর দরকার নেই। আর বেশি ছেলেপুলে হলে খরচ চালাতে পারবো না।

রাজেনের কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই। দীপ্তির বাড়ির লোকেরাও আর খোঁজ খবর রাখে না। তার এক জামাইবাবু বদলি হয়ে এসেছেন ব্যারাকপুরে, একবার সে রাজেনের সঙ্গে গিয়ে দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছে। ওঁরাও এসেছিলেন দু'বার। কিন্তু দিদির বাড়িতে

বেশি জায়গা নেই, দীপ্তি গিয়ে সেখানে থাকতে পারবে না, জামাই-বাবুরও সেরকম কোনো উৎসাহ নেই। আর দীপ্তির অভাবের সংসার, দিদিকে এনেই বা সে রাখবে কী করে? সুতরাং দীপ্তির সব কাজ এখনো তাকে করতে হয়, বাসন মাজা থেকে রান্না করা পর্যন্ত সব কিছু।

হীরক সিকিম থেকে ফিরলো আরও উল্লেখযোগ্য হয়ে। বাইরের সমাজে তার খাতির এখন অনেক বেশি। আর সময়ে অসময়ে তার কাছে লোকজন আসে। তার বইখানার প্রশংসা বেরিয়েছে বিলেতের কাগজে। তার উন্নতির সিঁড়ির ধাপগুলো এখন বেশ মজবুত।

হীরক একদিন দু'তিনজন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ফিরছিল দুপুর-বেলা, বোধহয় ওর ছাত্র। গুরু-গম্ভীর অধ্যাপকের মতন সে তার শিষ্যদলকে উপদেশ দিতে দিতে হাঁটছিল। অন্য কোনো দিকে মনোযোগ দেবার সময় নেই। আগেকার মতন, সে দীপ্তিদের ঘরের দিকেও তাকায় না। দীপ্তি আর ধৈর্য ধরতে পারলো না। তার ছেলেকে বললো, খোকন, যা তো একবার হীরকবাবুকে ডেকে নিয়ে আয় তো!

খোকন ছুটতে ছুটতে গিয়ে হীরকের হাত ধরে বললো, আপনাকে মা ডাকছে।

হীরক অন্যমনস্কভাবে তাকালো খোকনের দিকে। চিনতে পারলো না। তবে ফুটফুটে চেহারার বাচ্চাটা দেখে তার ভালোই লাগলো। তার মাথার সিল্কের মতন চুলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বললো, কে তোমার মা?

খোকন হাত দেখিয়ে বললো, ঐ যে ঐটা আমাদের ঘর!

হীরক বললো, আচ্ছা। তোমার মা-কে বলো একটু বাদে যাচ্ছি।

হীরক এলো আধঘন্টা পরে। এই সময়টুকুর প্রতিটি পল অনুপল দীপ্তি প্রতিক্ষা করছিল। আশঙ্কায় তার বুক কাঁপছিল, যদি হীরক না আসে? হীরক যে-রকম নিষ্ঠুর ধরনের মানুষ অনায়াসেই বলতে পারতো, এখন আমার সময় নেই। তাহলে সে কী করতো? মেয়ে-মানুষের আর কী জোর আছে? হীরকের ওপর কোনো জোরই খাটে না। তা ছাড়া হীরকের তো না আসার অধিকার আছেই, কারণ দীপ্তি তাকে একবার ফিরিয়ে দিয়েছে।

দীপ্তি এত তীব্রভাবে প্রতীক্ষা করছিল হীরকের, কিন্তু সে আসার পর কিছুই বলতে পারলো না। ঠোঁট কাঁপতে লাগলো, দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে।

হীরক চোখে কৌতুক নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী? কী খবর?

হীরকের গলায় কিন্তু রাগ বা অহঙ্কার নেই। সে তো অনায়াসেই বলতে পারতো, আমার অনেক কাজ, কেন আমাকে এখন বিরক্ত করছো?

হীরক বেশ স্বাভাবিকভাবেই বললো, হঠাৎ ডেকে পাঠালে যে? কী ব্যাপার?

দীপ্তি বললো, খুব ব্যস্ত ছিলে?

—তা তো একটু ব্যস্ত ছিলামই। ছাত্ররা আর ছাড়তেই চায় না। দু'মাস ওদের ক্লাস নিতে পারিনি।

—আমি শুধু শুধু ডেকে এনে তোমার সময় নষ্ট করলাম? তা হলে এখন থাক্।

—এই সব কথা বলে আরও বেশি সময় নষ্ট হয়। কোনো কাজের কথা ছিল?

দীপ্তি প্রায় অস্ফুট গলায় জিজ্ঞেস করলো, তুমি কেমন আছো?

—এটা জানবার জন্য ডেকেছো?

ঘরে ঢুকে এসে হীরক বসলো খাটের ওপর। দীপ্তির দিকে এক পলক তাকিয়েই সে দীপ্তির অবস্থা টের পেয়েছে।

হীরক নারীকে যেভাবে চায়, তার মধ্যে সন্তানের কোনো স্থান নেই। প্রাকৃতিক নিয়মেই নারীদের সন্তান হয়, মানুষের বংশবৃদ্ধি হয়। সন্তান-পালনের জন্যই নারী আর পুরুষ এক সঙ্গে ঘর বাঁধে—মানুষের সমাজ বিবাহ নামের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই গাঁট-ছড়া বেঁধে দেয়।

কিন্তু হীরক তো ঘর বাঁধেনি, তাই সন্তানের ব্যাপার নিয়েও মাথা ঘামায় না। সে নারীকে চায় শুধু আনন্দের সঙ্গিনী হবার জন্য।

কিন্তু হীরকের কৌতূহল নানারকম। দীপ্তিকে দেখেই তার মনে হলো, রাজেন যখন বেকার ছিল সেই সময়েই নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটা হয়েছে। এ দেশে বেকার কিংবা অতি দরিদ্রদেরই আজকাল বেশি বাচ্চা-কাচ্চা হয়। এককালে জমিদার কিংবা বড়লোকদেরই কাচ্চা-বাচ্চা হতো প্রচুর। এখন সে নিয়ম পাল্টে গেছে, এখন গরিব এবং অশিক্ষিতদেরই সংখ্যাবৃদ্ধির যুগ, এবং এরাই পৃথিবীতে নানান সমস্যার সৃষ্টি করছে।

তাছাড়া সে বহুদিন কোনো গর্ভবতী নারীকে কাছ থেকে দেখেনি।

মনুষ্য জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কেও তার আগ্রহ আছে। সে সহাস্যে জিজ্ঞেস করলো, তোমার আবার বাচ্চা হবে? ক' মাস?

মেয়েরা এই রকম আকস্মিক প্রশ্নের উত্তর চট করে দিতে পারে না।

খোকন কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। হীরক তাকে ডেকে একটু আদর করলো। কী নাম তোমার?

খোকন কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, কল্যাণ।

—বাঃ! বেশ সুন্দর ছেলে। আচ্ছা কল্যাণ, তুমি এক কাজ করতে পারবে? তিনতলায় উঠতে পারো? তিনতলায় উঠে আমার ঘরের দরজায় টোকা দেবে। আমার যে নেপালী চাকর আছে, তাকে বলবে, হীরকবাবু সিগারেট আর দেশলাই চাইছে। আনতে পারবে? যাও—

খোকন চলে যাবার পর দু'জনেই নিঃশব্দ। দীপ্তি কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারবে না যে তার গর্ভের সন্তান হীরকের। এ কথার মধ্যে একটা প্রচণ্ড হীনতা আছে। হীরক যদি নিজে না বোঝে—

হীরক আবার প্রশ্ন করলো, কী? কী বলবে?

দীপ্তি বললো, অনেকদিন তোমায় দেখিনি!

হীরক হাসতে হাসতে বললো, আরে! তুমি কি আমার প্রেমে পড়ে গেলে নাকি? দেখো, সাবধান!

—তোমাকে আমার কিছুই জিজ্ঞেস করার অধিকার নেই। তাই না?

—আঃ, সে কথা হচ্ছে না। অধিকার-টধিকারের ব্যাপার নয়। 'অনেকদিন তোমায় দেখিনি'—এই ধরনের কথা শুনলেই কি রকম প্রেম প্রেম মনে হয়। আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, ওসব প্রেম-ট্রেম আমার জন্য নয়।

—সিকিমে কী রকম কাটলো?

—পরে বলছি। একটু কাছে এসো তো?

—দীপ্তি অবাক হয়ে গেল। হীরক কী চায়? কেন সে খোকনকে ওপরে পাঠালো?

হীরক আবার বললো, কাছে এসো না!

দীপ্তি জিজ্ঞেস করলো, কেন?

হীরক হঠাৎ এক ধমক দিয়ে বললো, কেন আবার কী? আসতে বলছি, আসবে। আমাকে ডেকে পাঠিয়ে কি খেলা করছো নাকি? আমি যা বলবো, তোমাকেও তা শুনতে হবে।

দীপ্তি বললো, তোমাকে ডেকে আমি ভুল করেছি। আমার অন্যায় হয়েছে। তুমি চলে যেতে পারো।

এই কথা শুনেও হীরক যে কেন হাসলো, তা কে জানে। অবিচল-ভাবে দীপ্তির দিকে চেয়ে থেকে নরমভাবে বললো, একবার আমার কাছে এসে দাঁড়াও।

যন্ত্রচালিত পুতুলের মতন দীপ্তি এগিয়ে এলো খাটের কাছে। হীরক এক হাতে তার কোমর বেষ্টন করলো। তারপর অন্য হাত বুলোতে লাগলো দীপ্তির উঁচু হয়ে ওঠা পেটে। দীপ্তি বিবর্ণ হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এ কী করছো? হীরক নির্লিপ্ত ভাবে বললো একটা জিনিস দেখছি। যেন সে একজন ডাক্তার। কিংবা লম্পট ডাক্তার। মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলো, বাচ্চা নড়াচড়া করে? টের পাও?

দীপ্তি কোনো উত্তর দিল না।

হীরক বিনা দ্বিধায় দীপ্তির পেটের কাছ থেকে শাড়ি সরিয়ে ফেললো, তারপর নিজের কান চেপে ধরলো সেখানে। দীপ্তির কোনো বাধা দেবার ক্ষমতা নেই। এখন সে বুঝতে পারলো, পাপ পুণ্য যাই হোক এই দুঃসাহসী পুরুষটির স্পর্শ সে সব সময় কামনা করে। হীরক যে তার কোমর জড়িয়ে ধরে আছে, তার পেটের ওপর মাথাটা চেপে আছে, এতেই এক অস্বাভাবিক ভালো লাগায় শরীর যেন অবশ হয়ে আসছে। অথচ এই পুরুষটি তাকে চায় না।

হীরক মুখটা সরিয়ে নিয়ে বললো, ভারী আশ্চর্য নয়? একটা প্রাণ আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছে—। এখন তোমার দুটো প্রাণ, তোমার নিজের আর তোমার সন্তানের, একই শরীরে দুটো প্রাণ শুধু মেয়েরাই ধারণ করতে পারে।

দীপ্তি কাতরভাবে বললো, আমাকে ছেড়ে দাও।

হীরক বললো, কেন, হঠাৎ কেউ এসে পড়বে? দরজা খোলা। কিন্তু আমি তো খারাপ কিছু করছি না।

—কাকে খারাপ-ভালো বলে আমি জানি না।

—এখন থেকে সেটা জানতে শেখো। না-জানাটাই তো মেয়েদের প্রধান দুর্বলতা।

অনেকটা যেন স্নেহের সঙ্গেই সে দীপ্তির পেটে একটা চুম্বন করলো, তারপর শাড়িটাকে পরিপাটি করে ঠিক জায়গায় এনে হাত সরিয়ে নিল।

দীপ্তিও একটু সরে গিয়ে বললো, তুমি যখন সিকিমে ছিলে, আমি তোমার কথা খুব ভাবতাম।

হীরক যেন কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলো, কেন?

—তা জানি না। এমনিই।

—খুব রাগ হচ্ছিল বুঝি আমার ওপর? এখন রাগারাগি করা ভালো নয়। শরীরের যত্ন নিও। এখন তোমার নিজের ওপর যত্ন নেওয়াই পেটের সন্তানটিকে যত্ন করা।

—আমাকে এই অবস্থায় দেখে তুমি একটুও অবাক হওনি?

—কেন, অবাক হবো কেন? সারা পৃথিবীতে প্রতি মিনিটে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার বাচ্চা জন্মাচ্ছে, এতে অবাক হবার কী আছে!

দীপ্তি এর উত্তরে একটা কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। বুক থেকে বেরিয়ে এলো একটা দীর্ঘশ্বাস।

হীরক বললো, সত্যি কথা বলতে কি, তোমার কথাও আমার একদিন মনে পড়েছিল হঠাৎ। সিকিমে আমাকে খুব খাটতে হয়েছে। প্রত্যেকদিন বক্তৃতার নোটিস তৈরি করা, তাছাড়া ওদের স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রি সম্পর্কে একটা পেপার তৈরি করে দিয়েছি— সারাদিন খেটে-খুটে রাত্তিরে আর আমার ঘুম আসতো না। মানুষের পরিশ্রম করারও তো একটা সীমা আছে। মাঝে মাঝে একটু উদ্দেশ্যহীন ভাবে আনন্দ না করলে মাথার ঠিক থাকে না। সিকিমে আমি যেখানে ছিলাম, সেখানে কোন আনন্দের উপকরণ নেই, সন্ধে হতে না হতেই সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। ওখানে মেয়ে-টেয়ে পাওয়া মুস্কিল। শেষের দিকে অবশ্য পেয়েছিলাম। যাই হোক, একদিন রাত্তিরে ঘুম আসছিল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম, দূরের জঙ্গলে আগুন লেগেছিল মালার মতন, সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়লো, তোমার চমৎকার শরীর, তখন তোমাকে পাশে পেলে—।

দীপ্তির মুখখানা অপমানে কালো হয়ে গেল। দুঃখের সঙ্গে বললো আমি বুঝি শুধু একটা শরীর?

হীরক বললো, না, না, শুধু শরীর হবে কেন? তুমি একটি সম্পূর্ণ নারী। তোমার অনেক গুণও আছে। কিন্তু কোনো মেয়ের কথা ভাবলে তার শরীরের কথাই আমার আগে মনে পড়ে। আমি এই রকমই। টেক ইট অর লীভ ইট! মানুষ তো অনেক রকম হয়, আমি এই রকমই। আমি তো কাউকে জোর করি না। হয়ত আমার এমন একটা বয়েস আসবে যখন মেয়েদের শরীর বাদ দিয়েও অন্য অনেক কিছুতে আনন্দের স্বাদ পাবো। আমার এখনো সে অবস্থা আসেনি, আমি বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কবিত্বও করতে পারি না।

—তুমি যে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াও, আমাকে যদি সেই বাইরের জীবনের একটু স্বাদ দিতে, আমি স্বামীর সংসার ছেড়েও তোমার সঙ্গে চলে যেতে রাজি ছিলাম।

হীরক আশ্চর্য ভাবে বললো, তাই নাকি?

দীপ্তি বললো, আমি সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে পারতাম।

—একথা বিয়ের আগেই তোমার মনে পড়া উচিত ছিল। সংসারে জড়িয়ে পড়লে কেন?

—তখন এতটা বুঝতাম না। বুঝলেও আমার কোনো উপায় ছিল না।

হীরক পা দোলাতে দোলাতে লঘু ভাবে বললো, এখন আর তার উপায় নেই। এখন তোমার দুটো বাচ্চা। দুই সন্তানের মায়ের পক্ষে কি এসব মানায়?

হীরকের রূঢ় অথচ সত্যি কথাটায় দীপ্তি হঠাৎ চুপ করে গেল। তবু সে বলতে পারলো না যে দ্বিতীয় সন্তানটির বোঝা হীরকই তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। হীরককে সে এজন্য দায়ী করতে পারবে না। হীরক তো সত্যিই জোর করেনি! তার নিজেরও সমান অংশ ছিল। এমন কি হীরক যদি এখনো তাকে—

হীরক উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তোমার বয়েস এখনো খুবই কম, স্বাস্থ্যটা ভালো রেখো, তাহলে এরকম কোনো মানুষ তুমি এর পরেও পেতে পারো। জীবন সঙ্গিনী-টঙ্গিনী রাখা আমার দ্বারা পশাবে না। ওতে অনেক ঝামেলা।

দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হীরক আবার ফিরে বললো, আমাকে তুমি ডেকেছিলে কেন, বললে না তো?

—এমনিই।

—এমনিই? কোনো কাজের কথা ছিল না?

—না। আর ডেকে পাঠিয়ে তোমাকে বিরক্ত করবো না।

হীরকের ভুরু কুঁচকে গেল! একটু ইতস্তত করে বললে, তোমার ডেলিভারির সময় আমি যদি কোনো সাহায্য করতে পারি—

স্পষ্ট বোঝা যায়, টাকার কথাটা উচ্চারণ করতে তার দ্বিধা হচ্ছে।

দীপ্তি রাগের সঙ্গে বললো, কিছু দরকার নেই! তোমাকে কোনো সাহায্য করতে হবে না!

খোকন সিগারেট-দেশলাই নিয়ে ঘরে ঢুকতেই হীরক বললো, এতক্ষণ লাগলো, আমি যে এখনই চলে যাচ্ছি। যাকগে, তুমি খুব লক্ষ্মী ছেলে।

॥ ৫ ॥

যথাসময়ে দীপ্তি একটি কন্যা সন্তান প্রসব করলো। রাজেন খুব খুশি, মেয়েই চেয়েছিল। হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়ার জন্য সে অফিস থেকে খরচও পেয়ে গেল। দীপ্তি হাসপাতালে থাকার ক'দিন রাজেনকে ছেলের দেখাশুনো করতে হয়েছে, এইটুকুই যা অসুবিধে। সাতদিনের মধ্যেই মেয়ে বউকে বাড়িতে নিয়ে এলো সে।

এক মাসের মধ্যে দীপ্তি নিজেকে সামলে নিল। তার জীবনীশক্তি প্রবল, কোনো রকম শারীরিক অসুবিধে তাকে কাবু করতে পারে না। একটু উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা হতেই সে স্বামীকে রেঁধে খাওয়াতে লাগলো আবার। দেড় মাসের মধ্যেই সে আবার সুস্থ স্বাভাবিক।

মেয়ের রং কালো হয়েছে। দীপ্তির গায়ের রং মাঝামাঝি, কেউ কেউ তাকে ফর্সাই বলে, রাজেনও কালো নয়। তাদের ছেলেও ফর্সা হয়েছে, কপাল জোরে মেয়েটি কালো। প্রতিবেশীরা বললো, মেয়ের মুখের আদল দীপ্তির মতই হয়েছে। কিন্তু দীপ্তির তীক্ষ্ণ চোখে ধরা পড়ে, হীরকের সঙ্গেই মেয়ের মুখের মিল। যত বেশি বড় হবে, ততই ধরা পড়বে!

হীরকের সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপার নিয়ে কোনো কথা কানা-

কানি হয়নি। কেউ কোনো সন্দেহ করেনি। হীরকের কথাবার্তা এবং ব্যবহার এত চাঁচাছোলা যে অনেকে তাকে নিষ্ঠুর এবং অর্থলোভী মনে করলেও তার সম্পর্কে দুর্বলতার কথা কেউ চিন্তাও করতে পারে না।

প্রথম প্রথম দীপ্তি নিজেকে জোর করে বোঝাবার চেষ্টা করতো যে, এই সন্তান হীরকের নয়, রাজেনেরই। হীরক তার জীবনে একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। কিন্তু সে তার নারীত্বের সর্বসত্তা দিয়ে জানে, সে নিজেকে শুধুই ভুল বোঝাচ্ছে। বাড়ির অন্য ভাড়াটে গৃহিণীরা যখন তার মেয়েকে কোলে নেয়, তখন দীপ্তি মেয়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কিছুতেই দীর্ঘশ্বাস চাপতে পারে না।

একটা অশান্তি দীপ্তিকে সব সময় কুরে কুরে খায়। হীরক একদিনের জন্যও তার মেয়েকে দেখতে আসেনি। সে কি একবার অন্তত আসতে পারতো না। একই বাড়িতে আছে, অথচ মেয়ের যে খাঁটি পিতা সে একবারও মেয়ের মুখ দেখবে না!

হীরকের যেন একটু ভদ্রতাবোধও নেই। সে তো জানতো যে, দীপ্তির সন্তান হবে, তবু সে-বিষয়ে কোনো খোঁজ খবর নেবার প্রয়োজনও বোধ করে না। রাজেনই একদিন গিয়ে হীরককে খবরটা জানিয়েছিল, তাও হীরক এ ঘরে আর আসেনি। সেই যে দীপ্তি বলেছিল তার সাহায্যের কোনো প্রয়োজন নেই, হীরক সেই কথাটাই ধরে বসে আছে। যেন সাহায্য করা না করাই একমাত্র ব্যাপার। মানুষের আর কোনো অনুভূতি নেই।

এই ব্যাপারটা গোপন রাখবার সব রকম চেষ্টা করাই উচিত। তবু দীপ্তি ছটফট করে। রাজেন যখন মেয়েকে নিয়ে আদর করে তখন চোখ জ্বালা করে ওঠে তার। এই নিরীহ ভালো মানুষটি হয়তো কোনোদিনই বুঝতে পারবে না যে কাকের ঘরে কোকিলের ছানা মানুষ হচ্ছে। সারাজীবন রাজেনকে ঠকিয়ে যেতে হবে। এই গোপনতার বোঝা তাকে একলা বইতে হবে, যতদিন বেঁচে থাকবে। কিন্তু এর চেয়েও হীরকের নির্লিপ্ত ভাব তাকে বেশি পীড়া দেয়।

মেয়ে বুকের দুধ ছাড়ার কিছুদিন পর থেকেই দীপ্তি সংসারের নিয়মগুলো ভাঙতে লাগলো। হঠাৎ সে অকারণে হেসে ওঠে, যখন তখন ঝরঝর করে কাঁদে।

ভাতের থালা সামনে নিয়েও খেতে ভুলে যায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা

ঠায় বসে থাকে। ছেলে তার গায়ে ঠ্যালা দিয়ে বলে, মা! খাচ্ছো না?

দীপ্তি তখন হঠাৎ ছেলেকে মারতে শুরু করে। দীপ্তির এরকম স্বভাব কোনদিন ছিল না। ছেলেটা অভিমানে কাঁদতে কাঁদতে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, দীপ্তি আর তাকে ডাকেও না।

রাজেন এক একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখে, মেয়েটা কেঁদে কেঁদে গলা ফাটাচ্ছে, ছেলেটা কাগজ কুচিয়ে ঘরময় ছড়িয়েছে—আর তার মাঝখানেই পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে দীপ্তি। তার এরকম অনিয়ম, এরকম অলক্ষ্মী শ্রী রাজেন কখনো দেখেনি। বকুনি দিলেও দীপ্তি চুপ করে থাকে।

মেয়ের যখন সাত মাস বয়েস, সেই সময় একদিন মাঝ রাত্রে কী যেন শব্দ শুনে রাজেন জেগে উঠলো। দেখলো যে ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে নিয়ে দীপ্তি পা টিপে টিপে কোথায় যেন যাচ্ছে।

রাজেন ধড়পড় করে উঠে বসে বললো, কোথায় যাচ্ছো?

জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে অদ্ভুত ধরনের গলায় দীপ্তি বললো, রাস্তায় ফেলে দিতে যাচ্ছি।

—কী? কী বলছো?

—রাস্তায় ফেলে দিতে যাচ্ছি। ও মরে গেছে।

রাজেনের বুকের মধ্যে ধক করে উঠলো। দৌড়ে এসে ধরলো দীপ্তিকে। মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে দেখলো, গা গরম, দিব্যি নিশ্বাস পড়ছে।

রাজেন উদ্‌ভ্রান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো, এ কী? এর মানে কী?

—আমার মেয়েকে আমি রাস্তায় ফেলে দেবো, যা খুশি করবো, তোমার তাতে কী?

—এই, কী করছো কী?

—ছাড়ো। ছেড়ে দাও আমাকে।

—কী হয়েছে আমাকে বলো তো!

—কিছু হয়নি।

—দীপ্তি হঠাৎ এ রকম করছো কেন?

দীপ্তি বললো, ওকে নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি। আমি আর থাকবো না।

—কী পাগলের মতন যা তা বলছো।

দীপ্তি তবু পা বাড়ালো দরজার দিকে। রাজেন মেয়েকে কেড়ে নিতে গেল, দীপ্তি দাঁড়াবে না। ধস্তাধস্তিতে মেয়েটি জেগে উঠলো। আর একটু হলে মাটিতেই পড়ে যাচ্ছিল, কাঁথাসুদ্ধু শেষ মুহূর্তে কোনো ক্রমে ধরে ফেললো রাজেন, তারপর তাকে বিছানায় শুইয়ে এসে বিনা বাক্যব্যয়ে এক চড় কষাল দীপ্তির গালে।

দীপ্তি হি হি করে হেসে বললো, মারবে? আরও মারো! আরও মারো। যতই মারো আমি ঠিক চলে যাবো। তোমার ছেলেমেয়ে তোমার রইলো, আমি চলে যাবো।

রাজেন উঠে এসে দীপ্তির হাত চেপে ধরলো। দীপ্তি ফিসফিস করে বললো, আমি থাকবো না, কিছুতেই থাকবো না। কেন আমাকে আটকে রেখেছো? আমার কেউ নেই। হি-হি-হি—

রাজেন ভয় পেয়ে গেল। দীপ্তির চোখ, মুখ, গলার আওয়াজ কোনোটাই স্বাভাবিক নয়। তখন রাজেন কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, দীপ্তি, কী হয়েছে তোমার!

—কিছু হয়নি তো। আমি চলে যাবো।

রাজেন জড়িয়ে ধরলো দীপ্তিকে। গায়ের জোরে সে দীপ্তির সঙ্গে পেরে ওঠে না। তবু কোনোক্রমে টানতে টানতে নিয়ে এলো বিছানায়। কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো। সে রাত্রে আর তার ঘুম হলো না! মাঝে মাঝেই দীপ্তি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। আর রাজেন তাকে জোর করে ধরে রাখে। সকালবেলাতে আর কোনো সন্দেহই রইলো না যে দীপ্তি একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে।

রাজেন বেচারি খুব বিপদে পড়ে গেল। বাচ্চা দুটোকেই বা কে সামলায়, বউকেই বা কে সামলায়। ডাক্তার এসে দীপ্তিকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেল। ব্যারাকপুরের দিদিকে খবর পাঠানো হলো, তিনি এসে মেয়েটিকে নিয়ে গেলেন। দিদিরও বিরাট সংসার, সাতটি ছেলেমেয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ি আছেন, সুতরাং তার পক্ষে বিশেষ কিছু করা সম্ভব নয়।

কয়েকদিন চিকিৎসার পরই বোঝা গেল যে দীপ্তি সাধারণ চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে। এবং সে শুধু সাধারণ পাগল নয়, রীতিমতন হিংস্র। জিনিসপত্তর ভাঙে, লোকজনকে মারতে যায়।

রাজেন ভরসা করে অফিসে যেতে পারে না, ছুটি নিয়ে বাড়িতে থাকে সব সময়। অক্ষম হাতে রান্না-বান্নার চেষ্টা করে। তাও দীপ্তি হঠাৎ ঝড়ের বেগে রান্না ঘরে ঢুকে সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়। ছেলেটা হাঁ করে চেয়ে থাকে মায়ের দিকে। কখনো মায়ের আঁচল চেপে ধরে কিছু বলতে গেলে দীপ্তি তাকে এলোপাথাড়ি মারতে শুরু করে। রাজেন ছাড়াতে গেলে ঝটাপটি লেগে যায়। বাইরের লোক জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে আসে।

ছেলেটা বিনা দোষে মার খেয়ে যখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে—তখন দীপ্তি হঠাৎ তাকে জড়িয়ে ধরে আচ্ছন্ন করে দেয় আদরে। তার নিজেরও চোখের জল পড়তে থাকে তখন।

রাজেন স্ত্রীর হাত চেপে ধরে ব্যাকুল ভাবে বলে, দীপ্তি তোমার কী হয়েছে, আমাকে বলো! আমাকে বলো!

কোনো উত্তর না পেয়ে দিশেহারা হয়ে রাজেনও তখন কাঁদতে থাকে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

খবরটা হীরকের কাছে পৌঁছালো কয়েকদিন বাদে। রাজেনই গিয়ে তাকে খবর দিল। যে কোনো সংকটে হীরকই তার শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা।

হীরক খবরটা শুনে খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইলো। তার হিসেব করা জগতে এই খবরটা এমনই আকস্মিক এবং অবাস্তব যে প্রথমটায় সে কিছুই বুঝতে পারলো না। দীপ্তি আরও অনেক কিছু করতে পারতো, হঠাৎ তার পাগল হবার দরকার কী ছিলো? পাগলামি জিনিসটা হীরকের কাছে সত্যিই বিভ্রান্তকর। দীপ্তি সম্পর্কে সে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লো, অন্য কোনো নারী সম্পর্কে কখনো সে এমন মাথা ঘামায়নি।

প্রথমেই সে ভাবলো যে এই ব্যাপারে তার নিজের কোনো ভূমিকা আছে কিনা। সে কি দায়ী? সে তো কিছুই লুকোচুরি করেনি, দীপ্তির কাছ থেকে সে কী চায়, তা তো স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে। মেয়েটা খুব বোকাসোকাও নয়। হঠাৎ পাগল হবার কী আছে? এরকম লক্ষ লক্ষ কেরানির বউ ছেলেপুলে নিয়ে সংসার করছে, মাঝে মাঝে কারুর পদস্খলনও হয়, কিন্তু তার জন্য তো কেউ পাগল হয় না! অনেক চুলচেরা বিশ্লেষণ করেও হীরক নিজেকে দায়ী করতে পারলো না।

হীরক ভাবে, দীপ্তির মনের মধ্যে যদি কোনো অতৃপ্তি বা জ্বালা থেকে থাকে তা হলে সে হীরকের কাছে এসে অভিযোগ জানালেই তো পারতো। অনেক মেয়ে এরকম বলে, তুমিই আমার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছো! তখন নিজের ভূমিকার কথাটা ভুলে যায়।

দীপ্তি তো সেরকম কিছু করেনি। সে হীরকের কাছে আর আসতে চায় না, হীরকের কোনো রকম সাহায্যও সে প্রত্যাখ্যান করেছে। হীরক কোনো দিন তার ওপর জোর করেনি। এর মধ্যে পাগল হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আসে কোথা থেকে?

রাজেনকে সে জিজ্ঞেস করলো, বিশেষ কোনো ঘটনা কি ঘটেছিল? কোনো ঝগড়াঝাঁটি?

রাজেন জলে-ডোবা মানুষের মতন আঁকুপাঁকু করে বললো, কিছু না। বিশ্বাস করুন, কোনোদিন ঝগড়া হয় না।

—তাহলে এমনি এমনিই?

—মানুষ কেন পাগল হয়, তা কি কেউ বলতে পারে?

—ঠিক! কেউ সেটা পারে না। চলুন, একবার দেখে আসি।

হীরক সব সময় একটা দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে চলাফেরা করে। সে ডাক্তার নয়, কিন্তু মানব চরিত্র সম্পর্কে তার নিজস্ব কতকগুলো ধারণা আছে। সে ভেবেছিল, কথাবার্তা বলে সে দীপ্তিকে শান্ত করতে পারবে। কিন্তু দীপ্তির সঙ্গে দেখা হওয়ায় তার আত্মবিশ্বাসে বেশ বড় রকমের একটা ধাক্কা লাগলো। তার সম্মোহনে সে নারীদের সব সময় আকৃষ্ট হতেই দেখেছে, তার ওপরে কেউ বেশিক্ষণ রাগ বা অভিমান করে থাকতে পারেনি। কিন্তু হীরককে দেখে দীপ্তি রাগারাগি, চেঁচামেচি কিছুই করলো না। তাকে চিনতে পারলো না, তাকে গ্রাহ্য করলো না। একবারও তাকালো না হীরকের দিকে, প্রশ্ন করে করে হীরকের মুখে ফেনা উঠে গেল—দীপ্তি একটি শব্দ উচ্চারণ করল না পর্যন্ত। হীরক হার মেনে গেল।

বিছানার ওপর চুপ করে বসে আছে দীপ্তি, ছেলেটা খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে আছে ম্লান মুখে। আগে দীপ্তির ঘরখানা সবসময় সাজানো গোছানো থাকত, এখন সব কিছু অগোছালো। হীরকের মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। রাজেন দারুণ বিপদে পড়েছে। কিন্তু এজন্য কি হীরকের কোনো অপরাধ আছে? সে যুক্তিবাদী মানুষ,

কোনো কিছু যুক্তির বাইরে চলে গেলে সে দিশেহারা হয়ে যায়। দীপ্তিকে সে সব কথা খোলাখুলি বলেছিল, কোনো কু-অভিসন্ধি সে গোপন রাখেনি সবকিছু জেনেশুনে দীপ্তি হঠাৎ পাগল হতে গেল কেন? দীপ্তির চোখ দুটি দেখলেই বোঝা যায় তার নিজস্ব সত্তাটি হারিয়ে গেছে।

দীপ্তি যদি চ্যাঁচামেচি করতো, এমন কি হীরকের নামে কুৎসা রটাতো, তাতেও হীরক অবাক হতো না। সেইজন্য সে খানিকটা তৈরি হয়েই এসেছিল। কিন্তু দীপ্তি একটা কথাও বললো না—এই নীরবতাই হীরককে বিচলিত করে দেয়।

হীরক ঘর থেকে চলে যাবার মুহূর্তেই দীপ্তি ছুটে গেল তার কাঠের আলমারির দিকে। আলমারির মাথায় একটা ছোট টেব্‌ল ক্লক ছিল, সেটা নিয়ে প্রচণ্ড জোরে ছুঁড়ে ফেললো মাটিতে। ঘড়িটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। ছেলেটা কান্না শুরু করে দিল। রাজেন নিজের মাথার চুল আঁকড়ে ধরে বললো, হা ভগবান, এ কী করলে! শেষ-কালে কি আমি নিজেও পাগল হয়ে যাবো!

তখন হীরক ভাবলো, দীপ্তির সঙ্গে তার যা সম্পর্ক, তাতে দীপ্তির স্বামীর সামনে খোলাখুলি কথা বলা যাবে না। এবং ইচ্ছে থাকলেও দীপ্তি বলবে না কিছুই।

হীরক তাই সরাসরি রাজেনকে বললো, আপনি আপনার ছেলেকে নিয়ে একটু ঘুরে আসুন তো বাইরে থেকে।

হীরক কথাটা এমন স্বাভাবিকভাবে বললো, যেন ডাক্তার অপা-রেশানের সময় রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের বাইরে যেতে বলছে।

রাজেন তবু ক্ষীণ আপত্তি জানালো, আপনি কি একা ওকে সামলাতে পারবেন?

হীরক বললো, ঠিক পারবো। সে জন্য চিন্তা করবেন না।

রাজেন ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। একটুক্ষণ অপেক্ষা করে হীরক দরজা বন্ধ করে দিয়ে এলো। জামার হাতা গুটিয়ে দীপ্তির দিকে এগিয়ে এসে বললো, তোমার কী হয়েছে?

তাড়া খাওয়া বেড়ালের মতন দীপ্তি ঘরের এক কোণে দেয়ালে গা ঠেকিয়ে বসে আছে। কোনো রকম উত্তর না দিয়ে জলন্ত চোখে তাকিয়ে রইলো।

হীরক দীপ্তির একেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললো, দীপ্তি আমি কি তোমার ওপর কোনো অন্যায় করেছি ?

দীপ্তির চোখের দৃষ্টি সাদা! যেন সে এসব কথার কোনো মানেই বোঝে না।

তখন হীরক জোর করে দীপ্তিকে ধরে দাঁড় করালো, চোখের ওপর চোখ রেখে বললো, আমার দিকে তাকিয়ে দেখো। আমাকে চিনতে পারছো না।

এবার দীপ্তি বললো, তুমি কে ?

—আমি হীরক।

—না, তুমি সে না! তুমি অন্য লোক।

দীপ্তি, আমায় চিনতে পারছো না ? তুমি এত সুন্দর, তুমি এরকম করছো কেন ?

হীরক খুব নরম সুরে কথা বলছে। আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে দীপ্তির গালে। সে টের পেল, দীপ্তির শরীরে উত্তাপ আসছে। শারীরিক আনন্দ পেতে দীপ্তি খুব ভালোবাসে জেনেই হীরক ঠোঁট এগিয়ে দীপ্তিকে চুম্বন করতে গেল। দীপ্তি সঙ্গে সঙ্গে মুখ নিচু করে কামড়ে ধরালো হীরকের বুকের কাছে। যেন মাংস ছিঁড়ে নেবে। অসহ্য যন্ত্রণায় প্রচণ্ড জোরে একটা চড় মারলো ওকে। হীরককে ছেড়ে দিয়ে দীপ্তি তখন হেসে উঠলো হা হা করে।

পর পর দুটো দিন হীরকের খুব খারাপ কাটলো। নিজের মনের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক আর শেষ হয় না। যদি নিজেকে সে অপরাধী বলে মনে করতে পারতো, তাহলে সে প্রায়শ্চিত্তের জন্যও কিছু করতে রাজি ছিল। কিন্তু একটি মেয়েকে ভোগ করা কি অপরাধ, যদি সেই মেয়েটির নিজেরও সম্মতি থাকে, এই প্রশ্নের উত্তর সে কিছুতেই খুঁজে পেলো না। তার বিচারবোধে এটা মোটেই পাপ নয়।

তা ছাড়া হীরকের আর একটা চিন্তা দেখা দিল। মানুষের দাঁতে কি বিষ থাকে ? দীপ্তি তার বুকের যে জায়গাটা কামড়ে ধরেছিল, জামা ভেদ করে সেখানে গভীরভাবে দাঁতের দাগ বসে গেছে। অসহ্য ব্যথা। যদি কিছু হয়। ডাক্তার দেখাবার পর ডাক্তার অবশ্য বললো, এমন কিছু ভয়ের ব্যাপার নয়।

ডাক্তার হীরকের অনেকদিনের পরিচিত, হীরককে ভালোভাবেই

জানে। সেই জন্যই ব্যঙ্গ করে বললো, মেয়েরা আদর করে ওরকম কামড়ে দিলে আরও বেশি ভালো লাগে। জয়দেব পড়োনি? শ্রীকৃষ্ণের গা কীরকম ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত?

হীরক জিজ্ঞেস করতে পারলো না, জয়দেবের রাধা পাগল ছিল কিনা।

নিজের কাজকর্ম বন্ধ রেখে হীরক পাগলের সম্পর্কে পড়াশুনো করতে লাগলো। নানা বই পড়েও সে কোনো উত্তর খুঁজে পায় না। তখন হীরক এক সন্ধেবেলা বেশ সেজেগুজে বাড়ি থেকে বেরুলো। পার্ক স্ট্রিট থেকে মস্ত বড় একখানা কেক এবং কিছু ফুল কিনে নিয়ে হাজির হলো মে ফেয়ার স্ট্রীটের একটি বাড়িতে। দোতলার ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে বেল বাজালো। আয়া এসে দরজা খুলে দেবার পর বসবার ঘরে বসে রইলো কিছুক্ষণ। আয়া বলে গেল, দিদিমণি স্নান করছেন।

স্নান সেরে এক মহিলা এলো সেই ঘরে, তার বয়েস প্রায় পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। শরীরের বাঁধুনিটি চমৎকার। ভিজে ভিজে চোখ মেলে মহিলাটি বললো, তুমি? ভাবতেই পারিনি। কতদিন আসোনি! সেই দেড় বছর আগে—

হীরক হাতের ফুল ও কেক মহিলাটির কাছে রেখে বললো, বেলা এই তোমার অর্ঘ্য।

পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে হীরক মহিলার পায়ের কাছে রেখে বললো, আর এই তোমার প্রণামী।

হাওয়ায় একশো টাকার নোটটি উড়ে যাচ্ছিল, মহিলাটি অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে সেটি পা দিয়ে চেপে ধরে বললো, হঠাৎ পথ ভুলে এলে যে?

হীরক বিরস মুখে বললো, তোমার কাছে আমার আসতে ইচ্ছে করে না। তাছাড়া, আমার এখন অনেক কাজ—

—আসতে ইচ্ছে না করলেও তবু আসতে হয় আমার কাছে। আমার গায়ে কি চুম্বক আছে?

—সব মেয়েই মনে করে তাদের শরীরে চুম্বক আছে।

—থাকে না বুঝি?

—আমি জানি না। আমি নন্-ফেরাস মেটাল, চুম্বক আমাকে টানে না।

—যাক ওসব কথা। তুমি কেমন আছো?

—কয়েকদিন আগে পর্যন্ত খুব চমৎকার ছিলাম।

মহিলাটি সুন্দর ঝকঝকে দাঁতে হাসলো। তারপর বললো, তোমার একটা গুণ আছে হীরক। তুমি সব সময় ঠিক দিনে আসো। আজ আমার কোথাও যাবার কথা নেই। কারুর আসবার কথাও নেই, আজ সন্ধেটা একা একা কাটতো, ভাগ্যিস তুমি এলে।

—তোমার বুঝি একা একা থাকতে একটুও ভালো লাগে না।

—একটুও না। কিছু করার না থাকলে আমি আমার আয়াকে সঙ্গে নিয়ে নাইট শো-তে সিনেমা দেখতে যাই। বেশিক্ষণ একা থাকলে আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাবো।

হীরক স্থির চোখে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, বেলা, তুমি তো জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়েছো, তুমি পাগল হয়ে যাওনি কেন ?

বেলা ফুলের তোড়াটা নিয়ে মুগ্ধভাবে গন্ধ শুঁকলো। পায়ের আঙুল দিয়ে একশো টাকার নোটটা তুলে হীরককে বললো, এটা নিয়ে ঐ দেরাজে রেখে দাও তো।

হীরক দু'হাত দিয়ে বেলার পায়ের পাতাটা ধরলো। পরিষ্কার তকতকে পা। নর্তকীর পা বলে মনে হয়। আঙুলের শেষে লালচে রঙের আভা। নোটখানা ছাড়িয়ে নিয়ে হীরক রেখে দিল দেরাজে। তারপর বললো, বেলা, তোমার একটি ছেলে ছিল দু'বছরের। বারান্দা থেকে পড়ে গিয়ে সে মারা যায়। তার কথা তোমার মনে পড়ে না ?

বেলা এবার ভুরু কুঁচকে তাকালো। ফুলের তোড়াটা নামিয়ে রেখে বললো, ব্যাপার কী ? হঠাৎ এসব কথা বলছো কেন ?

—উত্তর দাও।

—হীরক, তুমি কি আমাকে বকুনি দিতে এসেছো ? এমন সুন্দর সন্ধে তুমি নষ্ট করবে ?

—আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে এসেছি।

—এই কি প্রশ্ন করার সময় ?

—আমি আজকাল একদম সময় পাই না। প্রশ্নগুলো মনে এসেছে বলেই আজ এখানে আসতে হয়েছে।

—আমি যদি উত্তর না দিই ?

—এক হারামজাদা তোমার স্বামীর কাছ থেকে তোমাকে ফুসলে এনেছিল, তারপর একসময় সে কালীঘাটে তোমাকে ফেলে পালিয়ে

যায়। একবার একজন পাঞ্জাবী ট্রাক ড্রাইভার তোমার ওপর চূড়ান্ত অত্যাচার করে গয়ার কাছে মাঠের মধ্যে তোমাকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল অর্ধমৃত অবস্থায়। তুমি সেইসব কথা ভুলে গেছ?

—তুমি কি আমার জীবনী লিখবে নাকি?

—তুমি আমার কথার উত্তর দিচ্ছো না কেন॥

—আগে বলো, কেন এসব জিজ্ঞেস করছো?

—কারণ তোমার কথাবার্তা, তোমার দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ মেয়েদের মতন নয়।

—আমি খুবই সাধারণ মেয়ে, হীরক।

—সাধারণ মেয়েদের কাছে আমি সময় নষ্ট করতে আসি না।

—একমাত্র তুমিই তাহলে আমাকে অসাধারণ মনে করো। তুমি কি আমাকে ভালবেসে ফেলেছো নাকি?

—না।

—আমাকে কেউ ভালোবাসে না। ভালোবাসা পাওয়া আমার ভাগ্যে নেই। ভালোবাসা পাইনি বলেই তো আমার জীবনটা এ রকম?

—তুমি কি ভালোবাসার জন্য কাঙাল?

—আমি তো জীবনে আর কিছুই চাইনি।

—বেলা, অনেকেই এখন তোমাকে ভালবাসে। যারা তোমার কাছে আসে, তারা তোমাকে মনে মনে খানিকটা শ্রদ্ধাও করে। শুধু তোমার চেহারা নয়, তোমার ব্যবহার, কথাবার্তা সবই সুন্দর, তোমার কাছে এলে একটা অন্যরকম আনন্দ পাওয়া যায়। অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত লোকও তোমার ভক্ত। কিন্তু আমি জানতে চাই, জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়েও তুমি এত আনন্দময়, এত সুন্দর থাকতে পারো কী করে? কী এর রহস্য।

বেলা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, দ্যাখো আমাকে দ্যাখো, আমার কোনো রহস্য নেই।

হীরক জোর দিয়ে বললো, দেখে যা বোঝা যায় না, আমি সেই কথা জানতে চাইছি।

—হীরক, মেয়েদের অদেখা দিকটার কথা জানতে চেও না। তার কূল-কিনারা পাবে না।

—সব মেয়েদের অদেখা দিক থাকে না। সব মেয়েই রহস্যময়ী নয়। দু'একজন এরকম হয়। তুমি সেই দু'একজনের মধ্যে পড়ো

বলেই এত লোক তোমার জন্য উতলা। নইলে, তুমি এমন কিছু সুন্দরী নও। তোমার নাক চোখ এমন কিছু সুন্দর নয়—

—এই ভর সন্ধেবেলা আমার রূপের নিন্দে করছো? একটু প্রশংসা করলেও তো পারতে।

—বেলা, তুমি খুব ভালোই জানো, মেয়েদের স্তুতি করা আমার দ্বারা পশায় না!

বেলা হীরকের কাছে এসে তার মাথার চুলে হাত রাখলো। আঙুল দিয়ে হীরকের চুল এলোমেলো করে দিতে দিতে বললো, তোমাকে দেখলে আমার ভালো লাগে। আজ তুমি এত উতলা কেন?

হীরক ডান হাতখানা মেলে দিয়ে বললো, তোমাদের হাত দেখা-টেখার বুজরুকিতে আমি কখনো বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আজ আমি দুর্বল। আমার হাত দেখে বলো তো, আমি কি পাপী?

বেলা হীরকের পাশে বসে পড়ে তার গালে হাত বুলোতে বুলোতে শান্তভাবে বললো, আবার কোনো মেয়ের সর্বনাশ করেছো বুঝি?

হীরক মাথা ঝাঁকিয়ে সরে গিয়ে বললো, আমি কোনো মেয়ের সর্বনাশ করি না।

—তাহলে কারুকে ভালোবেসেছো?

—তুমি খুব ভালো করেই জানো, মেয়েদের ভালোবাসাটাসা নিয়ে সময় কাটাবার মত সময় আমার নেই।

—তোমার বড্ড অহঙ্কার।

—না, আমি অন্য ধাতুর মানুষ। বিয়ে করে সংসার পাতা, সন্তান-বাৎসল্য কিংবা নারীর প্রেমের জন্য লালায়িত হওয়া—এসব আমার জন্য নয়। আমি আমার মতন থাকবো, অন্যরা অন্যদের মতন। আমার ক্ষমতা আছে। আমি এই সমাজকে কাঁচকলা দেখাতে পারি।

—তাহলে আজ হঠাৎ হাত দেখাবার ইচ্ছে হলো যে? আগে তো কোনোদিন রাজি হওনি!

—বললাম যে, আজ আমি দুর্বল। কয়েকদিন ধরে একটা ব্যাপারে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছি! তুমি আমার হাত দেখে বলে দাও, আমি পাপী কিনা।

—কার কাছে পাপী?

—সমাজ টমাজ আমি গ্রাহ্য করি না। কোনো একজন বিশেষ মানুষের কাছে। আর আমার বিবেকের কাছে।

—কী ব্যাপার তা আমাকে খুলে বলবে না?

—তা হলে আর তোমার হাত দেখার বিদ্যের কী মূল্য?

বেলা হীরকের ডানহাতের পাতা নিজের মুখের সামনে দর্পণের মতন তুলে ধরলো। খানিকটা সময় নিয়ে দেখলো নিবিষ্টভাবে তারপর বললো, তোমার হাতে উন্নতির রেখা খুব স্পষ্ট। তুমি আরও উঁচুতে উঠবে।

—সে কথা আমি জানি। যা জিজ্ঞেস করছি, তাই বলো।

—পাপী তো তুমি বটেই। তুমি মানুষকে কষ্ট দাও।

—আমি মানুষকে কষ্ট দিই? দ্যাখো, সামাজিক নীতিবোধকে আঘাত দিতে আমার একটুও দ্বিধা হয় না, কিন্তু মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে আমি কক্ষনো চাইনি। আমার জন্য যদি কারুর জীবন নষ্ট হয়—

—সে রকম হয়েছে বুঝি?

—তা আমি জানি না। একজনের জীবন, একটা সংসার নষ্ট হতে চলেছে, সেটা আমারই জন্য কিনা সেইটাই আমি জানতে চাই।

—যদি সেরকম হয়ও, তা হলেও হাত দেখে বোঝা যায় না, সেই মানুষটা পাপী কিনা।

—বোঝা যায় না? কেন?

—তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধরো, জিন্না আর গান্ধীর জন্য দেশ ভাগ হয়েছিল, কত সংসার তাতে ভেসে গেল, কত জীবন নষ্ট হলো, কিন্তু তা বলে জিন্না কিংবা গান্ধীর হাত দেখে কি বোঝা যাবে তারা পাপী?

—সে কথা বলছি না। জেনে শুনে, চোখের সামনে—

—কী হয়েছে বলো তো?

—শোনো, একটি মেয়ে, অল্প বয়েসে বিয়ে হয়েছে বেচারির, গরিব ঘরের বউ, দুটো বাচ্চা, এক সময় তারা খুব বিপদে পড়েছিল বলে আমি সাহায্য করেছি, তারপর মেয়েটি বোধহয় আমাকে ভালোবেসেই ফেলেছে—আমাকে সে বারবার দেখতে চায়, কিন্তু আমার তো ওসব নিয়ে মত্ত হয়ে থাকবার সময় নেই—সেই কথা তাকে বলেছিলাম।

এখন ওদের সংসারের কষ্টের দিনও আর নেই, তবু মেয়েটি হঠাৎ পাগল হয়ে গেল। এর জন্য কি আমি দায়ী ?

বেলার মুখখানা নরম হয়ে গেল। খুব করুণার সঙ্গে বললো, আহা !

হীরক বললো, কেউ হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে শুনলে সবারই মনে দুঃখ হয়। কিন্তু মানুষ কেন পাগল হয় তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।

বেলা দুঃখের সুরে বললো, হয়তো বেচারি মেয়েটি মনে খুবই কষ্ট পেয়েছে।

—তুমিও তো জীবনে কম দুঃখ পাওনি। তুমি পাগল হওনি কেন ?

—আমি তো কারুকে ভালোবেসে কষ্ট পাইনি।

—নিজের ছেলেকেও না ?

—হীরক, তুমি আজ আমাকে আঘাত করছো। আমিও তোমাকে একটা সত্যি কথা বলে আঘাত দেবো। তোমার হাতে স্পষ্ট দেখছি, তোমার একটা সন্তান আছে। সম্ভবত যে মেয়েটির কথা বললে, তারই—

হীরক বিবর্ণ মুখে তাকালো বেলার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললো, অসম্ভব ! মিথ্যে কথা।

বেলা বললো, এটা যদি মিথ্যে হয়, তাহলে আমার হাত দেখার বিদ্যেবুদ্ধি সবই মিথ্যে।

হীরক মাথা ঝাঁকিয়ে বললো. এ হতেই পারে না। এর কোনোই মানে হয় না।

—মেয়েটির সঙ্গে তোমার শারীরিক সম্পর্ক হয়নি ?

—সেটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে যদি মুখোমুখি বসে গল্প করতে পছন্দ করে, তা হলে তারা পাশাপাশি শুয়েও পড়বে না কেন, তা আমি বুঝি না !

—ব্যাপারটা এত সহজ ?

—আমার কাছে সহজ।

—তা হলে বিপদ তো তোমার কপালে লেখাই রয়েছে। যাক গে, তোমরা প্রোটেকশান নিয়েছিলে ?

—কী ? ও, সে তো মেয়েদেরই চিন্তা করার কথা।

—সব মেয়ে তা চিন্তা করে না। আর একটা ব্যাপার জানো কি ? অবৈধ প্রেমে সন্তান-সম্ভাবনা বেশি থাকে। ঐ মেয়েটির সন্তান তোমারই।

—হাতের রেখায় কখনো এসব লেখা থাকে ?

—আমি দেখতে পাই। মেয়েটিকে গিয়েই জিজ্ঞেস করো না।

—তার উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই। সে এখন বদ্ধ উন্মাদ।

—ইস, এক সঙ্গে দুটো জীবন নষ্ট হয়ে যাবে ?

—বেলা, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

—তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর, মেয়েটির কোনো সন্তান হয়নি ?

হীরক চুপ করে বসে রইলো। তার মনে পড়লো, গর্ভবতী অবস্থায় সে দীপ্তির পেটে কান ঠেকিয়ে নতুন প্রাণস্পন্দন শোনার চেষ্টা করেছিল। সেই প্রাণ কি তারই সৃষ্টি ?

বেলা সোফায় হেলান দিয়ে বসলো। তারপর নিজের কোল চাপড়ে হীরককে বললো, তুমি এখানে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ো। বেশি ভাবলে তুমিও পাগল হয়ে যাবে।

বিনা বাক্যব্যয়ে হীরক শুয়ে পড়লো সেইভাবে। বেলা তার সার্টের বোতামগুলো খুলে দিয়ে বুকের ওপর হাত রাখলো। মুখ নিচু করে বললো, হীরক, তুমি জীবনে উন্নতি চাও. সার্থকতা চাও—নিজেকে তুমি বড্ড জড়িয়ে ফেলছো।

—তুমি বলতে চাও, একটা বোকা মেয়ের জন্য আমার সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে ?

—বোকা নয়, বলো অসহায়। মেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসহায়।

—এত বেশি অসহায় হলে তার ফল ভোগ করতেই হবে। আমি কি সে জন্য দায়ী হবো ?

—হীরক, তুমি কি আমার কাছে এই ব্যাপারে পরামর্শ চাইতে এসেছো ?

—তা ছাড়া কী জন্য আসবো ? ফুর্তি করার জন্য ? এই কি আমার ফুর্তি করার সময় ?

—কিন্তু আমি নিজে মেয়ে, আর একটি মেয়ের সর্বনাশ হলে, আমি তোমাকে বাঁচাবার পথ দেখাতে কি পারি ?

—বেলা, তুমি আমাকে কী ভাবো, বলো তো? মেয়েদের সর্বনাশ করে বেড়ানো আমার পেশা নয়। আমি শুধু অন্য একজনের মুখ থেকে শুনতে চাই, এ ব্যাপারে আমার দায়িত্ব কতখানি।

—অনেকখানি।

—কেন? মেয়েদের তো দুটো তিনটে সন্তান হওয়া এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। তার মধ্যে একটা সন্তান স্বামী ছাড়া অন্য কারুর দ্বারা হলে কী যায় আসে? সমাজ একটা নিয়ম তৈরি করেছে বটে, কিন্তু মনে মনে কী যায় আসে?

—মন শক্ত থাকলে কিছুই যায় আসে না।

—ব্যাপারটা আর কেউ জানে না। ওর স্বামীও জানে না।

—তা হলে তুমি অত চিন্তা করছো কেন?

—জানে মাত্র দু'জন। দীপ্তি আর আমি। দীপ্তি নিজে পাগল হয়ে গিয়ে সবকিছু জানার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেছে—স টুকু দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে গেছে আমার ঘাড়ে। সারা জীবন আমাকে এই গোপনীয়তার বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে। এ কি আমার পক্ষে সম্ভব?

—মেয়েটি তোমাকে কখনো কিছু বলেনি?

—না। কী জানি, ও বলতে চেয়েছিল কিনা, আমি সুযোগ দিইনি। এখন আমি কী করবো বলো তো?

—যতটুকু পারো সাহায্য করো!

—কী সাহায্য আমি করতে পারি? অন্যের সংসারে নিয়মিত টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করলে সেটা দৃষ্টিকটু দেখাবে না? নাকি আমি ওর স্বামীকে গিয়ে বললো, মশাই, আপনার দ্বিতীয় সন্তানটির জনক আমি—ওর ভরণপোষণের দায়িত্ব আমার।

—বলে দেখো না। মন্দ কী!

হীরক ধড়মড় করে উঠে বসে বললো, এ হতেই পারে না! বেলা, তুমি যা বলছো তা সত্যি নয়। আমি হাত দেখা-ফেখায় বিশ্বাস করি না—আমার কোনো সন্তান নেই। মানুষ কেন পাগল হয়, তা কেউ জানে না। হয়তো দীপ্তিদের বংশে অন্য কেউ পাগল ছিল, সেইজন্য ও পাগল হয়েছে। আমার এতে কোনো দায়িত্ব নেই। এক আধবার ওরকম অ্যাফেয়ার অনেকেরই হয়।

বেলা বিচিত্রভাবে হাসলো। বললো, তা হতেও পারে। তোমার

পক্ষে এরকম একটা ধারণা রাখাই ভালো, না হলে, তুমিও হয়তো পাগল হয়ে যাবে।

হীরক কঠিনভাবে বললো, অত সহজ নয়, আমি কখনো পাগলও হবো না, আত্মহত্যাও করবো না। ঐ দুটি জিনিস আমার চরিত্রে নেই। কিন্তু একটা কথা আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, ঐ বাচ্চাটা যে সত্যিই আমার তার কোনো খাঁটি প্রমাণ যদি আমাকে কেউ না দিতে পারে—

বেলা আবার হেসে বললো, থাক্, প্রমাণ খোঁজার চেষ্টা করো না।

—এমনকি, দীপ্তি যদি নিজের মুখেও বলতো, তাও আমি বিশ্বাস করতাম কিন্তু সে তো একবারও বলেনি—

—ও কথা আর ভেবে লাভ কী? মেয়েটার কপালে দুঃখ আছে। তুমি আমাকে আজ যে একশো টাকার নোটটা দিয়েছো, সেটা নিয়ে যাও। তোমার কাজে লাগবে।

হীরক বললো, তার দরকার নেই। আমার টাকা পয়সা এখনো কম পড়েনি।

বেলার মুখ চোখ কঠিন হয়ে গেল এবার। দেরাজ থেকে নোটটা বার করে ময়লা কাগজের মতন ছুঁড়ে দিল হীরকের দিকে। তীব্র গলায় বললো, আজ সারা রাত ঐ মেয়েটির কথা আমাকে ভাবতে হবে, আমার ঘুম হবে না, তার দাম কে দেবে?

হীরক দেখলো বেলার চোখ জলে ভরে গেছে।

॥ ৬ ॥

দীপ্তিকে আর সামলে রাখা যায় না, বাড়ি থেকে সরিয়ে কয়েক দিনের জন্য তাকে একটি নার্সিং হোমে রাখা হলো। সেখানেও রাখা অসুবিধাজনক। লুম্বিনি পার্কে ভর্তি করে দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। সেখানে আবার জায়গা পাওয়া কঠিন। টাকা-পয়সার প্রশ্ন তো আছেই। হীরক চেষ্টা চরিত্র করে তাকে রাঁচির পাগলা গারদে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিল। প্রথমবারের কিছু খরচ ছাড়া আর টাকা-পয়সার প্রশ্ন নেই।

এর মধ্যে হীরক আরও দু'তিনবার চেষ্টা করেছিল দীপ্তির সঙ্গে কথা বলবার। তার অমূল্য সময় সে খরচ করছে এই একটি পাগলীর জন্য। নিজের চেনা ডাক্তার এনে দেখিয়েছে। দীপ্তির সঙ্গে আবার

আড়ালে কথা বলে ওর মনের কথা জানতে চেয়েছে। মেয়েটির জন্ম-বৃত্তান্ত জানার আগ্রহই হীরকের বেশি। সে স্পষ্টাস্পষ্টি সেকথা জিজ্ঞেস করেছে দীপ্তিকে! দীপ্তি তবু কোনো উত্তর দেয়নি। উত্তর দেবার কোনো ক্ষমতাই নেই তার। দীপ্তি অন্য সময় যাও-বা চ্যাঁচা-মেচি করে, হীরককে দেখলে একেবারে চুপ হয়ে যায়। কোনো কথারই জবাব দেয় না সে। হীরক ঘর থেকে চলে গেলেই কোনো না কোনো জিনিস ভাঙে।

বারবার হার মেনে শেষ পর্যন্ত হীরক বিরক্ত হয়ে গেল। শুধু শুধু একটা পাগলীর সঙ্গে ছেলেখেলা করে সময় নষ্ট হচ্ছে! দীপ্তিকে সে একেবারে মন থেকে মুছে ফেলতে চাইলো। তাই নিজে উদ্যোগী হয়ে ব্যবস্থা করেছিল রাঁচিতে।

রাজেন হীরকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দীপ্তিকে রেখে এলো রাঁচিতে। দীপ্তির বয়েস তখন মাত্র পঁচিশ, এই বর্ণগন্ধময় জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে সে চলে গেল জেলখানার মতন একটা জায়গায়।

ছেলেবেলা থেকেই দীপ্তি চেয়েছিল একটা বৃহত্তর জগতের স্বাদ। অনেক আশা ছিল, অনেক স্বপ্ন! কোথায় প্রকৃতির নিয়মে একটু ওলোট পালোট হয়ে গেল, সে বন্দী হয়ে পড়লো চেতনাহীন এক খাঁচায়।

মেয়ে রইলো মাসীর বাড়িতে, ছেলে রইলো রাজেনের কাছে। রাজেন একটি চাকর রেখে নিজেই কিছুদিন হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলে না, ছেলেকে ইস্কুলে পাঠাতে হয়। নিজেকে অফিসে যেতে হয়। অকুল পাথারে পড়লো রাজেন। এরকম লক্ষ্মীছাড়া জীবন তার সহ্য হয় না। সে তো বেশি কিছু চায়নি, শুধু চেয়েছিল অফিস থেকে ফিরে শান্তিতে শুয়ে থাকার আনন্দ, কিংবা লুঙ্গি পরে রান্না ঘরের দরজায় বসে বউয়ের সঙ্গে গল্প করবে, সেটুকুও সে পেল না।

রান্নার জন্য একজন বয়স্কা মহিলাকে রাখা হয়েছে, তার একটু আধটু চুরি করার দোষ আছে। ছেলে দুরন্ত হচ্ছে, তার নামে প্রায়ই নালিশ শুনতে হয়, রাজেনের জীবনে শান্তি নেই।

এক এক সময় রাজেন ভাবে, তার জীবনটা তো নষ্টই হয়ে গেল, এখন ছেলেটা আর মেয়েটার কী হবে? এই বয়েসে ওরা মাতৃস্নেহ

পেল না। ওরা পৃথিবীটাকে কী করে চিনবে? প্রথম কয়েকটা বছর মা-ই তো সন্তানদের সব কিছু চেনায়। মেয়েটা তো মাকে দেখলোই না ভালো করে। কেন যে সে ঠিকুজি-কুষ্ঠি না মিলিয়ে বিয়ে করেছিল।

এক বছর বাদে ছেলেকে নিয়ে সে রাঁচিতে গিয়েছিল দীপ্তির সঙ্গে দেখা করতে। দেখতে গিয়ে আরও মন খারাপ হয়ে গেল। দীপ্তির অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে, সে স্বামীকে বা ছেলেকে চিনতে পারলো না। চিকিৎসার ফলে এইটুকু পরিবর্তন হয়েছে—সে আর জিনিস-পত্র ভাঙে না কিংবা লোকজনকে মারতে আসে না, সর্বক্ষণ চুপচাপ থাকে। গত সাত মাসের মধ্যে সে নাকি একটি কথাও উচ্চারণ করেনি। দীপ্তির চেহারা এখন দারুণ শীর্ণ, চোখ দুটো কোটরে ঢোকা। কী জানি, হাসপাতালের লোকেরা তাকে মারধোর করে কিনা। রাজেন যখন ছেলেকে দীপ্তির কোলে জোর করে বসিয়ে দিতে গেল, তখন লোকে যেমন বেড়াল বাচ্চা দেখে ঘেন্নায় সরিয়ে দেয় দীপ্তি সেই রকম ভাবে সরিয়ে দিল ছেলেকে। ছেলেটা ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে, দীপ্তি সেদিকে ফিরেও তাকালো না।

পরের বছর রাজেন একাই এলো, সেবারও দীপ্তিকে দিয়ে কোনো কথা বলাতে পারলো না। হাসপাতালের লোকজনের কাছে শুনলো, দীপ্তি এখন মাঝে মাঝে একলা কথা বলে বটে, কিন্তু অন্যদের সঙ্গে কোনো কথা বলতে চায় না।

রাজেন অনেকের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করলো, দীপ্তি কী ধরনের কথা বলে আপন মনে। সে কি নিজের ছেলে-মেয়ের কথা একবারও বলে? স্বামীর কথা তার একবারও মনে পড়ে? কেউ সে সম্পর্কে কিছু বলতে পারে না। এবারও দীপ্তি রাজেনের সঙ্গে একটাও কথা বলেনি।

পরের দু'বছর রাজেনের আর যাওয়াই হলো না। দীপ্তির কোনো খবর নেওয়াই হয়নি। প্রকৃতি শূন্যতা সহ্য করে না, তাই দীপ্তির অভাববোধও আস্তে আস্তে মুছে গেল। ঐ পাগলাগারদেই দীপ্তির জীবন শেষ হবে, এই রকম ধরে নেওয়া হলো।

সময়ে আস্তে আস্তে সবই সহ্য হয়ে যায়। এমনকি কল্যাণও তার মায়ের অভাবে আর কাতর হয়ে থাকে না। ঐটুকু বয়েসেই সে

যেন বুঝে নিয়েছে, বাকি জীবনটা তাকে মায়ের চিন্তা বাদ দিয়েই বাঁচতে হবে। সে সব সময় বাবার কাছে কাছে থাকে, বাবাকে সাহায্য করার চেষ্টা করে। এর মধ্যেই সে নিজের জামাপ্যান্ট নিজে কাচতে শিখে নিয়েছে।

রাজেন ইতিমধ্যে বাড়ি বদল করে চলে এসেছে আহিরিটোলায়। এখান থেকে তার অফিস কাছে হয়। হীরকের সঙ্গে ইদানীং তার যোগাযোগও ছিল না। যে কয়েকবার হীরকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, হীরক ঘুণাক্ষরেও দীপ্তির কথা জানতে চায়নি। বরং রাজেনের চাকরির বিষয়ে খোঁজ নিয়েছে। রাজেনের চাকরি রক্ষাই যেন তার দায়িত্ব, দীপ্তি সম্পর্কে তার কোনো দায়িত্ব নেই। হীরক এখন রীতিমতন মান্যগণ্য লোক, প্রায়ই তাকে নানান সভা-সমিতিতে দেখা যায়।

বয়স্কা মহিলাকে ছাড়িয়ে রাজেন একটি যুবতী রাঁধুনি রেখেছিল, সেই এখন সংসারের কর্ত্রী। ছেলেটা দশ বছরে পা দিয়েছে। ওদিকে দীপ্তির দিদি, জামাইবাবু বারবার আভাসে ইঙ্গিতে জানাচ্ছেন যে তাঁদের পক্ষে আর দীপ্তির মেয়েকে বেশিদিন রাখা সম্ভব নয়। রাজেন মাঝে মাঝে জামা-কাপড় কিনে দিয়ে আসে, কিছু টাকা পয়সাও দেয়, তবু ওঁরা সন্তুষ্ট নন, বেশিদিন থাকলে যদি সারা জীবনের দায়িত্ব নিতে হয়! একটি মেয়ে সন্তানের দায়িত্ব নেওয়া কি সোজা কথা, তাঁদের নিজেদেরই একগাদা ছেলেমেয়ে।

মেয়ের পাঁচ বছর বয়েস হওয়ার পর সত্যিই যেদিন ওরা মেয়েকে এ বাড়িতে রেখে গেল, তখন রাজেন আর একবার বিপদে পড়লো। মেয়ে কিছুতেই থাকতে চায় না, সব সময় কান্নাকাটি করে। মাকে তো সে ভালো করে দেখেইনি, বাবাকেও ঠিক চেনে না। মাসিকেই সে মা বলে জানতো, সুতরাং মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হয়ে সে যা কান্নাকাটি করতে লাগলো, সেটা নিজের মায়ের জন্য নয়, মাসির জন্য।

কল্যাণ তখন নিজের বোনকে ভোলাবার চেষ্টা করে। সে বড় হয়েছে, অনেক কিছু বোঝে। সে বোনকে বলে, কার জন্য কাঁদছিস। আমাদের মা তো রয়েছে হাসপাতালে। কী সুন্দর জায়গা, পাহাড় আছে সেখানে। একদিন সেই পাহাড় থেকে মা চলে আসবে—

এই নতুন মায়ের বর্ণনা মেয়ের বিশ্বাস হয় না। সে একটুক্ষণ

চুপ করে শুনে আবার বলে, ও আমার মা নয়। ও তো তোর মা! আমার মা থাকে ব্যারাকপুরে—

মাসির বাড়িতে মেয়ের নাম রাখা হয়েছিল বাসন্তী, রাজেন সেটা বদলে রাখলো অনীতা। যে-কোনো কারণেই হোক, ছেলের চেয়ে মেয়ের প্রতিই তার টান বেশি। ছেলেকে সে শাসন করে, কিন্তু মেয়ে কান্নাকাটি করলে তার কণ্ট হয়।

যদিও হিন্দু কোড বিল পাশ হয়ে গেছে, তবু রাজেন চিন্তা করতে লাগলো আর একবার বিয়ে করার। কে আর এ নিয়ে মামলা মোকদ্দমা করতে যাচ্ছে। রাঁধুনিটিকেই বিয়ে করবে, না বাইরে পাত্রী খুঁজবে, এ সম্পর্কে মনঃস্থির করতে পারলো না। রাঁধুনিকে বিয়ে করলে যদি অফিসে বদনাম হয়, তবে বড় মুস্কিল। বাইরের কোনো মেয়েকে বিয়ে করলে সে কথা গোপন রাখাও যেতে পারে, কিন্তু রাঁধুনিকে বিয়ে করলে সে খবর চাউর হয়ে যাবেই।

রাঁধুনিটি কিন্তু কল্যাণ আর অনীতার বেশ যত্ন করে। ছেলে-মেয়ে মানুষ করা ছাড়া রাজেনের বিয়ে করার জন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। নারীর অভাব রাজেন অন্য কোনোভাবে অনুভব করে না—অবশ্য নারীর হাতের সেবা পেতে তার ভালোই লাগে।

এরকম ভাবে পাগল হয়ে না থেকে দীপ্তি যদি চট করে মরে যেত, তা হলে সব দিক থেকেই সুবিধে হতো। রাজেনের এমন কিছু বয়েস হয়নি, সে সামাজিক ভাবেই পাত্রী দেখে একটি গৃহকর্ম নিপুণা বউ আনতে পারতো। বাংলা দেশে মেয়ের তো অভাব নেই। আর ছেলেমেয়ের দেখা শুনো করার জন্যই তো তার আবার বিয়ে করার দরকার।

অবশ্য বর্তমান রাঁধুনিটি সব দিক থেকে বেশ ভালই কাজ চালাচ্ছে। ছেলেমেয়ের যত্ন করে, রাজেনেরও সুবিধে অসুবিধের দিকে চোখ রাখে, সংসারটাকে সে-ই সামলে রেখেছে। এই অবস্থায় আর বিয়ে করে নতুন ঝঞ্ঝাট বাড়াবার দরকার নেই। বর্তমান ব্যবস্থাটা সেদিক থেকে ঠিকই ছিল, কিন্তু রাঁধুনিটির নিজস্ব কিছু দাবি আছে মনে হয়।

রাজেন শুয়ে থাকলে সে বড্ড বেশি কাছ ঘেঁসে দাঁড়ায়, ফিক করে হাসে, রাজেনের খুব অস্বস্তি হয় তাতে। অবৈধ কোনো কিছু চিন্তা করলেই, তার গা ছম ছম করে। ভয় হয়, যদি আবার চাকরি যায়? অফিসে সে কোনোদিন এক পয়সাও ঘুস নেয়নি।

রাঁধুনিটির নাম ভুলোর মা, বছর পঁয়তিরিশেক বয়েস। চেহারা দেখলে ভদ্র ঘরেরই মনে হয়। এক কালে তার ভুলো নামে একটা ছেলে ছিল এবং ভুলোর বাবাও ছিল নিশ্চিত—এখন কেউ নেই। সে যেমন কাজের, সেরকম মনটিও তার ভালো। ঝগড়া-ঝাঁটি করে না, খাওয়া দাওয়ার দিকে লোভ নেই।

তবু সে এক এক সময় বড় উতলা হয়ে ওঠে, রাজেনের দিকে বড় গাঢ়ভাবে তাকায়। এ জন্য কি তাকে খুব দোষ দেওয়া যায়? এই স্ত্রীলোকটির আর একবার বিয়ে করার উপায় নেই, সমাজ এর সাময়িক প্রণয়ে সম্মতি দেবে না। অথচ ওরও তো একটা রক্ত মাংসের শরীর রয়েছে।

ভুলোর মা ছেলেমেয়ে দু'জনকে নিয়ে পাশের ঘরে শোয়। রাজেন একা নিজের ঘরে। কোনো রাত্তিরে যদি রাজেন একটু বাইরে বেরোয় অমনি খুট করে দরজা খুলে ভুলোর মা বেরিয়ে আসে। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করে, দাদাবাবু আপনার কিছু দরকার আছে?

রাজেন বলে, না।

তখন ভুলোর মা রাজেনের ঘরে ঢুকে দ্যাখে যে খাবার জল ঠিক মতন রাখা আছে কিনা। তারপর রাজেনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

রাজেনের শরীর শিরশির করে। ছেলে-মেয়েরা ঘুমোচ্ছে, পৃথিবী নিস্তব্ধ, কোথাও কেউ তাদের লক্ষ করছে না। তবু যে রাজেন ভুলোর মাকে শয্যায় ডাকতে পারেনি, তার কারণ সে মজ্জাগত ভাবে ভীরু এবং ঠিক ভোগী পুরুষ যাকে বলে, সে তা নয়। তার শারীরিক দাবি কম।

ভুলোর মা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এর চেয়ে বেশি নির্লজ্জতা সে দেখায় না।

এইরকম ভাবে, সাত বছরের মাথায় রাজেন হঠাৎ একটা খাঁকি রঙের চিঠি পেল। কাঁকের মানসিক হাসপাতাল থেকে তাকে জানানো হচ্ছে যে তার স্ত্রী দীপ্তিময়ী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ—আগামী দশ দিনের মধ্যে যেন তাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়, এরপর আর তার দায়িত্ব নেওয়া কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হবে না।

চিঠি পেয়ে রাজেন বিমূঢ় হয়ে গেল। আনন্দে লাফিয়ে উঠতে পারলো না। সরকারী নীরস ভাষার জন্য তার প্রথমেই মনে হলো,

বিনা খরচে সরকার তার স্ত্রীকে আর রাখতে চায় না, তাই বিদায় করে দিচ্ছে। দীপ্তি ভালো হয়নি। রাজেনের বুক কাঁপতে লাগলো, পাগল স্ত্রী যদি আবার এসে হাজির হয় তা হলে সে কী করবে? পাগলামি কি কখনো সারে? টি-বি রোগের মতন কি বারবার ফিরে আসে না? দীপ্তিকে যে অবস্থায় সে একবার দেখেছে সেই অবস্থা যদি আবার হয়, তাহলে সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে যে!

চিঠিখানা যে-সময় এলো, সেই সময় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস দীপ্তির কথা কারুর একবারও মনে পড়ে না। দীপ্তির কোনো অস্তিত্বই ছিল না। এবং বেশ কিছুদিন ভুলোর মার সঙ্গে ইঁদুর বেড়াল খেলার পর এবার বোধহয় রাজেনের জীবনে সত্যিই একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছিল। রাজেন বেশ জোরে একটা ধাক্কা খেল।

দীপ্তিকে যদি সে না আনতে যায়, তাহলে ওরা কি জোর করে পাঠিয়ে দেবে? রাজেন তো চিঠিখানা না-ও পেতে পারতো, চিঠিখানা এসেছে তার অফিসের ঠিকানায়—রাজেন তো এ চাকরি ছেড়েও দিতে পারতো ইতিমধ্যে। কিংবা রাজেন যদি মরে যেত, তাহলে দীপ্তিকে নিয়ে ওরা কী করতো। যার কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই, তাকে নিয়ে ওরা কী করে?

একটু পরেই সে আবার ভাবলো, সরকারের আইন-কানুন খুব কড়া। নির্দিষ্ট তারিখের পর ওরা নিশ্চয়ই দীপ্তিকে ছেড়ে দেবে, কেউ নিতে আসুক বা না আসুক। তখন দীপ্তি কী করবে? একা অসহায়ভাবে রাস্তায় রাস্তয়ে ঘুরে বেড়াবে? কথাটা মনে হতেই রাজেনের বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠলো। রাজেন তো কুচক্রী বা শয়তান ধরনের মানুষ নয়। সে ভালোয় মন্দোয় মেশানো সাধারণ মানুষ। এখনো দীপ্তির জন্য একটু একটু ভালোবাসা রয়ে গেছে। বিয়ের পর প্রথম দু'তিনটে বছর বড় আনন্দে কেটেছিল, চাকরি থাকার আগে পর্যন্ত।

তাছাড়া, সরকারী চিঠিতে যখন লিখেছে সে ভালো হয়ে গেছে, তাহলে কি ওরা মিথ্যে কথা লিখেছে? দীপ্তি যদি সুস্থ হয়ে ফিরে আসে, ছেলে-মেয়ে দুটোর জন্য তাহলে আর ভাবনা করতে হবে না।

তখন রাজেন ভাবলো, হীরকের কাছ থেকে একবার পরামর্শ নিতে হবে। সে তার নিজের জীবনের সব ব্যাপারেও ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তার জীবনের কয়েকটা সংকটের সময় হীরক এসেছে পরিত্রাতার মতন। এখনও হীরকই তাকে দেখিয়ে দেবে ঠিক পথ।

কিন্তু কয়েক দিন ঘোরাঘুরি করে সে জানতে পারলো, হীরক কলকাতায় নেই। এদিকে নির্দিষ্ট তারিখও এগিয়ে আসছে।

ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিয়েই রাজেন গেল রাঁচিতে। ভাগ্যহীন ছেলে-মেয়ে দুটির এই প্রথম বেড়াতে যাওয়া। কল্যাণের একটু একটু মনে আছে মাকে, খুকু তার মায়ের কথা কিছুই জানে না। তবু ট্রেনে চড়ার উত্তেজনা, মনে হয় যা খুব দুর্লভ, দূরের জিনিস। এই দূর পথের শেষে মা তাদের জন্য প্রতীক্ষা করে বসে আছে।

থার্ড ক্লাস ট্রেনের কামরায় অসহ্য ভিড়, তবু ছেলে-মেয়ে দুটির তাতে একটুও কষ্ট নেই। জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তারা একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

ট্রেন রাঁচিতে এসে পৌঁছোলো ভোরবেলা। ছেলে-মেয়েরা ঘুমিয়ে আছে। রাজেন তাদের গায়ে হাত দিয়ে বললো, এই কল্যাণ, এই এই অনীতা, ওঠ্।

ধড়ফড় করে উঠে ওরা দেখলো অন্য জায়গায় এসে গেছে। অনীতা ভেবেছিল, পৌঁছেই বুঝি মাকে দেখতে পাবে। সে বলে উঠলো, মা কই? কই আমার মা?

রাজেনের বুকটা একটু কেঁপে উঠলো। এত আশা করে এসেছে ছেলে-মেয়ে দুটো, দীপ্তি সত্যি ভালো হয়ে উঠেছে তো? চিনতে পারবে তো ওদের? সেই প্রথমবার কল্যাণকে নিয়ে আসবার পর যা হয়েছিল, সে রকম যদি আবার হয়?

না, না, রাজেন আর সেরকম অবস্থার কথা ভাবতেই পারে না।

রাঁচিতে রাজেনের অফিসের এক বন্ধুর বাবা-মা থাকেন। বন্ধুটি রাজেনকে সেখানেই উঠতে বলেছিল কিন্তু অচেনা মানুষজনের মধ্যে রাজেন সহজ হতে পারে না, তা ছাড়া তার বউয়ের বিস্তারিত ইতিহাস জানাতে হবে, সেও এক ঝামেলা। অনেক ভেবে চিন্তে রাজেন একটা হোটেলেই উঠলো। ছেলে-মেয়ে দুটিকে নাইয়ে খাইয়ে তারপর বললো এবার তোরা চুপটি করে ঘুমো—আমি তোদের মাকে নিয়ে আসছি।

ছেলেমেয়েরাও সঙ্গে যেতে চায়, রাজেন সেটা সমীচীন মনে করলো না। কল্যাণকে বলে গেল, সাবধানে থাকবি, খুকুকে দেখবি—যেন ঘর থেকে না বেরোয়।

রাজেন নার্ভাস ধরনের মানুষ, মানসিক হাসপাতালের অফিস ঘরে বসে তার বুকের মধ্যে দুপ দুপ করতে লাগলো। দীপ্তিকে সে কী ভাবে দেখবে? কতদিন দেখা হয়নি। পাগল হবার পর আবার সেরে উঠলে কি মানুষের পুরোনো কথা মনে থাকে! দীপ্তি তাকে চিনতে পারবে তো?

দীপ্তিকে দেখে রাজেন নিজেই প্রথমটায় চিনতে পারে না। মাথার চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা, একটা সেমিজ আর নীল পাড়ের খদ্দরের শাড়ি পরে আছে, বেশ মোটা সোটা হয়েছে, সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্নমাত্র নেই। দীপ্তির বয়েস এখনো তিরিশ পেরোয়নি—কিন্তু তাকে দেখলে একজন মাঝবয়েসী বিধবা মনে হয়।

হাতে একটা কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে সে ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকালো। ঘরে আরও চার পাঁচজন লোক ছিল, রাজেনের দিকে চোখ পড়তেই সে খুব সাধারণ ভাবে বললে, চলো! যেন একটু আগে সে এখানে রাজেনকে বসিয়ে ভেতরে গিয়েছিল, আর অপেক্ষা করার দরকার নেই।

মাঝখানের এই কয়েকটা বছর যেন কিছুই নয়।

কাগজপত্রে সই-টই করতে খানিকক্ষণ সময় লাগলো। আর্দালি বেয়ারারা বখশিস চাইতে বেশ দরাজ হাতেই টাকা পয়সা দিল রাজেন। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট খুব হৃদ্যতার সঙ্গে করমর্দন করলেন রাজেনের, দীপ্তিকে বললেন, কী, যাবার আগে আমাদের একটা ধন্যবাদও দিয়ে যাবেন না?

দীপ্তি একটু হাসলো শুধু। কারুর কাছ থেকে বিশেষভাবে বিদায়ও নিল না। সে এই জায়গার কথাটা এরই মধ্যে ভুলে গেছে—আর একটুও বেশি সময় এখানে থাকতে চায় না।

রাজেন অন্যদের সঙ্গে কথা বলছে, কিন্তু দীপ্তি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রাজেনের দিকে। এরকম স্থির দৃষ্টি বড় অস্বস্তিকর! রাজেন আড় চোখে মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছে স্ত্রীকে, কিন্তু ঠিক চোখে চোখ রাখতে পারছে না। মনের মধ্যে তার এখনো একটু ভয় ভয় রয়ে গেছে।

দীপ্তি যেন সেখানে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারছে না। যেন ছটফট করছে, কখন সব মিটে যাবে।

বাইরে বেরিয়ে সাইকেল রিক্সায় ওঠার পর দীপ্তি রাজেনকে বললো, তোমার খুব কষ্ট হয়েছে, না? আমি তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছি।

রাজেন বললো, না, না, তোমারই তো—

দীপ্তি গাঢ় স্বরে বললো, তুমি এমন একটা বিয়ে করলে, যে তোমাকে সারা জীবন শুধু কষ্টই দিল। আমি তোমাকে কখনো সেবা করতে পারিনি। আমার জন্যই তোমাকে কত কিছু সহ্য করতে হলো। এবার থেকে আমি খুব ভালো হয়ে থাকবো, দেখো—

রাজেনের চোখে জল এসে গেল প্রায়। অভিভূতভাবে বললো, না, না, আমার এমন কিছু অসুবিধে হয়নি। তুমি যে ভালো হয়ে উঠেছো, এইটাই সবচেয়ে বড় কথা।

দীপ্তি রাজেনের দিকে বড় বড় চোখ মেলে বললো, আমি একদম ভালো হয়ে গেছি। বিশ্বাস করো, তোমার গা ছুঁয়ে বলেছি। আমি আর তোমাকে কষ্ট দেবো না।

রাজেন ব্যস্ত হয়ে বললো, না, না, বিশ্বাস করবো না কেন? এই তো ডাক্তারের সার্টিফিকেটও রয়েছে।

—শুধু ডাক্তারের কথা নয়। আমি নিজে জানি, আমি পুরোপুরি ভালো হয়ে গেছি। তোমার বাড়িতে আমাকে থাকতে দেবে তো?

—এ কী কথা বলছো। আমার বাড়ি তো তোমারও বাড়ি।

—এখনো কি তোমার বাড়ি, আমারও বাড়ি?

—নিশ্চয়ই।

—তুমি আর বিয়ে করোনি?

রাজেন মনের ভাব তেমন লুকোতে জানে না। তবু বিস্ময়ের ভান করে বললো আবার বিয়ে? তা কখনো হয় নাকি? ওসব কথা আমি চিন্তাই করিনি।

দীপ্তি বেশ আন্তরিকভাবেই বললো, আবার বিয়ে করাই উচিত ছিল তোমার। আমার জন্য শুধু শুধু তুমি—

—বিয়ে করবো কেন? আমি তো জানতামই, তুমি আবার সেরে উঠবে।

—তুমি বিয়ে করলেও আমি কিছু মনে করতাম না। তোমার বাড়ির এক কোণে জায়গা দিলেই হতো, আমি রান্না করে, বাসন মেজে দিতাম। আমি এখানে কিছু হাতের কাজও শিখেছি—বেতের চেয়ার, টেবিল, মোড়া বানাতে পারি, সেইসব বানিয়ে কিছু রোজগারও করতে পারতাম।

—থাক, তোমাকে আর রোজগারের চিন্তা করতে হবে না।

—আমি শুধু শুধু তোমার বোঝা হয়ে থাকতে চাই না। আমাকে শুধু যদি তোমার কাছে একটু থাকতে দাও, তাহলে তুমি যা বলবে আমি তাই করবো।

—যাঃ, সে সব কিছুই না। তোমার সংসার তুমি আবার গুছিয়ে তুলবে। তোমারও কি কম কষ্ট গেছে! এখানে থাকতে খুব কষ্ট হয়, তাই না!

দীপ্তির মুখের চামড়া কুঁচকে গেল। যন্ত্রণা-মিশ্রিত গলায় বললো, ভীষণ কষ্ট। সে যে কী কষ্ট তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। পরম শত্রুরও যেন কখনো এ অবস্থা না হয়। আমি যখন একটু একটু ভালো হয়ে উঠলাম—তখন আমার আরও বেশি কষ্ট হতো, সব কথা মনে পড়ে, কষ্ট আরও বাড়ে।

—থাক, আর কষ্ট পেতে হবে না। ছেলে-মেয়েকেও এখানে নিয়ে এসেছি, এক্ষুনি দেখতে পাবে।

দীপ্তি চমকে উঠে বললো, মেয়ে? কার মেয়ে?

—তোমার মেয়ের কথা তোমার মনে নেই?

—আমার আবার মেয়ে কবে হলো?

রাজেন অস্বস্তিতে পড়ে চুপ করে গেল। দীপ্তির সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হবে বুঝতে পারছে না সে। সব কথা দীপ্তির হয়তো মনে নেই, সেগুলো মনে করিয়ে দেওয়া কি খারাপ? হঠাৎ কোনো মানসিক আঘাত পেলে আবার যদি কিছু ক্ষতি হয়।

এই মেয়ে জন্মানোর পর থেকেই দীপ্তির মাথার গোলমাল শুরু হয়। সেইজন্যই বোধহয় দীপ্তির সেই সময়কার কথাটা মনে নেই। পাগলামি সেরে যাবার পর সব স্মৃতিই কি ফিরে আসে! রাজেন অতশত জানে না।

দীপ্তি যদি মেয়েকে সত্যিই চিনতে পারে? মেয়েটা এত আশা করে মাকে দেখতে এসেছে—সেই মা যদি তাকে একবারও কোলে না নেয়? রাজেনের মন খারাপ লাগতে লাগলো।

দীপ্তি বললে, এই, বলো না! সত্যি আমার মেয়ে হয়েছিল?

রাজেন মৃদু গলায় জানালো, হ্যাঁ, হয়েছিল। অবশ্য ও তখন খুবই ছোট ছিল, তাই তোমার মনে নেই।

—সত্যি বলছো? আমারই মেয়ে? তুমি পুষ্যি নাওনি তো?

—পুষ্যি নেবো কেন? ওর যখন ছ'মাস তখন তুমি এখানে চলে এলে। অনেকদিন ও তোমার দিদির বাড়িতে ছিল। তোমার মনে পড়ছে না, তুমি ওকে খুকু খুকু বলে ডাকতে?

দীপ্তি যেন নিজেকেই ভর্ৎসনা করছে, এরকম গলায় বললো, মা হয়ে নিজের সন্তানকে ভুলে যাওয়া, ছিঃ! কেমন দেখতে হয়েছে ওকে?

—ভারী সুন্দর, মিষ্টি মুখখানা। রঙটা একটু চাপা।

—কালো? আমার পেটে আবার কালো মেয়ে হলো কী করে?

—সে রকম কালো নয়। বয়সের সংগে সঙ্গে রঙটাও হালকা হয়ে যাবে।

—ও মেয়েটা অপয়া।

—ছিঃ দীপ্তি, ওরকম ভাবে বলো না। সন্তান কখনো অপয়া হয়? মেয়েটা কত আশা করে এসেছে মাকে দেখবে বলে—

দীপ্তি রাজেনের হাঁটুর ওপর হাত রেখে বললো, তুমি বড্ড ভালো গো! তোমার ভাগ্যটাই শুধু খারাপ, তাই আমাকে বিয়ে করেছিলে। তুমি আর একটা বিয়ে করো না, তোমাদের দু'জনের দাসী হয়ে থাকবো?

—আবার ঐ সব কথা? তুমি আমার সংসারের লক্ষ্মী।

একথা বলার সময় রাজেন একটুও অতিরঞ্জন করে না। সে নরম স্বভাবের মানুষ। দীপ্তিকে দেখে তার বিয়ের পরের দু'একটা বছরের চমৎকার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। ভাগ্যিস সে আর একটা বিয়ে করে ফেলেনি বোকার মতন! তা হলে যে কী ঝঞ্ঝাট হতো এখন! দীপ্তিকে সে কোনোদিনই ফেলে দিতে পারতো না। এখন আবার সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। দীপ্তির হাতে সংসারের ভার তুলে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হবে। দীপ্তি যখন সুস্থ ছিল তখন তাকে সংসারের সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তা করতে হয়নি।

সে আবার আবেগাপ্লুত গলায় বললো, তুমি এসে গেছ—এখন ছেলে-মেয়ে দুটো বাঁচবে, আমিও বাঁচবো।

দীপ্তি রাজেনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বললো, আমি আর কোনদিন তোমাদের কষ্ট পেতে দেবো না।

সাইকেল রিক্সা শহরে এসে ঢুকেছে। সন্ধেবেলার আলো জ্বলে উঠেছে, দোকানপাটে। এই শহরের বুক দিয়েই দীপ্তি একদিন রাঁচির মানসিক হাসপাতালে গিয়েছিল, কিন্তু তখন সে কিছুই দেখেনি, এখন এই শহর সে প্রথম দেখছে। স্বামীর সঙ্গে সে একটা অচেনা শহর বেড়ালো রিক্সা চেপে। এরকম ভাবে তারা আগে কখনো বেড়াতে বেরোয়নি।

রাজেন এক জায়গায় রিক্সা থামালো। দীপ্তিকে বললো, এসো, দোকান থেকে কিছু কেনাকাটি করে নিই আগে।

দীপ্তি বললো, ছেলে-মেয়ে দুটো কোথায় বসে আছে? চলো আগে ওদের দেখে আসি।

—ওরা হোটেলে আছে, ওদের জন্য কোনো চিন্তা নেই।

—আগে ওদের দেখতে ইচ্ছে করছে।

—একটু পরেই দেখতে পাবে। তুমি দু' একটা শাড়ি-টাড়ি কিনে নাও, তোমার তো কিছু নেই?

—এই তো যে শাড়ি পরে আছি—

রাজেন হাসতে হাসতে বললো, এ শাড়ি পরে তুমি কলকাতায় যাবে নাকি? লোকে যে আমারই নিন্দে করবে।

দীপ্তি মুচকি হেসে বললো, লোকে নিন্দে করবে কেন? সবাইকে বলো, তুমি বিদেশ থেকে একটা দাসী নিয়ে এসেছো।

—না। তোমাকে আমি নতুন বউয়ের মতন সাজিয়ে নিয়ে যাবো।

—ও রকম কোরো না গো! তোমার একগাদা টাকা খরচ হবে। আমি এই বেশ আছি।

—টাকার জন্য চিন্তা কোরো না। এই ক'বছরে আমার চাকরির উন্নতি হয়েছে, কিছু টাকাও জমেছে তোমার জন্য রাঁধুনি রেখেছি বাড়িতে—তোমাকে বেশি খাটা-খাটুনি করতেও হবে না এখন।

—আমি সব করবো—রান্না, বাসন মাজা—আমার জন্য তোমাকে কিছু খরচ করতে হবে না।

—আমার যা কিছু, সবই তো তোমার।

দীপ্তির কেনাকাটার বিশেষ গরজ নেই। রাজেনই তাকে জোর করে দুটো শাড়ি, ব্লাউজ আর কিছু টুকিটাকি জিনিস কেনালো। ফিরে এসে আবার রিক্সায় বসার পর দীপ্তি বললো, আচ্ছা, দোকানের লোক-গুলো আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাচ্ছিল কেন বলো তো? আমাকে দেখে কি কিছু বোঝা যায়?

রাজেন এর উত্তর জানে না। দোকানের লোকগুলো হাঁ করে তাকাচ্ছিল ঠিকই। আরও তো কত মেয়েরা শাড়ি কিনছে—তারাও দেখছিল। কাঁকে থেকে যারা ছাড়া পায়, তাদের দেখেই কি ওরা চিনতে পারে? ধর্মস্থানে বাইরের তীর্থযাত্রীদের দেখলেই যেমন স্থানীয় লোকেরা বুঝে ফেলে। কিংবা নীল পাড় খদ্দরের শাড়ি দেখলেই চেনা যায়।

দীপ্তি নিজেই বললো, বুঝেছি। আমার চুল তো পুরুষ মানুষের মতন ছোট ছোট করে ছাঁটা, অথচ আমি রঙিন শাড়ি কিনছি—সেই-জন্য অবাক হয়েছে। আগে বোধ হয় ভেবেছিল যে আমি বিধবা। হাসপাতালে প্রত্যেক মাসে আমার চুল কেটে দিয়ে যেত জোর করে, আমার কী সুন্দর চুল ছিল।

—আবার হবে।

—ছাই হবে! বুড়ি হয়ে গেছি।

—তোমার বয়েস তিরিশও হয়নি। আমিই বুড়ো হয়ে গেছি। দেখো চুল পেকে গেছে।

—পুরুষ মানুষের চুল পাকলেও খারাপ দেখায় না। ছেলেমেয়েরা আমাকে দেখলে ভয় পাবে না তো?

—মাকে দেখে কখনো ছেলে-মেয়েরা ভয় পায়?

হোটেলের কাছে রিক্সা থেকে নেমে দীপ্তি হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

রাজেন ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দীপ্তিকে বললো, চলো!

দীপ্তি মুখ নিচু করে বললো, আমার খুব লজ্জা করছে গো!

—এ মা, লজ্জা আবার কী?

—আমি মা হয়ে ছেলেমেয়ের যত্ন করিনি—এতদিন তাদের দূরে সরিয়ে রেখেছি।

—তাতে কী হয়েছে? এখন তো ফিরে এসেছ, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

—ওরা আমাকে ভালোবাসবে তো?

—নিশ্চয়ই ভালোবাসবে। ওরা তোমার জন্য ছটফট করছে।

রাজেন দীপ্তির হাত ধরে ঢুকলো ভেতরে।

ছেলেমেয়েরা হোটেলের ঘরের জানালা দিয়ে উৎসুক হয়ে তাকিয়েছিল। দীপ্তি আর রাজেন যখন তিনতলায় ওদের ঘরে এসে ঢুকলো, তখন ওরা কিন্তু ছুটে কাছে এলো না। জানালার কাছেই দাঁড়িয়ে নোখ খুঁটতে লাগলো লজ্জা পেয়ে। এই মা ওদের অচেনা, এমন কি কল্যাণও চিনতে পারছে না।

দীপ্তি এক পা এক পা করে এগিয়ে গিয়ে ওদের দু'জনের কাঁধে হাত রাখলো। তারপর অস্ফুট গলায় বললো, কত বড় হয়ে গেছে! এরা আমার পেটের ছেলেমেয়ে? মনে হয় যেন স্বপ্ন। খুকু ছুটে চলে গেল বাবার কাছে, দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো।

রাজেন বললো, খুকু, এই তো মা এসেছে, মার কাছে যাও!

খুকু যেতে চাইছে না। কল্যাণও আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজেন বললো, খুকু, এই তো মা, এত বলছিলি মার কথা।

খুকু তবু বাবার জামা শক্ত করে ধরে আছে।

রাজেন খুকুকে টানতে টানতে নিয়ে এলো দীপ্তির কাছে। দীপ্তির চোখ দিয়ে তখন জল পড়ছে টপটপ করে। দু'হাত দিয়ে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললো হু হু করে। কল্যাণও মায়ের কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে এবং আচমকা ভাই-বোন দুজনেই কাঁদতে শুরু করেছে। এত কান্না দেখে রাজেনেরও চোখে জল এসে যায়—সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যায় চা জল খাবারের কথা বলতে।

॥ সাত ॥

খোঁচা খোঁচা চুলের জন্য দীপ্তিকে এখনো বিসদৃশ দেখায়—কিন্তু রঙিন শাড়ি প'রে সাজগোজ করার পর তার চেহারা আবার অনেকটা বদলে গেছে। রাঁচি থেকে অবিলম্বে কলকাতায় না ফিরে ওরা চার পাঁচ দিন ওখানেই থেকে গেল। হোটেলের ঘরে আরম্ভ হলো ওদের নতুন সংসার।

একদিনের মধ্যেই সব কিছু আবার স্বাভাবিক। দীপ্তি ছেলে-মেয়েকে স্নান করিয়ে দেয়, রাজেনের গেঞ্জি-ধুতি কাচে। যত বিপর্যয়কর ঘটনাই ঘটে যাক জীবনে, বেশিদিন তার দাগ থাকে না। এখন ওদের দেখে বাইরের কেউ বুঝবে না যে মাঝখানে কতগুলো বছর কী দুঃখের সঙ্গে কেটেছে। ছেলে আর মেয়ে যখন দীপ্তিকে মা বলে ডাকে, রাজেনের কান জুড়িয়ে যায়—কতদিন এই শব্দটা সে শোনেনি! সে নিজে শৈশবে মাতৃহীন, তার ছেলে-মেয়েরা মা ফিরে পাওয়ায় তার আনন্দই যেন বেশি।

হোটেলের ঘরে তো রান্নার ব্যবস্থা নেই। তাই একতলায় খাবার-ঘরে যেতে হয় দু'বেলা। অন্য অচেনা মানুষের চোখের সামনে বসতে দীপ্তি এখনও অস্বস্তি বোধ করে। খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করে, বিশেষ কিছুই খায় না নিজে।

তা ছাড়া, তার সাধ, স্বামী-পুত্র-কন্যাকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবে। হোটেলে থাকা পছন্দ হয় না তার। দু'একদিন পরেই সে বলে, চলো, কলকাতায় ফিরে চলো। এখানে থেকে শুধু শুধু টাকা নষ্ট করে কী হবে?

রাজেন বলে, কেন, এত চমৎকার জায়গা, তোমার ভালো লাগছে না? কলকাতায় সেই ঘিঞ্জির মধ্যে এক্ষুনি ফিরে গিয়ে কী হবে?

—নিজের বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও থাকতে ভালো লাগে না। কতদিন নিজের বাড়ি দেখিনি!

—আরও ক'টা দিন থাকি। কোনোদিন তোমাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাইনি। বেশ ভালো লাগছে। ছেলে-মেয়েরা আনন্দ করছে খুব।

ছেলে-মেয়েদের আনন্দের কথা ভেবেই দীপ্তি চুপ করে যায়, আর আপত্তি করে না।

সকাল-বিকেল সবাই মিলে বেড়াতে বেরোয়। কল্যাণ আর খুকু উৎসাহের সঙ্গে লাফালাফি করে। দীপ্তি সাবধানে তাদের হাত ধরে রাখে। একদিন ওরা হুড্রুতে গেল। সেই জলপ্রপাত, পাহাড় ও মস্ত বড় আকাশের কাছে অনাবিল আনন্দ। দীপ্তিরও উৎসাহের অন্ত নেই। এরকম আনন্দের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার স্বাদ সে যেন এই প্রথম পাচ্ছে। ছেলে-মেয়েদের দেখে তার এক এক সময় মনে হয়, সে নিজে তো ঐ বয়সে এরকম সুযোগ কখনো পায়নি, ওদের চোখে

দিয়েই সে যেন ফিরে পাচ্ছে তার নিজের শৈশব। এত দুঃখ-কষ্টের পর এবার এসেছে তাদের সুখের দিন। কষ্টে অর্জিত বলেই এ সুখের স্বাদ বেশি তীব্র।

রাঁচিতে কয়েকদিন থেকে যাওয়ার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল রাজেনের। দীপ্তি সম্পূর্ণ সেরে উঠলেও সাংসারিক জীবন সে কতটা মানিয়ে নিতে পারে, সেটা একটু দেখা দরকার। হঠাৎ কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেলে সে এখানকার হাসপাতালের ডাক্তারদের সাহায্য পেতে পারবে। কলকাতায় কিছু হলে তো আবার মহা বিপদ।

প্রত্যেকদিন সে হাসপাতালের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট-এর সঙ্গে একবার করে দেখা করতে যায়। দীপ্তির প্রতিটি ব্যবহার ও কথাবার্তার বিবরণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলে। সেই রকমই নির্দেশ ছিল তার ওপর।

পাঁচদিন পরে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট তাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবার আশ্বাস দিলেন। এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ওর স্বামী, আপনি বলুন, আপনার কি আর কোনো ভয় আছে?

না, রাজেনের আর কোনো রকম দ্বিধা নেই। দীপ্তিকে যেন আগের থেকেও প্রাণবন্ত ও ছেলেমানুষ মনে হয়। একটু মোটা হয়ে পড়েছে—নইলে ওকে তেইশ চব্বিশ বছরের মেয়ে হিসেবেও ভাবা যায়।

—না, স্যার, আমার আর মনেই হয় না যে ও কোনদিন পাগল হয়েছিল। আপনাদের চিকিৎসার গুণ আছে।

—আগে যে-রকম দেখেছিলেন, এখনও ঠিক সেই রকম?

—হ্যাঁ। তাই তো মনে হয়।

—কখনো এমন কি কিছু কথা বলে বা এমন কোনো ব্যবহার করে, যা বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিক মনে হতে পারে?

—সেরকম কিছু তো নেই। তবে, মাঝে মাঝে হঠাৎ ও কী রকম যেন গম্ভীর হয়ে যায়। কী যেন ভাবে।

—ও কিছু নয়। নানা রকম কথা তো ভাববেই, মাঝখানে এতগুলো বছর গেল। আমরা ওকে অনেক স্টাডি করেছি—শী ইজ পরফেক্টলি নর্মাল। হ্যাঁ, আর একটা কথা। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছে তো? সেইটাই সবচেয়ে জরুরি—

—খুব মানিয়ে নিয়েছে। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ও একেবারে আনন্দে মেতে আছে।

—বাঃ ঠিক আছে। আপনার মনে আর কোনো রকম খটকা নেই তো?

—না, স্যার।

—তা হলে এবার নিশ্চিন্ত হয়ে নিয়ে যান। শুধু একটা কথা মনে রাখবেন, আপনার স্ত্রী বড় চাপা আর অভিমানী ধরনের মেয়ে। মনে একটা আঘাত পেলেও মুখে সে কথা কখনো বলবে না। ভয়ানক ইনট্রোভার্ট। সুতরাং ওর সঙ্গে একটু সাবধানে ব্যবহার করবেন। মিষ্টি কথা বললেন, তাতেই সব ঠিক থাকবে।

কলকাতায় ফিরে এসে দীপ্তি প্রথমটায় একটু অবাক হয়েছিল। ইতিমধ্যে যে বাড়ি বদল হয়েছে সে কথা তো সে জানে না। নিজের বাড়ি বলতে সে হীরকের বাড়ির সেই একতলার ঘরখানাই জানতো। আহিরিটোলার বাড়িতে তাদের ঘর দোতলায় এবং ঘরও একখানা নয় দু'খানা।

বাড়ি বদলানোর জন্য দীপ্তি কোনো মন্তব্য করলো না, বরং তাকে একটু খুশিই মনে হলো। এ বাড়িতে জায়গা বেশি, অনেক খোলামেলা, ব্যবস্থাও বেশ ভালো, রান্নাঘরটা বড়, নিজস্ব বাথরুম। তাছাড়া, মানিকতলার বাড়িতে ফিরলে পাড়া-প্রতিবেশীরা ভিড় করে আসতো—সেখানকার সবাই দীপ্তিকে পাগলিনী হিসেবে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। এখানে কেউ কিছু জানে না, এখানেই নতুন জীবন শুরু করা সহজ।

রাজেন জিজ্ঞেস করলো, তোমার এ বাড়ি পছন্দ তো?

দীপ্তি বললো, তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, আমি সেখানেই থাকবো।

রাজেন বললো, উঁহুঃ। ওরকম ভাবে বললে তো চলবে না। তোমার সংসার, তোমার পছন্দ-অপছন্দ বড় কথা।

দীপ্তি বললো, এ তো চমৎকার বাড়ি। কত আলো হাওয়া। এত ভালো বাড়িতে থাকতে পারবো, কোনদিন কি ভেবেছি?

—আগেকার বাড়িটা অফিস থেকে বড্ড দূর হয়ে যেত তো।

—ও বাড়িতে যেতে আর আমার একটুও ইচ্ছে করে না।

যে রাঁধুনিটির ওপর এতদিন সংসারের ভার ছিল, দীপ্তি তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে লাগলো যেন সেই রাঁধুনির সংসারেই সে অতিথি হয়ে এসেছে। যে-কোনো একটা কিছু করতে গেলেই তার মতামত

নেয়। এই রমণী তার স্বামী ও পুত্র—কন্যার সেবা-যত্ন করেছে এতদিন, এইজন দীপ্তি কৃতজ্ঞ। তার সঙ্গে খুবই সম্মান করে কথা বলে।

কিন্তু রাঁধুনি গোড়া থেকেই দীপ্তিকে কিংবা দীপ্তির আকস্মিক ফিরে আসা অপছন্দ করে বসলো। মাস খানেক বাদেই বিনা কারণে চলে গেলো চাকরি ছেড়ে দিয়ে। দীপ্তি তাকে রাখার অনেক চেষ্টা করলো। বেশি মাইনের কথা তো বললেই, তা ছাড়া কাকুতি-মিনতি করে তার হাত জড়িয়ে ধরলো পর্যন্ত। তবু সে থাকতে রাজি হলো না। অবশ্য রাজেন তাতে খুশিই হলো। কিন্তু দীপ্তিকে সে আর রান্নাঘরে আটকে রাখতে চায় না, তার অবস্থাও অনেকটাও ভালো হয়েছে, আর একজন বুড়ো ঠাকুর নিযুক্ত হয়ে গেল।

দীপ্তি এখন মন দিয়ে ঘর-সংসার করে, ছেলে-মেয়েকে নিজেই স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসে, নিয়ে আসে, সন্ধেবেলা ওদের পড়াতে বসে। তিনতলার কয়েকটি ছেলে-মেয়ে ওদের বন্ধু, দীপ্তি তাদেরও বলে বই নিয়ে আসতে, একটা পাঠশালা বসে যায়।

আর পাঁচটা গৃহস্থবাড়ির বউয়ের সঙ্গে তার আর কোনো তফাত নেই এখন। বরং সে অনেকের চেয়ে বেশি কাজের, সংসারের খুঁটি-নাটি কাজ সেরেও সে ছেলেমেয়েদের বেশ সামলাতে পারে, তাদের লেখাপড়ার যত্ন নেয়, কোনো ব্যাপারেই তার ক্লান্তি নেই। সে কখনো রাগ করে না, ঝগড়া করে না, বাড়ির অন্য কেউ তার গলার আওয়াজই শুনতে পায় না প্রায়। আস্তে আস্তে তার সুনাম ছড়ায় প্রতিবেশীদের মধ্যে।

দীপ্তি এখন একা একা রাস্তাঘাটে বেরোয়। দরকার হলে বাজার করে আনে। কোনো কোনো দিন দুপুরের শো-তে লেডিজ সিটে সিনেমা দেখে। ছেলে-মেয়েকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যায়। আস্তে আস্তে তার শরীরের অতিরিক্ত মেদ ঝরে যাচ্ছে, চুলও বড় হচ্ছে, ফিরে আসছে তার আগের চেহারা। সে এখন শান্ত গম্ভীর হয়ে গেলেও তার মুখ চোখে এখনো একটা ছেলেমানুষি ভাব রয়ে গেছে। সে খুব রূপসী নয়, তবু রাস্তার আর পাঁচটা মেয়ের মধ্যেও তার মুখের দিকে অন্যেরা তাকিয়ে দেখে। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যখন বেরোয়, তখন মনে হয় না সে ওদের মা, অনেকেই তাকে দিদি বলে ভুল করে।

দীপ্তির চরিত্রে পরিবর্তনের মধ্যে শুধু এই যে, সে বাড়িতে ছেলে, মেয়ে কিংবা স্বামীর সঙ্গে খুবই স্বাভাবিক, সংসারের কাজও নিখুঁত,

কিন্তু বাইরের কারোর সঙ্গে একদম মিশতে চায় না। এক সময় বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে তার খুব আগ্রহ ছিল, এখন যেন সে সব মিটে গেছে। এখন সে শুধু তার সংসারের বৃত্তটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট। খুকুর স্কুলে অনেক অনেক মেয়ের মা আসে, নিজেদের মধ্যে গল্প করে, পরস্পরের বাড়ি যায়, কিন্তু দীপ্তির সঙ্গে তাদের ভাব হয়নি। দীপ্তি এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। অন্যেরা তাকে মনে করে অহঙ্কারী।

একদিন রাজেনের অফিসের তিনজন বন্ধু এলো বেড়াতে। দীপ্তি তাদের জন্য খাবার দাবার বানিয়ে, বার বার চা পাঠিয়ে অনেক যত্ন করলো কিন্তু তাদের সামনে একবারও গেল না। রাজেন এসে অনেক পিড়াপিড়ি করলো, তবু দীপ্তি কিছুতেই রাজি নয়। তার লজ্জা করে। আর একটা ছুটির দিনে রাজেনের আর এক বন্ধু তার স্ত্রী-বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে হাজির। মানুষ তো মানুষের বাড়িতে এরকম বেড়াতে আসেই। তবু দীপ্তি যেন একেবারে জলে পড়লো। এইসব অচেনা মানুষের সঙ্গে কী ভাবে কথা বলতে হয়, তাও যেন সে জানে না। কোনোরকমে দু'চারটে কথা ব'লে সে প্রায় সারাদিনটাই কাটিয়ে দিলো রান্নাঘরে।

রাজেনের বন্ধুর স্ত্রী রান্নাঘরেই এলো দীপ্তির সঙ্গে ভাব জমাতে। হেসে হসে বললো, আমরা খবর না দিয়ে হঠাৎ এসে পড়ে তোমাদের ভাই খুব বিরক্ত করলুম, তাই না?

দীপ্তির এইটুকু বোধ আছে যে, সাধারণ সৌজন্যের সীমা কতখানি। সে যদি ওদের সঙ্গে না মেশে কিংবা গম্ভীর হয়ে থাকে, তাহলে সেটা মনে হবে অভদ্রতা। ওরা ক্ষুণ্ণ হবে, বাড়ি থেকে বেরিয়েই রাজেনের নিন্দে করবে।

দীপ্তি তাই মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো, না, দিদি। বিরক্ত হবো কেন! এ কী বলছেন! একা একা থাকি, কথা বলার একটাও লোক পাই না, আপনারা যদি মাঝে মাঝে আসেন—

সবটাই অভিনয়। দীপ্তি লোকজনের সঙ্গ সত্যিই পছন্দ করে না।

একদিন রাজেন বললো, তুমি যে ফিরে এসেছো, এখবরটা হীরক-বাবুকে এখনো দেওয়াই হয়নি। উনি এখন মস্তবড় লোক, সব সময় ব্যস্ত।

দীপ্তি বিস্মিতভাবে বললো, হীরক? যেন এ নামটাই সে

আগে কখনো শোনেনি। শূন্য চোখে চেয়ে রইলো রাজেনের দিকে।

রাজেন বললো, হীরকবাবুকে তোমার মনে নেই? আমাদের কত উপকার করেছেন। বলতে গেলে হীরকবাবুর জন্যেই তো বেঁচেবর্তে আছি। যে-বাজারে উনি আমাকে চাকরি জোগাড় করে দিয়েছেন, সেই বাজারে কত লোক আত্মহত্যা করে মরেছে। আর ফ্যালনা চাকরিও নয়। মনে নেই হীরকবাবুকে?

দীপ্তি অস্ফুট গলায় বললো, মনে আছে। ও বাড়ির বাড়িওয়ালা।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। শুধু বাড়িওয়ালা বললে ছোট করা হয়। প্রায় এক বছর ভাড়া বাকি পড়েছিল, কথাটি বলেননি পর্যন্ত। ক'জন মানুষ এরকম মানুষের জন্যে করে? উনি করপোরেশনের কাউন-সিলার হয়েছেন। এখনও কাউনসিলার আছেন কিনা জানি না, আগের-বার জিতেছিলেন জানি। দেখো, উনি একদিন ঠিক মিনিস্টার হবেন।

দীপ্তি বললো, আমি ফিরে এসেছি কিনা, সে খবর ওঁকে জানাবার কী দরকার! ও কি আর এসব খবর রাখার সময় আছে?

—উনি খুব ব্যস্ত হলেও সাধারণ মানুষের কথা খুব ভাবেন। আমি তো যে কবার দেখা করতে গেছি, কোনোদিন ফিরিয়ে দেননি।

—তুমি এখনো ওঁর কাছে যাও কেন?

—এমনিই। কৃতজ্ঞতা বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। আচ্ছা হীরকবাবুকে একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়ালে কেমন হয়? আমাদের দিক থেকে একটা কিছু করা উচিত।

—এ বাড়িতে খাওয়াবে?

—হ্যাঁ। আসবেন কিনা জানি না। বড় বড় লোক—ওঁদের কত কাজ। তবু বলে দেখা উচিত অন্তত আমাদের।

দীপ্তি একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো, এখন থাক বরং আর কিছুদিন যাক্।

—কেন, এ মাসেই তো এরিয়ারের টাকা আছে হাতে, এখনই ভালো হবে। সামনের সপ্তাহেই একদিন বলে দিই? ধরো, শনিবার?

—আরও কিছুদিন পরে বলো। এখনও সংসারটা গুছিয়ে উঠতে পারিনি ভালো করে।

—উনি তখন ভাববেন, তুমি ফিরে এলে অথচ আমি কিছু খবরই দিলাম না।

—উনি কিচ্ছু ভাববেন না।

রাজেন একদিন অফিস থেকে এসে দেখলো, দীপ্তি শোবার ঘরের এক কোণে খানিকটা পুজোর জায়গা করেছে। একটি শ্রীকৃষ্ণের ফ্রেমে-বাঁধানো ছবি, পিতলের লক্ষ্মী-নারায়ণ, মাটির লক্ষ্মী, একটা কাঁসার ঘট পর্যন্ত।

রাজেন হেসে জিজ্ঞেস করলো, হঠাৎ তোমার ধর্মে মতি হলো নাকি?

দীপ্তি লাজুকভাবে বললো, এখন থেকে প্রত্যেক বেস্পতিবার লক্ষ্মী-পুজো করবো।

—আর যে সব ঠাকুর দেবতা এনেছো তাদের মন খারাপ হবে না?

—সময় পেলেই পুজোর জায়গায় বসবো, এখন থেকে আমার তো অনেক সময়। ভালো দেখে একটা শিবঠাকুরের ছবি কিনে দেবে?

রাজেনও সাধারণ ধর্মভীরু মানুষ, দীপ্তির তুলনায় তার বয়েস এখন অনেক বেশি বলেই ধর্ম সম্পর্কে সে আরও নরম। বাড়িতে একটু আধটু পুজো-আর্চা হলে তার খুশি হবারই কথা। হাসিমুখে বললো, আচ্ছা কিনে এনে দেবো।

দীপ্তি খুব নিবিষ্টভাবে ঠাকুরের ছবিগুলোর সামনে মাটিতে আল্পনা দিচ্ছে দেখে রাজেন বললো, আগে তো কখনো তোমাকে দেখিনি পুজো-টুজো করতে। আল্পনা দিতে শিখলে কোথা থেকে?

দীপ্তি বললো, এ আবার শিখতে লাগে নাকি? সব মেয়েরাই পারে।

—তোমাদের বাড়িতে কি পুজো-আর্চার রেওয়াজ ছিল?

—না।

—যাই বলো, ঠাকুর দেবতার ছবি না থাকলে সংসার যেন ঠিক মানায় না। ছেলেমেয়েদের বলে দিও, যখন তখন যেন ছুঁয়ে না দেয়।

দীপ্তি জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, আমি দীক্ষা নিতে পারি না?

—দীক্ষা নেবে? কেন?

—অনেকে তো কোনো গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নেয়।

—এত কম বয়েসে নয়। আরও কিছুদিন যাক। ওসব নিয়ে তো ছেলেখেলা করা যায় না।

সন্ধেবেলা স্নান করে গলায় কাপড় জড়িয়ে দীপ্তি পুজো করতে

বসে। দেখে রাজেনের খুব ভালো লাগে। কল্যাণ আর খুকুও মায়ের পাশে গিয়ে বসেছে, সুর করে লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়ছে দীপ্তি। পড়া শেষ হলে সবাই মিলে মাটিতে গড় হয়ে প্রণাম করলো। বাতাসা ও টুকরো টুকরো সন্দেশের প্রসাদ পেল সকলে। রাজেন ভাবলো ঠাকুরের কৃপাতেই তার সংসারটা সামলে গেছে।

পুজো করা ছাড়াও যখন তখন দীপ্তিকে দেখা যায় ঠাকুরের ছবির সামনে বসে থাকতে। সংসারের কাজে একটু ফুরসত পেলেই সে এখানে এসে বসে। অস্ফুটভাবে কী যেন প্রার্থনা জানায়।

রাজেন এ-সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করে না কিংবা প্রশ্ন করে না। ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে যদি শুচিবাই এসে যায়, সেটাই ভয়ের কথা। দীপ্তির সে সব কিছু নেই। পুজো আর্চার ব্যাপার নিয়েও সে বাড়াবাড়ি করে না। ঠাকুরের সামনে চোখ বুজে চুপ করে বসে থাকাটাই যেন তার কাছে প্রধান ব্যাপার।

ইদানীং রাজেন অম্বলের অসুখে ভুগছে। রাত্রিবেলা তার বুক-ব্যথা করে। দীপ্তি উঠে বসে তার বুকে হাত বুলিয়ে দেয়। রাজেন বলে, না, না, তুমি ঘুমোও। আমার এমনি সেরে যাবে। দীপ্তি তবু সে কথা শোনে না। মশারি থেকে বেরিয়ে রাজেনের জন্য ওষুধ নিয়ে আসে, ওষুধ খাওয়াবার পরও বসে বসে হাত বুলোতে থাকে তার বুকে। বুকের ওপরে হাত বুলোলেও যে অম্বলের ব্যথা কমে না, একথা দীপ্তিকে বোঝানো যায় না। স্বামীর সেবার কোন ত্রুটি রাখতে চায় না সে।

রাজেন কখনো আদর করার জন্য দীপ্তিকে জড়িয়ে ধরলে দীপ্তি যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে যায়। সে আড়ষ্টতা এমনই সূক্ষ্ম যে রাজেনের বোঝার কথা নয়। রাজেনের কোন কিছুতেই সে বাধা দেয় না। সবটুকুই যেন রাজেনের সেবা। তার নিজস্ব সাধ-আহ্লাদ বলে এখন আর কিছু নেই, নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছে রাজেনের জন্য। রাজেনের সামান্য শরীর খারাপ হলেই সে তাই বড়ো ব্যাকুল হয়ে পড়ে।

রাজেন দীপ্তির এই রকম নীরব যত্নে অভিভূত হয়ে পড়ে। স্ত্রীকে ভালোবাসার বদলে ভক্তি করতে ইচ্ছা হয় এখন। দীপ্তির হাত জড়িয়ে ধরে বলে, লক্ষ্মীটি, এবার শুয়ে পড়ো। নইলে তোমার শরীর খারাপ হবে।

একথা শুনে দীপ্তি হাসে। একবার সে পাগল হয়েছিল, এ ছাড়া আর কখনো ছোটখাটো অসুখে ভুগে সে স্বামীর জীবনে বিড়ম্বনা আনেনি। কখনো তার জ্বরও হয় না। রাজেন ঘুমিয়ে পড়ার পরও অনেকক্ষণ সে জেগে থাকে। ঘর-ভর্তি অন্ধকার, বাইরে ঘুমন্ত নগরী, দীপ্তি নিজের জীবনের কথা ভাবে।

খুকু ঘুমের মধ্যে কেঁদে উঠলো। ভয় পেয়েছে। ছেলের এখন আলাদা বিছানা হয়েছে, কিন্তু মেয়ে এই খাটেই শোয়। প্রত্যেকদিন সে রাজেনের মুখে গল্প না শুনে কিছুতেই ঘুমোবে না। দীপ্তি খুকুকে চাপড়ে দিল। এই মেয়েকে সে একদিন রাস্তায় ফেলে দিতে গিয়েছিল, ভাবলেও এখন তার বুক টনটন করে। একটা রক্তমাংসের জীবন, কত প্রাণ-উচ্ছলতা—এ নেই, এ কি কল্পনা করা যায়? অল্প অল্প অন্ধকারেও দীপ্তি মেয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। মায়াময় একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুক থেকে, আর কেউ না বুঝুক হীরকের সঙ্গে যে এর মুখের অদ্ভুত মিল, সেটা দীপ্তির চোখ এড়ায় না।

দীপ্তি তার ঘুমন্ত মেয়ের মুখ নানা পাশ থেকে দেখে। সব দিক থেকেই হীরকের মুখের আদল আছে। কিন্তু হীরক কে? হীরক বলে কি কারুকে চিনতো কখনো সে? সবই যেন ধোঁয়া ধোঁয়া, স্বপ্নের মত। এখন হীরকের কোনো অস্তিত্বই নেই দীপ্তির জীবনে। তবু দীপ্তির ঘুম আসে না।

দীপ্তিদের পাশের ফ্ল্যাটেই একজোড়া স্বামী-স্ত্রী ও একটি ছোট বাচ্চা থাকে। দীপ্তি ওদের সঙ্গে কখনো ভাব জমাবার চেষ্টা করেনি, কিন্তু বউটি প্রায়ই আসে এ ঘরে। বউটির নাম অর্চনা, তেমন লেখা-পড়া শেখেনি, পরচর্চা করতে খুব ভালোবাসে, স্বাস্থ্য ভালো না, বয়সে দীপ্তিরই সমান হবে, কিন্তু শরীরটা একেবারে শুকিয়ে গেছে।

অর্চনার স্বামীর নাম প্রণবেশ, ফুড কর্পোরেশনে চাকরি করে, মানুষটি শৌখিন ধরনের, ভালো ভালো পোশাক ছাড়া পরে না, এক একদিন সন্ধেবেলা সে নিজের ঘরে বসে গান জুড়ে দেয়, গলার আওয়াজ খুব বেসুরো নয়। মাঝে মাঝে সে খুব বেশি রাত করে বাড়ি ফেরে। ওদের ছেলেটির বয়েস বছর তিনেক, অত্যন্ত দুরন্ত।

অর্চনা যখন-তখনই দীপ্তিদের ফ্ল্যাটে আসে। ফ্ল্যাটের আলাদা দরজা নেই, একটাই টানা বারান্দা, সুতরাং কোনোই অসুবিধে নেই। আলাদা

অর্চনা এ বাড়ির সব ফ্ল্যাটেই ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। দীপ্তি যে কোথাও যায় না, এটা বুঝেও সে দীপ্তির কাছে আসে। অন্যদের ঘরের খবর নিয়ে অবান্তর আলোচনা করে। এই ভাবেই ওর সময় কাটে।

অর্চনার আর একটা স্বভাব আছে, জিনিসপত্র চাওয়া। কখনো একটু চিনি, কখনো দুটো পেঁয়াজ বা কাঁচালঙ্কা। মাঝে মাঝে দুধও। দীপ্তি এইসব সামান্য জিনিস ফেরত পাবার প্রত্যাশা করে না, কিন্তু অর্চনা ফেরত দেবার কোনো চেষ্টাও করে না দেখে তার একটু অবাক লাগে। অর্চনাদের সংসার তাদের থেকেও সচ্ছল হবার কথা, কেননা প্রণবেশ রাজেনের থেকে ভালো চাকরি করে, এ কথা রাজেনই বলেছে।

ইদানীং অর্চনা দীপ্তির কাছে টাকা চাইতেও শুরু করেছে। মাঝে মাঝেই দু' পাঁচ টাকা নেয়, আর ফেরত দেয় না। প্রত্যেকবারই এমনভাবে এসে হন্তদন্ত হয়ে চায়, যেন এক্ষুনি টাকাটা না পেলে একটা কিছু বিপদ হয়ে যাবে। দীপ্তি না দিয়ে পারে না। মুখ ফুটে এ সম্পর্কে অর্চনাকে কিছু বলাও খুব শক্ত তার পক্ষে। টাকার কথা মনে করিয়ে দিলে অর্চনা নিশ্চয়ই অপমান বোধ করবে, মানুষকে অপমান করতে পারবে না দীপ্তি।

মুস্কিল হচ্ছে এই যে, দীপ্তির হাতে সব সময় টাকাও থাকে না। মূল সংসার-খরচের টাকা থাকে রাজেনের কাছে। দীপ্তি ইচ্ছে করেই নিজের কাছে রাখেনি, দরকার মতন রাজেনের কাছ থেকে চেয়ে নেয়। অর্চনাকে দিতে গিয়ে তার হাত খরচের টান পড়তে লাগলো। মাঝে মাঝে সে দু' একটা সিনেমা দেখতো—তাও বন্ধ হয়ে গেল, ছেলেমেয়ে-দের জন্য টুকিটাকি কিছু ইচ্ছে মতন কিনে দিতে পারে না।

দীপ্তি আগে ভেবেছিল এক একজন মানুষের থাকে ধার চাওয়া স্বভাব, অভাবের জন্য নয়, অর্চনার ব্যাপারটাও তাই। কিন্তু আস্তে আস্তে তার অন্যরকম মনে হয়। প্রণবেশ প্রায় দিনই আজকাল দুপুরের দিকে বাড়িতে থাকে, সন্ধের দিকে বেরিয়ে অনেক রাত করে ফেরে। দীপ্তি কিছু জিজ্ঞেস করেনি, কিন্তু অর্চনাই গায়ে পড়ে শুনিয়ে দিয়েছে যে ছুটি জমে পচে যাচ্ছিল বলে প্রণবেশ একটানা দু' মাস ছুটি নিয়েছে।

একদিন দীপ্তি খুকুকে স্কুল থেকে নিয়ে ফিরছে, সিঁড়িতে প্রণবেশের মুখোমুখি পড়ে গেল। দীপ্তি কোনোদিন তার সঙ্গে কথা বলেনি, তবু প্রণবেশ দাঁড়িয়ে পড়লো। বললো, কী বৌদি, কোথায় গিয়েছিলেন?

আপনাকে দেখতেই পাওয়া যায় না। খুকুমণি, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? বাঃ, কী সুন্দর চুল তোমার!

তারপরই প্রণবেশ কোলে তুলে নিল খুকুকে। কিন্তু খুকু আর এখন তেমন ছোটটি নেই যে কোলে চড়া পছন্দ করবে। সে নেমে আসার জন্য ছটফট করতে লাগলো। প্রণবেশ তাকে আদর করে বললো, চলো, আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে? তোমাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

খুকু যেতে চায় না। দীপ্তি স্মিতমুখে চুপ করে আছে। প্রণবেশ খুকুর সঙ্গে কথা বললেও তাকিয়ে রইলো দীপ্তির দিকে।

মিনিট দু' এক কথা বলে প্রণবেশ নেমে গেল। দীপ্তি একটার বেশি দুটো কথা বলেনি। একবার মাত্র সে প্রণবেশের মুখের দিকে তাকিয়েছে। তাকিয়েই চমকে উঠলো। মুখে কী রকম একটা তেলতেলে ভাব, ঠোঁটের হাসিটা জোর করে টেনে আনা। অবান্তর কথা বলে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা। এই মুখ দীপ্তির চেনা। এক সময় রাজেনের মুখের চেহারাও ছিল এই রকম। এত শৌখিন মানুষ প্রণবেশ, আজ তার জামা ময়লা।

পাগল হবার আগের সব কথা পুরোপুরি মনে নেই দীপ্তির। আস্তে আস্তে মনে পড়ে। প্রণবেশকে দেখে মনে পড়ে গেল সেইসব দিন-গুলোর কথা, যখন রাজেন বেকার হয়ে বসেছিল। সেই সব দুঃখের দিন। প্রণবেশেরও কি এখন সেই অবস্থা!

এই প্রথম দীপ্তি একটু কৌতূহলী হয়ে উঠলো প্রণবেশ সম্পর্কে। যাওয়া-আসার পথে প্রণবেশকে দেখলে সে ভালো করে তার মুখটা পরীক্ষা করে। সেই তেলতেলে ভাবটা প্রতিদিনই বাড়ছে। মানুষ যখন মনে মনে নিচু হয়ে থাকে কোনো কারণে, তখনই মুখে এই ছাপটা পড়ে। প্রণবেশ যদিও লঘু হাস্য-পরিহাসের চেষ্টা করে, রাত্তিরে তার ঘর থেকে গানও শোনা যায়, তবু তার মখে রাজেনের সেই বেকার অবস্থার মুখের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় দীপ্তি। তার কেমন যেন মায়া হয়।

এর পর অর্চনা তার কাছ থেকে এক কাপ চিনি চাইতে এলে দীপ্তি তাকে প্রায় এক সের চিনি দেয়। অর্চনা বলে, না, না, দীপ্তিদি, এতখানি দরকার নেই, তবু দীপ্তি প্রায় জোর করেই বাটিটা তুলে দেয় তার হাতে।

দু'তিনদিন বাদেই রাজেন রাত্তিরবেলা বললো, প্রণবেশবাবু তো

আমাকে বিপদে ফেলে দিলেন। বুঝলে দীপ্তি, উনি আমার কাছে আড়াই শো টাকা ধার চেয়েছেন!

দীপ্তি কোনো কথা বললো না, রাজেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

রাজেন আবার বললো, বলছেন তো সামনের সপ্তাহেই ফেরত দেবেন, কিন্তু আমি জানি, সে সব বাজে কথা। যতদূর শুনেছি, ওঁকে অফিস থেকে সাসপেণ্ড করেছে, ঘুস-টুসের ব্যাপারে ধরা পড়েছে বোধহয়। তা হলে চাকরি ফিরে পাবে কিনা সন্দেহ। বুঝতে পারছি ভদ্রলোক বিপদে পড়েছেন—দু'দশ টাকা দেওয়া যায়, কিন্তু আড়াই শো টাকা কি কেউ গচ্চা দিতে পারে! আমারও ছেলে-মেয়ে আছে। কী করা যায় বলো তো?

সত্যি ওঁর চাকরি গেছে?

—হুঁ। তাতে আর এখন কোনো সন্দেহ নেই! আমার কাছে এসে অবশ্য খুব চাল মারছিল।

—কিন্তু চাকরি গেলে তো ওদের খুব বিপদ! অর্চনা কী করবে এখন?

রাজেন গুম হয়ে গিয়ে বললো, চাকরি গেলে তো বিপদ বটেই। নিজের দোষেই তো হারিয়েছে। এখন আমাদের কাছে যদি রোজ রোজ ধার চায়!

দীপ্তি বললো, ভদ্রলোকের জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারো না?

—চাকরি দেবার কি আমার কোনো হাত আছে? তাও চেষ্টা চরিত্র করতে পারি, কিন্তু এদিকে যে বাবুর তেজ আছে! কিছুতেই স্বীকার করবে না, যে চাকরির বিপদ। বারবার বললো, ছুটি নিয়েছি। কিন্তু আমি ঠিক জানি—। তা ছাড়া বদনাম নিয়ে যদি চাকরি যায়, তা হলে কি আর চাকরি পাবে কোথাও?

—তাহলে ওদের কী হবে?

—প্রাইভেট ফার্ম-টার্মে যদি পায়। কিংবা ছোটোখাটো ব্যবসা করতে পারে। ঐটুকু একটা ছেলে আছে।

কিছুক্ষণ কথা বলে রাজেন ঘুমিয়ে পড়লো। দীপ্তির খুব মায়া হলো অর্চনার জন্য। ওর যে কী রকম অসহায় অবস্থা, সে কথা দীপ্তি

জানে। তাদেরও তো সে সময় এই রকম অবস্থাই ছিল—স্বামী, স্ত্রী আর একটি ছেলে। কিন্তু এখন অর্চনাদের কে সাহায্য করবে? এখানে তো হীরকের মত বাড়িওয়ালা নেই। এ বাড়িতে কোনো বাড়িওয়ালা নেই—বাড়িওয়ালার লোক এসে প্রতি মাসে ভাড়া আদায় করে নিয়ে যায়। রাজেন কি বিপদত্রাতার ভূমিকা নিতে পারবে? রাজেনের চরিত্রের কোনো দোষ কেউ দিতে পারবে না কখনো, তার রাজেনের ক্ষমতা কতটুকু। তবে প্রণবেশ চাকরি হারাচ্ছে তার নিজের দোষে। চাকরি গিয়েছিল অফিস উঠে যাবার কারণে। শুধু, অসুস্থ রাজেনের ঘরে যখন চিকিৎসার কিংবা পথ্যের জন্য একটাও পয়সা ছিল না, তখন দীপ্তিকে হীরকের কাছে পাঠিয়েছিল টাকা চেয়ে আনবার জন্য।

ভাবতে ভাবতে দীপ্তির শরীর শিউরে উঠলো। তার স্বামী তখন অসুস্থ হয়ে একতলার ঘরে শুয়ে কাতরাচ্ছিল, আর সে তিনতলায় হীরকের সঙ্গে—। মানুষ এরকমও হয়? হীরক তাদের জীবনের একমাত্র শত্রু।

কয়েক দিনের মধ্যেই বোঝা গেল প্রণবেশদের অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে পড়েছে। এতদিন প্রণবেশ আর অর্চনার সংসারটাকে বেশ সুখের সংসারই মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন নানারকম উড়ো কথা কানে ভেসে আসে।

রাজেনই প্রত্যেকদিন এক একটা নতুন খবর আনে। ঘুস নেওয়ার অভ্যেস থাকলেও প্রণবেশের রেস খেলার নেশা ছিল, তাই টাকা পয়সা জমাতে পারেনি। ঘুস নেওয়ার জন্যই রেস খেলতো, না রেস খেলার জন্যই ঘুস নিত—তা অবশ্য জানা যায় না। এখন ঘুস নেওয়া বন্ধ হলেও তার রেস খেলার নেশা ঘোচেনি, এ উপায়ে সে এখনও নিজের ভাগ্য ফেরাবার স্বপ্ন দেখছে।

পাড়ার সকলের কাছেই প্রণবেশের ধার, আস্তে আস্তে তা জানাজানি হয়ে যাচ্ছে। ওদের ঘরে আগে অনেক সৌখিন জিনিস-পত্র ছিল, সেগুলো উধাও হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। সেগুলো বিক্রি করে প্রণবেশ খাবার-দাবার কেনে না, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় রেস খেলতে।

এরকম ভাবে আর বেশিদিন চলবে না। শিগগিরই এমন অবস্থা আসবে, যেদিন—। দীপ্তির মনে পড়ে সেই দিনটা, যেদিন রাজেন বিছানায় শুয়ে অসুখে কাতরাচ্ছে, ঘরে একটাও পয়সা নেই, ছেলেটার

খাবার পর্যন্ত নেই, সেদিন হীরকের কাছে যাবার বদলে দীপ্তির কি উচিত ছিল বিনা চিকিৎসায় স্বামীকে মেরে ফেলা, ছেলেকে নিয়ে তাদের অনশনের পরীক্ষা দেওয়া?

না, দীপ্তি একথা আর ভাবতে চায় না। তবু কেন মনে পড়ে! এ চিন্তাটা মাথা থেকে তাড়াতেই হবে! এ কথাটাও তো ঠিক, হীরকের কাছে শুধু চাইলে, সে বোধ হয় দিত, অন্য কোনো ভাবে জোর করতো না। দীপ্তি কেন দুর্বল হয়েছিল? এ চিন্তার হাত থেকে কি নিষ্কৃতি নেই?

দীপ্তি এখন অর্চনাকে নানাভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করে। ওর ছেলেটিকে প্রায় সময়েই নিজের ঘরে ডেকে আনে। নিজের ছেলেমেয়ের খাবার ওকেও ভাগ করে দেয়। কোনো কোনো দিন অর্চনাকেও সে তার সঙ্গে খেতে বলে। এই উপকারের কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য অর্চনা এত বেশি প্রশংসা করে দীপ্তির যে, সেটাও এক অস্বস্তিকর ব্যাপার। সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির অন্যদের নিন্দে। অন্যরাও যে খারাপ আছে এই কথা বলে অর্চনা খুব আনন্দ পায়।

কিন্তু বিপদ বাধালো প্রণবেশ। দুপুরবেলা পুরুষ মানুষরা সবাই বেরিয়ে যায়, একমাত্র প্রণবেশই বাড়িতে থাকে। আত্ম-গোপন করে না থেকে সে মাঝে মাঝেই এ ঘরে ও ঘরে হানা দিতে লাগলো। ইদানীং তার হাস্য-পরিহাসের প্রবণতাও বেড়ে গেছে। কারুর সঙ্গে দেখা হলেই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে, মুখে হাসি-খুশি ভাব দেখিয়ে বোঝাতে চায় যে, সে খুব ভালো আছে।

পাঁচ সংসারের ভাড়াবাড়িতে দুপুরবেলা পুরুষ মানুষেরা প্রায় কেউই থাকে না। দুপুরটা মেয়েদের বিশ্রম্ভালাপের সময়। প্রণবেশেরও একটু যেন মেয়েলি স্বভাব আছে, নিজের ঘরে না থেকে সে এ ঘরে ও ঘরে গল্প করতে আসে।

বউদি ঘুমোচ্ছেন নাকি? এই বলে দুপুরবেলা সে দীপ্তির ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। দীপ্তি দুপুরে ঘুমোয় না, শুয়ে বই পড়ছিল। উঠে বসলো ধড়মড় করে। দরজা বন্ধ, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে প্রণবেশ। দীপ্তির মুখে বিরক্তির রেখা ফুটলো। এসব সে পছন্দ করে না। একবার সে ভাবলো সাড়া-শব্দ করবে না, দরজাও খুলবে না।

প্রণবেশ আর একবার ডাকলো, দরজায় শব্দ করলো। তখন দীপ্তির মনে হলো, যদি ওদের খুব কিছু বিপদ হয়ে থাকে ?

এ বাড়িতে আরও অনেক ভাড়াটে আছে। কিন্তু দোতলাতে অর্চনা আর দীপ্তিদের ফ্ল্যাট পাশাপাশি বলেই যাতায়াত বেশি। দুপুরবেলা রাজেন বাড়িতে থাকবে না জেনেও প্রণবেশের এই ডাকাডাকির কোনো মানে হয় না। কোনো দরকার থাকলে অর্চনাকে পাঠালেই পারতো।

প্রথম দিন থেকেই প্রণবেশকে পছন্দ করতে পারেনি দীপ্তি। ওর তাকাবার ভঙ্গিটা ভালো নয়। মেয়েরা এই তাকাবার ভঙ্গি দেখেই পুরুষদের চিনে নেয়। প্রণবেশ যখন বেশি বেশি আন্তরিকতা দেখিয়ে দীপ্তির সঙ্গে গল্প করতে আসে, তখন দীপ্তি আড়ষ্ট বোধ করে। অথচ রাজেন যখন বাড়িতে থাকে তখন প্রণবেশ পারতপক্ষে এদিকে আসে না। ধার নিয়েছে বলেই হয়তো।

বেশবাস বিন্যস্ত করে দরজা খুললো দীপ্তি। একটা পাজামা পরে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রণবেশ। হাতে এক প্যাকেট তাস। খালি গায়ে মেয়েদের সামনে আসতে তার কোনো দ্বিধা নেই। শারীরিক বিচারে প্রণবেশকে সুপুরুষই বলা যায়, এবং তা নিয়ে বেশ গর্ব আছে তার।

—আপনাকে বিরক্ত করলাম নাকি ? ঘুমোচ্ছিলেন ?

—না।

আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়, আপনি দুপুরে ঘুমোন না! বই পড়ছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—আপনি বুঝি বই পড়তে খুব ভালোবাসেন ?

—কী দরকার বলুন তো ?

—আমাদের ঘরে একটু আসবেন ? অর্চনার জ্বর হয়েছে।

সকালবেলাতেও দেখা হয়েছে অর্চনার সঙ্গে। সুতরাং তার জ্বর হয়ে থাকলেও এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয় নিশ্চয়ই। দুপুরবেলা ডেকে শোনাবার মতন কিছু নয়।

প্রণবেশও বললো, জ্বর বেশি নয় অবশ্য। তবে ওর যা স্বাস্থ্য, একটুকুতেই কাত হয়ে পড়ে। একবার আসুন না আমাদের ঘরে।

এ কথায় না বলা যায় না। ছেলেটা ইস্কুলে, খুকু ঘুমোচ্ছে। দরজাটা ভেজিয়ে দীপ্তি এলো প্রণবেশের ঘরে।

অর্চনা একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, সত্যি বেশ জ্বর এসেছে তার। ছলছলে চোখ দেখে মনে হয় আরও জ্বর বাড়বে। ছেলেটা ঘরের মেঝেতে খেলা করছে, সর্বাঙ্গে ধুলো, খালি গা। কয়েকটা চায়ের কাপ, এঁটো প্লেট রাখা রয়েছে টেবিলের ওপর। ঘরটা বেশ নোংরা। অর্চনা দীপ্তিকে দেখে ফ্যাকাশেভাবে একটু হাসলো, তারপর শীতে কাঁপতে লাগলো।

দীপ্তি প্রণবেশকে জিজ্ঞেস করলো, ডাক্তার দেখিয়েছেন?

প্রণবেশ উদাসীনভাবে বললো, এমনি সাধারণ জ্বর। দেখি যদি কালকেও জ্বর না ছাড়ে—

প্রণবেশ কোনোই গুরুত্ব দিলো না। তা হলে দীপ্তিকে ডেকে আনার মানে কী? এরকম আগোছালো নোংরা ঘর দেখতে তার একটুও ভালো লাগে না। প্রণবেশ নিজেও তো একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখতে পারতো। দীপ্তি এগিয়ে এসে জিনিসপত্তরগুলো একটু গুছিয়ে দিল। এঁটো কাপ ডিসগুলো সরিয়ে রাখলো রান্নাঘরে।

প্রণবেশ একবার বলেছিল, আহা, আপনি আবার এসব করছেন কেন? দীপ্তি সে-কথার উত্তর দেয়নি, প্রণবেশও আর কিছু বলেনি। প্রণবেশ একদৃষ্টিতে দেখতে লাগলো দীপ্তির কাজ করা—আর ফরফর করতে লাগলো হাতের তাসগুলো।

অর্চনা চোখ বুজে আছে। দীপ্তি তার কপালে রাখলো ঠাণ্ডা হাত। বললো, কত জ্বর দেখেছো?

ক্লিষ্টভাবে অর্চনা বললো, দেখেছিলাম একটু আগে। একশো দুই।

—আরও বেড়েছে মনে হচ্ছে।

—এমনি ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে, বিশেষ কিছু না।

—তুমি খেয়েছো কিছু?

—কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। গায়ে, হাত-পায়ে বড্ড ব্যথা। ছেলেটাকে নিয়েই হয়েছে মুস্কিল। ওকে যে কে দেখে—

প্রণবেশ সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। বললো, অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই বৌদি, বসুন না। তাস খেলবেন? সময় আর কাটতেই চায় না!

দীপ্তি অবাক হয়ে তাকালো প্রণবেশের দিকে। এই কি তাস

খেলার সময়! অর্চনা অসুখে ধুঁকছে, আর তারা ওর পাশে বসে তাস খেলবে। এ রকম কেউ কখনো শুনেছে?

দীপ্তি কোনো উত্তর দিল না। প্রণবেশ তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, বসুন না! আপনার কোনো কাজ নেই তো এখন? দু'হাত খেলি।

—আমি তাস খেলতে জানি না।

—শিখিয়ে দিচ্ছি, এক্ষুনি শিখে যাবেন।

—থাক্। আমি টুকুনকে নিয়ে যাচ্ছি। ওকে ঘুম পাড়িয়ে দেবো।

—ও থাক না, খেলছে আপন মনে। আপনি একটু বসুন।

দীপ্তি আর কিছু বললো না। টুকুনকে কোলে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলো। প্রণবেশও এলো সঙ্গে সঙ্গে। দীপ্তির ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললো, অর্চনা তো এখন ঘুমোবে। আপনার এখানে একটু বসবো? একটু চা খাওয়াবেন? সময় আর কাটতেই চায় না—

দীপ্তি একটু কঠোরভাবেই বলল, আপনি এখন ঘরে যান। আমি বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়াবো।

প্রণবেশ লুব্ধভাবে হাসলো। তারপর বললো, চা খাওয়াবেন না তা হলে? ঠিক আছে, সরি, আপনাকে ডিসটার্ব করলাম।

দীপ্তি ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ভিজে তোয়ালে দিয়ে গা মুছে দিল ছেলেটার। তারপর তাকে চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়াতে বসলো। প্রণবেশের ওপর তার রাগ হয়ে গেছে। প্রণবেশের মতিগতি ভালো নয়। তার চাহনিতে অন্যায় লোভ, পুরুষ মানুষের ঐ চাহনি দেখলেই চেনা যায়। দুপুরবেলা চাকরির চেষ্টা না করে এ কী করছে সে! রাজেনের সঙ্গে প্রণবেশের অনেক তফাত। বেকার অবস্থায় প্রণবেশের অন্যায় লোভ বেড়ে যাচ্ছে, রাজেনের এ ধরনের কোনো লোভই নেই। নারীর প্রতি তার আসক্তিই কম।

প্রণবেশ নতুন চাকরি খোঁজার জন্য কত দূর কী চেষ্টা করছে কে জানে, তবে আজকাল তাকে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই বাড়িতে বসে থাকতে দেখা যায়। চাকরি কি উড়ে উড়ে আসবে তার কাছে? পাওনাদারদের ভয়েই বোধহয় সে রাস্তায় বেরোয় না। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে কিছু রোজগার না করলে পাওনাদারদের মেটাবেই বা কী

করে? এই রকম অবস্থায় পড়ে দুঃখিত হবার বদলে হঠাৎ এ কী বিচিত্র মতিগতি তার?

প্রণবেশ যদি এর পরও এরকমভাবে জ্বালাতন করার চেষ্টা করে, তাহলে তো মুস্কিল। নির্জন দুপুরগুলো সে বিষাক্ত করে দেবে। ঘরের দরজা থেকে একজন মানুষকে চলে যেতে বলার মধ্যেও একটা গ্লানি আছে। দীপ্তি কি রাজেনকে বলবে, এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও উঠে যাবার জন্য? সহজে বাড়িও পাওয়া যায় না। বেশ ভালোই কাটছিল এ বাড়িতে। অর্চনার কপালে অনেক দুঃখ আছে, দীপ্তি তাকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না।

সেদিনই অফিস থেকে ফিরে রাজেন বললো, জানো আজ কার সঙ্গে দেখা হলো? হীরকবাবুর সঙ্গে।

দীপ্তি খুবই নির্লিপ্তভাবে এবং অন্যমনস্ক গলায় জিজ্ঞেস করলো, কোথায়?

—রাস্তায়। উনি গাড়ি করে যাচ্ছিলেন, আমি দেখতে পাইনি, উনিই আমাকে দেখে গাড়ি থামালেন। একেই বলে ভদ্দরলোক। আমার সঙ্গে কী সম্পর্ক বলো, আমি তো নেহাত্ত এক ভাড়াটে ছিলাম, তাও উনি আমাকে দেখে গাড়ি থামিয়ে নেমে এলেন।

—কী বললেন?

—অনেক কথা হলো। তোমার কথা বললাম। তুমি ফিরে এসেছো শুনে খুব খুশি হলেন। সত্যি খুশি হয়েছেন, মুখ দেখলেই বোঝা যায়। উনি সত্যিই আমাদের জন্য ভাবেন।

দীপ্তি হীরকের খুশি হওয়া মুখখানা কল্পনা করার চেষ্টা করলো। হীরককে তো কেউ কখনো খুশি হতে দেখেনি। সে তো সর্বক্ষণ নিজের চিন্তায় ব্যস্ত। কী তার দায় পড়েছে, কোথাকার কোন পাগল মেয়ে ভালো হলো কিনা। হয়তো হীরকের কিছুই মনে নেই। সবটাই রাজেনের কল্পনা। রাজেন নিজে থেকেই হীরককে এক গাদা কথা বলেছে, ভদ্রতার খাতিরে শুনেছে হীরক।

মাঝখানে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। তবু হীরকের কথা ভাবলেই তার মুখখানা তার নামের মতনই জ্বলজ্বল করে ওঠে। তার সেই অহঙ্কারী মুখ, পৃথিবীতে কারুকেই গ্রাহ্য না করার ভাব।

রাজেন জামা খুলে আলনায় টাঙিয়ে রেখে উৎসাহের সঙ্গে বললো,

উনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জিজ্ঞেস করলেন। তোমার কথা, ছেলের কথা, মেয়ের কথা—

দীপ্তি অপ্রত্যাশিত ভাবে বললো, তুমি ওকে প্রণবেশবাবুদের কথা বললে না কেন? যদি উনি কোনো সাহায্য করতে পারেন!

—হীরকবাবু কী সাহায্য করবেন?

—ওঁর তো অনেক জায়গায় চেনা-শুনো, উনি হয়তো কোনো চাকরি জোগাড় করে দিতে পারবেন।

—প্রণবেশকে উনি চেনেন না, শোনেন না।

—তুমি যদি একটু বুঝিয়ে বলতে!

রাজেন হেসে বললো, উনি কি বিশ্বশুদ্ধ লোকের উপকার করে বেড়াবেন নাকি? দেশে কি বেকারের অভাব আছে? একথা কখনো বলা যায়? তা ছাড়া উনি এখন কত ব্যস্ত মানুষ। ওঁকে কি এই সব নিয়ে বিরক্ত করা যায়?

দীপ্তি বুঝতে পারলো, সে ভুলই করেছে। বেকারদের সম্পর্কে বই লেখা হয়ে গেছে হীরকের। আর তার কোনো উৎসাহ থাকার কথা নয়। তা ছাড়া, প্রণবেশ রাজেনের মতন দয়া চাইতে পারবে না।

রাজেন বললো, উনি নিজে থেকেই বললেন, একদিন আসবেন আমাদের বাড়িতে। আমি তখনই ভাবলাম ওঁকে নেমন্তন্ন করে দিই। তারপর আবার ভাবলাম, তোমাকে জিজ্ঞেস করে দিন ঠিক করাই ভালো। ওঁরও সেদিন সময় থাকা চাই।

দীপ্তি এসম্পর্কে কোনো মন্তব্য করলো না। চুপচাপ তাকিয়ে রইলো দেয়ালের দিকে।

—কী, কিছু বলছো না যে!

—বললেই হয় যে-কোনো একদিন। তোমার যখন ইচ্ছে—

—কেন, তোমার ইচ্ছে নেই?

—বাইরের লোকেদের সামনে আমার বেরুতে ইচ্ছে করে না!

—হীরকবাবু কি বাইরের লোক? চলো এক কাজ করি বরং! একদিন সবাই মিলে ওখানে বেড়াতে যাই। হীরকবাবুকে নেমন্তন্ন করে আসাও হবে, পাড়ার লোকজনের সঙ্গে দেখা করাও হবে। বলো, এই শনিবার যাবে?

দীপ্তি দীর্ঘশ্বাস চেপে বললো, আমার যেতে ইচ্ছে করে না। তুমি একলা যাও।

রাজেন একটু আবেগাপ্লুত গলায় বললো, হীরকবাবু আমাদের জন্য যা করেছেন, তা কি তুমি কোনোদিন ভুলতে পারবে? বলো, ভুলতে পারবে?

দীপ্তি বললো, আমার অনেক কিছুই এখন আর মনে পড়ে না।

—আমি অন্তত কোনোদিন ভুলতে পারবো না। আমি নেমকহারাম নই। তাহলে, হীরকবাবুকে নেমন্তন্ন করার জন্য তুমি যেতে চাও না?

—না।

রাজেন আর কথা বাড়ালো না! তার মনে হলো, ও বাড়িতে যাবার প্রসঙ্গ তুলে সে ভুলই করেছে। ও বাড়িতে গেলে দীপ্তির সব পুরোনো কথা বেশি করে মনে পড়ে যাবে, সেটা বিশেষ ভালো নয়।

দীপ্তিকে খুব উতলা দেখালো সেদিন। ছেলে-মেয়েকে পড়াবার উৎসাহ পেল না। তার বদলে ভর-সন্ধেবেলা স্নান সেরে এসে বসলো ঠাকুর-পুজোর আসনে। চোখ বুজে বসে রইলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দূর থেকে তাকে মনে হয় ধ্যানমগ্না যোগিনী। ছেলে-মেয়ে দুটি খিদের চোটে কান্নাকাটি সুরু করার পর দীপ্তি উঠলো।

সারা সন্ধে দীপ্তি গম্ভীর হয়ে রইলো। রাত্তিরে ছেলেমেয়েরা ঘুমোবার পর রাজেনকে খাবার দেবার সময়ও একটাও কথা বললো না। রাজেন একটু ভয় পেয়ে গেল।

একটু বাদে বিছানায় শুয়ে রাজেন দীপ্তিকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার হঠাৎ কী হলো বলো তো?

দীপ্তি শুকনো গলায় বললো, কিছু না তো।

—মেজাজটা খারাপ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

—মেজাজ খারাপ নয়। মনটা মাঝে মাঝে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে যায়।

—কেন?

—তা ঠিক জানি না।

রাজেনের শঙ্কাকুল মুখ দেখে দীপ্তি তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধরে বললো, তুমি ভয় পাচ্ছো? ভয় নেই, আমি পাগল হবো না। আমি ঠিক থাকবো। আমি ঠিক থাকবো।

প্রণবেশ প্রায়ই এসে উঁকিঝুঁকি মারে, অবান্তর কথা তুলে সময় কাটাতে চায়। অর্চনার যে ক'দিন জ্বর ছিল, দীপ্তি প্রত্যেকদিন একবার করে তাকে দেখতে গেছে। সেই সময় ঘরে প্রণবেশের উপস্থিতি

তাকে অস্বস্তি দেয়। প্রণবেশ তখন দীপ্তিকে চা খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে, যদিও দীপ্তি প্রত্যেকদিন তা প্রত্যাখ্যান করে। তারপর প্রণবেশ চেয়ারে বসে সিগারেট টানতে টানতে হাঁটু দোলায় এবং সর্বক্ষণ দীপ্তির শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বঞ্চিত মানুষের এমন লোভের কোনো মানেই বোঝা যায় না। দীপ্তির শরীরটাই শুধু সে দেখে, তার মনের সন্ধান পাবার কোনোই চেষ্টা করে না সে।

আবার এক দুপুরে ভূতগ্রস্তের মতন প্রণবেশ এসে দাঁড়ায় দীপ্তির ঘরের সামনে। ব্যাকুলভাবে বলে, বউদি, শিগগির একবার শুনুন, ভীষণ দরকার।

দীপ্তি দরজার কাছে এসে বললো, কী ব্যাপার!

হাতের মুঠো খুললো প্রণবেশ। তাতে এক জোড়া সোনার দুল। দুল দুটো দীপ্তির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আপনি এ দুটো রেখে আমাকে পঞ্চাশটা টাকা দেবেন? আমার বিশেষ দরকার।

—আমার কাছে তো অত টাকা নেই।

—হাতে নিয়ে দেখুন, এ দুটোর দাম দেড়শো টাকার কম নয়।

ঘৃণায় দীপ্তির শরীর রি-রি করে উঠলো। এই ধরনের কথা সে নিজে কখনো কারুকে বলবে না বলে অন্য কারুর কাছ থেকে শোনারও আশা করে না। আবার এই ধরনের অসহায় মানুষের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতেও তার লজ্জা হয়। নিজেকে সামলে নিয়ে সে আবার শান্তভাবে বললো, আমার কাছে দশ-বারো টাকার বেশি নেই। আপনি কোনো দোকানে যান না!

—দোকানে গেলে জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে। আমি কয়েকদিন বাদেই আপনার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেবো।

—আমার টাকা থাকলে কি ও দুটো রাখতে হতো? আমি এমনিতে দিতাম না? ও দুটো থাক, আপনি দশ টাকা নিয়ে যান।

হঠাৎ দীপ্তির মনে পড়ে গেল, এই রকম এক জোড়া দুল নিয়ে সেও একদিন গিয়েছিল হীরকের কাছে। এই রকমই এক দুপুরবেলা। সে দিন সে ছিল প্রার্থী, আজ সে হঠাৎ দাতা হয়ে গেল কী করে?

কিন্তু সেদিন দীপ্তির মধ্যে যে রকম ব্যাকুলতা ছিল, আজ প্রণবেশের মধ্যে তার চিহ্নমাত্র নেই, সে পর্যায়ক্রমে দীপ্তির মুখের দিকে এবং ঘরের মধ্যে তাকাচ্ছে লোভীর মতন।

প্রণবেশ এক পা এগিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। হঠাৎ দীপ্তির একটা হাত জড়িয়ে ধরে গদগদ ভাবে, বললো, বৌদি, আপনি দেবীর মতন। আপনাকে যে কী ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবো—

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দীপ্তি বললো, দাঁড়ান, টাকাটা এনে দিচ্ছি।

প্রণবেশ বললো, থাক্, দশ টাকাতে আমার হবে না। আমি অন্য জায়গা থেকে জোগাড় করছি। আপনি আমাদের জন্য যা করছেন—

প্রণবেশের মুখে কৃতজ্ঞতার ভাষা। কিন্তু তার ব্যবহারের সঙ্গে এর কোনো সঙ্গতি নেই। সে দীপ্তির গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রেখে বললো, আপনি এত সুন্দর—

দীপ্তি একটু সরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, অর্চনা কেমন আছে?

ভালো। এখন ভালো।

আপনার ছেলেকে আমার ঘরে রেখে যেতে পারেন।

বৌদি, আপনি আমার দিকে ভালো করে তাকান না কেন? আমি কি এতই অধম?

প্রণবেশ এগিয়ে এসে বললো, আমি প্রথম দিন থেকেই আপনার প্রেমে পড়ে গেছি। আপনি, তুমি আমাকে একটু দয়া করবে না?

প্রণবেশ আবার দীপ্তির কাঁধে হাত রেখে আকর্ষণ করলো তাকে।

দীপ্তি প্রণবেশের চোখে চোখ রেখে শান্ত ঘৃণার সঙ্গে বললো, পশু! তারপর প্রণবেশকে একটা ধাক্কা দিল।

প্রণবেশ হাসলো। বললো, কেউ দেখতে পাবে না।

দু'হাতে সে বন্দী করে ফেললো দীপ্তিকে। সাঙ্ঘাতিক জোরে চেপে ধরে আবার বললো, কেউ দেখতে পাবে না, ভয় নেই।

রান্নার ঠাকুর দুপুরে থাকে না। মেয়েটাও তিনতলায় খেলতে গেছে আজ। কাছাকাছি কেউ নেই। প্রণবেশ কি এই সব দেখে শুনেই দুল বাঁধা দেবার ছুতো নিয়ে এসেছে?

আশ্চর্যের ব্যাপার, দীপ্তি কিন্তু একটুও ভয় পায়নি। প্রণবেশকে যেন তার মানুষ বলেই মনে হয় না।

সে কঠিন গলায় বললো, ছেড়ে দিন আমাকে।

—কেন? আমাকে আপনার পছন্দ হয় না?

উষ্ণ নিশ্বাস নিয়ে প্রণবেশের মুখখানা দীপ্তির মুখের কাছে এগিয়ে,

আসছে। দীপ্তি হাতের চুড়ি দিয়ে প্রণবেশের ডান ভুরুর ওপর অসম্ভব জোরে ঠুকে দিল। প্রণবেশ তক্ষুনি ওকে ছেড়ে দিয়ে চোখ চেপে ধরলো। দীপ্তি ছুটে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

সে প্রতীক্ষা করতে লাগলো, কখন প্রণবেশ এসে দরজা ঠেলাঠেলি করবে। যদি ঐ লোকটা আরও কোনো ভাবে জোর করার চেষ্টা করে, দীপ্তি মাছ কাটা বঁটিটা ওর গলায় বসিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করবে না। অর্চনার জীবন এখনই যথেষ্ট দুঃখময়, এরকম স্বামী না থাকলে তার দুঃখ আর কতটা বাড়বে?

প্রণবেশের সঙ্গে হীরকের অনেক তফাত। হীরক কখনো জোর করেনি। তবু হীরকের টান ছিল সাংঘাতিক। প্রণবেশ হীরকের তুলনায় অনেক ভীরু। সে এসেছিল চোরের মতন।

কয়েক মিনিট বাদে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দীপ্তি দেখলো প্রণবেশ রাস্তা দিয়ে হন হন করে হেঁটে যাচ্ছে উদভ্রান্ত মানুষের মতন। চোখের ওপরের ক্ষতটা এক হাতে চেপে ধরে আছে, সেখানে একটু তুলোও লাগায়নি। বোধহয় নিজের ঘরেও ফিরে যায়নি। দীপ্তি নিজে একবার পাগল হয়েছিল, প্রণবেশকে দেখে ভাবলো, প্রণবেশও কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? এই অবস্থাতেই মানুষ আস্তে আস্তে পাগল হয়।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দীপ্তি ঠাকুরের ছবির সামনে বসলো। দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে বললো, শান্তি দাও, শান্তি দাও, আমি ওকে ভুলতে পারছি না।

এক-একবার সে খর চোখে তাকায় দেয়ালের ছবি ও ঠাকুরের মূর্তির দিকে। ঝাপসা হয়ে যায় তার চোখের দৃষ্টি। সে শুধু একটাই মুখ দেখতে পায়।

শূন্য ঘরে দীপ্তি চেঁচিয়ে ওঠে, না, না, আমি ঐ মুখ আর দেখতে চাই না। আমি ওকে ভুলতে চাই!

রাজেন বাড়ি ফিরে দেখলো, ঘরময় কাঁচ ছড়ানো, কৃষ্ণের ছবিখানা ভাঙা অবস্থাতে মেঝেতে পড়ে আছে। বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে দীপ্তি, তার শরীরটা ফুলে ফুলে উঠছে।

রাজেন আস্তে তার পিঠে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে, দীপ্তি?

দীপ্তি উত্তর দিল না।

রাজেন পাশে বসে খুব নরম গলায় বললো, কী হয়েছে, আমাকে বলো না।

দীপ্তি কান্না-মাখা মুখখানা ফিরিয়ে বললো, আমি আর পারছি না, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি কি আবার পাগল হয়ে যাবো ?

—কী হলো হঠাৎ !

—তা জানি না।

—নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। আমাকে খুলে বলো! কেউ কি তোমার মনে আঘাত দিয়েছে ?

দীপ্তি ধড়মড় করে উঠে বসলো। একদৃষ্টে তাকালো তার প্রৌঢ় স্বামীর দিকে। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে নিয়ে বললো, কিছু হয়নি গো। এমনিই মাঝে মাঝে বড় বিরক্ত লাগে, সময় কাটতে চায় না।

রাজেন বললো, তুমি আমায় ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। ছবিটা ভাঙলো কী করে ?

—ঝড় উঠেছিল না আজ দুপুরে। সেই সময় পড়ে ভেঙে গেছে।

—কোথায় ঝড় ! শুকনো খটখটে আকাশ, ঝড় হবে কী করে !

—হ্যাঁ, একবার ঝড় উঠেছিল আজ দুপুরে। তুমি দেখতে পাওনি। আমি আর আজ থেকে ঠাকুরপুজো করবো না, ওতে কোনো লাভ হয় না।

খাট থেকে নেমে দীপ্তি রাজেনের জন্য খাবার তৈরি করতে গেল।

।। আট ।।

হীরক টেলিফোন তুলে বললো, কে ?

—আমাকে আপনি বোধহয় চিনতে পারবেন না। আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। আপনি কি খুব ব্যস্ত ?

—আপনার কী দরকার বলুন ?

—দেখা করে বলবো। আজ না হোক, অন্য যেদিন আপনার সময় হবে।

—কী দরকার না জানলে সময় করা মুস্কিল।

—কোনদিনই কি একটু সময় হবে না ?

—আপনার নাম কী?

ওদিক থেকে একটুক্ষণ নিস্তব্ধতা। তারপর খুব ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে এলো, আমার নাম দীপ্তি। আপনি এক সময় আমাকে চিনতেন। আমি শুধু একবার দেখা করবো।

হীরক অন্যমনস্ক ছিল, দীপ্তি নামটা তার মনে রেখাপাত করলো না। সে একটু বিরক্তভাবে বললো, দীপ্তি কী? পুরো নামটা কী?

ওপাশ থেকে এবার পরিষ্কার গলা ভেসে এলো, দীপ্তি একজন পাগলের নাম। আপনার বাড়িতে থেকেই সে পাগল হয়ে গিয়েছিল।

হীরকও দু'এক মুহূর্ত কথা বললো না। মুখের চেহারাটা বদলে গেল। সেই দু'এক মুহূর্তে সে ফিরে গেল বেশ কয়েক বছর আগে। তারপর বললো, তুমি এক্ষুনি চলে এসো। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

হীরকের সামনে দুটি ছাত্রী বসে নোট নিচ্ছিল এতক্ষণ। হীরক তাদের বললো, তোমরা আজকে যাও। আমার একটু অন্য কাজ আছে।

ছাত্রী দুটি সে কথা আগেই বুঝতে পেরে খাতাপত্র গুছোতে শুরু করেছিল, উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আবার কালকে আসবো?

ছাত্রী দুটি চলে যাবার পর হীরক টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে সিগারেট ধরালো। ধোঁয়ার কুণ্ডলির দিকে তাকিয়ে সে একটু একটু হাসছে। জীবনের সব বৈচিত্র্যই সে উপভোগ করে।

রিক্সা থেকে দীপ্তি একা নামলো সেই বাড়ির সামনে। একতলায় তাদের ঘরটায় অন্য ভাড়াটে এসেছে। আরও নতুন ভাড়াটে এসেছে, পুরোনোও কেউ কেউ আছে।

দীপ্তি যখন এ বাড়ি থেকে চলে যায়, তখন তার চেতনা ছিল না। আজ এ বাড়িতে পা দিয়েই তার মনে হলো, সে যেন এতদিন এখানেই ছিল, মাঝখানে কিছুই ঘটেনি। সব কিছুই স্বপ্ন।

কিন্তু যে-ঘরটায় দীপ্তিরা থাকতো, সেই ঘরের জানালায় একজন বর্ষীয়সী রমণীর মুখ দেখেই দীপ্তির ঘোর ভাঙলো।

দোতলায় যে ছেলেটি দীপ্তিকে লাইব্রেরির বই এনে দিত তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল গেটের মুখে! সে খুশি হয়ে বললো, এ কী, কাকিমা, আপনি কবে ফিরলেন?

দীপ্তি মুখ নিচু করে বললো, এই তো কয়েক মাস আগে।

—এর মধ্যে একবারও এ-বাড়িতে আসেননি ? আমরা ভাবি আপনার কথা।

দীপ্তি ছেলেটির সঙ্গে বেশি কথা বলতে পারলো না। কলঙ্কিনীর মত তার মুখখানি লজ্জারুণ। দুপুরবেলা অধিকাংশ ঘরেরই দরজা বন্ধ ভাগ্যিস, তাই কারুর সঙ্গে দেখা হলো না।

তিনতলায় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে হীরক। হাসিমুখে বললো এসো।

দীপ্তি নতমুখে ঘরে ঢুকলো। চেয়ারে বসেও সে হীরকের মুখের দিকে তাকাতে পারছে না।

হীরক বললো তুমি তো বিশেষ বদলাওনি। আমি ভাবছিলাম, তোমাকে ঠিক কী রকম দেখবো। একবার ইচ্ছে হয়েছিল তোমাদের বাড়িতে যাই, রাজেনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, উনি বলেওছিলেন, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারিনি, তুমি আমার সঙ্গে এখন আর দেখা করতে চাও কিনা।

দীপ্তি চুপ করে রইলো।

—শেষ যে-দিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল সেদিন তুমি বলেছিলে, তুমি আমার সঙ্গে আর দেখা করতে চাও না।

—তোমার মনে আছে সে কথা ?

—আমি কিছুই ভুলি না। আমার স্মৃতিশক্তি বড় বেশি রকমের ভালো। এর পরও দু'বার আমি তোমার সঙ্গে দেখা করেছি, কিন্তু তখন তুমি পাগল ছিলে, আমার সঙ্গে কথা বলোনি।

—আজ আমি নিজে থেকেই এসেছি।

হীরক বললো, তুমি কি আমার সম্পর্কে কোনো অভিযোগ নিয়ে এসেছো ? এখনো কোনো অভিযোগ আছে ?

—হ্যাঁ।

—তাই বুঝি ? কী অভিযোগ ?

—তোমার জন্যে আমি আবার পাগল হয়ে যাবো।

হীরক উৎফুল্লভাবে হাসলো। কাছে এসে দীপ্তির চেয়ারের পিঠের কাছে হাত রেখে বললো, দেখো, এখন আমার চুয়াল্লিশ বছর বয়স—এখনও কোনো জায়গায় হেরে যাইনি বটে, কিন্তু মানুষ সম্পর্কে আর নিস্পৃহ থাকতে পারি না। আগে এসব কথা শুনলে বলতাম, তুমি যতবার ইচ্ছে পাগল হও, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু

এখন তা বলতে পারি না, বয়স হবার এই দোষ। সুতরাং আমাকে আর এসব কথা বোলো না। তুমি কেমন ছিলে তাই বলো?

—আমি ভালো নেই।

—এখন? কেন, এখন আবার কী হলো?

—আমি কী রকম থাকি বা না থাকি, তাতে কি তোমার কিছু যায় আসে?

—ছিঃ, দীপ্তি, এতদিন পর দেখা হলো, এখনই কি আর এরকম-ভাবে কথা বলে? তোমার জীবনের ওপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপটা গেছে, এখন শান্ত হও।

—আমি শান্ত হতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু পারছি না কিছুতেই। আমার বুকটা জ্বলে যাচ্ছে সব সময়।

—আমার ওপর রাগে?

দীপ্তি কোলের ওপর হাত দু'খানি রেখে স্থির হয়ে বসে রইলো। তারপর বললো, ও কথার উত্তর একটু পরে দেবো।

হীরক দীপ্তির মতন এমন শান্ত হয়ে বসে থাকতে জানে না। সে ছটফট করছে। একবার দীপ্তির মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনের ভাব বুঝতে চাইছে। এক সময় দীপ্তির কাছে দাঁড়িয়ে বললো, ওসব কথা থাক। তুমি এখন ভালো আছো তো?

—আমি কী নিয়ে বাঁচবো? আমার কী আছে?

হীরক দীপ্তির পিঠে হাত রাখতে গিয়েও হাতটা সরিয়ে নিল। সেখান থেকে সরে এসে নিজের চেয়ারে বসলো। বক্তৃতা দেবার মতন সুরে বললো, তোমার স্বামী আছে, সংসার আছে, ছেলে, মেয়ে—মেয়েরা এই নিয়েই তো স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়ে দেয়। তুমি আবার আলাদা কী চাও।

দীপ্তির মুখখানা উত্তেজনায় লালচে। ঠোঁটের ওপর অল্প অল্প ঘাম। সে এবার হীরকের মুখের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

হীরকই চোখ নামিয়ে নিল প্রথমে। যে দীপ্তিকে সে এক সময় চিনতো, এই দীপ্তি তার থেকে অনেক আলাদা। এখন দীপ্তির কথায় ও চেহারায় বেশ খানিকটা ব্যক্তিত্ব আছে, তার এক সময়কার অসুস্থতা তাকে যেন খানিকটা সম্মান দিয়েছে। মানুষ কেন পাগল হয়, হীরক এখনো তা জানে না। সে অবাক হয়ে ভাবলো, পাগলামি রোগ সেরে গেলে মানুষের চরিত্রে কি অনেকখানি পরিবর্তনও এনে দেয়?

হীরক জিজ্ঞেস করলো, রাঁচিতে এই কটা বছর কী করে কাটালে? সে সব কথা মনে আছে তোমার? ওরা কি খুব কষ্ট দেয়? শক ট্রিটমেণ্ট বলে একটা ব্যাপার আছে শুনেছি।

—কেন, তুমি কি এবার পাগলদের নিয়ে বই লিখবে নাকি?

হীরক আহত বোধ করলো। দীপ্তির কাছে আজ সে হেরে যাচ্ছে। এবার সে হাসতে পারলো না। আস্তে আস্তে বললো, না, সে জন্য নয়। শুধু তোমার কথা জানতে চাই। তোমার কথা জানতে ইচ্ছে করে। দীপ্তি, তুমি কেন বললে, তুমি আমার জন্য আবার পাগল হয়ে যাবে? আমি আবার কী দোষ করেছি? আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইবো?

—কেন?

—আমি যদি তোমার কাছে কোনো দোষ করে থাকি।

—তুমি কী দোষ করেছো?

—করিনি? আমার এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি তোমার প্রতি কোনো অন্যায় করেছি। তুমি যখন অসুস্থ হয়ে পড়লে, তখন আমি বারবার এই কথা ভেবেছি।

দীপ্তি বিষণ্ণভাবে বললো, আমি বুঝতে পারছি, আমি আর বেশি-দিন সুস্থ থাকবো না। আমার মন খুব দুর্বল। আমার স্বামী ভালো মানুষ। তাকে আমি দুঃখ দিতে চাই না, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও আমি মন ফেরাতে পারছি না। ঠাকুরের পুজোটুজো করলে অনেকের মন ফেরে—আমি তা-ও চেষ্টা করে দেখেছি। তাতেও কোনো লাভ হলো না। ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়েও আমি অন্য একটা মুখ দেখতে পাই।

—কার?

—তুমি জানো না?

—দীপ্তি, এসব কী বলছো?

দীপ্তি থেমে থেমে কিন্তু স্পষ্টভাবে বললো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না।

হীরক সাধারণত এই সব কথা শুনলে হাসে। কিন্তু এখন হাসলো না। সিগারেট ধরাবার জন্য একটু সময় নিল। তারপর বললো, দীপ্তি, তুমি তো জানো, ভালোবাসা-টালোবাসা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। যে-বয়সের ছেলেরা ঐ সব নিয়ে মাতামাতি করে, সেই বয়সে

আমি ব্যাপারটাকে একদম উড়িয়ে দিয়েছি। এখন তো আর প্রশ্নই ওঠে না। তুমি এরকম ভাবে আমাকে ভালোবাসার কথা বলছো কেন? ভালোবাসা নিয়ে আমি কী করবো?

দীপ্তি বললো, আমি অনেক কিছুরই উত্তর জানি না। সব উত্তর যদি নিজেই বুঝে উঠতে পারতাম, তাহলে আমি পাগল হতাম না।

—তুমি একথা কি জানো, ভালোবাসা কাকে বলে?

—তুমি আমাকে আষ্টে-পৃষ্টে জড়িয়ে রেখেছো। ঠাকুরের পুজো করতে গেলেও কেন তোমার কথা মনে পড়ে?

হীরকের কথা বলতে একটু সময় লাগলো। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আমার জুলপিতে পাক ধরেছে। জীবনে উন্নতি করার নেশাও ঘুচে গেছে। রাজনীতি করতে গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে বুঝতে পেরেছি, আমি ও পথের যোগ্য নয়। আমি হেরে গেছি, আমার আর কী আছে?

— তুমি সেই একই রকম আছো।

—কপালে এই দাগটা দেখছো? এটা আগে ছিল না। একটা উনিশ বছরের মেয়ের জন্য আমি পাগল হয়েছিলাম, তার একখানা জলজ্যান্ত প্রেমিক ছিল সে কথা জানতাম না, তার হাতে মার খেয়েছিলুম। ভাগ্য ভালো, খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেয়নি। কারুর কারুর চোখে আমি শয়তান।

—আমার চোখেও তুমি তাই। তবু আমি তোমাকে ভালো না বেসে পারি না। তুমি আমাকে অপমান করেছিলে বলেই আমার বেঁচে থাকার আর কোনো মানে নেই মনে হয়।

—আমি তোমাকে অপমান করেছিলাম? হয়তো তাই; নিজের কাজটাই আমার চোখে সব সময় বড় ছিল।

—আমি এখন কী করবো আমাকে বলে দাও?

—আমি কী করে বলবো?

—হ্যাঁ, তুমিই বলবে। কেন তুমি আমার সারা জীবনটা আচ্ছন্ন করে আছো।

হীরক দ্রুত উঠে এসে দীপ্তির পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো, অদ্ভুত গলায় বললো, দীপ্তি, আমি তোমাকে ভয় পাচ্ছি। আমার কখনো এরকম হয়নি। কোনো মেয়েকে আমি কখনো এরকম ভয় পাইনি।

যেন দয়াপ্রার্থীকে দয়া করছে, এই রকমভাবে দীপ্তি হীরকের

কাঁধের ওপর হাত রাখলো। ঘোর লাগা লাজুকের মতন বললো, আমি চলে যাবো? অনেক দূরে কোথাও হারিয়ে যাবো একা একা?

—কেন যাবে? তোমার ছেলে-মেয়ে আছে।

—এক এক সময় ওদের কথাও মনে থাকে না। শুধু ভুলতে পারি না তোমার কথা। তোমাকে আমি ঘৃণা করি। দারুণ, ভীষণ ঘৃণা করি। কিন্তু তোমাকে ছাড়াও আমি বাঁচতে পারবো না।

—দীপ্তি, আমাকে দয়া করো।

—কী দয়া চাও?

—আমি ভালোবাসতে জানি না। ভালোবাসার ক্ষমতা আমার নেই। আমাকে তোমার বন্ধু হবার সুযোগ দাও।

—বন্ধু কাকে বলে? আমার তো কোনোদিন কোনো বন্ধু ছিল না—আমি জানাবো কী করে?

হীরক হঠাৎ নিজের জামার বোতামগুলো খুলে ফেললো। জামা ও গেঞ্জি খুলে বুকের খানিকটা অংশ বার করে একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি ক্ষত দেখলো। ক্ষতস্থানটা এখনো লাল।

হীরক জিজ্ঞেস করলো, এটা চিনতে পারো?

দীপ্তি বিস্মিতভাবে বললো, না। এটা কী করে হয়েছে?

—তোমার মনে থাকার কথা নয়। তুমি তখন পাগল ছিলে। তুমি আমাকে কামড়ে দিয়েছিলে।

দীপ্তি আর্তভাবে বলে উঠলো, আমি? আমি তোমাকে—

—অনেকদিন হয়ে গেছে, তবু এটাতে মাঝে মাঝে ব্যথা করে। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, অনেক ওষুধ লাগিয়েছি, এটা কিছুতেই পুরোপুরি সারে না। যখন এটাতে ব্যথা হয়, তখন তোমার কথা আমার নিশ্চয়ই মনে পড়ে, বুঝতেই পারছো। সুতরাং আমি তোমাকে ভুলিনি। তা হলে এই দাগটার নামই কি ভালোবাসা?

—আমি তো এটার কথা জানতামই না।

—তোমাকে আমার একটা গোপন জিনিস দেখালাম। আমি ভাবতাম, আমার মনের মধ্যে কোনো দাগ পড়ে না। কিন্তু আমার বুকের ওপর একটা স্থায়ী দাগ পড়ে গেছে। সেইজন্যই আমি ভাবতাম আমি তোমার ওপর কোনো অন্যায় করেছি।

দীপ্তি কিছু বলার আগেই হীরক আবার অপ্রত্যাশিতভাবে বললো, আমার মেয়ে কেমন আছে?

দীপ্তি অস্ফুটভাবে বললো, তোমার মেয়ে?

—আমার কোনো মেয়ে নেই?

—না। খুকু শুধু আমার মেয়ে।

—তাই বলো। কেউ কেউ আমাকে এরকম একটা ধারণা করিয়ে দিয়েছিল যে আমি তোমাকে অনেক বিপদে ফেলেছি।

—তুমি আমার সর্বনাশ করেছো।

—তাই হবে বোধ হয়। মানুষের কোনো উপকার করার ক্ষমতা আমার নেই, এতদিন পরে আমি সেটা বুঝেছি। তাও আমি তোমার বন্ধু হতে চাইছি।

নিজের দুর্বল ভাবটা কাটাবার জন্য হীরক জোর করে হাসলো। দীপ্তির উরুতে রাখলো এবার একটা হাত। মুখ তুলে দীপ্তির চোখের দিকে তাকালো। তারপর বললো, সভ্যতার অনেক রকম আইন-কানুন আছে! আমি তার থেকে দূরে থাকতে চেয়েছি। তাই অন্যেরা আমার কথা বোঝে না। তুমিও বুঝবে না, না হলে বলতাম, দুটি শরীর যদি পরস্পরের কাছে আনন্দ পায়—তার চেয়ে বড় কথা তার কিছু নেই। একটু আগে আমি তোমাকে ভয় পাচ্ছিলাম অথচ এখন তোমার শরীরটা ছুঁয়ে মনে হচ্ছে, আমি তোমাকে চাই, এর কোনো অতীত বা ভবিষ্যৎ নেই।

—তুমি আমাকে চাও?

—এতে কোনো ভুল নেই।

—তোমার কাছে আমি কে? শুধু তো একটা শরীর, তাই না?

—এ সম্পর্কে আমার যা বলার, তা অনেক বার বলেছি। তুমি শুধু একটা শরীরও নও, আবার ভালোবাসা নামে একটা ধোঁয়াটে ব্যাপারও নয়, তুমি দীপ্তি, তোমার একটা আলাদা মূল্য আছে আমার কাছে।

—আমি আজ নিজে থেকে যদি না আসতাম, তুমি কোনোদিন আমার দিকে ফিরেও চাইতে না। কোনোদিন কি আমার খোঁজ করতে?

—না বোধহয়। তবে তোমার বাড়িতে নেমন্তন্ন করলে খুব আগ্রহের সঙ্গেই যেতাম।

হীরক অনুভব করল, দীপ্তির উরুর যেখানটায় সে হাত রেখেছে আস্তে আস্তে সেখানটা উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। আরক্ত মুখে দীপ্তি

বললো, আমি নির্লজ্জের মতন তোমার কাছে এসেছি। কিন্তু তুমি যেদিন থেকে আমাকে ছুঁয়েছো, তারপর থেকে অন্য যে কোন পুরুষের স্পর্শ আমার কাছে অসহ্য মনে হয়। এমনকি আমার স্বামীরও। কেন আমার এরকম হলো?

হীরক বললো, দীপ্তি, তুমি এমন পরিষ্কার করে কথা বলছো কী করে? হাসপাতাল থেকে কি তোমার আগের মনটা বদলে ভিন্ন একটা মন দিয়ে দিয়েছে?

—তাই দিয়ে দিলে বোধহয় আমি বেঁচে যেতাম। তাহলে তোমাকে ভুলতে পারতুম।

হীরক ধমক দিয়ে বললো, তখন থেকে আমি নিচে বসে আছি, আর তুমি চেয়ারে বসে আছো কেন? আমার বুঝি মান-সম্মান নেই। নিচে নেমে বসো।

দীপ্তি হেসে বললো, তারপর আমি আর একদিন আসবো, তুমি সেদিন আবার আমাকে ফিরিয়ে দেবে, তাই না?

—আবার সেই অতীত–ভবিষ্যতের প্রশ্ন? বললাম না, আমার কথাটা কেউ বোঝে না।

—তুমি কেন আমার অতীত-ভবিষ্যৎ জুড়ে আছো? কেন আমার সর্বনাশ করেছো?

—তুমি আজ প্রথম থেকেই আমাকে বকুনি দিয়ে কথা বলছো। যেন আমার থেকে কোনো একটা জায়গায় তুমি ওপরে উঠে গেছ। তুমি সাধারণ মেয়ে ছিলে—এ রকম হলে কী করে? তুমি পাগল হয়ে গিয়েই এতখানি যোগ্যতা অর্জন করেছো?

—আমি যে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম, একথা এখন আমাকে আর কেউ মনে করিয়ে দেয় না।

—একটা কথার সত্যিকারের উত্তর দাও। তুমি কি আমার কোনো ব্যবহারেই পাগল হয়েছিলে?

দীপ্তি দ্বিধাহীন গলায় বললো, হ্যাঁ। আমি যদি আবার পাগল হই, তার জন্যেও তুমিই দায়ী হবে।

হীরক দীপ্তির গা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে টেবিলের পায়ায় ঠেস দিয়ে বসলো। বললো, টেবিলের ওপর থেকে আমার সিগারেট-দেশলাইটা দাও। তারপর আমার নামে সব অভিযোগ শুনিয়ে যাও। চাও তো, আমি সেগুলো ইংরিজিতে লিখে

দিচ্ছি, সেই কাগজটা পুলিশে আর খবরের কাগজে পাঠিয়ে দাও।

সিগারেট-দেশলাই নিয়ে দীপ্তিও মাটিতে নেমে এলো। বললো, আমি একটা সামান্য মেয়ে। তবু তোমার জন্য আমার সব গেল।

হীরক দুই করতলে দীপ্তির মুখখানা ধরে বললো, আমি মেয়েদের চাই। মেয়েরা আমাকে চায় না। অন্তত আর কোনো মেয়ে আমার জন্য পাগল হয় না। সাত বছর বাদে কেউ ফিরে আসে না আমার কাছে। নিজেকে আমার রীতিমত বিলাসী পুরুষ মনে হচ্ছে। ওরে পাগলী, তুই আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছিস।

দীপ্তি আস্তে আস্তে হীরকের বুকে মাথা হেলান দিয়ে বসলো। চোখ থেকে গড়িয়ে পড়লো জল। গভীর-স্বরে বললো, সবাই আমাকে খারাপ বলবে। কিন্তু তোমার কাছে ফিরে না এসে আমার উপায় নেই।

হীরক খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো দীপ্তির কান্না। সিগারেটের ধোঁয়া এলোমেলো হয়ে ঘুরছে সেই কান্নাভরা মুখের চার পাশে। সেই দিকে চেয়ে থেকে হীরক বললো, যখন সত্যি সত্যি বুড়ো হবো, রক্তের জোর কমে যাবে, শরীরের আকাঙ্ক্ষা মরে যাবে, তখন চেষ্টা করে দেখবো তোমাকে ভালোবাসতে পারি কি না। ততদিন আমি তোমার বন্ধু থাকতে চাই। তুমি রাজেনের স্ত্রী থাকো—কিন্তু আমার ঘরবাড়ি, এসবও তোমার। তুমি যখন খুশি আসতে পারো। তোমার ছেলেকে মেয়েকেও নিয়ে এসো। লোকে কে কী বলবে কিছুই গ্রাহ্য করবে না। পারবে?

দীপ্তি বললো, আমি আর কিছু চাই না। তুমি শুধু আমাকে ফিরিয়ে দিও না।

হীরক উঠে দাঁড়ালো, দীপ্তির হাত ধরে টেনে তুললো। দীপ্তির আঁচল দিয়েই মুছিয়ে দিল তার চোখ। দুঃখিত সুরে বললো, আমাকে খারাপ লোক জেনেও কেউ কখনো আমাকে এইভাবে চায়নি। আমি হেরে গেছি তোমার কাছে। তোমাকে ফিরিয়ে দেবার সাধ্য আর আমার নেই।

দীপ্তি হীরকের বুকের জামা সরিয়ে সেই ক্ষতস্থানটা বার করলো, ঠোঁট চেপে ধরে চুম্বন করলো সেখানে। তার চোখের জল কিছুতেই বাধা মানে না। তার অশ্রু হীরকের বুক ভিজিয়ে দেয়। কে কার কাছে হেরে গেছে, বোঝা যায় না।

শকুন্তলা

অরণ্যের নিস্তব্ধতা খান্ খান্ হয়ে ভেঙে যাচ্ছে বহু মানুষের কোলাহলে। রথের ঘর্ঘর শব্দ, অস্ত্রের ঝনৎকার আর অশ্বের হ্রেষার সঙ্গে মিশছে ভয়ার্ত পশু ও পাখিদের আর্তরব। যেন বনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে আসছে ঝড়। সদলবলে রাজা দুষ্মন্ত এসেছেন শিকার-অভিযানে।

রাজা দুষ্মন্ত এই সসাগরা পৃথিবীর প্রধান চারটি খণ্ড এবং নানান দ্বীপ ও উপদ্বীপের অধিপতি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, যবন ও ম্লেচ্ছ জাতি—সমাকীর্ণ তাঁর রাজ্যে ন্যায় ও শৃঙ্খলা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সুশাসনে এমন কি মেঘের দলও যথাসময়ে বারিবর্ষণ করে, শস্য সকল অতি সুরস এবং ধরাতল অসংখ্য প্রকার রত্ন ও পশুযূথে পরিপূর্ণ। মহীপাল দুষ্মন্তের তুল্য বীর পুরুষ এ ধরণীতে তো আর কেউ নেই-ই, দেবতাদের মধ্যেও দুর্লভ।

রাজা দুষ্মন্ত এখন ঠিক যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের মধ্য-সীমায় রয়েছেন, কিন্তু তাঁর অনিন্দ্য দেহকান্তি এবং তেজ ও কোমলতা-মিশ্রিত মুখমণ্ডলের জন্য তাঁকে এখনও পূর্ণ তারুণ্যের প্রতীক বলে মনে হয়। রাজা চান তাঁর রাজ্যে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকুক, কিন্তু শান্তির সময় বীরপুরুষদের পক্ষে বড়োই অস্বস্তিকর। তাঁর কোনো প্রতিপক্ষ বা শত্রু না থাকলেও তিনি মাঝে মাঝেই অস্থির হয়ে ওঠেন, বাহু দু'টি ছটফট করে অস্ত্র চালনার জন্য, সেই সময় তিনি বেরিয়ে পড়েন অরণ্য-মৃগয়ায়।

শিকারে তিনি যেমনই পারঙ্গম, তেমনই নিষ্ঠুর। এক-আধটি পশু বধ করে তাঁর আশ মেটে না। অরণ্যে এলেই তাঁর রাজপ্রাসাদের বিলাসবহুল জীবনের আলস্যের ভাব সম্পূর্ণ কেটে যায়, কোনো পলায়মান পশুর পশ্চাতে ধাবমান অবস্থায় তিনি তীব্র উত্তেজনা অনুভব করেন এবং সেই জন্যই সব সময়ই তিনি তাঁর রথকে চালিত রাখতে চান। ধনুর্বাণ এবং বর্শা যেন তাঁর দু'হাতে সমানভাবে চলে এবং বাঘ বা সিংহের মতন কোনো হিংস্র প্রাণীকে খুব কাছাকাছি দেখলে তিনি লম্ফ দিয়ে রথ থেকে নেমে খড়্গের আঘাতে তাদের বিনাশ করেন। পশুরাও যেন চিনে গেছে রাজা দুষ্মন্তকে, দূর থেকে তাঁর সুবর্ণপ্রভ রথ দেখতে পেলেই বনের সমস্ত পশু ঊর্ধ্বশ্বাসে চতুর্দিকে পালায়।

একটি কৃষ্ণসার মৃগকে অনুসরণ করে রাজা দুষ্মন্তের রথ তাঁর

সেনাবাহিনীকে অনেকখানি পিছনে ফেলে চলে এসেছে গহন বনে। হরিণটি গতিবেগে রাজার রথের অশ্বদের অনায়াসে হারিয়ে দেয়। সে তার গ্রীবা বাঁকিয়ে মাঝে মাঝে রথটিকে দেখে নিচেছ আর ছুটছে। যাতে তীর এসে না লাগে, তাই তার শরীরের পিছনের অংশটি কুঁকড়ে এনেছে সামনের দিকে। রাজা তাকে তাড়া করবার আগে হরিণটি সদ্য একগুচ্ছ ঘাস ছিঁড়ে মুখে দিয়েছিল, এখন তার মুখ থেকে সেই ঘাস খসে পড়ছে একটু একটু করে। তার পায়ের ক্ষুর প্রতিবার মাটিতে এত সামান্য স্পর্শ করে লাফিয়ে উঠছে যে, মনে হয় সে দৌড়াচ্ছে শূন্যপথেই।

ধনুকে বাণ জুড়ে সেই কৃষ্ণসার মৃগটির দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে রাজা দাঁড়িয়ে আছেন রথের ওপর। বাণ ছোঁড়ার ঠিক মুহূর্তটি তিনি পাচ্ছেন না, তাঁর সর্বাঙ্গ টানটান।

রথের সারথি বললো, মহারাজ, উদ্যত কার্মুক আপনাকে দেখে আমি যেন পিনাকপাণি শিবকেই প্রত্যক্ষ করছি!

রাজা বললেন, সারথি, মাঝে মাঝে আমি মৃগটিকে দেখতে পাচ্ছি না কেন বলো তো?

সারথি বললো, আয়ুষ্মণ্, জমিটা অসমতল, এখানে বল্গা ছেড়ে রথ চালানো যায় না। হরিণটির তো সে রকম কোনো অসুবিধে নেই। তবে এবার আমরা সমতল জায়গায় এসে পড়েছি, এখন আর হরিণটার নাগাল পেতে কোনো অসুবিধে হবে না।

রাজা বললেন, দেখি, এবার ছোটাও তো তোমার ঘোড়াগুলো।

সারথি সোজা হয়ে বসে বল্গার রাশ ছেড়ে দিয়ে বললো, এবার দেখুন তাহলে মহারাজ। দেখবেন ঘোড়াগুলোকে, ওদের শরীরের সামনের দিকগুলো কেমন লম্বা হয়ে গেছে! দেখুন, ওদের কেশর একটুও কাঁপছে না, কানগুলো খাড়া। ওদের পায়ের ধুলোয় পেছনে মেঘের সৃষ্টি হচ্ছে। হরিণটার কাছে হেরে যাবার অপমান ওরা সহ্য করতে পারছে না।

এগুলি রাজা দুষ্মন্তের প্রিয় অশ্ব। সামান্য একটা হরিণকে তাঁর রথ ছুঁতে পারবে না, এটা তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। এ হরিণ তো মায়া-হরিণ নয়! যাই হোক, এবার তিনি সন্তুষ্ট হলেন, ঘোড়াগুলো সত্যই ছুটছে দারুণ।

রাজা তারিফ করে বললেন, সত্যি, সূর্যদেব আর ইন্দ্রের অশ্বকেও ওরা গতিবেগে হার মানিয়ে দিয়েছে। এইমাত্র দূরে যে যে ছোট ছোট

জিনিসগুলো দেখছি, তা যেন পরের মুহূর্তেই বড় হয়ে যাচ্ছে। বাঁকা জিনিসগুলো মনে হচ্ছে সোজা; ছাড়া ছাড়া জিনিসগুলো মনে হচ্ছে যেন গায়ে গায়ে লাগা। পাশের জিনিস, দূরের জিনিস সবই যেন একাকার।

হরিণটিকে এবার নিশানার মধ্যে পেয়ে রাজা ধনুক উদ্যত করে বললেন, এই দ্যাখো, এবার আমি ওকে মারছি!

ঠিক তখনই কারা যেন চিৎকার করে বলে উঠলো, মহারাজ, মারবেন না, মারবেন না, এ আশ্রমের হরিণ!

সারথি সঙ্গে সঙ্গে রথের রাশ সংযত করে বললো, মহারাজ, কৃষ্ণসার মৃগ আর আপনার মাঝখানে সাধুরা এসে পড়েছেন।

মহারাজ বললেন, থামাও, থামাও, ঘোড়াদের থামাও।

সারথি ততক্ষণে রথ থামিয়ে ফেলেছে। ঠিক সামনেই দেখা গেল দু'জন সঙ্গী-সমেত একজন জটাজূটধারী তপস্বী। ওদের হাতে গোছা গোছা কাঠ।

তপস্বী হাত উঁচু করে বললেন, তুলোর পাঁজায় আগুন দেবার মতন, এই হরিণের কোমল দেহে তীর ছুঁড়বেন না মহারাজ। আপনার তীর বজ্র-কঠিন, এই ক্ষীণজীবী মৃগশিশুদের ওপর তা প্রয়োগ করবেন না। সংবরণ করুন আপনার অস্ত্র। মহারাজ বিপন্নদের রক্ষা করার জন্যই আপনার অস্ত্রের উপযোগিতা, নিরীহ নির্দোষদের আঘাত করবার জন্য তো নয়।

রাজা তীর ধনুক নিচু করলেন।

তপস্বী তখন রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, এই তো আপনার বংশের যোগ্য কাজ। পুরু বংশে জন্ম আপনার, আপনি তো মহান এবং উদার হবেনই। আশীর্বাদ করি, আপনার সর্বগুণান্বিত পুত্রলাভ হোক এবং আপনার সেই পুত্র সমগ্র ভুবনের একচ্ছত্র অধিপতি হোক।

মাথা নিচু করে বিনীতভাবে আশীর্বাদ গ্রহণ করে রাজা প্রশ্ন করলেন, আপনারা কে? কোথায় আপনাদের বসতি এবং এই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে কোথায়ই বা চলেছেন?

তপস্বী বললেন, আমরা আশ্রমবাসী, যজ্ঞের কাষ্ঠ-সংগ্রহে বেরিয়েছি। এই তো কাছেই মালিনী নদী, তার তীরে মহর্ষি কণ্বের আশ্রম। আপনি সে আশ্রম কথনো দেখেননি?

রাজা মাথা নেড়ে জানালেন যে, তিনি এদিকে কখনো আসেননি আগে।

তপস্বী তখন বললেন, হে রাজন, তা হলে আপনি আমাদের তপোবনে এসে একটু বিশ্রাম গ্রহণ করুন। আপনি আমাদের অতিথি হোন। আপনার শাসনের গুণে আমাদের যাগযজ্ঞ নির্বিঘ্ন হয়েছে। আপনি বীর, কত যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত আপনার বাহু, তার সুফল আমরা কতখানি ভোগ করছি, আপনি নিজের চোখে একবারদেখে যান।

রাজা ঈষৎ চিন্তা করে বললেন, কুলপতি কণ্বের সঙ্গে একবার দেখা করে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসা উচিত। তিনি আশ্রমে আছেন তো?

তপস্বী বললেন, না মহারাজ, তিনি সোমতীর্থে গিয়েছেন। তবে তাঁর কন্যা শকুন্তলা রয়েছেন আশ্রমে, সেই কন্যার ওপরেই এখন আশ্রমের অতিথি পরিচর্যার ভার।

রাজা বললেন, তবে তাঁর কাছেই যাই, তিনি মহর্ষি কন্বকে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য পেঁৗছে দেবেন।

তপস্বী বললেন, আপনি এই দিক দিয়ে সোজা চলে যান, মহারাজ। আমরা সমিধ্ সংগ্রহ করে খানিক পরেই আসছি।

রাজা সারথিকে বললেন, ঘোড়া ছোটাও। চলো, পুণ্য তপোবন দর্শন করে আমরা নিজেরাও পবিত্র হয়ে আসি।

রথ আবার ছুটে চললো। একই অরণ্যের মধ্যে হলেও স্পষ্ট বোঝা যায়, এখানকার পরিবেশ অন্য রকম। বৃক্ষগুলি সারবদ্ধ, সুঠাম ও সুন্দর। বাতাসে কেমন যেন দিব্য গন্ধ, পাখিদের স্বর এখানে যেন বেশি সুমিষ্ট।

রাজা ব লেন, কেউ না বলে দিলেও বোঝা যায়, এই জায়গাটাই তপোবন।

সারথি জিজ্ঞেস করলো, কী করে বুঝলেন, মহারাজ?

রাজা বললেন, দ্যাখো, শুক পাখিদের কোটর থেকে ঝরে পড়েছে নীবার ধান গাছের নিচে। ঐ যে মসৃণ পাথরখণ্ডগুলো দেখছো, ওখানে ঋষিরা প্রতিনিয়ত ইঙ্গুদী ফল ভাঙেন বলেই ওগুলি অত মসৃণ হয়েছে। দ্যাখো, হরিণরা আমার রথ দেখেও দৌড়ে পালাচ্ছে না, সরল চোখে চেয়ে আছে, ওরা বোধহয় হিংসার কথা জানেই না। আর এই দ্যাখো, এই পথে আশ্রমবাসীরা স্নানের ঘাটে যান, তাঁদের বল্কলের

প্রান্ত থেকে ঝরে পড়া জলের ধারায় চিহ্নিত হয়েছে এই পথ। এখানকার বাতাসে নিঃশ্বাস নিতেও আমার আনন্দ হচ্ছে। সারথি, রথ থামাও, আমি এখানেই নামবো। আর বেশি দূর গেলে রথের চাকার শব্দে তপোবন-বাসীদের ব্যাঘাত হবে।

সারথি রথ থামিয়ে দিল সেখানে। রাজা রথ থেকে অবতরণ করে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। তারপর আবার থেমে গিয়ে বললেন, এত সব অস্ত্রশস্ত্র, কবচ-অলঙ্কার নিয়ে তপোবনে প্রবেশ করা উচিত নয়, যোদ্ধৃবেশ সেখানে মানায় না।

একে একে সে সব খুলে রথের ওপর রেখে রাজা বললেন, যতক্ষণ আমি না ফিরি, ততক্ষণ অপেক্ষা করো এখানে। অশ্বগুলি ক্লান্ত হয়েছে। তুমি বরং ওদের পিঠ জলে ভিজিয়ে দাও এখন।

খানিকদূর গিয়ে রাজা দেখতে পেলেন আশ্রমের দ্বার। বিনীত ভঙ্গিতে ভেতরে প্রবেশ করে রাজা প্রথম কারুকে দেখতে পেলেন না কোথাও। শান্ত, সুন্দর পরিবেশ। এরকম জায়গাতে এলেই মন প্রসন্ন হয়।

তবু রাজার দক্ষিণ বাহু হঠাৎ কেঁপে উঠলো। তিনি বিস্মিত হলেন। এ লক্ষণ তো কামনাসূচক। তিনি ভোগী, ভোগ তাঁর সঙ্গ ছাড়ে না। কিন্তু এ রকম জায়গায় কামনা মেটাবার সম্ভাবনা কোথায়?

তারপরই তিনি ভাবলেন, কে জানে, ভবিতব্যের কথা কে বলতে পারে? ভবিতব্যের দ্বার সব সময়ই উন্মুক্ত।

সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শুনতে পেলেন, অদূরে একটি ঝোপের আড়ালে একটি সুমিষ্ট নারীকণ্ঠ বলে উঠলো, এদিকে, এদিকে আয়!

রাজা একটু চমকে উঠলেন। কৌতূহলী হয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন সেদিকে। আড়াল থেকে তিনি দেখলেন, কয়েকজন তপস্বী-কন্যা জলের কলসি কাঁখে নিয়ে এগিয়ে আসছে, আর মাঝে মাঝে নিচু হয়ে জল দিচ্ছে চারা গাছের গোড়ায়। তাদের অঙ্গে বল্কলের সাজ। গুচ্ছ গুচ্ছ চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। তাদের চলার গতিতে যেন নৃত্যছন্দ।

সেই বালিকাদের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন রাজা। দেশ বিদেশ থেকে খুঁজে খুঁজে অতিশয় সুন্দরী রমণীদের আনা হয়েছে রাজ অন্তঃপুরে। কিন্তু সেই রূপসীরা যেন এই আশ্রম-কন্যাদের নখের

যোগ্যও নয়। যেন দুর্লভ সব বৃক্ষে সজ্জিত রাজার উদ্যান সৌন্দর্যে হেরে গেল এই এখানকার বনলতার কাছে।

কণ্বমুনির কন্যা শকুন্তলা প্রতিদিন বিকেলবেলায় তার দুই সখী অনসূয়া আর প্রিয়ংবদাকে সঙ্গে নিয়ে গাছে জল দেয়। এই সময় সূর্যের আলো সবচেয়ে গাঢ় হয়ে আসে, পাখিদের কণ্ঠে শোনা যায় ঘরে ফেরার ডাক।

শকুন্তলা সখীদের ডেকে বললো, এগিয়ে আয়, এদিকে এখনো জল সিঞ্চন করা বাকি আছে।

অনসূয়া বললো, ওলো শকুন্তলা, আমার মনে হয় কণ্ব তোকে যতখানি ভালোবাসেন, তার চেয়েও ভালোবাসেন এই আশ্রমের গাছ-গুলোকে। নইলে, নবমল্লিকা ফুলের মতন এমন কোমল তোর শরীর, আর সেই তোকেই কিনা তিনি গাছে জল দেবার মতন খাটুনির কাজের ভার দিয়েছেন?

শকুন্তলা বললো, আহা, কোমল শরীর আবার কী? তোরা পারিস, আর আমি পারি না! তা ছাড়া বাবা বলেছেন বলেই তো নয়, এই গাছগুলোকে যে আমি আমার নিজের ভাইবোনের মতন ভালোবাসি।

কুঞ্জের আড়াল থেকে সব কিছুই দেখছেন এবং শুনছেন রাজা দুষ্মন্ত। তিনি ভাবলেন, ও, এই মেয়েটিই তা হলে সেই কণ্বদুহিতা। এমন একটি অপরূপ লাবণ্যবতী কন্যাকে দিয়ে এমন ভাবে আশ্রমের কাজ করানো মোটেই উচিত নয়। মান্যবর কণ্বঋষি এটা সুবিবেচনার পরিচয় দেননি। প্রকৃতি যে রমণীকে এমন সুন্দরভাবে গড়ে তুলেছেন, তাকে কি তিনি তপস্বিনী সাজিয়ে রাখতে চান! নীল পদ্মপাতা দিয়ে কি শমীগাছের লতা ছেদন করা যায়!

রাজা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন শকুন্তলার মুখের দিকে।

মেয়ে তিনটি তো জানে না যে খুব কাছ থেকে দাঁড়িয়ে কোনো পুরুষ তাদের দেখছে, তাই তারা কাজের ফাঁকে ফাঁকে নানা রকম রঙ্গ-রসিকতা করতে লাগলো।

শকুন্তলা একটা গাছে জল দেওয়ার পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অনসূয়াকে বললো, প্রিয়ংবদা আজ আমার বল্কল বড্ড আঁট করে বেঁধে দিয়েছে একটু আলগা করে দে, সখী!

অনসূয়া বললো, দাঁড়া, দিচ্ছি।

প্রিয়ংবদা মুচকি হেসে বললো, আমি মোটেই আঁট করে বাঁধিনি। তোর যৌবনই এজন্য দায়ী, সখি, যৌবন যে তোর দুই স্তনকে উপচে দিচ্ছে।

নেপথ্যে দাঁড়িয়ে রাজা মনে মনে বললেন, এই রমণীয় দেহ তো বল্কলের পোশাক ধারণ করবার জন্য নয়! অবশ্য, তাতেও একে মানিয়ে গেছে খুব। পদ্মের চারপাশে শ্যামলিমা থাকলে তাকে বেশি সুন্দর দেখায়। চাঁদের বুকে যে কলঙ্করেখা, তা যেন চাঁদের শোভা আরও বাড়িয়ে দেয়। যারা খাঁটি রূপসী, তাদের অঙ্গে যে-কোনো জিনিসই অলঙ্কার হয়ে যায়। বল্কল-সজ্জায় যেন শকুন্তলাকে আরও বেশি আকর্ষণীয়া মনে হচ্ছে।

শকুন্তলা সখীদের বললো, দ্যাখ, দ্যাখ, ঐ বকুল গাছটার নতুন পল্লবগুলো যেন ঠিক ওর আঙুল। বাতাসে ওগুলো নড়ছে আর আমার মনে হচ্ছে ঠিক যেন হাতছানি দিয়ে আমায় কাছে ডাকছে। যাই, ওকে একটু আদর করে আনি।

প্রিয়ংবদা বললো, এখানে একটু দাঁড়া তো, শকুন্তলা। একটু ভাল করে দেখি। তুই পাশে দাঁড়ালে মনে হয় ঐ বকুল গাছটার যেন কোনো লতার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে।

শকুন্তলা বললো, তুই এত সুন্দর কথা বলিস, তোর নামটা সার্থক।

এমন সহজ সাবলীল অবস্থায় রাজা দুষ্মন্ত এরকম রূপসী কুমারী-দের আগে কখনো দেখেননি। তিনি রাজা, এ জন্য তাঁর সামনে এলেই সকলের ব্যবহার বদলে যায়। ভোগের জন্য নারীর অভাব নেই তাঁর, কিন্তু সেই সব রমণীরা তো কেউ কখনো এমন অসংকোচ সরলতায় কথা বলে না তাঁর কাছে। অবশ্য, এমনভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে নারীদের অবলোকন করার কোনো সুযোগ বা প্রয়োজনও তাঁর জীবনে আগে আসেনি।

শকুন্তলার কথা তিনি শুনেছেন ঠিক যেন তৃষ্ণার্তের ভঙ্গিতে। রাজপ্রাসাদে সোনা বা রুপার পাত্রে যিনি প্রতিনিয়ত সুরা ও সরবত পান করেন, তিনি যেন এই প্রথম দেখলেন কোনো নির্জন পাহাড়তলিতে এক ঝরনার স্ফটিক-স্বচ্ছ জল।

রাজা মনে মনে বললেন, ঐ প্রিয়ংবদা নামের মেয়েটি শুধু প্রিয় কথাই বলে না, সত্যি কথাও বলে। শকুন্তলা সত্যই যেন এক বনলতা।

ওর অধরের বর্ণ কিশলয়ের মতন রক্তিম, বাহু দু'টি ঠিক যেন দু'টি কোমল শাখা আর ওর সর্ব অঙ্গে ফুটে আছে ফুলের মতন মনোহারিণী যৌবন।

এ তপোবনের প্রতিটি বৃক্ষলতাই যেন শকুন্তলার চেনা। প্রত্যেকের সঙ্গে তার আলাদা আলাদা সম্পর্ক। এরা কেউ তার ভাই, কেউ বোন, কেউ বন্ধু। এমন কি এদের বিয়ে দেবার ব্যবস্থাও সে করে। একটি আমগাছের গায়ে সে জড়িয়ে দিয়েছিল বনমল্লিকা। ঐ হলো তাদের বিবাহ। এই নবমল্লিকা লতার নাম শকুন্তলা রেখেছে বনজ্যোৎস্না।

অনসূয়া বললো, ওলো সখি, তুই যে আজ বনজ্যোৎস্নার সঙ্গে একবারও কথা বললি না। ওকে ভুলে গেলি নাকি?

শকুন্তলা বললো, ওমা, ওকে ভুলবো কি, তা হলে যে নিজেকেই ভুলে যেতে হয়। দ্যাখ, কী সুন্দর সময় মিলিয়ে ওদের দু'টিতে বিয়ে দিয়েছিলাম আমি। বনজ্যোৎস্না নতুন ফুলে ভরে উঠেছে আর আমগাছটিতেও গজিয়েছে নতুন পল্লব। কেমন মনোরম দেখাচ্ছে?

প্রিয়ংবদা সব সময় কৌতুক করতে ভালবাসে। সে বললো, জানিস অনসূয়া শকুন্তলা এমন মুগ্ধভাবে বনজ্যেৎস্নাকে দেখছে কেন?

অনসূয়া একটু বেশি সরল সাদাসিধে, সে সব কথার ভেতরের দ্বিতীয় অর্থ বোঝে না। সে জিজ্ঞেস করলো, কেন বল তো?

প্রিয়ংবদা বললো,শকুন্তলা ভাবছে, বনজ্যোৎস্নার সঙ্গে আমগাছটির যেমন চমৎকার মিলন হয়েছে, তেমনি আমিও কি ওরকম একজন মনের মতন বর পাবো?

শকুন্তলা কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বললো, আহা-হা! ওটা তোরই মনের কথা, সেটা বল না!

রাজা দুষ্মন্ত ততক্ষণে তাঁর দক্ষিণ বাহু কম্পনের সার্থকতা উপলব্ধি করে ফেলেছেন। তাঁর শরীরে জ্বলছে আগুন। তিনি ঠিক করে ফেলেছেন, এই মেয়েটিকে তাঁর চাই। তখুনি ওদের সামনে আত্মপ্রকাশ না করে তিনি চাইছেন আর যতক্ষণ সম্ভব ওদের নিভৃতালাপ শুনতে।

কিন্তু ওদের শেষের কথাগুলি শুনে তাঁর একটু খটকা লাগলো। শকুন্তলার মতন এমন একজন সর্বগুণান্বিতা কন্যার আবার মনের মতন স্বামী পাওয়া সম্পর্কে সন্দেহ কেন? কিংবা, এতদিনেও বা ওর বিবাহ কোন হয়নি? তবে কি ওর জন্মের কোনো দোষ আছে?

মহর্ষি কণ্ব ঊর্ধ্বরেতা কঠোর ব্রহ্মচারী, এ কথা সবাই জানে তবে তাঁর কন্যাই বা হলো কী করে? তবে কি শকুন্তলা কুলপতি কণ্বের সাময়িক অসংযমের সন্তান?

পরক্ষণেই রাজা দৃঢ়ভাবে ভাবলেন, না, তা হতেই পারে না। তিনি অভিজ্ঞ জহুরী, খাঁটি রত্ন চিনতে তাঁর ভুল হয় না। তাঁর যখন আসক্তি জন্মেছে, তখন এই মেয়ে নিশ্চয়ই তাঁর যোগ্য। কোনো রকম সন্দেহের কারণ ঘটলে সজ্জনের অন্তরই সঠিক নির্দেশ দেয়। যাই হোক, আর একটু খোঁজ নিতে হবে।

তিন সখী আবার জল-সিঞ্চনে নিমগ্ন। একটি লতার ফুলের ওপর বসেছিল একটি ভ্রমর। জল-সিঞ্চনের ফলে ফুলটি কেঁপে ওঠায় ভ্রমরটি উড়ে এলো শকুন্তলার মুখের দিকে।

শকুন্তলা মুখের সামনে দু' হাত তুলে, ওমা, এ যে আমার মুখে বসতে আসছে, বলে উঠলো।

ভ্রমরটিকে খুব ঈর্ষা করলেন রাজা। সস্পৃহ দৃষ্টিতে ভ্রমরটির দিকে চেয়ে তিনি মনে মনে বললেন, ইস, তুই কত সৌভাগ্যবান রে, মধুকর। ঐ চঞ্চল, কম্পিত চোখ দুটো ছুঁয়ে আসছিস তুই, কানের কাছে গুনগুন করে যেন কী গোপন কথা বলছিস? শকুন্তলা দু' হাত নেড়ে বাধা দিচ্ছে, তবু তুই ওর রসে ভরা অধর-সুধা পান করে নিচ্ছিস ঠিক। আমরা শুধু ভাবনা চিন্তায় সময় নষ্ট করি, আর তুই কাজের কাজ করে নিস ঠিক সময়।

শকুন্তলা বললো, ওমা, এই বেহায়াটা যে কিছুতেই যাচ্ছে না। আমি পালাই এবার। আরে, আরে, এ যে আমার সঙ্গে সঙ্গেই আসছে এদিকে। ওরে তোরা এই দস্যি ভ্রমরটার হাত থেকে আমায় বাঁচা না!

সখী দুজন হেসে ঢলে পড়ছে এ ওর গায়ে। তারা বললো, আমরা রক্ষা করবার কে ভাই! তুই বরং রাজা দুষ্মন্তকে ডাক। তপোবন রক্ষা করার ভার তো রাজারই।

রাজা দুষ্মন্ত তক্ষুনি কুঞ্জের আড়াল থেকে, ভয় নেই, ভয় নেই বলে এগিয়ে আসতে উদ্যত হয়েও থেমে গেলেন। তাঁর মনে হলো, প্রথমেই তাঁর নিজের পরিচয় না দেওয়া ভালো। রাজার নাম শুনলেই যদি ওদের ব্যবহার বদলে যায়।

এর পর শকুন্তলা যেই আরো একবার বলে উঠলো, এখনো আমার

দিকে তেড়ে আসছে, বাঁচা, আমাকে বাঁচা, অমনি রাজা এগিয়ে এসে বললেন, তপস্বী কন্যাদের সঙ্গে কে দুর্ব্যবহার করছে? দুষ্ট ও অশিষ্টদের দমনকারী পুরুবংশের রাজা যখন পৃথিবী শাসন করছেন, তখন আশ্রমে এসে বিঘ্ন ঘটাবে এমন সাহস কার।

হঠাৎ একজন সুদর্শন অপরিচিত পুরুষকে দেখে মেয়ে তিনটি হত-চকিত হয়ে উঠলো। আড়ষ্টভাবে সরে দাঁড়ালো একপাশে।

অনসূয়া বললো, আর্য, সে রকম কিছু ব্যাপার নয়! আমাদের এই সখী একটি দুষ্ট ভ্রমরকে দেখে ভয় পাচ্ছিলো।

যেন খুব স্বস্তি পেয়েছেন সেইভাবে রাজা একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর তিনি শধু শকুন্তলার দিকে চেয়ে বললেন, আপনার তপস্যার কুশল তো?

লজ্জায় শকুন্তলা অবনতমুখী, তার শরীর কাঁপছে, সে কোনো উত্তর দিতে পারলো না।

অনসূয়াই তার হয়ে বললো, আপনার মতন এক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পেয়ে আমাদের তপস্যার আরও বেশি কুশল হলো। এই শকুন্তলা, দৌড়ে যা, কুটির থেকে থালায় করে ফলের অর্ঘ্য নিয়ে আয়! আমরা এই কলসির জল দিয়ে ওঁর পা ধুইয়ে দিচ্ছি।

রাজা বললেন, থাক, থাক, আপনাদের মুখের কথাতেই যথেষ্ট পরিচর্যা হয়েছে;

প্রিয়ংবদা বললো, তা হলে এই ছাতিম গাছের নিচে পাথরের বেদীতে বসে একটু বিশ্রাম করুন। এখানে বেশ ঠাণ্ডা ছায়া আছে।

রাজা বললেন, আপনারাও এতক্ষণ জল-সিঞ্চন করে নিশ্চয়ই ক্লান্ত। আপনারাও বসুন।

শকুন্তলা রাজার দিকে একপাশ ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। তার খুবই ইচ্ছে করছে এই আগন্তুকের মুখের দিকে পরিপূর্ণভাবে চেয়ে দেখতে, কিন্তু লজ্জায় পারছে না। অনসূয়া তার হাত ধরে বললো, এই আয় একটু বসি, উনি বলছেন যখন। অতিথির মনস্তুষ্টি করা আমাদের কর্তব্য।

শকুন্তলার শরীরের কম্পন বেড়েই যাচ্ছে ক্রমশ। তপোবন-বিরোধী এক প্রকার আবেগ যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছে তাকে। তার এরকম পরিবর্তনে সে নিজেই বিস্মিত।

মেয়ে তিনটি চুপ করে আছে বলে আলাপ জমাবার উদ্দেশ্যে রাজা

বললেন, আপনাদের তিনজনের বয়েস এবং আকৃতি প্রায় সমান। আমার মনে হচ্ছে ,আপনাদের মনেরও খুব মিল আছে।

প্রিয়ংবদা ফিসফিস করে অনসূয়াকে জিজ্ঞেস করলো, ইনি কে রে। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি মধুর ব্যবহার। কথাবার্তাও বলেন খুব চমৎকার। মনে হচ্ছে ইনি একজন কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি হবেন।

শকুন্তলা উৎকণ্ঠিতা হরিণীর মতন সখীদের দিকে তাকালো। তার মনেও ঐ একই প্রশ্ন। তার হৃদয়চাঞ্চল্য যাতে ওরা বুঝতে না পারে, সেই জন্য সে বুকে হাত দিয়ে রইলো।

রাজা মনে মনে ভাবলেন, এবার তাকে কিছু একটা পরিচয় দিতেই হবে। একটু ঘুরিয়ে তিনি বললেন, পুরুবংশীয় রাজা আমাকে ধর্ম-রক্ষার কাজে পাঠিয়েছেন, আপনাদের এই তপোবনে যজ্ঞের কাজে কেউ কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করে কিনা, তাই দেখতে আমি এসেছি।

অনসূয়া বললো, আপনি এসেছেন বলে আশ্রমবাসীরা আরো নিশ্চিন্ত বোধ করবেন।

সেই সময় শকুন্তলা তার আয়ত চক্ষু দুটি মেলে পুরোপুরি তাকিয়েছে রাজার দিকে। রাজাও মুগ্ধভাবে দেখছেন তাকে, অন্য সখীরা যে সেখানে উপস্থিত আছে, সে কথা যেন ভুলেই গেছে ওরা। রাজা ও শকুন্তলার চারিচক্ষুর সম্পূর্ণ মিলন হলো।

প্রিয়ংবদা চুপি চুপি বললো, শকুন্তলা, সখি, আজ যদি পিতা এখানে উপস্থিত থাকতেন।

শকুন্তলা সচেতন হয়ে চোখ ফিরিয়ে বললো, কেন, তিনি থাকলে কী হতো ?

প্রিয়ংবদা বললো, তা হলে তিনি এই বিশিষ্ট অতিথিকে তাঁর জীবনসর্বস্ব অর্পণ করতেন হয়তো।

শকুন্তলার কর্ণমূল আরক্ত হয়ে উঠলো। সে রেগে উঠে বললো, যাঃ! কী সব আবোল তাবোল বকছিস ! চুপ কর, তোর কোনো কথাই শুনতে চাই না।

রাজা ওদের কথার মাঝখানে বললেন, আমি আপনার এই সখী সম্পর্কে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি ?

দুই সখী অমনি একসঙ্গে উত্তর দিল, নিশ্চয়ই আপনি যে কোনো অনুরোধ করলে আমরা ধন্য হবো।

রাজা বললেন, আমি শুনেছি মহামতি কণ্ব চিরব্রহ্মচারী, তা হলে আপনাদের এই সখী তাঁর কন্যা হলেন কী করে।

অনসূয়া বললো, মহারাজ, আমি বলছি শুনুন। আমাদের এই সখীর জন্মের একটা ইতিহাস আছে। কৌশিক নামে মহাপ্রভাবশালী এক ব্রাহ্মণ আছেন....

রাজা বললেন, হ্যাঁ জানি। যিনি বিশ্বামিত্র নামেই বেশি পরিচিত এবং এক সময় যিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন।

অনসূয়া, বললো, হ্যাঁ সেই তিনিই। সেই কৌশিকই আমাদের এই সখী শকুন্তলার জন্মদাতা। পরিত্যক্তা সেই কন্যাকে দেখতে পেয়ে আশ্রমে নিয়ে এসে মহর্ষি কণ্ব লালনপালন করেছেন বলে তিনিও এর পিতা।

রাজা বিস্মিতভাবে বললেন, পরিত্যক্তা! কেন, পরিত্যক্তা কেন? আপনি আরো গোড়া থেকে বলুন, আমার কৌতূহল আরও বেড়ে যাচ্ছে।

অনসূয়া চকিতে একবার শকুন্তলার দিকে তাকালো। শকুন্তলা চেয়ে আছে মাটির দিকে, তার মুখে একটু যেন রাগ রাগ ভাব। কিন্তু প্রিয়ংবদা তাকে ইঙ্গিত করলো বাকি ইতিহাসটা বলতে।

অনসূয়া তখন রাজাকে বললো, মালিনী নদীতীরে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র একবার কঠিন তপস্যায় বসেছিলেন। তখন তাঁর সেই অসাধারণ নিষ্ঠা দেখে কী কারণে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন দেবতারা।

রাজা বললেন, মানুষের নৈষ্ঠিক তপস্যা দেখলে দেবতাদের ভয়ের কারণ আছে বটে। হ্যাঁ, তারপর—

অনসূয়া বললো, দেবতারা সেই তপস্যা ভাঙবার জন্য স্বর্গ থেকে মেনকা নামে এক অপ্সরাকে পাঠালেন বিশ্বামিত্রের সামনে। তখন বসন্তকাল, তার ওপরে বাতাসে বাতাসে সেই অপ্সরার বসন....ইয়ে··· মেনকার পাগল-করা রূপ দেখে···ইয়ে মানে···

রাজা হেসে বললেন, বুঝেছি, তারপর কী হলো তা তো বোঝাই যাচ্ছে। ইনি তা হলে সেই অপ্সরার গর্ভের সন্তান?

অনসূয়া বললো, হ্যাঁ মহারাজ। নদীতীরে পড়ে থাকবার সময়, সেই শিশুর মুখে যাতে রোদ না লাগে, তাই শকুন্ত অর্থাৎ পাখিরা ডানা মেলে এর মুখ ঢাকা দিয়ে রেখেছিল বলে এর নাম রাখা হয়েছে শকুন্তলা।

রাজা অত্যন্ত পুলকিত হয়ে বললেন, এবার সব বুঝলাম! মানুষের ঘরে তো এত রূপবতী কন্যা জন্মাতে পারে না। এ যে স্থির বিদ্যুৎ, মর্ত্য-জগতে এর সৃষ্টি হয় না। এমন কি এই রূপকে দেব-দুর্লভও বলা যায়। আপনারা হয়তো জানেন না, আমি বহু দেশ ঘুরেছি, কিন্তু এমন লাবণ্যময়ী রমণী কোথাও দেখিনি।

সামনা-সামনি রূপের এত প্রশংসা শুনে শকুন্তলার মুখে একই সঙ্গে লজ্জা, খুশি, ভয় ও কোপের ছায়া পড়লো। সে আর চোখ তুলে চাইতে পারলো না।

শকুন্তলার লজ্জারুণ মুখখানি যত দেখছেন, ততই রাজা দুষ্মন্তের কামনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি মনে মনে বলছেন, একে আমার চাই, একে কি আমি পাবো না? সঙ্গে সঙ্গেই আবার মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হচ্ছে, আশা আছে, আশা আছে, আশা আছে।

কৌতুকপ্রিয়া প্রিয়ংবদা যেন অনেকটা বুঝতে পেরেছে রাজার মনোভাব। সে হেসে বললো, হে আর্য, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি যেন আরও কিছু বলতে চাইছেন!

রাজা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, আপনি ঠিক ধরেছেন। আপনার এই সখী সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা জানতে চাই। যদি অবশ্য কোন বাধা না থাকে।

প্রিয়ংবদা বললো, বলুন না, আপনার দ্বিধার কোনো কারণ নেই, আশ্রমের তপস্বীদের কাছে যে কোনো প্রশ্নই করা যায়।

রাজা এবার সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, আপনাদের এই সখী কি ব্রহ্মচারিণী থাকবেন, এমন কিছু ঠিক আছে? এঁর বিবাহ বা প্রণয় ব্যাপারে কি কোনো বিধিনিষেধ আছে? এঁর চক্ষু দুটি অবিকল হরিণীর মতন, উনি কি সারা জীবন এই আশ্রমের হরিণীদের সঙ্গেই কাটাবেন?

প্রিয়ংবদা বললো, অন্যান্য মেয়েদের মতন আমাদের সখী শকুন্তলাও ওর পিতার অধীনা। তবে যোগ্য পাত্রের সন্ধান পেলে তার হাতে মহর্ষি কন্ব একে অর্পণ করবেন, তা জানি।

রাজা দুষ্মন্ত যেন উল্লাসে ফেটে পড়বেন। যোগ্য পাত্র! এই বসুন্ধরায় তাঁর চেয়ে যোগ্য পাত্র আর কে আছে! তা হলে আর কোনো সংশয় রইলো না! প্রথমে যাকে দেখে তিনি ভেবেছিলেন জ্বলন্ত আগুন, এখন বুঝতে পারছেন সে আসলে একটি উজ্জ্বল রত্ন,

যাকে অনায়াসে স্পর্শ করা যায়। শকুন্তলা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে রাগতভাবে বললো, আমি চললাম!

অনসূয়া বললো, কেন রে, চলে যাচ্ছিস কেন?

শকুন্তলা বললো, দ্যাখ না, প্রিয়ংবদা কী সব আজেবাজে কথা বলছে। আমি আর্যা গৌতমীকে সব বলে দিচ্ছি গিয়ে।

অনসূয়া বললো, ওমা, অতিথি বসে রয়েছেন, আর তুই চলে যাবি! এটা মোটেই উচিত নয়।

দুষ্মন্ত লাফিয়ে উঠে শকুন্তলার হাত ধরতে গিয়েও নিরস্ত হলেন। এখনি এতটা বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। তবু সেই বসে থাকা অবস্থাতেই যেন তিনি মনে মনে শকুন্তলাকে স্পর্শ করে এলেন।

শকুন্তলাকে প্রস্থানোদ্যত দেখে প্রিয়ংবদা বললো, ওমা, তুই চলে যাচ্ছিস যে বড়! আগে ধার শোধ করে যা!

শকুন্তলা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ধার! কিসের ধার!

প্রিয়ংবদা বললো, তোর হয়ে যে দু কলসি জল এনে আমি গাছে দিলাম। এবার তুই আমার হয়ে দু কলসি জল এনে দে।

রাজা ওদের কথার মধ্যে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, না, না, ওঁকে আর জল আনতে বলবেন না। অনেকক্ষণ ধরে জল বয়েছেন বলে ওঁকে বেশ পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে। জলের ঘট তুলে তালু দুটি রক্তবর্ণ, কাঁধ দুটো যেন নুয়ে পড়েছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য ওঁর বুক কাঁপছে। কানের লতিতে গড়াচ্ছে ঘাম, কানের শিরীষ ফুল দুটি যেন বসে গেছে আঁট হয়ে। চুলগুলো বোধ হয় এক হাতে জড়িয়ে কবরী বাঁধতে গিয়েছিলো, কিন্তু সব এলোমেলো হয়ে গেছে। কিছু যদি না মনে করেন, তা হলে ওঁর হয়ে ঋণটা আমিই শোধ করছি। এই আংটিটা নিন।

রাজা আঙুল থেকে অঙ্গুরীয়টি খুলতে গেলেন, কিন্তু তার আগেই অঙ্গুরীয়টি দেখে চমকে উঠে প্রিয়ংবদা রাজার মুখের দিকে তাকালো।

অঙ্গুরীয়টিতে রাজচিহ্ন অঙ্কিত।

তখনো আত্মপরিচয় না দিয়ে রাজা বললেন, না, না, ভুল বুঝবেন না, এটি রাজা আমাকে উপহার দিয়েছেন।

প্রিয়ংবদার আর কিছুই বুঝতে বাকি নেই। সে একবার রাজার মুখের দিকে আর একবার শকুন্তলার দিকে তাকালো। প্রথমে সে রাজাকে বললো, ও আংটি আপনার আঙুলেই থাক, আপনার মুখের

কথাতেই আমার সখী ঋণমুক্ত হয়েছে। তারপর শকুন্তলাকে বললো, ওলো সই, তুই এঁর কৃপায় অথবা মহারাজার কৃপায় ঋণমুক্ত হয়েছিস। এখন ইচ্ছে হলে যেতে পারিস।

শকুন্তলা আর চলে যাবার কোনো লক্ষণ দেখালো না, সে গ্রীবা বাঁকিয়ে সামান্য পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে অভিমানের সঙ্গে বললো, আমি যাবো না থাকবো, সে সম্পর্কে তুই বলবার কে রে? আমার ইচ্ছে হলে যাবো, না হলে যাবো না!

প্রিয়ংবদা বললো, তবে তোর যা ইচ্ছে কর।

রাজা বুঝলেন, তিনি যেমন তীব্রভাবে চাইছেন এই মেয়েটিকে, এই মেয়েটিও তেমনই আকৃষ্ট হয়েছে তাঁর দিকে। এই কথা ভেবেই তাঁর আরও বেশি পুলক হলো। জোর করে তো পাওয়াই যায় অনেককে। কিন্তু তাতে আর সুখ নেই। বন-কুসুম আর বাগান থেকে ছিঁড়ে আনা ফুলের গন্ধ যেন কিছুতেই এক হয় না। এই মেয়েটির দৃষ্টি চঞ্চলা, রাজার সঙ্গে এখনো কোনো কথা বলছে না বটে, কিন্তু তিনি কথা বলতে শুরু করলেই উৎসুক ভাবে তাকাচ্ছে রাজার দিকে। কিন্তু কন্বঋষি ফিরে আসা পর্যন্ত কি তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে? কবে ফিরবেন তিনি তার ঠিক নেই, ততদিন রাজা ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবেন কি? তার আগেই এই বন-কুসুমটির আঘ্রাণ তিনি নিতে চান, কিন্তু জোর করে ছিঁড়ে নিয়ে নয়।

এই সময় দূরে একটা ঘোষণা শোনা গেল। কে যেন আশ্রম-বাসীদের সাবধান করে দেবার জন্য উচ্চ স্বরে বললো, তপস্বীরা সবাই শুনুন, তপোবন রক্ষার জন্য সবাই সজাগ হোন! রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়ায় বেরিয়ে তপোবনের খুব কাছে এসে পড়েছেন। তাঁর সেনা-বাহিনীর অশ্বক্ষুরের ধুলোয় আকাশ রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। আশ্রমের গাছে গাছে মেলে দেওয়া ফিজে বল্কলে পঙ্গপালের মতন এসে পড়েছে সেই ধুলো। রাজার রথ দেখে একটি হাতি ভয় পেয়ে তপোবনে ঢুকে পড়ে সব তছনছ করছে। তপস্যাভঙ্গের মূর্তিমান বিগ্রহস্বরূপ এই হাতিটা থেকে সবাই সাবধান! এইমাত্র প্রচণ্ড আঘাত করায় একটা গাছের গায়ে বিঁধে গেছে তার দাঁত। অসংখ্য লতা জড়িয়ে গেছে তার গায়ে, সেগুলি সে ছিঁড়ে বেরুবার চেষ্টা করছে। হরিণ-শিশুরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পালাচ্ছে তাকে দেখে। সাবধান, সাবধান!

অনসূয়া বললো, ওমা, হাতিটা যদি এদিকে এসে পড়ে!

প্রিয়ংবদা বললো, এরকম বিপদের সময় আমাদের বাইরে থাকা উচিত নয়। হে আর্য, আমাদের অনুমতি দিন, আমরা কুটিরে যাই।

রাজা অনুতপ্ত হয়ে বললেন, ইস, ছি ছি, আমার লোকজনরা আমার খোঁজ করতে এসেই তপোবনে এরকম বিপত্তি ঘটিয়েছে। আমি এখনই ফিরে গিয়ে তাদের নিবৃত্ত করছি। আপনাদের কাছে আমি লজ্জিত।

অনসূয়া বললো, আর্য, আমরা আপনার যোগ্য অতিথি-সৎকার করতে পারিনি, সেজন্য আমরাও লজ্জিত।

রাজা বললেন, না, না, সে কী কথা! আপনাদের সঙ্গে যে দেখা হলো, এটাই আমার কাছে এক মস্ত পুরস্কার।

প্রিয়ংবদা বললো, আবার যদি আপনি আসেন, আর একবার যদি আপনাকে সেবা করবার সুযোগ দেন—

রাজা ব্যগ্র হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই।

দুই সখী এবার শকুন্তলার দিকে ফিরে বললো, তা হলে আর দেরি নয়, চল, এই বুঝি হাতিটা এদিকে এসে পড়লো।

ক্ষ্যাপা হাতির কথা শুনেও শকুন্তলা যেন তেমন বিচলিত নয়। ফিরে যেতে তার পা উঠছে না। একটুখানি গিয়ে বললো, দাঁড়া, আমার পায়ে বুঝি একটা কুশাঙ্কুর ফুটলো!

নিচু হয়ে সে পা থেকে কাঁটা তুলবার ছলে নিজের পায়ের বদলে দেখলো রাজার দিকে।

আবার খানিকটা গিয়ে সে সখীদের বললো, দাঁড়া, আমার বল্কলটা জড়িয়ে গেছে এই কুর্চি গাছের ডালে।

গাছের ডাল থেকে নিজের বল্কল-সাজ ছাড়িয়ে নেবার অছিলায় আবার সে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রইলো রাজার দিকে।

তারপর সখীদের তাড়নায় সে সত্যিই চলে গেল কুটিরের দিকে।

প্রথম সাক্ষাতে রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার একটিও বাক্য বিনিময় হলো না, তবু যেন তারা পরস্পর অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে রইলো।

রাজা ধীর পায়ে চললেন তপোবনের বাইরের দিকে। তাঁরও যেতে ইচ্ছে করছে না। এরপর আজ আর তাঁর নগরে ফিরে যাওয়ার একটুও সাধ নেই। তিনি ঠিক করলেন, কাছাকাছি কোথাও তাঁবু ফেলবেন।

বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে রাজার মনে পড়লো একটি পতাকার কথা। তিনি নিজেই যেন সেই পতাকা। দণ্ডের মাথায় পাতলা রেশমী কাপড়ের পতাকা ওড়ে। সেটা হাতে নিয়ে যখন কেউ ছুটে যায়, তখন দণ্ডটাই ধায় সামনের দিকে আর পতাকাটি যেন ছুটে যেতে চায় পেছনে। রাজার শরীরটা ছুটছে সম্মুখে, কিন্তু তাঁর মন ধেয়ে যাচ্ছে তপোবনের দিকে।

॥ ২ ॥

অরণ্যের মধ্যে কিছুটা ফাঁকা জায়গায় রাজবাহিনীর সারি সারি শিবির স্থাপিত হয়েছে। শিকার-অভিযানে বেরুবার সময়ও রাজার সঙ্গে বিশাল দলবল থাকে। সৈন্যসামন্ত, সেনাপতি, দৌবারিক, সভাসদ, পাত্রমিত্র, পাচক-ভৃত্য ছাড়াও রাজার মনোরঞ্জনের জন্য থাকে একদল নারী। রাজার কখন কী প্রয়োজন হয় সেদিকে নজর রাখার জন্য সকলেই সদা প্রস্তুত।

মাধব্য নামে রাজা দুষ্মন্তের এক প্রিয় বন্ধুও সব সময় রাজার সঙ্গে এই সব অভিযানে থাকে। সকলে তাকে বিদূষক বলে জানলেও এই মাধব্যই একমাত্র ব্যক্তি যে রাজার মুখের ওপর উচিত কথা শুনিয়ে দিতে পারে। রাজা অনেক ব্যাপারে এই মাধব্যের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করেন আবার অনেক সময় একে ভয়ও পান।

মাধব্য একজন খাঁটি নাগরিক স্বভাবের মানুষ। বন-জঙ্গলে বেশি ঘোরাঘুরি তার মোটেই পছন্দ হয় না। রাজার শখ, তাই তাকেও বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে, নইলে এই দারুণ গ্রীষ্মকালে বনবাস তার কাছে মোটেই সুখকর নয়।

মাধব্য নিজের হাতে শিকার করতেও ভালোবাসে না। শুধু শুধু বাঘ সিংহের পেছনে দুপুর রোদে দৌড়াদৌড়ি করে কী লাভ! তাছাড়া ঐ জন্তুগুলোকে অত কষ্ট করে মারবারই বা কী দরকার, ওদের মাংস তো মানুষের খাদ্য নয়। সেদিক থেকে হরিণ বা শূকর শিকার করার তবু একটা যুক্তি আছে, কারণ হরিণ ও শূকরের মাংস মাধব্যের খুব প্রিয়। তাও দিনের পর দিন জঙ্গলের মধ্যে ঝলসানো মাংস

খেতে হচ্ছে, এসব মাংস বাড়িতে তেল ঘি ও অন্যান্য সব মশলা দিয়ে রাঁধলে তবেই না উত্তম স্বাদ হয় !

যারা বুদ্ধির চর্চা করে, শারীরিক পরিশ্রম তাদের তেমন পছন্দ নয়। মাধব্যের অভ্যাস, রীতিমতন দেরিতে ঘুম থেকে ওঠা, কিন্তু এখানে তার উপায় নেই, ভোর হতে না হতেই সৈন্যরা পাখি শিকারের জন্য বন ঘিরে ফেলে বিষম হল্লা শুরু করে, তার মধ্যে ঘুমোয় কার সাধ্য। আবার সারাদিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে দৌড়াদৌড়ি করার জন্য শরীরের অষ্ট-গ্রন্থিতে ব্যথা হয়ে থাকে। সেইজন্য প্রথম রাত্রিতে ঘুমও আসতে চায় না।

মোট কথা, মাধব্যের মেজাজ-মর্জি বেশ খারাপ হয়ে আছে। সকাল বেলা নদীর জলে চোখ মুখ প্রক্ষালন করতে গিয়ে তার আর এক প্রস্ত রাগ হলো। গ্রীষ্মের নদী, এমনিতেই প্রায় শুকনো, তার ওপর আবার গাছের পাতা পড়ে পচে গিয়ে জল হলদে হয়ে আছে। রাজধানীতে সুগন্ধ গোলাপ জল দিয়ে যে প্রাতঃকৃত্য করে, তার কি এই জল পছন্দ হতে পারে ? আবার এই দুর্গন্ধযুক্ত নোংরা জলই পান করতে হচ্ছে।

কবে যে এখান থেকে ফেরা হবে, তারও ঠিক নেই। এমনিতে এই সময় ফেরারই কথা ছিল। কিন্তু নতুন একটি ফ্যাসাদ হয়েছে। কী কুক্ষণে যে রাজা দলবল ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে একা একা তপোবন আশ্রমে ঢুকে পড়লেন ! সেখানে আশ্রম-কন্যা শকুন্তলাকে তাঁর নজরে ধরে গেছে, আর তিনি এ জায়গা ছেড়ে নড়তে চাইছেন না। অন্য কোনো জনপদের কোনো সুন্দরীকে রাজার পছন্দ হলে চোখের নিমেষেই সেই রমণীকে রাজ-সন্নিধানে আনার ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু ঋষিকন্যাদের ওপর সে-রকমভাবে বলপ্রয়োগ করা যায় না। ওদের ধারে-কাছে যাওয়াই বিপজ্জনক। কোন ঋষি কখন ফট্‌ করে কী অভিশাপ দিয়ে বসবেন, তার ঠিক নেই। হয়তো ঋষি একটা ভেড়া না ইঁদুর বানিয়ে দেবেন !

সকাল থেকেই গনগনে রোদ, পত্রহীন গাছগুলিতে তেমন ছায়াও নেই, শিবিরের বাইরে দাঁড়িয়ে মাধব্য এই সব সাতপাঁচ ভাবছিলেন, এমন সময় দূরে দেখতে পেলেন রাজা দুষ্মন্তকে।

রাজাকে ঘিরে রয়েছে কয়েকটি যবনী রমণী, তারা পরিধান করে আছে ফুলের পোশাক। তারা বিভিন্নভাবে মনোরঞ্জনের চেষ্টা করছে

রাজার, কিন্তু তাঁর মুখখানি গম্ভীর, উদাসীন। তাই দেখে মাধব্য ভাবলেন, এখন আর ঐ যবনীদের পছন্দ হবে কেন, ওরা পুরোনো হয়ে গেছে।

পাছে রাজা এক্ষুনি আবার তাকে শিকারের সঙ্গী হতে বলেন, সেজন্য মাধব্য অসুস্থতার ভান করে হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে জবুথবু হয়ে রইলো।

রাজার ললাটে চিন্তার রেখা। তবু মাঝে মাঝে তাঁর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তিনি দুলছেন আশা-নিরাশার দোলায়। একবার তিনি ভাবছেন, ওকে আমি সহজে পাবো না জানি। কিন্তু ও কি আমায় চায়? যদি সেটুকু অন্তত জানতাম, তাতেও তৃপ্তি পেতাম অনেকখানি।

পরক্ষণেই তিনি মনে মনে হাসলেন। আমি যেমনভাবে ওকে চাই, আমার প্রেয়সীও ঠিক তেমনভাবেই আমায় চায়, এই রকম কল্পনা করে তো প্রেমিকরা বারবার ঠকে। তবে, শকুন্তলা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলেও তার দৃষ্টিতে কি ছিল না অনুরাগ? সে যখন চলে গেল, মৃদুমন্দভাবে দুলছিল তার নিতম্ব, তাতে কি তার মনের বিলাস ভাব প্রকাশ পায়নি? যেতে যেতে সে থেমে যাচ্ছিল, সে কি আমার জন্য নয়?

রাজা আবার ভাবলেন, প্রেমিকদের মতন আমিও কি সব কিছুই নিজের অনুকূলে কল্পনা করছি?

রাজাকে খুব কাছাকাছি দেখে মাধব্য বললো, হে বয়স্য, হাত পা আর চলতে চাইছে না, তাই দূর থেকেই আপনার জয় ঘোষণা করছি। জয়তু রাজা দুষ্মন্ত।

রাজা চমকে উঠে ঘোর ভাঙলেন। যবনী রমণীদের তিনি ইঙ্গিত করলেন চলে যাবার জন্য। তারপর তাঁর প্রিয় বিদূষককে অষ্টাবক্রের ভঙ্গিতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আবার কী হলো?

মাধব্য বললো, বাঃ, নিজেই চোখে খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করছেন, চোখ দিয়ে জল পড়ছে কেন?

রাজা বললেন, তার মানে?

মাধব্য বললো, নদীর ধারের বেতগাছ যে ঝুঁকে কুঁজো হয়ে যায়, তা কি তার নিজের ইচ্ছেয় না নদীর গতিবেগের জন্য?

রাজা বললেন, নদীর গতিবেগের জন্যই অবশ্য।

মাধব্য বললেন, তা হলেই বুঝে দেখুন, আমার এ অবস্থার জন্যও আপনিই দায়ী।

রাজা বললেন, সে কী? কেন?

মাধব্য বললো, আপনি ছিলেন রাজা, এখন হয়েছেন ব্যাধ। রাজকার্য সব জলাঞ্জলি দিয়ে বনে বনে জন্তু-জানোয়ারের পেছন পেছন ছুটছেন। এ কি আপনাকে মানায়? তা সে আপনার যা ইচ্ছে হয় করুন, কিন্তু এত ছুটোছুটি আমার শরীরে আর বইছে না! আজকের দিনটা অন্তত আমায় ছুটি দিন।

রাজা কোনো উত্তর না দিয়ে হাসলেন। তিনি ভাবলেন, বয়স্য আজ ঠিক তার মনের কথাটাই বলেছে। আর শিকারে প্রবৃত্তি নেই আমার। একবার শকুন্তলাকে দেখবার পর কি কারুর আর পশুবধে প্রবৃত্তি যায়? হরিণের চোখ দেখলে মনে হয় ওরাই যেন শকুন্তলাকে অমন মধুরভাবে দৃষ্টিপাত করতে শিখিয়েছে। সুতরাং হরিণদের ওপর আর আমার তীর বর্ষণ করতে ইচ্ছে হয় না।

রাজাকে নীরব দেখে মাধব্য বললো, আমার কথা কি শুনতে পেলেন না? আমি কি সত্যি সত্যি অরণ্য-রোদন করলাম? এত কী ভাবছেন, রাজা?

রাজা বললেন, তোমার কথাটাই ভেবে দেখছিলাম। তুমি বন্ধু হয়ে যখন এত করে বলছো, তা হলে আজ না হয় শিকার বন্ধই থাক।

মাধব্য বললো, বাঁচা গেল! আপনার পরমায়ু বৃদ্ধি পাক। আমি তাহলে গিয়ে একটু শুয়ে পড়ি।

রাজা বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও! তোমার সঙ্গে আমার কাজ আছে।

মাধব্য বললো, আবার কী কাজ?

রাজা বললেন, ভয় নেই, পরিশ্রম করতে হবে না এমন একটা কাজের ভার তোমার ওপর দিতে চাই।

মাধব্য বললো, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও খানিকটা পরিশ্রম করতে হয় বটে, কিন্তু সেটুকু পরিশ্রম করতে আমি রাজি আছি। আজ একটা বেশ জমাটি ভোজ হোক না।

রাজা বললেন, তোমার খালি খাওয়ার কথা। একটু অপেক্ষা করো।

তারপর গলা চড়িয়ে তিনি বললেন, এখানে কে আছো?

সঙ্গে সঙ্গে দৌবারিক এসে রাজাকে প্রণাম করে দাঁড়ালো। রাজা তাকে বললেন, রৈবতক, সেনাপতিকে একটু ডেকে আনো তো!

সেনাপতি কাছাকাছিই ছিলেন, তিনি এসে উপস্থিত হলেন অবিলম্বে। মাধব্যের ভাবভঙ্গি দেখেই সেনাপতি বুঝলেন যে, রাজার প্রিয় বয়স্য আজ শিকারের ব্যাপারে বাগড়া দিচ্ছে।

তাই সেনাপতি এসেই শুরু করলেন শিকারের গুণ বর্ণনা। তিনি বললেন, মহারাজের জয় হোক। মহারাজ, এই ক'দিন শিকারে এসে আপনার স্বাস্থ্যের কিন্তু চমৎকার উন্নতি হয়েছে। অনবরত তীর চালনা করায় আপনার বাহু দু'টি হয়েছে সুদৃঢ়। রোদে পুড়ে জলে ভিজেও আপনাকে ক্লান্ত হতে দেখি না। আপনার দেহ থেকে কিছুটা মেদ ঝরে গেছে বলে আপনাকে আরও শক্তিমান দেখায়। মহারাজ, বন ঘিরে ফেলা হয়েছে, হিংস্র জন্তুগুলো কোথায় লুকিয়ে আছে তাও আমরা জেনে গেছি। আর দেরি করে লাভ কী, মহারাজ শিকারে বেরুবেন না?

রাজা একটু বিব্রত হয়ে বললেন, সেনাপতি, এই মাধব্য আমার কাছে শিকারের এমন নিন্দে করলে যে আজ আর যেন উৎসাহ পাচ্ছি না।

সেনাপতি আর মাধব্যতে চোখ ঠারাঠারি হলো। জীবজন্তু শিকারের বদলে এখন কোন্ শিকারে যে রাজা উৎসাহী, তা জানতে সেনাপতিরও বাকি নেই। তবু রাজাকে আর একটু পরীক্ষা করে দেখবার জন্য তিনি মাধব্যের সঙ্গে কৃত্রিম ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে বললেন, মহারাজ, এ মূর্খটা শিকারের বোঝেটা কী? ওর পরামর্শ আপনি শুনছেন? আপনি নিজেই দেখুন, আপনার পেটের স্থূলতা কতখানি কমে গেছে, শরীর কত হালকা হয়েছে। আপনি এখন অনেক কঠিন কাজ অনায়াসে করতে পারেন। তাছাড়া মহারাজ, শিকারের মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় ব্যাপারও আছে। ভয় পেলে কিংবা রেগে গেলে প্রাণীদের ব্যবহারের কী পরিবর্তন হয়, সেটা স্বচক্ষে দেখা যায়। ছুটন্ত প্রাণীর ওপর ঠিক ঠিক বাণ মারতে পারলে লক্ষ্যভেদের আনন্দে শরীরে উত্তেজনা আসে। সর্বক্ষণ আপনাকে রাজকার্য নিয়ে চিন্তা করতে হয়। সেইজন্যই শিকারের মতন আমোদ-প্রমোদ আপনার দরকার, তাতে হালকা হয় মস্তিষ্ক। কে বলেছে, শিকার করা অন্যায়?

মাধব্য তেড়ে উঠে সেনাপতিকে বললো, তুই তো শুধু যুদ্ধ করতেই জানিস, বুদ্ধি তোর লবডঙ্কা। রাজাকে আবার মিথ্যে প্ররোচনা দিচ্ছিস ? যা, এখান থেকে দূর হয়ে যা। আমি মহারাজকে ঠিক কথাই বুঝিয়েছি, উনি আজ বিশ্রাম নেবেন। তোর ইচ্ছে হয়, যত ইচ্ছে জন্তু-জানোয়ার মারগে যা ! তারপর দেখিস, একদিন একটা ভাল্লুকে তোর নাক কামড়ে দেবে !

রাজা ওদের থামিয়ে দিয়ে বললেন সেনাপতি, আমরা অহিংসা, তপোবন–আশ্রমের কাছাকাছি রয়েছি, এখানে শিকারের উৎপাত না করাই ভালো। আজ বনের পশুদেরও ছুটি দেওয়া যাক। আজ বন্য মহিষরা প্রাণের আনন্দে জলাশয়ে নেমে শিঙ দিয়ে জলের সঙ্গে খেলা করুক, হরিণের পাল আজকের দিনটায় নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াক। আমার ধনুকটারও গুণ আলগা করে ওকে আজ বিশ্রাম দিন।

সেনাপতি বললেন, মহারাজের যদি এরকম ইচ্ছে হয়, তবে তাই হোক।

রাজা বললেন, যারা বন ঘিরে ফেলতে গেছে, তাদের ফিরে আসতে বলুন। সবাইকে জানিয়ে দেবেন, কেউ যেন তপোবনে গিয়ে কোনো রকম বিঘ্ন না ঘটায়। ওখানে শিকার নিষিদ্ধ। সবাই তো জানে না, তপস্বীদের কতখানি শক্তি ! এমনিতে দেখতে শান্তশিষ্ট ভালো মানুষ, কিন্তু কখন যে আগুন হয়ে জ্বলে উঠবেন, তার ঠিক নেই।

মাধব্য সেনাপতিকে বললো, এবার হলো তো ? খুব যে ফুসলোতে এসেছিলি মহারাজকে, এবার যা, বিদায় হ !

সেনাপতি হাসি গোপন করে মাধব্যের দিকে চোখ মটকে অপসৃত হলেন।

সবাই চলে যাবার পর রাজা আর মাধব্য একটি গাছের ছায়ায় বসলেন পাশাপাশি শিলাসনে। রাজা তাঁর মনের কথাটা বলি বলি করেও বলতে পারছেন না বন্ধুকে। মাধব্য তো জানেই, কেন রাজা সবাইকে বিদায় করে শুধু তাকে কাছে রেখেছেন। কিন্তু সে-ও নিজে থেকে তুলবে না ও প্রসঙ্গ।

একটু পরে রাজা বললেন, তুমি তাকে দেখোনি ?

যেন কিছুই জানে না, এই ভাব করে মাধব্য জিজ্ঞেস করলো, কাকে ?

রাজা বললেন, তুমি চোখ থাকতেও কানা! সত্যিকারের দেখবার মতন যা, তাও তুমি দেখতে পাও না?

মাধব্য বললো, কেন আপনিই তো আমার সামনে রয়েছেন। এর চেয়ে ভালো দেখবার মতন জিনিস....

রাজা বললেন, আপনজনকে সবাই ভালো দেখে। আমি সে কথা বলছি না, আমি বলছি শকুন্তলার কথা।

মাধব্য সঙ্গে সঙ্গে বললো, ও, সেই ঋষিকন্যা! আবার তার দিকে নজর কেন? সে বেচারীকে শান্তিতে থাকতে দিন না! আপনার মতন অতবড় একজন রাজা একজন সামান্য ঋষিকন্যায় আসক্ত হবেন, এটা ভাবা যায় না!

রাজা বললেন, প্রথম কথা, সে সামান্য নয়। দ্বিতীয় কথা, ঋষি-কন্যায় আসক্ত হওয়া কি কোনো রাজার পক্ষে নিষিদ্ধ? শোনো, আমি পুরু বংশের সন্তান, কোনো নিষিদ্ধ ব্যাপারে আমার মন ধায় না। সে ঋষিকন্যা হলেও তার মা এক অপ্সরা। তার শরীরে আছে ক্ষত্রিয় রক্ত। পরিত্যক্ত অবস্থায় তাকে পেয়ে মহর্ষি কন্ব তাকে লালন করে-ছেন। সে যেন এক বৃন্তচ্যুত নবমল্লিকা ফুল, পড়েছিল এক অর্কতরুর ওপর।

মাধব্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, বুঝলাম।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, কী বুঝলে?

মাধব্য বললো, মিষ্টি খেজুর খেয়ে খেয়ে মুখে অরুচি হয়ে গেলে তখন একটু তেঁতুলের টক খেতে ইচ্ছে হয়। এই মেয়েটি হচ্ছে সেই তেঁতুলের টক।

রাজা বললেন, মোটেই না! তুমি তাকে দেখোনি, তাই একথা বলছো! সে যে কী সুন্দর—

মাধব্য বললো, আপনি তো তাকে দেখেছেন, আপনার চোখ দিয়েই আমার দেখা হয়ে গেছে! সে যে সুন্দর, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সুন্দর না হলে আর আপনার মন উচাটন হবে কেন?

রাজা আচ্ছন্নভাবে বললেন, তার রূপের কথা কী করে তোমায় বোঝাবো? শকুন্তলার তনুর ভঙ্গিমা দেখলে মনে হয়, আগে যেন একটি ছবি এঁকে তারপর তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অথবা, বিধাতা একে গড়বার সময় বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য এই একটি নারীতেই দিতে চেয়েছেন।

মাধব্য বললো, তা হলে তো বুঝতে হবে যে আর যত রূপসীদের আমরা দেখেছি, তারা সবাই হেরে গেছে এর কাছে।

রাজা বললেন, ঠিক তাই।

মাধব্য বললো, সময় বিশেষে-একটু ঘি-মাখা গরম ফেনযুক্ত ভাত-কেই মনে হয় শ্রেষ্ঠ খাবার। যখন পলান্ন-পায়সান্ন খেতে খেতে মুখে অরুচি ধরে যায়।

রাজা বললেন, মোটেই না! আবার তুমি ওরকম কথা বলছো! এ রূপ যে সত্যিই তুলনাহীন, যেন এমন একটি ফুল যার ঘ্রাণ এখনো কেউ নেয়নি, এমন একটি নতুন পল্লব, যাকে কেউ স্পর্শ করেনি, এমন এক মধু, যার স্বাদ কেউ জানে না। কিংবা এমন এক পুণ্য-ফল, যাকে ভাঙা হয়নি এখনো। জানি না কে প্রথম একে পাবে, বিধাতা কার ভাগ্যে ওকে দেবেন ঠিক করেছেন।

মাধব্য ব্যস্ততার ভান করে বললো, তাহলে তো এক্ষুনি একটা কিছু ব্যবস্থা করে ফেলতে হয়। ইঙ্গুদ তেল মাখা চকচকে টাকমাথা-ওয়ালা কোনো মুনি যাতে আগেই একে নিয়ে না নেয়, তা আটকাতে হবে।

রাজা বললেন, কিন্তু কী করে তা হবে? ওর পালক-পিতা কণ্ব যে আশ্রমে উপস্থিত নেই। কত দূরে গেছেন কে জানে?

মাধব্য বললো, সে তো এক হিসেবে ভালোই, পিতা মাতা উপস্থিত থাকলে প্রণয় ব্যাপারটা তেমন জমে না। তবে, তার আগে জানা দরকার, ঐ শকুন্তলা আগে থেকেই কারুকে মন দিয়ে ফেলেনি তো?

রাজা ব্যস্ত হয়ে বললেন, না, না।

মাধব্য জিজ্ঞেস করলেন, কী করে বুঝলেন? সে আপনার প্রতি অনুরাগের কোনো ইঙ্গিত দিয়েছে?

রাজা বললেন, মেয়েটি মনে হয় খুব লাজুক। তাছাড়া মুনিকন্যারা এমনিতেই খুব শিষ্ট স্বভাবের হয়। মেয়েটি আমার সঙ্গে কথা বলেনি, অথচ মনে হয়েছে যেন কথা বলতে চায়, চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে, অথচ যেন আমাকেই দেখছিল। সে তার অনুরাগ প্রকাশও করেনি, গোপনও করেনি, এ রকমই তো মনে হলো।

মাধব্য বললো, তার বেশি আর কী করবে? প্রথম দেখামাত্রই সে আপনাকে আলিঙ্গন করবে, এমন আশা করেননি নিশ্চয়ই?

রাজা বললেন, ওর ব্যবহারে খুবই শালীনতা ছিল, কিন্তু যখন ও চলে যায়, তখন একবার পায়ে কুশাঙ্কুর ফুটেছে বলে থামলো, সেটা বোধ হয় ভান। আর একবার বললো, গাছের ডালে তার পরিধেয় বল্কল আটকে গেছে, কিন্তু আসলে আটকায়নি।

মাধব্য বললো, ব্যস, ব্যস, ওতেই বোঝা গেছে। এবার তপোবন-টিকে আপনি উপবন করে তুলুন। সেটাই তো আপনি চাইছেন।

রাজা ঠিক বুঝতে পারলেন না যে মাধব্য তাঁকে ব্যঙ্গ করছে কিনা। তিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে। মাধব্যের মুখে মৃদু হাসি।

আঙুল দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে কাটতে মাধব্য বললো, বন্ধু, আপনি তপোবনে শিকার করতে নিষেধ করেছিলেন, এবার নিজেই তো শিকারী হলেন।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, তার মানে?

মাধব্য বললো, আপনি এক সরলা আশ্রমবালার হৃদয় শিকারে উদ্যত হয়েছেন। না, না, আমি আপনাকে নিবৃত্ত করছি না। রমণীর হৃদয় শিকার অতি উত্তম ব্যাপার।

রাজা বললেন, কিন্তু কী করে সেটা হবে তাই বলো না?

মাধব্য বললো, সোজা তপোবনে চলে যান।

রাজা একটু লজ্জিতভাবে বললেন, কয়েকজন ঋষি আমায় চিনে ফেলেছে মনে হয়। এখন তপোবনে যাবার জন্য একটা উপলক্ষ তো দরকার! কোন্ ছুতোয় যাই বলো দেখি? সেই পরামর্শই তো চাইছি!

মাধব্য বললো, আপনি রাজা, আপনার আবার উপলক্ষের দরকার? আশ্রমে গিয়ে বলুন, প্রজারা সবাই তাদের উৎপাদনের এক ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসেবে দেয়। তোমরাও তো যথেষ্ট নীবার শস্য জমিয়েছ দেখছি। আমার রাজস্বের ভাগ দাও!

রাজা রেগে গিয়ে বললেন, এই তোমার বুদ্ধি! আমি আমার প্রিয়তমার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়ে আশ্রমে রাজস্বের ভাগ চাইবো?

মাধব্য হাসতে লাগলো।

রাজা বললেন, মূর্খ! তপস্বীরা না চাইতেই আমাদের যা দেন,

তা এক রত্নভাণ্ডারের চেয়েও অনেক বেশি। অন্য অন্য প্রজারা দেয় শস্য কিংবা ধন। আর তপস্বীরা দেন তাঁদের এক ষষ্ঠাংশ ফল।

মাধব্য তখনো হাসছে।

রাজা বললেন, হাসছো যে! তোমার কাছে পরামর্শ চাইলাম, আর তার বদলে তুমি পরিহাস করছো?

মাধব্য বললো, বয়স্য, পরিহাস সত্যিই করছি না। আমি একটা জিনিস শুনছি। দূরে কারা যেন কথা বলছে।

রাজাও উৎকর্ণ হয়ে শুনে বললেন, ধীর ও শান্ত কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে, যেন আশ্রম থেকে কারা এসেছে।

মাধব্য বললো, আমিও সে রকমই আশা করছিলাম।

তখনই দৌবারিক এসে বললেন, মহারাজের জয় হোক। দু'জন ঋষিকুমার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

রাজা বললেন, নিয়ে এসো তাঁদের।

দৌবারিক সঙ্গে নিয়ে এলো ঋষিকুমারদ্বয়কে।

প্রথা অনুযায়ী ওঁরা দু'জনে প্রথমে কিছুক্ষণ রাজার উদ্দেশে স্বস্তি ও প্রশস্তি বাক্য উচ্চারণ করতে লাগলেন।

একজন বললেন, কী আশ্চর্য তেজোদ্দীপ্ত এই রাজার মূর্তি! কিন্তু এঁর কাছে নির্ভয় চিত্তে যাওয়া যায়। ইনি গৃহে বাস করেও প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করে তপস্যার ফল অর্জন করেন। চারণরা এঁর গুণগান করে বেড়ায়, তা স্বর্গে পর্যন্ত পৌঁছায়। ইনি একই সঙ্গে রাজা এবং ঋষি।

দ্বিতীয় জন জিজ্ঞেস করলেন, ইনিই কি ইন্দ্রের সখা সেই দুষ্মন্ত?

প্রথম জন বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই।

দ্বিতীয় জন তখন বললেন, সেই জন্যই নগরদ্বারের অর্গলের মতন এঁর দীর্ঘ বাহু। ইনি যে সসাগরা পৃথিবীকে নিজ ভুজবলে শাসন করেছেন, তা এঁকে দেখলেই বোঝা যায়। দৈত্যদের সঙ্গে লড়াই শুরু হলে ইনি ইন্দ্রের পাশে ধনুর্বাণ নিয়ে দাঁড়ান, দেবতারা ইন্দ্রের মতন এঁর ওপরেও ভরসা রাখেন।

তারপর দু'জনে কাছে এগিয়ে এসে বললেন, হে রাজন, আপনার জয় চিরস্থায়ী হোক।

রাজা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের অভিবাদন জানালেন।

রাজাকে হাত তুলে আশীর্বাদ করার পর তপস্বীদ্বয় বললেন, মহারাজ, আমরা তপোবনের দূত হয়ে এসেছি। আপনি যে এখানে আছেন, তা আমরা জেনেছি। আশ্রমবাসীরা আপনার কাছে একটি প্রার্থনা জানিয়েছেন।

রাজা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তাঁরা কী আজ্ঞা করেছেন বলুন?

তপস্বীদ্বয় বললো, মহারাজ, মহর্ষি কণ্ব এখন আশ্রমে নেই। সেইজন্যই আশ্রমটিকে অনাথ মনে করে আজ প্রভাতেই একদল রাক্ষস আমাদের যজ্ঞকাজে বিঘ্ন ঘটিয়ে গেছে। সুতরাং মহারাজ, আপনি যদি কয়েকটি রাত আশ্রমে কাটিয়ে যান, তা হলে রাক্ষসরা ভয় পাবে, আর আসবে না। আশ্রমবাসীরা বিপন্মুক্ত হবেন। আমাদের সকলেরই এই ইচ্ছা।

রাজার মুখে সুখের হাসি ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, আপনাদের কথায় আমি অনুগৃহীত হলাম।

তারপরই তিনি দৌবারিককে হেঁকে বললেন, রৈবতক, শীঘ্র আমার সারথিকে রথ প্রস্তুত করতে বলো। আমার ধনুর্বাণও যেন সঙ্গে দেয়।

দুই তপস্বীকুমার বললেন, মহারাজের পূর্বপুরুষেরা যেমন ছিলেন, আপনিও তাঁদেরই অনুসরণ করে চলেছেন। পুরুবংশীয়রা সব সময়ই বিপন্নদের প্রতিপালক।

রাজা বললেন, আপনারা আশ্রমে গিয়ে সংবাদ দিন এবং সকলকে নিশ্চিন্তে থাকতে বলুন। আমি অবিলম্বেই যাচ্ছি।

সকলে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলে রাজা মাধব্যকে ঈষৎ বিদ্রূপ করে বললেন, দেখলে, তুমি তো কোনো উপায়-সন্ধানই বলতে পারলে না, অথচ কেমন সুযোগ জুটে গেল।

মাধব্য তখনও মুচকি হেসে বললো, তা ঠিক।

রাজা বললেন, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে নাকি? শকুন্তলাকে একবার দেখার কৌতূহল হচ্ছে না?

মাধব্য বললো, কৌতূহল তো ছিল বটেই। কিন্তু রাক্ষস-টাক্ষসের কথা শুনে আর যেতে সাহস হচ্ছে না।

এবার রাজা চটে উঠে বললেন, কী, তুমি এমন কথা বললে? তুমি আমার সঙ্গে থাকবে, তবু তোমার রাক্ষসে ভয়? কোন রাক্ষসের সাধ্য আছে যে আমার নাম শুনেও আমার সামনে আসতে পারে?

মাধব্য সঙ্গে সঙ্গে বললো, তা বটে, আপনার সঙ্গে থাকলে আবার ভয় কী ? তবু আমার না যাওয়াই বোধ হয় ভালো।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, কেন ?

মাধব্য বললো, আপনি যে উদ্দেশ্যে তপোবনে যাচ্ছেন, সেখানে একা যাওয়াই শ্রেয় নয় কী ? দোসর থাকলেই তো ঝঞ্ঝাট ! হে বয়স্য, প্রণয় ব্যাপারে কখনো দোসর সঙ্গে নিয়ে যেতে নেই।

রাজা তবু বললেন, ও-সব কথা শুনছি না। ওহে ভীরু, তোমাকে আমি নিয়ে যাবোই এবং রাক্ষসের সম্মুখে নিক্ষেপ করবো।

মাধব্য বললো, সে ব্যাপারেও একটু অসুবিধে আছে, মহারাজ ! ইদানীং রাক্ষস-টাক্ষস বড় দুর্লভ। আপনার সুশাসনের গুণেই রাক্ষস-দের আর বিশেষ দেখা যায় না।

রাজা বললেন, এই যে তপস্বীরা বলে গেল, তপোবনে আজ সকালেই রাক্ষসের উৎপাত দেখা দিয়েছিল।

মাধব্য বললো, আজ সকালে আমিই কিছু লোককে পাঠিয়েছিলাম রাক্ষসের মতন বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে তপোবনের ঋষিদের ভয় দেখিয়ে আসতে।

রাজা ভুরু তুলে বললেন, সে কি ? কেন ?

মাধব্য বললো, আপনার আশ্রমে গিয়ে কয়েক রাত্রিবাসের একটা উপযুক্ত উপলক্ষ তৈরি করার জন্য।

রাজা প্রথমে বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলেন মাধব্যের দিকে। তার-পর হো হো করে হেসে উঠলেন। মাধব্যও যোগ দিল সেই হাসিতে।

রাজা মাধব্যের পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন, বন্ধু, এইজন্যই তোমাকে এত প্রীতি করি। তুমি আগে থেকে সব ভেবে রাখতে পারো।

আরও একটুক্ষণ রাজা ও মাধব্য বিশ্রম্ভালাপ করছেন, এমন সময় হঠাৎ দৌবারিক এসে উপস্থিত। সে জানালো যে রাজধানী থেকে রাজার জননীর এক বিশেষ দূত এসেছে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

রাজা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। এই সময় মায়ের কাছ থেকে দূত ! নিশ্চয়ই বার্তা খুব জরুরী।

দূতের নাম করভক। সে এসে রাজাকে প্রণাম করে জানালো যে দেবী আদেশ করেছেন রাজাকে অবিলম্বে নগরে ফিরে যেতে। আজ

থেকে চার দিন পর তিনি পুত্রের দীর্ঘজীবন কামনায় পুত্রপিণ্ড পালন' ব্রত ও উপবাস করছেন। সেই সময় রানীমা তাঁর পুত্রের উপস্থিতি চান।

রাজা গম্ভীরভাবে বললেন, মায়ের আদেশ আমি শুনলাম। রৈবতক তুমি এখন করভকের বিশ্রাম ও স্নানাহারের ব্যবস্থা করে দাও।

তারপর রাজা বিবর্ণ মুখে মাধব্যের দিকে ফিরে বললেন, এবার কী হবে?

মাধব্য কৌতুক করে বললো, একেই বলে উভয়সঙ্কট।

রাজা বললেন, মাধব্য, তুমি হাসছো? তপস্বীদের কাছে আমি যাবো বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আবার এদিকে মাতৃ আদেশ অলঙ্ঘনীয়। দুটোর মধ্যে এখন আমি কোন দিকে যাই?

মাধব্য বললো, মাঝখানে ত্রিশঙ্কুর মতন ঝুলে থাকুন।

রাজা রাগতভাবে বললেন, তুমি জানো শুধু রসিকতা করতে। তোমার কাছ থেকে একটুও সাহায্য পাওয়া যায় না। পাহাড়ের সামনে বাধা পেয়ে নদীর স্রোত যেমন ভাগ হয়ে দু'পাশ দিয়ে বইতে থাকে, আমার মনও তেমনি দ্বিধান্বিত। বন্ধু, তুমিই একমাত্র আমায় এখন বাঁচাতে পারো।

মাধব্য বললো, আমি?

রাজা বললেন, আমার জননী তোমাকেও আপন সন্তানের মতন মনে করেন। সুতরাং আমার বদলে যদি তুমি যাও—

মাধব্য বললো, অথবা আপনিই জননীর কাছে যান, আমি আপনার বদলি হিসেবে শকুন্তলার কাছে গিয়ে প্রণয় নিবেদন করে আসিগে।

রাজা সদর্পে বললেন, মাধব্য!

যেন দারুণ ভয় পেয়েছে, এইভাবে মাধব্যের শরীর কাঁপতে লাগলো থরথর করে। তারপর শিলাসন ছেড়ে ভূমিতে বসে পড়ে বললো, আরে ছি ছি ছি, স্বয়ং মহারাজ যে রমণীকে মনোনীত করেছেন, তার দিকে কি আমাদের মতন ক্ষুদ্র ব্যক্তি নজর দিতে পারে! আমি শুধু পরীক্ষা করছিলাম—

রাজা বললেন, তুমি রাজধানীতে এখুনি যাবে কি যাবে না?

মাধব্য বললো, মধুর বদলে অনেক সময় গুড় দিয়ে কাজ চালানো যায় বটে, কিন্তু মায়ের কাছে ছেলের বদলে ছেলের বয়স্যকে দিয়ে কি কাজ চালানো যায়?

রাজা বললেন, শুধু বয়স্য কেন, তোমাকে কি আমি আপন সহোদরের মতন মনে করি না ?

মাধব্য বললো, এখন যে করছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আশা করি ভবিষ্যতেও আপনার একথা মনে থাকবে।

রাজা ব্যাকুলভাবে বললেন, তুমি আর বিলম্ব কোরো না। আমার প্রতিনিধি হয়ে তুমি আমার জননীর কাছে যাও। তাঁকে বুঝিয়ে বলো, আমি এখানে তপস্বীদের রক্ষার কাজে খুবই ব্যস্ত, তাই তোমাকে পাঠাচ্ছি।

মাধব্য কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, তপোবন যে সত্যিই বিপন্ন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি এখন এখান থেকে চলে গেলে সবাই ভাববে আমি রাক্ষসের ভয়ে পালাচ্ছি। তা আমাকে তো সবাই কাপুরুষ বলেই জানে, এতে আর নতুন কী অপবাদ হবে।

রাজা বললেন, তুমি কাপুরুষ, কে বলল ? তুমি ইচ্ছে করলে কী না পারো !

মাধব্য বললো, আপনার ভাই সেজে যেতে হলে তো আমাকে যুবরাজের মতন জাঁকজমকের সঙ্গে যেতে হয়। এত সৈন্যসামন্ত আর এখানে রাখবার দরকার কী, তারাও আমার সঙ্গে চলুক।

রাজা বললেন, ঠিক বলেছো। ওদের তো আর থাকবার প্রয়োজন নেই। ওদের হট্টগোলে তপোবনে অশান্তি হয়। ওরাও তোমার সঙ্গে চলে যাক।

মাধব্য বললো, আপনার পক্ষেও এখন নির্জনতা দরকার।

রাজা বললেন, তুমি তা হলে আর দেরি করো না, রওনা হয়ে পড়ো।

মাধব্য তখনও মৃদু হাস্যমুখে দাঁড়িয়ে রইলো দেখে রাজার মনে একটা খটকা লাগলো। তাঁর বন্ধু এই ব্রাহ্মণটি অতি বুদ্ধিমান এবং বেশি কথা বলতে ভালোবাসে। রাজধানীতে গিয়ে বিশেষত রাজ-অন্তঃপুরে যদি ও এখানকার সব কথা বলে দেয়, তা হলেই বিপত্তির সম্ভাবনা।

সেইজন্য তিনিও হালকা ভাবে হেসে বললেন, বয়স্য, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো, এতক্ষণ সবই পরিহাস করছিলাম। তপস্বীরা ডেকেছেন বলেই আমি কর্তব্যবোধে আশ্রমে থাকতে যাচ্ছি। সেই মুনিকন্যা সম্পর্কে আমার সত্যি সত্যিই কোনো অভিলাষ নেই।

আমরা নগরবাসী, আমাদের জীবনবোধ অন্যরকম, আর এরা মৃগশিশুর সঙ্গে বেড়ে ওঠা সরল মানুষ, আমাদের সঙ্গে কি আর ওদের মেলে ? সুতরাং আমি যে শকুন্তলাকে চাই, এ-কথা যেন তুমি সত্যি বলে ভেবো না।

মাধব্য বললো, মহারাজ, আপনার অভিলাষ সিদ্ধ হোক। নগরবাসীরা প্রণয় ব্যাপারে অভিজ্ঞ ও কামকলায় নিপুণ হয়। অরণ্য–বালিকারা সে সব কিছুই জানে না, তাদের হৃদয় পবিত্র-নির্মল, তারা মিথ্যে বলতে জানে না বলে সব কিছুই বিশ্বাস করে। নগর ও অরণ্য পরস্পরের পরিপূরক। তবু দেখবেন, যেন নগরের চাতুর্য অরণ্যের সারল্যকে নষ্ট না করে।

রাজা বললেন, তুমি যাও, কোনো চিন্তা করো না।

মাধব্য বললো, আপনি যে শিকারে যাচ্ছেন, তাতে রক্তপাত হয় না। কিন্তু অশ্রুপাত যেন না হয়, তা দেখবেন।

রাজা অন্তরের উত্তেজনা দমন করে যতদূর সম্ভব শান্ত ভাব এনে মাধব্যের স্কন্ধে একটি হাত রাখলেন। মাধব্যের ওষ্ঠে তখনো লেগেই রইলো সেই রহস্যময় হাস্য।

॥ ৩ ॥

এদিকে শকুন্তলা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার শরীর অবশ এবং উত্তপ্ত। গাছে গাছে জল-সিঞ্চনের কাজ আর সে করতে পারছে না, অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা তাকে নিয়ে চিন্তিত।

রাজা দুষ্মন্ত তপোবনে প্রবেশ করার পর ঋষিরা তাঁকে নিয়ে গিয়ে যজ্ঞস্থলে বসিয়ে রেখেছিল। অনার্যরা মাঝে মাঝে উৎপাত করে যজ্ঞ ভেঙে দিতে আসে। যজ্ঞের উপচার লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। পরম প্রতাপশালী রাজা দুষ্মন্ত উপস্থিত থাকলে তা কেউ কাছে ঘেঁসতে সাহস করবে না।

রাজা শকুন্তলাকে দেখার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু মুখে প্রকাশ করতে পারছেন না সে কথা। যজ্ঞ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁকে বসেই থাকতে হলো। তারপর তিনি ঋষিদের এড়িয়ে শকুন্তলার অন্বেষণে বেরুলেন।

তাঁর ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়ছে। শকুন্তলার সঙ্গে কোন সুযোগে

মিলন হবে, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। মুনিদের তপস্যার প্রভাবকে কে না ভয় পায়। শকুন্তলা আশ্রম-কুমারী, পিতার অধীনা, রাজা চাইলেই তো আর শকুন্তলাকে পেতে পারেন না।

অরণ্যপথে হাঁটতে হাঁটতে রাজা অভিসম্পাত দিচ্ছেন প্রণয়ের দেবতা মদনকে। মদন আর চাঁদ যেন দুই-ই সমান। কামার্ত মানুষেরা ওদের বিশ্বাস করে প্রতারিত হয়। মদনের পুষ্পবাণ আর চাঁদের শীতল কিরণও এক এক সময় যেন অসহ্য মনে হয়, চন্দ্রকিরণকে মনে হয় জ্বলন্ত অগ্নি আর পুষ্পবাণকে মনে হয় বজ্র।

আকাশে বিকেলের রঙ গাঢ় হয়ে এসেছে। রাজার মনে পড়লো, আগের দিন এই সময়ই মালিনী নদীর কাছেই এক কুঞ্জে সখীদের সঙ্গে শকুন্তলাকে গাছে জল দিতে দেখেছিলেন। রাজা সেই দিকেই এগোলেন।

তিনি দু'পাশে যা দেখছেন, তাতেই মনে পড়ছে শকুন্তলার কথা। কোনো ফুলগাছ দেখে মনে হয়, সদ্য সেখান থেকে ছেঁড়া হয়েছে ফুল, বৃন্তগুলো এখনো ভিজে ভিজে, রাজা ভাবলেন, নিশ্চয়ই শকুন্তলা গেছে এই পথে দিয়ে পুষ্প চয়ন করতে করতে।

বাতাসের স্পর্শ তাঁর এমন মধুর লাগছে যে, তাঁর মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই এই বাতাসে মিশে আছে শকুন্তলার অঙ্গের সুবাস। সম্ভোগ-বাসনায় রাজার শরীর উত্তপ্ত, মালিনী নদীর জলকণা-মিশ্রিত বাতাসকে তিনি যেন দু'হাতে আলিঙ্গন করলেন।

এক জায়গায় বালির ওপর দেখলেন কার পায়ের ছাপ। রাজার মনে হলো, নিশ্চয়ই শকুন্তলার। পায়ের ছাপটা সামনের দিকে একটু হালকা, পেছন দিকে গভীর, গুরু-নিতম্বিনী রমণীদেরই এমন পায়ের ছাপ হয়।

খানিক দূর যেতে যেতে তিনি দেখলেন, প্রিয়ংবদা কিছু মৃণাল-সমেত পদ্মপাতা আর কোনো একটা গাছের শিকড় বাটা প্রলেপ হাতে নিয়ে যাচ্ছে। রাজা অমনি গোপনে অনুসরণ করলেন তাকে।

প্রিয়ংবদা ঢুকে গেল একটা কুঞ্জের মধ্যে। সেখানে এসে আড়াল থেকে একটু উঁকি দিতেই রাজার বুক পুলকে কেঁপে উঠলো। এত-ক্ষণে জুড়িয়ে গেল তাঁর চোখ। তিনি দেখলেন, একটি পাথরের ওপর লতাপাতা ও ফুল-বেছানো শয্যায় শুয়ে আছে শকুন্তলা আর তাকে সেবা করছে তার দুই সখী।

তখনই দেখা না দিয়ে রাজা অন্তরালেই রইলেন। সখীদের সঙ্গে শকুন্তলা কী কথা বলে, তাই তিনি শুনতে চান।

দুই সখী দুপাশে বসে পদ্মপাতা দিয়ে হাওয়া করছে শকুন্তলাকে। অনসূয়া জিজ্ঞেস করলো, কি রে, হাওয়াতে একটু ভালো লাগছে?

শকুন্তলা বললো, তোরা হাওয়া করছিস বুঝি? আমি বুঝতেই পারছি না। আমার শরীর যেন পুড়ে যাচ্ছে!

দুই সখী পরস্পরের দিকে উদ্বিগ্নভাবে তাকালো।

অসুখের কথা শুনে রাজাও একটু চিন্তিত হলেন। সত্যিই কি খুবই অসুস্থ শকুন্তলা? প্রচণ্ড রোদের তাপে এই অবস্থা হয়েছে তার?

ডালপাতা সরিয়ে রাজা একটু ভালো করে দেখলেন শকুন্তলাকে। তখন তাঁর মনে হলো, সে রকম আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। আজ যেন আরও বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। তার হাতে মৃণালের বলয় শিথিল হয়ে গেছে. স্তন দুটিতে ঠাণ্ডা কোনো প্রলেপ লাগানো, তবু তাকে দেখাচ্ছে যেন চন্দ্রলেখার মতন। রাজা ভাবলেন, কাম ও গ্রীষ্ম এই দুটিরই উত্তাপ যদি সমান বলেও ধরা যায়, তা হলেও কোনো যুবতী-শরীরে গ্রীষ্মের প্রকোপ এমন মোহময় রূপের সঞ্চার করতে পারে না।

শকুন্তলার দুই সখী ফিসফিস করে খানিকটা পরামর্শ করলো। প্রিয়ংবদা অনসূয়াকে বললো, সেই যেদিন প্রথম রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গে দেখা হলো, তারপর থেকেই শকুন্তলাকে এমনটি দেখছি। তোর তাই মনে হয় না?

অনসূয়া বললো, তুই ঠিকই বলছিস বোধহয়, আমারও তাই মনে হচ্ছিল। ওকে জিজ্ঞেস করেই দেখা যাক না।

অনসূয়া বললো, হ্যাঁরে শকুন্তলা, তোর অসুখটা কী ঠিক করে বলতো? খুবই গুরুতর অসুখ?

শকুন্তলা অর্ধেকটা শরীর তুলে বললো, তোরা কী বলতে চাইছিস? কী অসুখ তা তো আমি নিজেই জানি না।

অনসূয়া বললো, দ্যাখ ভাই, আমরা তো প্রেম-ভালোবাসার ব্যাপার কিছুই জানি না। কিন্তু কাব্যে, ইতিহাসে পড়েছি, হঠাৎ যারা দারুণ-ভাবে প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে, সেই কামসন্তপ্তদের এক রকম অবস্থা হয়। তোরও যেন অনেকটা সেই রকম লক্ষণ দেখছি। কিসের কষ্ট হচ্ছে, সত্যি করে আমাদের খুলে বল তো, আমরা ঠিক একটা কিছু ব্যবস্থা করবোই।

শকুন্তলা লজ্জায় মুখ ফেরালো। সে তার মনের কথা কেমনভাবে বলবে, তা সে জানে না। তার শরীর শীতল করার জন্য সখীরা পদ্মপাতা পেতে দিয়েছে, তবু সেই শয্যাও যেন তার কাছে মনে হচ্ছে তপ্ত কটাহ।

প্রিয়ংবদা বললো, তুই কেন চুপ করে আছিস রে, শকুন্তলা? মনের কথা এমনভাবে চেপে রাখিস না! দিন দিন যে শুকিয়ে যাচ্ছিস একেবারে। তোর শরীরের চেয়ে তোর ছায়াটি এখন বেশি লাবণ্যময়, সেই ছায়াটি তোকে ছেড়ে যায়নি এখনো।

আর একটু মুখ বাড়িয়ে রাজা ভাবলেন, তাই তো, আমি আগে ভুল বুঝেছিলাম, এখন দেখছি প্রিয়ংবদা ঠিকই বলেছেন! শকুন্তলার গাল দুটি যেন শুকনো শুকনো লাগছে, স্তনের চূড়া উচ্চ হয়ে নেই, কোমরটি যেন বেশি কৃশ আর দুই কাঁধে ক্লান্ত নুয়ে পড়া ভঙ্গি। তার তপ্ত কাঞ্চনবর্ণও যেন কেমন মলিন। তবে অতৃপ্ত মিলন-বাসনায় শরীরে যে প্রচণ্ড উত্তাপ জাগে, তাতেও এমন হয়। সেইজন্যই, পীড়িতা হলেও তাকে সুন্দর দেখাচ্ছে। এ যেন প্রবল গ্রীষ্মে নেতিয়ে পড়া মাধবীলতা, একটু জল-সিঞ্চনেই যে আবার সতেজ হয়ে উঠবে।

সখীরা বারবার পিড়াপিড়ি করায় শকুন্তলা বললো, ওরে আমার দুঃখের কথা আর তোদের বলে কী হবে? তাতে শুধু তোরাও দুঃখ পাবি।

দুই সখী একসঙ্গে বলে উঠলো, ওমা, তুই বুঝি আমাদের পর ভাবিস? তুই আমাদের বলবি না? আমাদের সঙ্গে দুঃখ ভাগ করে নিলে সে দুঃখ সহ্য করা অনেক সহজ হবে।

শকুন্তলা ব্রীড়ায় আনতমুখী হয়ে বললো, তপোবনের রক্ষক যে রাজর্ষি এসেছেন, তাঁকে প্রথম যেদিন দেখলাম, সেদিন থেকেই—

শকুন্তলা আর বলতে পারলো না, থেমে গেল।

দুই সখী বললো, থামলি কেন, বল!

শকুন্তলা বললো, সেদিন থেকে আমি মনে মনে ওঁকেই শুধু কামনা করছি। সেইজন্যই আমার এই অবস্থা।

রাজা আনন্দে বুক চেপে ধরলেন। আর কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ রইলো না। এবার তিনি শকুন্তলার নিজের মুখ থেকে শুনলেন যে সে তাঁকে চায়। গ্রীষ্মের শেষে আকাশের মেঘ যেমন মানুষকে তাপিত করে, আবার সেই মেঘ থেকেই শান্তিজল বর্ষিত হয়,

সে-রকম কামদেবও এতক্ষণ রাজার সন্তাপের কারণ হয়ে এখন আবার তিনিই হর্ষ এনে দিলেন।

মনের কথা একবার খুলে বলার পর শকুন্তলার আর লজ্জা রইলো না। সে সখীদের জড়িয়ে ধরে কাতরভাবে বললো, ওরে, তোরা বল না, আমি কী করে সেই রাজার করুণা পাবো? নইলে আমি যে আর বাঁচবো না! তোরা সাহায্য না করলে আমার কিছুই হবে না।

প্রিয়ংবদা অন্য সখীর দিকে চেয়ে বললো, অনসূয়া, ও রাজাকে এতখানি ভালোবেসেছে, আর তো ফেরার পথ নেই। তা ছাড়া ও ভুল মানুষকে বাছেনি; পুরু বংশের অলঙ্কার ওর মনের মানুষ। ও সৌভাগ্যবতী!

অনসূয়া বললো, ঠিক বলেছিস।

প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে বললো, সখি, আমাদের সকলের সৌভাগ্য যে, তুই এমন মানুষকে আকাঙ্ক্ষা করেছিস। মহানদী তো সাগরে গিয়েই মেশে। সহকার বৃক্ষই তো মাধবীলতার শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

অনসূয়া বললো, কিন্তু শকুন্তলার যা অবস্থা দেখছি, তাতে এক্ষুনি কিছু একটা করা দরকার! আর সেটা করতে হবে গোপনে।

প্রিয়ংবদা বললো, এক্ষুনি ব্যবস্থা করাটা শক্ত কিছু নয়, কিন্তু গোপনীয়তা রক্ষা করার ব্যাপারটাই চিন্তা করতে হবে।

অনসূয়া বললো, তুই এক্ষুনি ব্যবস্থা করতে পারিস?

প্রিয়ংবদা বললো, আমি দেখে যা বুঝেছি, তাতে বলতে পারি যে, সেই রাজর্ষিও আমাদের সখীকে পছন্দ করেছেন খুবই। তিনি যেমন কোমলভাবে তাকাচ্ছিলেন, তাতেই প্রকাশ পাচ্ছিল ওঁর বাসনা। তাছাড়া ক'দিন ধরে দেখছি, উনিও যেন তোরই মতন অনেকটা রোগা হয়ে গেছেন।

আড়াল থেকে একথা শুনে রাজা নিজের গায়ে হাত বুলোলেন। সত্যি নাকি? মনে হলো যেন তাঁর হাতের বলয় একটু আলগা আলগা লাগছে। যজ্ঞস্থলে বসে থাকার সময় কখন অজান্তে ঝরে পড়েছে অশ্রু, তাতে স্বর্ণালঙ্কারের মণিগুলি যেন একটু বিবর্ণ দেখাচ্ছে।

প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে বললো, সখি, এক কাজ কর, তুই তোর প্রিয়তমকে উদ্দেশ করে একটা চিঠি লেখ, আমি তা ফুলের সাজির মধ্যে লুকিয়ে রাজার কাছে পৌঁছে দেবো। রাজাকে বলবো, এই নিন আপনার প্রতি পূজার অর্ঘ্য।

অনসূয়া বললো, প্রিয়ংবদার মাথা থেকে ঠিক ঠিক বুদ্ধি বেরোয়। শকুন্তলা, তুই লিখবি চিঠি?

শকুন্তলা বললো, তোদের কথা তো অমান্য করিনি কখনো। কিন্তু কেমন ভাবে চিঠি লিখবো? কী কথা লিখবো? তিনি যদি আমায় অবজ্ঞা করেন?

রাজা আড়াল থেকে হাসলেন। তিনি ব্যাকুল হয়ে আছেন শকুন্তলার সঙ্গে মিলনের জন্য, সে আশঙ্কা করছে অবজ্ঞার। শকুন্তলা যেন মূর্তিমতী শ্রী, যে কেউ তাকে চাইলে পাবে না, কিন্তু শ্রী নিজেই যাকে দয়া করতে চায়, সে যে তা পরম আনন্দের সঙ্গে মাথায় করে রাখবে।

প্রিয়ংবদা বললো, তোকে অবজ্ঞা করবে? সখি, তুই জানিস না যে তুই পরম রমণীয়া! শরতের সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাকে কি কেউ চাদর দিয়ে ঢেকে আড়াল করে রাখে?

শকুন্তলা বললো, আচ্ছা তা হলে কী লিখবো? একটা শ্লোক ভাবি।

শকুন্তলা চিবুকে আঙুল দিয়ে বসলো। গভীরভাবে চিন্তা করছে বলে ওর একটা ভ্রূ উঁচু হয়ে উঠেছে, রোমাঞ্চিত হচ্ছে গাল দুটি।

লজ্জা ও খুশি মেশা সেই অপরূপ রমণী-রত্নের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন রাজা। তাঁর মানসপটে মুদ্রিত হয়ে গেল এই ছবিটি।

একটু পরে শকুন্তলা বললো, ওরে, একটা গানের শ্লোক মাথায় এসেছে, কিন্তু কিসে লিখবো সেই চিঠি?

প্রিয়ংবদা বললো, এখন ভূর্জপত্র খুঁজে আনতে গেলে আবার দেরি হয়ে যাবে, তুলিকাই বা পাবো কোথায়? তার চেয়ে বরং এই নে, এই যে পদ্মপাতা, শুক পাখির বুকের মতন সুমসৃণ, এর ওপর তোর সুচারু নোখ দিয়ে লিপি রচনা কর।

শকুন্তলা খুব মন দিয়ে তেমনভাবেই পদ্মপাতার ওপর রচনা করলো তার প্রেমপত্র। তারপর বললো, তোরা শুনবি?

দুই সখী বললো, বাঃ শুনবো না?

শকুন্তলা পড়তে লাগলো, আমি তো জানি না, ওগো নিষ্ঠুর, তোমার মনের কথা, অনঙ্গবাণে আমি যে দগ্ধ, আমি তব অনুগামিনী, আমার অঙ্গ তোমার জন্য ব্যাকুল, সন্তাপিত।

চিঠির বয়ান শুনে রাজা অতিশয় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারছেন না। এই চিঠি প্রিয়ংবদা তাঁর কাছে পৌঁছে

দেবে, তারপর তিনি উত্তর লিখবেন, এত দেরি তাঁর সইবে না। তা ছাড়া মাধব্য উপস্থিত নেই, এমন সুন্দর শ্লোক বাঁধা চিঠি কে লিখে দেবে তাঁর হয়ে?

গাছপালা সরিয়ে রাজা হঠাৎ ওদের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। ওদের বিস্ময়ের সুযোগ না দিয়েই রাজা শকুন্তলাকে উদ্দেশ করে বললেন, হে তন্বি, কামদেব তোমায় সন্তাপিত করেছেন, কিন্তু আমার দিকে চেয়ে দ্যাখো, আমি যে দগ্ধ হচ্ছি। চাঁদ আর কুমুদিনী দুই–ই রাত্রে ফোটে, তবু দিনের প্রখর আলো কুমুদিনী কিছুটা সহ্য করতে পারলেও চাঁদ একেবারেই পারে না।

দুই সখী তাড়াতাড়ি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, স্বাগতম হে রাজন! আপনি আমাদের মনোরথকে ধন্য করলেন।

শকুন্তলাও শিষ্টাচার দেখাবার জন্য উঠে দাঁড়াতে রাজা তাকে বাধা দিয়ে বললেন, থাক, থাক তোমাকে আর উঠতে হবে না। পুষ্পশয্যায় শুয়েও তোমার কোমল শরীর কাতর, এখন আর লৌকিকতা প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই।

অনসূয়া বললো, হে রাজন, এই সামান্য প্রস্তরের আসন আপনার যোগ্য নয়, তবু এখানে বসে আমাদের ধন্য করুন।

রাজা সেখানেই বসে শকুন্তলার দিকে তাকালেন। কিন্তু অকস্মাৎ যেন রাজ্যের লজ্জা শকুন্তলাকে পেয়ে বসেছে, সে চাইতে পারছে না রাজার দিকে।

প্রিয়ংবদা বললো, হে রাজর্ষি, আপনাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ এখন আর আপনাদের দু'জনের কাছে অজানা নেই। তবু আমার অভিন্নহৃদয় সখীর হয়ে দুটো একটা কথা বলি?

রাজা বললেন, নিশ্চয়ই! কিছুমাত্র গোপন না করে সব বলুন। না-বলা কথায় অনেক দুঃখ থেকে যায়।

প্রিয়ংবদা বললো, আপনি এত বড় রাজ্যের রাজা, বিপন্ন প্রজাদের দুঃখ লাঘব করাই আপনার কর্তব্য।

রাজা বললেন, এ তো অতি সাধারণ কথা, আর কিছু বলবেন না?

প্রিয়ংবদা বললো, আমাদের এই প্রিয় সখীটিও বিপন্ন, আপনাকে উপলক্ষ করেই মদনদেব ওকে এই অবস্থায় এনেছেন। সুতরাং ওর জীবন রক্ষা করা এখন আপনারই কর্তব্য, এই আমাদের প্রার্থনা।

রাজা বললেন, হে চারুশীল, এ-কথা আমাদের দু'জনের পক্ষেই তো সমান। তবু আপনি যে প্রার্থনা জানালেন, সে জন্য আমি ধন্য হলাম।

শকুন্তলার হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ে গেছে। মুখখানা একটু বিবর্ণ হয়ে গেল। সে প্রিয়ংবদাকে ফিসফিস করে বললো, রাজা হয়তো আরও অনেককে ভালোবাসেন, তাদের বিরহে উনি কাতর, তুই আমার হয়ে আর জোর করতে যাস না ওঁর ওপরে।

রাজা সে কথা শুনতে পেয়ে বললেন, হে খঞ্জননয়না, আমার হৃদয়বাঞ্ছিতা, অন্য কারুর প্রতি আমার এখন আসক্তি নেই, আমি শুধু তোমাতেই মুগ্ধ। তবু তুমি যদি আমাকে অবিশ্বাস করো, তাহলে মদনশরে আমি তো একবার মরেছিই, তোমার কথায় আর একবার মরবো।

অনসূয়া বললো, রাজন, দোষ নেবেন না। আমরা শুনেছি, রাজাদের অনেক পত্নী থাকে। তাই আমাদের প্রিয় সখীর জন্য তার শুভার্থীরা যেন কখনো দুঃখবোধ না করে, সেটা মনে রাখবেন।

রাজা বললেন, আমার অন্তঃপুরে যে বহু স্ত্রী রয়েছেন, তা আমি অস্বীকার করি না। তবে এখন আমার প্রিয়তমা মাত্র দু'জন। এক এই সসাগরা পৃথিবী, আর একজন আপনাদের এই সখী।

দুই সখীর মুখই একসঙ্গে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। শকুন্তলাও এবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো রাজার দিকে।

প্রিয়ংবদা বললো, এই অনসূয়া, দ্যাখ, দ্যাখ, এ হরিণ শিশুটি কোথা থেকে যেন পথ ভুলে এখানে এসে পড়েছে। বেচারী ভয় পেয়ে খুঁজছে ওর মাকে। চল, আমরা ওকে ওর মায়ের কাছে দিয়ে আসি।

প্রিয়ংবদা অনসূয়ার হাত ধরে উঠে পড়লো।

শকুন্তলা কোনো পুরুষ মানুষের কাছে আগে কখনো একা থাকেনি। প্রিয়তমের পাশেও সে বসতে লজ্জা পেল। সে হাত বাড়িয়ে বললো, ওলো, দু'জনেই চলে যাচ্ছিস কেন? একজন আমার কাছে থাক অন্তত।

প্রিয়ংবদা বললো, সখী, পৃথিবীর যিনি সহায়, তাঁর কাছেই তো তোকে রেখে গেলাম।

তারপর মুখ টিপে হাসতে হাসতে প্রস্থান করলো তারা।

শকুন্তলা বললো, সত্যি ওরা চলে গেল?

রাজা শকুন্তলার একেবারে কাছে এসে বললেন, ওরা চলে গেল, কিন্তু আমি তো রয়েছি তোমার সেবক। কী সুন্দর তুমি, শকুন্তলা! এই পদ্মপাতায় আমি তোমায় হাওয়া করবো! পদ্মফুলের মতন রক্তিম তোমার দু'খানি পা আমার কোলে নিয়ে তোমার সেবা করবো!

রাজাকে এত কাছে দেখে শকুন্তলা অস্বস্তি বোধ করলো। সে বললো, আপনি পূজনীয়, আপনি অমন বলবেন না, তাতে আমারই অপরাধ হবে।

শকুন্তলা উঠে যাবার চেষ্টা করতেই প্রণয় কলাকুশলী রাজা দুষ্মন্ত তার হাত ধরে বললেন, কোথায় যাচ্ছো, হে সুন্দরী! এখনও দিনের আলো শেষ হয়নি, তোমার শরীর অসুস্থ, এখন বেরিয়ো না! এই পুষ্পশয্যায় জলে ভেজা শীতল পদ্মপাতা তোমার স্তনের আবরণ হয়ে আছে, তা ত্যাগ করে প্রখর রৌদ্রে তুমি কেন যাবে? ঝলসে যাবে যে তোমার কাতর কোমল অঙ্গ।

শকুন্তলা গ্রীবা তুলে ঈষৎ দুঃখ মিশ্রিত তেজের সঙ্গে বললো, হাত ছাড়ুন, হে পৌরব! শিষ্টাচার লঙ্ঘন করবেন না। কামপীড়িতা হলেও আমি কুমারী, আমি স্বেচ্ছাচারিণী হতে পারি না।

রাজা হাত ছাড়লেন না, শকুন্তলাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, তুমি কি গুরুজনদের ভয় পাচ্ছো? ভয় করো না। মহর্ষি কন্ব সর্বজ্ঞ, তিনি সব বুঝতে পারবেন। এতে তো দোষের কিছু নেই। আমি তো তোমায় বিবাহ করতে চাই। এখনি, এই মুহূর্তে।

শকুন্তলা বললো, এই মুহূর্তে বিবাহ? তা কখনো হয়?

রাজা বললেন, হ্যাঁ হয়, গন্ধর্বমতে, সেরকম বিধি আছে। পরে পিতামাতারা এই বিবাহের কথা জেনে তা অনুমোদনও করেন।

শকুন্তলা তবু চঞ্চল হয়ে উঠে বললো, আপনি এখন আমায় ছেড়ে দিন, আমি আগে সখীদের সঙ্গে পরামর্শ করে আসি।

রাজা বললেন, আচ্ছা, ছেড়ে দেবো একটু পরে।

শকুন্তলা বললো, কখন?

রাজা বললেন, দিচ্ছি, দিচ্ছি, তার আগে, হে বরাঙ্গিনী, কৃপা করে তোমার অধর সুধা একটু পান করতে দাও। আমি তৃষ্ণার্ত,

ভ্রমর যেমন নতুন ফুলের মধু আহরণ করে, আমিও একবার তোমার অস্পৃষ্ট ওষ্ঠাধরের স্বাদ নিই ?

রাজা জোর করে শকুন্তলাকে চুম্বনে উদ্যত হলে শকুন্তলা না না বলে তার রক্তাভ কোমল হাতের পাতা দিয়ে চাপা দিল নিজের মুখ।

বহু নারীর ভোক্তা রাজা দুষ্মন্ত জানেন যে রমণীরা প্রথমে এমনভাবে বাধা দেয়ই। এ বাধা অতিক্রম করা কিছুই না! শুধু একটু সময় লাগে।

কিন্তু আর একটি অপ্রত্যাশিত বাধা এসে গেল।

খুব কাছ থেকে শোনা গেল শকুন্তলার সখীদের কণ্ঠের এক সঙ্গীত। তার কথাগুলি এই রকম ঃ চক্রবাকী, সন্ধ্যা হলো, এবার তোমার বধূর কাছে বিদায় নাও!

গানটি শুনেই শকুন্তলা চকিতা হয়ে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে সরে গিয়ে রাজাকে মিনতি করে বললো, নিশ্চয়ই আমার অসুখ শুনে আর্যা গৌতমী আসছেন আমাকে দেখতে। আপনি গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ুন, এখানে আর থাকবেন না।

রাজা আর দ্বিরুক্তি না করে কুঞ্জের আড়ালে চলে গেলেন।

প্রায় তখুনি শকুন্তলার সখীদের সঙ্গে আর্যা গৌতমী এসে পড়লেন সেখানে। শকুন্তলার কপালে হাত দিয়ে বললেন, কেমন আছিস রে, বাছা? শরীরের তাপ কমেছে?

শকুন্তলা বললো, হ্যাঁ, অনেক কমেছে।

গৌতমী কুশের জল শকুন্তলার মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, দেখিস, এইবার একেবারে ভালো হয়ে যাবি।

তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্যাস্ত নিরীক্ষণ করে তিনি বললেন, বেলা পড়ে এলো, আর এখানে থেকে কী করবি? চল, এবার কুটিরে চল।

আর থাকবার উপায় নেই। এবার যেতেই হবে। তবু দু' পা এগোতে না এগোতেই শকুন্তলার চোখে জল এসে গেল, অনুতাপে পুড়ে গেল মন। এ সে কী করলো? ক'দিন ধরে ধ্যানজ্ঞানে যাঁকে সে চেয়েছে তিনি নিভৃতে এত কাছে আসবার পরও সে দ্বিধা-সঙ্কোচ ত্যাগ করতে পারলো না? অথচ এখন যে ফিরে যেতে তার মন চাইছে না!

যেন গাছদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে এইভাবে শকুন্তলা একবার

থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে বললো, হে লতাকুঞ্জ, আমায় এতক্ষণ আশ্রয় দিয়েছিলে। আমার সন্তাপ দূর করেছিলে। আমি আবার ফিরে আসবো, তোমার কাছে সুখ সম্ভোগ করবো।

সকলে চলে যাবার পর অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এলেন রাজা। শকুন্তলাকে স্পর্শ করার মোহসুখে এবং অতৃপ্তির উষ্মায় তাঁর হৃদয় মথিত হচ্ছিল। এত কাছে পেয়েও শকুন্তলাকে পাওয়া হল না। যা চাওয়া যায়, তা পাওয়ার পথে কত বিঘ্ন। তিনি রাজা, তাঁর চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে এতখানি ব্যবধান বা দূরত্ব দেখার অভ্যেস তাঁর নেই। তবু চুম্বনের জন্য তিনি মুখখানি এগিয়ে দেবার সময় শকুন্তলা যে হাত আড়াল দিয়ে না না করছিল, তখন কী অপরূপ দেখাচ্ছিল তাকে। মুখখানাকে বারবার ঘোরাচ্ছিল এদিক-ওদিক। শকুন্তলার চক্ষের পল্লবগুলি সুদীর্ঘ। সেই চোখ, সেই মুখ কত কাছে এসেছিল, তবু অধরে অধর স্পর্শ হলো না।

আফসোসে রাজা হাত ছুঁড়তে লাগলেন।

এখন তিনি কোথায় যাবেন? কোনো জায়গায় যেতেই তাঁর মন চাইলো না। বরং এই লতামণ্ডপে শকুন্তলার দেহ-সৌরভ, তার উপস্থিতির উষ্ণতা এখনো রয়ে গেছে, এখানেই থাকতে ইচ্ছে হলো তাঁর।

শকুন্তলা যে কুসুমশয্যায় শুয়েছিল, সেখানেই এসে বসলেন রাজা। শকুন্তলার বাহু থেকে খসে পড়া মৃণাল বলয় ছড়িয়ে আছে এদিক-ওদিক, এমন কি সেই নোখ দিয়ে পদ্মপাতার ওপর লেখা পত্রটিও।

সেই পত্রটি তুলে নিয়ে সতৃষ্ণভাবে রাজা সেটি পড়তে লাগলেন বার—বার। কিছুতেই যেন আশ মেটে না।

সেখানে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর রাজা শুনতে পেলেন, যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অংশ নেবার জন্য দূর থেকে মুনিরা তাঁকে ডাকাডাকি করছেন!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজা কুঞ্জ ছেড়ে যাত্রা করলেন যজ্ঞবেদীর দিকে।

॥ ৪ ॥

পরদিন সেই কুঞ্জে আবার রাজার সঙ্গে দেখা হলো শকুন্তলার। শকুন্তলা রাজাকে না দেখেও থাকতে পারে না, আবার রাজা কাছে

এলেই সে লজ্জায় অধোমুখী হয়। তার বরতনু রাজার সঙ্গে মিলনের জন্য উদগ্রীব, অথচ তার মনের মধ্যে দ্বিধা ও ভয়। সে আশ্রম-কুমারী, নারী-পুরুষের মিলন-রহস্য সে জানে না। এর মধ্যে যেন কী এক অসীম রহস্য জড়ানো। তা ছাড়া, সে পিতা কন্বের অনুমতি ছাড়া কখনো কোনো কাজ করেনি। এখন পিতার অনুপস্থিতিতে রাজার কাছে আত্মসমর্পণ করলে পিতা যদি রাগ করেন?

সখীরা এমন সুকৌশলে ব্যবস্থা করেছে যে কুঞ্জের মধ্যে রাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার নিভৃত আলাপের সময় কেউ অকস্মাৎ এসে বিঘ্ন ঘটাবে না।

রাজা দুষ্মন্ত অধীর হয়ে পড়েছেন। শকুন্তলার রূপ-লাবণ্য দেখে তিনি আর আত্ম সংবরণ করতে পাচ্ছেন না, তিনি শকুন্তলার লাবণ্যসলিলে মগ্ন হতে চান।

কামকলার যতগুলি অস্ত্র আছে, সব ক'টি পরপর প্রয়োগ করতে লাগলেন রাজা। শকুন্তলার মতন এক সরলবালা দুষ্মন্তের মতন এক ধুরন্ধর প্রণয়ীর কাছে আর কতক্ষণ আত্মরক্ষা করতে পারবে? তার আর বাধা দেবার শক্তি রইলো না।

রাজা তাকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হলে তবু শেষ মুহূর্তে শকুন্তলা নিজেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে অসহায়ভাবে বললো, আমার পিতা আমার বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন—

রাজা বললেন, আমি তোমাকে বিবাহ করবো। তোমার পিতা কি আমায় পছন্দ করবেন না?

শকুন্তলা বললো, পিতা যে আশ্রমে উপস্থিত নেই!

রাজা বললেন, তবু আমাদের বিবাহ সম্ভব। এই মুহূর্তেই। শোনো শকুন্তলা, ধর্মশাস্ত্রে আট প্রকার বিবাহের প্রথা আছে। যেমন, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। ভগবান স্বায়ম্ভুব মনু এইসব নিয়ম ঠিক করে দিয়েছেন, সুতরাং তেমোর বাবা এতে আপত্তি করতে পারেন না। এই আট রকম বিয়ের মধ্যে শুধু পৈশাচ বিবাহ রাজাদের পক্ষে নিষিদ্ধ, ওটা শূদ্রদের জন্য।

শকুন্তলা বললো, কিন্তু বিয়ের তো অনেক আয়োজন লাগে?

রাজা বললেন, রাক্ষস ও গান্ধর্ব বিবাহে কিছুমাত্র আয়োজন লাগে না। সব আয়োজন তো আমাদের শরীরে ও মনে। রাক্ষস মতে আমি এখনই তোমাকে সবলে হরণ করে গ্রহণ করতে পারি। তুমি

জানো, আমি যদি তোমায় হরণ করতে চাই, আমাকে বাধা দেবার সাধ্য কারুর নেই। কিন্তু তার চেয়েও ভালো গান্ধর্ব মত। সত্য করে বলো, শকুন্তলা, তুমি আমাকে চাও ?

শকুন্তলা মুখে কিছু না বললেও তার দৃষ্টি ও নীরবতাই বুঝিয়ে দিল তার সম্মতি।

রাজা বললেন, তুমি আমাকে মনে মনে চাও, আমিও তোমাকে তীব্রভাবে পেতে চাই। পরস্পরের সম্মতি গান্ধর্ব বিবাহের পক্ষে অতি প্রশস্ত।

তারপর রাজা নিজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় শকুন্তলার বাঁ হাতের অনামিকায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, এই মুহূর্তে আমাদের বিবাহ হলো। শকুন্তলা, তোমার স্বামী তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এই দ্যাখো ? এই বিবাহবন্ধন অবিচ্ছেদ্য।

ঠিক নববধূর মতন ব্রীড়ায় মাটিতে বসে পড়ে শকুন্তলা রাজার পদ-বন্দনা করলো।

রাজা বললেন, আর তুমি আমাকে ফেরাতে পারবে না। তুমি ধর্মপত্নী, তুমি আমার বক্ষে এসো।

শকুন্তলা বললো, যদি আমার—

রাজা তার মনের কথা বুঝে নিয়ে তৎক্ষণাৎ বললেন, তোমার গর্ভে পুত্র সন্তান হলে সে হবে যুবরাজ, সে-ই হবে পুরু বংশের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী।

কোনো রকম চিন্তা না করেই রাজা এই প্রতিশ্রুতি দিলেন শকুন্তলাকে। তারপর কামক্রীড়া কৌতুকে প্রমত্ত হলেন দু'জনে। সে যেন আকাশ ও পৃথিবীর মিলন, সে যেন শরীরের মধ্যে সমুদ্রের উপ-লব্ধি।

বিভোর আবেশে কাটলো পরপর কয়েকটি দিন। সম্পূর্ণ পরি-তৃপ্তির পর রাজার মনে আবার কর্তব্যজ্ঞান ফিরে এলো। অনেকদিন তিনি রাজধানীতে অনুপস্থিত। এবার নিশ্চয়ই তাঁর সন্ধানে দূত আসবে। না, আর দেরি করা যায় না। এবার ফিরতে হবে।

শকুন্তলার কাছে এ কথা উত্থাপন করাই খুব শক্ত কাজ, অনেক ভনিতা করে সে, কথা বলে ফেললেন রাজা।

শকুন্তলা আমূল চমকিত হয়ে বললো, আপনি চলে যাবেন ? আপনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন না ?

রাজা বললেন, তোমাকে নিয়ে যাবো না ? তুমি আমার প্রিয়তমা পত্নী ! কিন্তু তোমাকে নিয়ে যেতে হবে যোগ্য সম্মানের সঙ্গে। বিনা উৎসবে কি আমি নববধূকে নিয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করতে পারি ? তা ছাড়া, তোমার পিতা এখন উপস্থিত নেই, তার অনুমতি না নিয়ে তুমি যাবেই বা কী করে ? প্রিয়তমে, তুমি চিন্তা করো না, তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য আমি চতুরঙ্গিনী সেনাবাহিনী পাঠাবো।

শকুন্তলার কাতর অনুরোধেও রাজা আরও কিছুদিন থেকে যেতে সম্মত হলেন না। মহর্ষি কন্ব কবে ফিরবেন, তার ঠিক নেই, আর অপেক্ষা করা চলে না !

রাজা বিদায় নেবার মুহূর্তে শকুন্তলা অশ্রুভরা নয়নে জিজ্ঞেস করলো, আমি কতদিন অপেক্ষা করে থাকবো ? আপনাকে ছেড়ে যে আমার এক মুহূর্তও আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না !

রাজা শকুন্তলাকে প্রভূত আদর ও সান্ত্বনা দিলেন। তারপর বললেন, তোমার আঙুলে আমার যে অঙ্গুরীয় রয়েছে, তাতে আমার নামের অক্ষরগুলো গণনা ক'রো, সে ক'দিনের মধ্যেই আমার বাহিনী এসে পড়বে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য।

তারপর শকুন্তলার চক্ষে সর্বজগৎ শূন্য করে চলে গেলেন রাজা। এই তপোবনের বাইরের জগৎ সম্পর্কে কিছুই জানে না শকুন্তলা। সেখানকার একজন মানুষ এসে হরণ করে নিয়ে গেল তার হৃদয়। রাত্রির অন্ধকারে দিকভ্রষ্ট পথিকের মতন সে যেন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কিছুই চিনতে পারছে না।

শকুন্তলার আত্মা নিয়ে চলে গেছেন রাজা দুষ্মন্ত, আবার শকুন্তলার শরীরে তিনি তাঁর আত্মার একটি টুকরোও রেখে গেছেন। সেজন্য যখন তখন আবেগে চক্ষু মুদে আসে শকুন্তলার। শরীরের মধ্যে মৃদু কম্পন হয়।

সেই দিনই সন্ধ্যাকালে কুটিরদ্বারে বসে আছে শকুন্তলা। এমন সময় সেখানে এসে দাঁড়ালেন এক ঋষি। এই ঋষি এই আশ্রমনিবাসী নন। ইনি দূর থেকে এসেছেন কন্বমুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য।

সেই ঋষি শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললো, অয়মহং ভোঃ। ওহে এই যে আমি এসেছি।

কিন্তু শকুন্তলা সে কথা শুনতে পেল না। সে যে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। সে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু কিছুই দেখছে না! সে জেগে আছে, কিন্তু তার কানে কোনো শব্দ প্রবেশ করছে না। সুখের মিলন স্মৃতি এবং প্রিয় বিরহের ব্যথা একসঙ্গে মিশে আছে তার মনে। সে শুধু সেই দেবদুর্লভকান্তি রাজা দুষ্মন্তের কথাই ভাবছে।

পর পর দুবার একই কথা উচ্চারণ করলেন ঋষি, তবু শকুন্তলার হুঁস নেই! সে কী করবে, তার শরীরটা শুধু এখানে বসে কিন্তু মন যে নিরুদ্দেশ! পূর্ব পরিচিত মহ্যমান্য ঋষিকে সে গ্রাহ্যই করলো না। তখন ক্রোধে জ্বলে উঠলো ঋষির চক্ষু। চিত্তশুদ্ধির জন্য ইনি কঠোর তপস্যা করলেও ক্রোধের মতন রিপুটিকে জয় করতে পারেননি। যখন তখন অভিশাপ দিয়ে বসেন!

শকুন্তলা যে তখনই উঠে এসে পাদার্ঘ্য দিয়ে ঋষিকে বন্দনা করলো না, এতেই ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন সেই ঋষি। তিনি মনে করলেন, শকুন্তলা তাঁকে অবমাননা করছে।

অমনি তিনি অভিশাপ উচ্চারণ করে বললেন, অতিথির অবমাননা করিস তুই? আমি সামনে এসে দাঁড়িয়েছি; তাও তোর নজরে এলো না? ঠিক আছে, অনন্য মনে যার কথা তুই ভাবছিস, সে তোকে চিনতে পারবে না! পাগল যেমন কখন কী বলে সে কথা তার মনে থাকে না, তোর মনের মানুষটিও সে রকম সব ভুলে যাবে।

এ অভিশাপ শুনেও ভীত বা চমকিত হলো না শকুন্তলা। এই অভিশাপও সে শুনতে পায়নি যে! সে যেমন বসেছিল তেমনই বসে রইলো।

ঋষি আর দাঁড়ালেন না। পিছন ফিরে হনহন করে হেঁটে চলে গেলেন।

ঠিক তখনই আশ্রম-কুঞ্জে ফুল তুলতে তুলতে দুই সখী শকুন্তলা সম্পর্কেই কথা বলছিল। শকুন্তলার গান্ধর্ব মতে বিবাহ হয়েছে বলে দু'জনেই খুশি। শুধু চিন্তা এই যে, কন্বমুনি ফিরে এসে এ বিবাহ অনুমোদন করবেন কিনা? অনসূয়ার মনে একবার এই ভয়ও জেগেছিল, শকুন্তলাকে রেখে তো চলে গেলেন রাজা। রাজধানীতে তাঁর অন্তঃপুরে তো কত রূপসী স্ত্রী আছে, তাদের পেয়ে রাজা আবার শকুন্তলাকে ভুলে যাবেন না তো! প্রিয়ংবদার অবশ্য ধারণা, না, সেরকম

কিছু হবে না। রাজার সুন্দর মুখশ্রী দেখলেই বোঝা যায়, তিনি বিশ্বাস নষ্ট করতে পারেন না।

এমন কথা বলতে বলতে তারা হঠাৎ দেখলো, এক ঋষি রাগতভাবে শকুন্তলার সামনে থেকে চলে যাচ্ছেন। তাঁকে দেখেই ওরা চমকে উঠলো ভয়ে। এই ঋষিকে ওরা চেনে, ইনিই তো দুর্বাসা মুনি, এঁর কোপন স্বভাবের জন্য সবাই এঁকে ভয় পায়। বিমনা শকুন্তলা অতিথি সৎকার করতে পারেনি বলে উনি আবার শাপটাপ দিয়ে বসেননি তো! অমঙ্গল আশঙ্কায় প্রিয়ংবদার হাত থেকে পড়ে গেল ফুলের সাজিটা।

অনসূয়া দৌড়ে গেল ঋষির পিছু পিছু। বারবার মুনিকে অনুনয় করে বোঝাতে লাগলো যে, আপনি চলে যাবেন না, ফিরে আসুন, বসুন। আমরা এখুনি আপনার পাদ্যার্ঘ্যের ব্যবস্থা করছি।

কিন্তু দুর্বাসা আর কিছুতেই ফিরবেন না।

অনসূয়া কাতর ভাবে বললো, আমার সখীর ওপর রাগ করবেন না। ও তো অবোধ বালিকা, ও আপনার তপস্যার প্রভাবের কথা জানলে কখনো এমন করতো না। ও আপনার কন্যার মতন এই তো, ওর প্রথম আর একমাত্র অপরাধ, সেই হিসেবেও ওকে ক্ষমা করুন।

অনসূয়া দুর্বাসা মুনির পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে তিনি একটু নরম হলেন। তারপর বললেন, শোনো, আমার মুখের কথা তো কখনো ফেরে না। তবে এর প্রতিকারের উপায়ও বলে দিয়ে যাচ্ছি। অভিজ্ঞান হিসেবে কোনো কিছু দেখাতে পারলে, স্মৃতি ফিরে আসবে।

অনসূয়া ফিরে এসে সে কথা জানালো প্রিয়ংবদাকে। প্রিয়ংবদা বললো, তবু যাই হোক কিছুটা তো ছেড়েছেন। শকুন্তলার কাছে তো রাজার নাম লেখা আংটি আছেই। আয়, আমরা ওর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি।

আশ্রমের দিকে এগিয়ে এসে ওরা দেখতে পেল শকুন্তলাকে। আঙুলে থুতনি ঠেকিয়ে ঠিক একটি ছবির মতন বসে আছে।

প্রিয়ংবদা বললো, ইস, দ্যাখ, দ্যাখ, ও বেচারী স্বামীর চিন্তায় এমনই বিভোর হয়ে আছে যে ওর নিজের সম্পর্কেই কোনো হুঁশ নেই, ও কী করে এখন কোনো অতিথিকে দেখবে বল?

অনসূয়া বললো, তা হলে দুর্বাসা মুনির ব্যাপারটা আর এখন ওকে

বলবার দরকার নেই। এই অবস্থায় আরও ওর মনের কষ্ট কি বাড়ানো উচিত আমাদের ?

দুই সখী তখনকার মতন আর শকুন্তলার ধ্যান ভঙ্গ করলো না। তারা চলে গেল অন্য দিকে।

তারপর কাটতে লাগলো মাসের পর মাস। কোনো চতুরঙ্গ বাহিনী এলো না শকুন্তলাকে নিয়ে যাবার জন্য। এমনকি রাজার কাছ থেকে এলো না কোনো দূত। কিংবা একটা চিঠিও না।

শকন্তলা একটিও অভিযোগের কথা বলে না, শুধু পথের দিকে চেয়ে থাকে। আর সে আংটির অক্ষরগুলি গোনে। গুনে গুনে কত-বার যে শেষ করেছে তার ঠিক নেই। দুই সখী উৎকণ্ঠা ভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে শকুন্তলার দিকে আর তারা নিজেদের মধ্যে ফিস-ফিস করে আশঙ্কার কথা বলে। হঠাৎ একদিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে মহর্ষি কন্ব ফিরলেন আশ্রমে। তখন আকাশের একদিকে অস্ত যাচ্ছেন চাঁদ, অন্য দিকে সপ্তাশ্ববাহিত রথে উদিত হচ্ছেন সূর্যদেব। একই সঙ্গে এই উদয় ও অস্তের দৃশ্য যেন মানুষের জীবনের অবস্থান্তরেরই প্রতিচ্ছবি। চাঁদ অস্ত যাওয়ায় কুমুদিনী এখন পতিবিরহকাতরার মতন ম্লান। আবার নতুন সূর্যের বর্ণচ্ছটায় ঝলমল করে উঠছে পত্র-পুষ্প-তৃণে সঞ্চিত শিশির বিন্দুগুলি। ময়ূর ঘুম ভেঙে উড়ে গেল কুটিরের ছাদ থেকে। বেদীর ওপর বসে থাকা হরিণটি লাফিয়ে নামলো।

রাতের অন্ধকারে যিনি সুমেরু পর্বতকেও জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল করে রেখেছিলেন, সেই চাঁদ এখন আকাশের অধিকার সূর্যকে ছেড়ে দিয়ে মহিমাচ্যুত অবস্থায় চলে গেলেন এক কোণে।

আশ্রমপতি কন্ব ফিরে আসায় মুনিগণ তাঁর অভ্যর্থনার জন্য বন্দনা গান গাইতে লাগলো। বহু তীর্থ পরিক্রমা করে ফিরে এসেছেন মহর্ষি কন্ব, তাঁকে দেখবার জন্য আশ্রমের পশুপাখিরাও উদ্‌গ্রীব।

শুধু ভয়ে বুক কাঁপছে অনসূয়া আর প্রিয়ংবদার। কে প্রথমে শকুন্তলার কথা গিয়ে কুলপতিকে জানাবে ? যদি শোনা মাত্র তিনি রেগে ওঠেন ?

এই ক'টা মাস যে কী ভাবে কেটেছে, তা শুধু ওরাই জানে! দুই সখী শকুন্তলার জন্য আড়ালে কেঁদেছে, কিন্তু শকুন্তলার সামনে

গিয়ে হাসিমুখে নানা রকম স্তোকবাক্য দিতে চেয়েছে। কী অকৃতজ্ঞ সেই রাজা! এই ক'মাসে তিনি শকুন্তলাকে নিয়ে যাবার জন্য চতুরঙ্গিনী বাহিনী পাঠানো তো দূরে থাক, কোনো রকম খবরও নিলেন না!

দুই সখী একবার ভেবেছিল, তারাই কোনো দূত মারফত রাজার নামাঙ্কিত সেই অঙ্গুরীয়টি রাজার কাছে পাঠাবে। অন্তত সেই আংটি দেখলেও তো সব কথা মনে পড়বে রাজার কিন্তু সাত-পাঁচ ভেবেও আর শেষ পর্যন্ত পাঠানো হয়নি। তা ছাড়া কার মারফতই বা পাঠাবে? আশ্রমের কোনো তপস্বীকে দিয়ে পাঠাতে হলে সব কথা জানাজানি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এ-আশ্রমের ঋষিরা নগর জনপদের আড়ম্বরপূর্ণ জীবনকে ঘৃণা করেন, নিতান্ত বাধ্য না হলে কখনো যান না।

শকুন্তলা গোপনে কেঁদে কেঁদে শীর্ণা হয়ে গেছে। তার মুখের সেই সরল উজ্জ্বল জ্যোতিটি আর নেই, তার শরীরে গর্ভলক্ষণ সম্পূর্ণ পরিস্ফুট। কিছুদিনের মধ্যে তার এ অবস্থা আর একেবারেই গোপন করা যাবে না। সে আসন্নপ্রসবা।

কুটিরে এসে মহর্ষি কন্ব প্রথমেই শকুন্তলার খোঁজ নিলেন।

শকুন্তলা সেখানে নেই। দুই সখী তৎক্ষণাৎ খুঁজতে গেল শকুন্তলাকে। কুঞ্জের মধ্যেও নেই সে।

একটু পরেই তারা দেখতে পেল মালিনী নদী থেকে স্নান সেরে সিক্ত বসনে এবং দু'হাতে ধরা একটি পাত্রে ফুল-ফলের অর্ঘ্য নিয়ে ধীর পায়ে আসছে শকুন্তলা। সে ঠিক করেছে পিতার কাছে সে নিজেই সব কথা খুলে বলবে।

কিন্তু কুটিরের দ্বারে কন্বের সামনে এসে সে নিশ্চল হয়ে পড়লো। লজ্জায় সে চাইতে পারলো না পিতার চোখের দিকে, অশ্রু এসে তার কণ্ঠরোধ করলো।

দিব্যজ্ঞানী কন্ব এক পলক মাত্র কন্যার দিকে তাকিয়েই তার অবস্থাটা বুঝলেন। শমীবৃক্ষ যেমন অগ্নিকে ধারণ করে তেমনি তাঁর কন্যা রাজা দুষ্মন্তের তেজ গর্ভে ধারণ করেছে। তপঃপ্রভাবে তাঁর কিছুই জানতে বাকি রইলো না, যেন এক ছন্দোবদ্ধ আকাশবাণী ভেসে এলো তাঁর শ্রবণে।

তিনি কন্যাকে আলিঙ্গন করে বললেন, বৎসে, তুমি যোগ্য পাত্রের হাতেই পড়েছ। যোগ্য শিষ্যকে বিদ্যাদান করলে তা যেমন দুঃখের কারণ হয় না, তেমনই তোমার জন্য আমার দুঃখ পেতে হবে না। চক্ষে ধোঁয়া লাগলেও যজ্ঞকারীর আহুতি ঠিক ঠিক অগ্নিতেই পড়েছে।

শকুন্তলা তখন কন্বের পায়ের কাছে তার অর্ঘ্য রেখে বললো, তাত, আমি রাজা দুষ্মন্তকে বরণ করেছি। আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন করে তাঁর প্রতি প্রসন্ন হোন।

কন্ব বললেন, তোমার জন্য আমি রাজার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। তুমি আমার কাছে বর চাও।

শকুন্তলা বললেন, তাহলে এই আশীর্বাদ করুন, পুরুবংশীয়রা যেন কখনো রাজ্যচ্যুত কিংবা স্বধর্মচ্যুত না হয়।

কন্ব বললেন, তথাস্তু!

এরপর মহর্ষি কন্ব সবিস্তারে সকল সংবাদ শুনলেন। এবং তিনি ঠিক করলেন, এখনই শকুন্তলাকে হস্তিনাপুরে রাজা দুষ্মন্তের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। যে কোনো দিন শকুন্তলার সন্তানের জন্ম হতে পারে! এ অরণ্য—আশ্রম কোনো রাজসন্তানের জন্মের যোগ্য স্থান নয়।

তখনই তিনি শিষ্যদের আদেশ দিলেন শকুন্তলাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করার জন্য! অনাহূতা অবস্থাতেই শকুন্তলাকে যেতে হবে স্বামী-সন্দর্শনে।

মহর্ষি কন্ব শকুন্তলার বিবাহ অনুমোদন করেছেন বলে তার সখীদের মধ্যে যে আনন্দলহরী এসেছিল, পরবর্তী বার্তা শুনে তারা আবার শোকাকুলা হয়ে পড়লো। তাদের প্রিয় সখী আজই তাদের ছেড়ে চলে যাবে চিরকালের জন্য? কিন্তু স্বামী-বঞ্চিতা শকুন্তলা স্বামীর কাছে গিয়ে সুখী হবে, এই চিন্তা করে তারা আবার বিষাদ কাটিয়ে উঠে শকুন্তলাকে সাজাবার জন্য মালা গাঁথতে বসলো।

শকুন্তলা আজই চলে যাবে শুনে আশ্রমের ঋষিরা সবাই এলেন তাকে আশীর্বাদ জানাতে। শকুন্তলা সকলেরই বিশেষ স্নেহের পাত্রী। তারপর শকুন্তলার মাথায় ধান-দুর্বা ছুঁইয়ে স্বস্তিবচন পাঠ করলেন তাপসীরা।

তাঁদের কেউ বললেন, বৎসে, তোমার স্বামী যেন তোমাকে মহাদেবীর সম্মান দেন।

অন্যজন বললেন, বীর সন্তানের জননী হও, মা।

আরেকজন বললেন, স্বামীর বিশেষ প্রিয়পাত্রী হও, বাছা।

সকলে চলে যাবার পর শুধু গৌতমী রইলেন শকুন্তলার কাছে। তারপর দুই সখী এলো শকুন্তলাকে সাজাতে।

দু'জনে দু'পাশে বসে বললো, এবার স্থির হয়ে বোস, আমরা মঙ্গল সাজে সাজাবো তোকে!

শকুন্তলা বললো, আর কোনো দিন সখীদের হাতে সাজবার সৌভাগ্য আমার হবে না! আজ যে তোরা—

বলতে বলতেই কেঁদে ফেললো শকুন্তলা।

দুই সখী অমনি বলে উঠলো, ওমা, একী করছিস? এই শুভ সময়ে কেউ কাঁদে?

দু'জনে মুছে দিল তার চোখ। তারপর অঙ্গে পরাতে লাগলো ফুলের অলঙ্কার।

প্রিয়ংবদা বললো, এত রূপ তোর, এই শরীরে হীরা-মুক্তো-মাণিক্যের অলঙ্কারই মানায়। তা আমরা আশ্রমে আর সে-সব পাবো কোথায়, তাই আমাদের যা আছে, তাই দিয়ে সাজাচ্ছি তোকে।

শকুন্তলা বললো, আমার মণি-মাণিক্য দরকার নেই। আমার ফুলের গয়নাই ভালো।

প্রিয়ংবদা বললো, আহা, তবু রাজবাড়িতে যাবি তো, সেখানকার উপযুক্ত সাজ না হলে....

ঠিক তখনই দু'জন ঋষিকুমার বস্ত্র ও রত্নালঙ্কার এনে বললো, এই নিন, আপনারা ওঁকে এই বস্ত্র অলঙ্কার পরিয়ে দিন!

গৌতমী অবাক হয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ওমা, এগুলো তোমরা পেলে কোথায়?

ঋষিকুমারদের একজন বললো, পিতা কণ্ব কী না পারেন?

গৌতমী আবার জিজ্ঞেস করলেন, তিনি এগুলি সৃষ্টি করলেন?

দ্বিতীয় ঋষিকুমার বললো, না। তবে তিনি আমাদের আদেশ করলেন, গাছ থেকে শকুন্তলার জন্য ফুল পেড়ে আনবার জন্য। তারপর দেখলাম, একটি গাছে মেলা আছে এই শুভ্র রেশমী বস্ত্রটি। আর একটি গাছের কোটরে রয়েছে শকুন্তলার পা রাঙানোর জন্য আলতা। এ যেন গাছগুলিরই উপহার! আর একটি গাছ থেকে

বেরিয়ে এলো একটি হাত, নতুন কিশলয়ের মতন সবুজ সেই হাতের রঙ, সেই হাতই দিল এই অলঙ্কারগুলি।

অনসূয়া বললো, আশ্চর্য!

গৌতমী বললেন, আশ্চর্যের কী আছে। এগুলি বনদেবতাদের উপহার তাঁরাও তো প্রাণাধিক ভালবাসেন শকুন্তলাকে।

প্রিয়ংবদা বললো, ওলো শকুন্তলা, এই সব লক্ষণ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, স্বামীর ঘরে গিয়ে রাজরানী হবি তুই। সবাই আশীর্বাদ করছেন তোকে।

ঋষিকুমার দু'জন চলে গেল মহর্ষি কণ্বকে এই অলৌকিক বিষয়-গুলি জানাতে।

সখীরা অলঙ্কারগুলি আগ্রহের সঙ্গে দেখতে লাগলো। তাদের জ্যোতিঃপ্রভায় যেন চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

অনসূয়া বললো, আমরা তো আশ্রমে কোনো অলঙ্কার পারি না, আর এসব কখনো চোখেই দেখিনি। ওগুলো কোন্‌টা কোথায় পরাতে হয় তাও তো আমরা জানি না।

প্রিয়ংবদা বললো ছবিতে অনেক সময় দেখেছি। আয়, তেমনটি করে পরিয়ে দিই।

শকুন্তলা বললো, আমি জানি, তোরা সব পারিস। তোদের যেমন খুশি পরিয়ে দে।

গৌতমী সস্নেহে চেয়ে রইলেন মেয়ে তিনটির দিকে।

আজ ওদের একজন চলে যাবে, এই বিচ্ছেদ যেন কল্পনাও করা যায় না।

তখন মহর্ষি কণ্ব মালিনী নদীতে গেছেন স্নান করতে। অর্ধেক জলে নেমে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন স্থিরভাবে। উন্মনা হয়ে স্নান করতেও ভুলে গেছেন। এক সময় তাঁর চোখ থেকে দু'ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়লো নদীর জলে।

তৎক্ষণাৎ তিনি সচকিত হলেন। বিষাদ বেদনায় যে তিনি এত-খানি কাতর হয়ে পড়বেন, তা তিনি নিজেও জানতেন না আগে। অশ্রু রোধ করতে গিয়ে তাঁর কণ্ঠ বুজে আসছে। চোখ খোলা, তবু যেন কিছু দেখতে পাচ্ছেন না।

তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, আমরা বনবাসী,

স্নেহের জন্য যদি আমাদেরও এতখানি চিত্ত চাঞ্চল্য হয়, তাহলে যারা সংসারী, তারা কন্যার বিচ্ছেদ-দুঃখে কতই না কষ্ট পায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি জলে ডুব দিলেন।

স্নান সমাপ্ত করে মহর্ষি কণ্ব ফিরে এলেন কুটিরে। সেখানে সখীরা শকুন্তলাকে ততক্ষণে রেশমী বস্ত্র পরিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে তৈরি করেছে। তাদের কথার মধ্যে মুহূর্তে মুহূর্তে এসে যাচ্ছে হাসি-কান্না।

কণ্বকে আসতে দেখে গৌতমী শকুন্তলাকে বললেন, বাছা, ঐ দ্যাখ তোর পিতা আসছেন। ওঁর চক্ষু দু'টি আনন্দময়, সেই আনন্দ যেন আলিঙ্গন করছে তোকে। যা, ওঁকে প্রণাম কর।

শকুন্তলা কণ্বকে প্রণাম করতে তিনি তার মাথা স্পর্শ করে বললেন, বৎসে, শর্মিষ্ঠা যেমন যযাতির কাছে অত্যন্ত সমাদৃতা হয়েছিলেন, তুমিও তেমনি তোমার স্বামীর প্রিয়তমা হও। শর্মিষ্ঠার সন্তান পুরু যেমন সম্রাট হয়েছিলেন, তেমনি তুমিও সম্রাট-পুত্রের জননী হও।

গৌতমী বললেন, ভগবান, আপনার কথা যেন সব সময় সত্য হয়।

কণ্ব বললেন, আর দেরি করা নয়। এবার যাত্রা করতে হবে।

শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বত নামে কণ্ব মুনির দুই তরুণ শিষ্য শকুন্তলাকে রাজধানীতে নিয়ে যাবার জন্য আদিষ্ট হয়েছেন। তাঁদের ডাকা হলো।

তারপর সেখানে জ্বালা হলো যজ্ঞের অগ্নি।

কণ্ব শকুন্তলাকে বললেন, বৎসে, সদ্য আহূত এই অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করো।

সকলে একসঙ্গে পরিক্রমা করলেন সেই অগ্নি।

কণ্ব তখন মঙ্গলবাক্য উচ্চারণ করলেন: বেদীর চারিদিকে নির্দিষ্ট স্থানে এই যে সমিধযুক্ত অগ্নি, যার প্রান্তে কুশ ছড়ানো, যিনি হোমগন্ধে পাপনাশক, বৎসে শকুন্তলা, সেই অগ্নি তোমায় পবিত্র করুন।

সকলে একসঙ্গে অগ্নির উদ্দেশে প্রণতি জানালো।

কণ্ব বললেন, শার্ঙ্গরব, এবার তোমরা তোমাদের ভগিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

শকুন্তলা আশ্রমের গাছগুলির দিকে চাইলো।

কণ্ব মুনি তখন উচ্চস্বরে বললেন, হে তপোবনের তরুগণ, তোমাদের জল না দিয়ে যে নিজে কখনো জল পান করেনি, অলঙ্কার

প্রিয় হয়েও তোমাদের ভালবেসে যে কখনো একটি পল্লবও ছেঁড়েনি, তোমাদের কুসুম প্রসবের সময় যে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতো, সেই শকুন্তলা আজ তোমাদের ছেড়ে পতিগৃহে চলে যাচ্ছেন, তোমরা অনুমতি দাও।

সকলে নীরব হলেন। অমনি একটি কোকিল ডেকে উঠলো।

কণ্ব বললেন, ঐ শুনলে! শকুন্তলার বৃক্ষবন্ধুরা তার যাত্রা অনুমোদন করেছে। তাদের মুখের ভাষ্য নেই, কিন্তু কোকিলের মধুর স্বরের মধ্য দিয়েই তারা পাঠিয়েছে তাদের উত্তর!

এরপরও আকাশ থেকে যেন দৈববাণী শোনা গেল ঃ হে শকুন্তলা, তোমার যাত্রাপথে পড়বে পদ্মপাতার সমাচ্ছন্ন সরোবর। রোদের তাপ থেকে তোমায় রক্ষা করবে ছায়াতরু। তোমার পথ হোক শুভ, সে পথের ধুলো হোক পদ্মরাগের মতন, বাতাস হোক কোমল মধুর।

সকলে বিস্মিত ও শিহরিত হলেন সেই দৈববাণী শুনে। আর্যা গৌতমী বললেন, বনদেবীরাও আশীর্বাদ করলেন শকুন্তলাকে। ও যেন তাদেরও আপনজন। বৎসে, তাঁদের উদ্দেশে প্রণাম করো।

সকলে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে প্রণাম করলো।

কণ্ব বললেন, আর বেলা বাড়ানো ঠিক হবে না। এবার অগ্রসর হও তোমরা।

শকুন্তলা প্রিয়ংবদার কাঁধ ধরে বললো, সখী, আর্যপুত্রকে দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়েছি ঠিকই, কিন্তু আশ্রম ছেড়ে যেতেও যে কিছুতেই আমার পা উঠছে না।

প্রিয়ংবদা বললো, তুই আর কতটুকু কাতর হয়েছিস, সখী? চেয়ে দ্যাখ, তুই চলে যাচ্ছিস বলে বিচ্ছেদ-বেদনায় তপোবনের অবস্থা কী হয়েছে? হরিণের মুখ থেকে খসে যাচ্ছে কুশতৃণ, ময়ূরেরা নাচতে ভুলে গেছে, শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে অনবরত, ঠিক মনে হচ্ছে তরুলতারাও চোখের জল ফেলছে তোর জন্য।

শকুন্তলা মুখ নিচু করে এগিয়ে গেল কয়েক পা। তারপর হঠাৎ আবার থেমে গিয়ে বললো, ওমা, বনজ্যোৎস্নার কাছ থেকে তো বিদায় নিইনি। সে যে আমার বোনের মত।

কণ্ব বললেন, বৎসে, তুমি যে তাকে আপন ভগিনীর মতনই দেখতে, তা আমি জানি। ঐ তো, তোমার ডান দিকেই সে রয়েছে।

শকুন্তলা দৌড়ে গিয়ে সেই মাধবী লতাটিকে আলিঙ্গন করে বললো,

হে বনজ্যোৎস্না, আম্রতরুর সঙ্গে তুমি মিলিত হয়ে থাকলেও তোমার এক শাখা দিয়ে আমায় একবার জড়িয়ে ধরো। আজ থেকে আমি তোমায় ছেড়ে দূরবর্তিনী হলাম।

কণ্ব বললেন, বৎসে তোমার জন্য কিছুদিন ধরেই আমি উপযুক্ত পাত্র খুঁজছিলাম। তোমার পুণ্যবলে তুমি নিজেই যোগ্য স্বামী পেয়েছো, এই নবমল্লিকাও পেয়েছে আম্রতরুকে। এবার থেকে তোমাদের দু' জনের জন্য আমাকে আর চিন্তা করতে হবে না।

শকুন্তলা সখীদের বললো, বনজ্যোৎস্নাকে তোদের দু'জনের হাতে সঁপে দিয়ে গেলাম।

দুই সখী অমনি ডুকরে কেঁদে উঠে বললো, ওলো শকুন্তলা; তুই আমাদের সঁপে দিয়ে যাচ্ছিস কার কাছে, সে কথা বল।

কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে মহর্ষি কণ্ব বললেন, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, তোমরা কেঁদো না। তোমরাই তো তোমাদের সখীকে এখন সান্ত্বনা দেবে। আর দেরি করো না মা!

আরও কয়েক পা এগিয়ে আবার থামলো শকুন্তলা। তার চোখ পড়লো একটি গর্ভবতী হরিণীর দিকে। গর্ভভারের জন্য সে এদিকে আসতে পারছে না, দূরে দাঁড়িয়ে আছে শকুন্তলার দিকে চেয়ে।

শকুন্তলা হরিণীটির কাছে গিয়ে তাকে আদর করে পিতাকে বললো, তাত, এর নির্বিঘ্নে প্রসব হলে কারুকে দিয়ে সেই প্রিয় সংবাদ আমায় জানাবেন।

কণ্ব বললেন, নিশ্চয়ই জানাবো, আমি ভুলবো না।

আবার কিছুটা চলতে গিয়ে শকুন্তলা কিসের যেন বাধা পেলো! কে যেন শকুন্তলার কাপড় টেনে ধরছে। শকুন্তলা 'ওমা' বলে ফিরে তাকালো! দেখলো, একটি শিশু হরিণ তার কাপড় কামড়ে ধরেছে।

কণ্ব বললেন, বৎসে, ওর মুখে কুশাগ্রের খোঁচা লেগে ক্ষত হয়েছিল, তখন তুমি রোজ ওর মুখে ইঙ্গুদী তেলের প্রলেপ মাখিয়ে দিতে, কচি ধান তুলে তুলে নিজের হাতে খাইয়ে তুমি বড় করেছো, ও তোমাকেই মা বলে জানে, তাই ও তোমার পথ ছাড়ছে না।

আবার কান্না সংবরণ করতে পারলো না শকুন্তলা। এই মৃগশিশুটি সত্যিই তার সন্তানের মতন। প্রসবের পরই ওর মা মারা গেলে শকুন্তলা ওকে মাতৃস্নেহে পালন করেছে এতদিন।

কাঁদতে কাঁদতেই শকুন্তলা বললো, ওরে তুই আর আমার পেছনে

পেছনে আসিস না। তুই তো এখন বড়ো হয়েছিস। আমি তোদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি, এখন থেকে পিতা তোদের দেখবেন।

কণ্ব বললেন, এত কেঁদো না, হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে যে। একটু স্থির হও। পথের দিকে দেখো। চোখের জলের ধারায় তোমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে বলে উঁচু-নিচু পথে তোমার পা ঠিক মতন পড়ছে না।

ক্রমে আশ্রমের বাইরে চলে এলো তারা। শকুন্তলাকে ঘিরে রেখেছে সকলে। যেন সকলে মিলেই শকুন্তলাকে নিয়ে যাবে রাজধানীতে।

একটি সরোবরের প্রান্তে পৌঁছে শার্ঙ্গরব কণ্বকে বললেন, ভগবন, আপনারা আর কতদূরে যাবেন? প্রথা অনুসারে প্রিয়জনকে কোনো জলাশয় পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হয়। ফিরে যাবার আগে আপনি আমাদের নির্দেশ দিন এবং শকুন্তলাকে উপদেশ দিন।

কণ্ব বললেন, এসো, তবে এই ক্ষীর বৃক্ষের ছায়ায় একটু দাঁড়ানো যাক।

সবাই সেখানে থামলো। শকুন্তলা দুই সখীর সঙ্গে এগিয়ে গেল সরোবরের কিনারায়। বনদেবীদের দৈববাণী অনুযায়ী সত্যিই সেই সরোবর পদ্মপাতায় ভরা। তাতে ফুটে আছে মনোহর ফুল। চক্রবাক-চক্রবাকীরা খেলা করছে সেই জলে।

একটি চক্রবাকী হঠাৎ খুব জোরে ডেকে উঠলো।

শকুন্তলা বললো, দ্যাখ ঠিক যেন মনে হচ্ছে ঐ চক্রবাকীটা কাঁদছে।

প্রিয়ংবদা বললো, বোধহয় ওর প্রিয় চক্রবাক কোনো পদ্মপাতার আড়ালে ঢাকা পড়েছে। ওরা যে পরস্পরকে না দেখে এক মুহূর্ত থাকতে পারে না।

শকুন্তলা বললো, কই, আমি তো তেমন উচ্চস্বরে বিলাপ করছি না। তা হলে বল, আমি অনেক কঠিন কাজ করছি কিনা?

প্রিয়ংবদা বললো, সখি, ও কথা বলিস না। চক্রবাক-চক্রবাকী কখনো রাতের বেলায় একসঙ্গে থাকে না। রাত্রে ওদের বিচ্ছেদ-বিরহ কতই না দীর্ঘ বোধ হয়। কিন্তু আবার দেখা হবে, এই আশাই দুঃসহ বেদনাকেও শান্ত করতে পারে।

মহর্ষি কণ্ব একটুক্ষণ ধরে রাজাকে পাঠাবার মতন উপযুক্ত কোনো বার্তার কথা চিন্তা করলেন। তারপর শার্ঙ্গরবকে ডেকে বললেন, শোনো, শকুন্তলাকে তোমার সামনে দাঁড় করিয়ে তুমি রাজার উদ্দেশে বলবে, হে রাজন, সংযমই আমাদের সম্পদ। তুমি উচ্চ বংশসম্ভূত, শকুন্তলার সঙ্গে তোমার প্রণয় সকলের অজান্তে ঘটেছে, এ কথা মনে রেখে এবং সবদিক ভালো করে বিবেচনা করে দেখে, তোমার অন্য পত্নীদের মতন একেও সমান চক্ষে দেখবে। এরপর ওর নিয়তিতে যা আছে, তাই ফলবে। আমরা আর বেশি কী বলবো।

শার্ঙ্গরব বললেন, এই বার্তা রাজাকে জানাবার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম।

কণ্ব এবার শকুন্তলার দিকে চেয়ে বললেন, বৎসে, এবার তোমাকেও দু' একটি উপদেশ দেবো। আমরা বনবাসী বটে, তবে লৌকিক ব্যাপারেও একেবারে অনভিজ্ঞ নই।

শাঙ্গর্রব বললেন, ভগবন, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা সব কিছুই জানতে পারেন।

কণ্ব বললেন, বৎসে, পতিগৃহে গিয়ে তুমি গুরুজনদের সেবাযত্ন করবে যথাসাধ্য এবং প্রতিদানের আশা না করে। সকলের দিকে কোমল চক্ষে তাকাবে। তোমার সপত্নীদের সঙ্গে ব্যবহার করবে প্রিয় সখীর মত। তোমার স্বামী কখনো তোমার অনভিপ্রেত কিছু করলেও তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধতা করো না। স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেরই একসঙ্গে ক্রোধ কখনই সমীচীন নয়। দাসদাসীদের প্রতি তুমি আত্মীয়সম দয়ালু আচরণ করবে। সম্পদ সুখ পেয়েও কখনো গর্বিত বোধ করবে না। যুবতী স্ত্রীরা এইভাবেই সংসারের গৃহিণী হয়। যারা এর বিপরীত আচরণ করে তারা বংশে অশান্তি ডেকে আনে। মনে রেখো, সুখ ও শান্তি, এ দুটিই মানুষের ইচ্ছাধীন।

এবার কণ্ব গৌতমীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, এ বিষয়ে আপনি কী বলেন?

গৌতমী বললেন, আপনি যা বলেছেন, তার চেয়ে বেশি বলার তো কিছু নেই। এই-ই তো বিবাহিতা নারীদের আদর্শ। বাছা, ওঁর এই উপদেশ মনে রেখো।

কণ্ব বললেন, শকুন্তলে, এবার বিদায় নেবার পালা, আমাকে ও সখীদের আলিঙ্গন দাও।

শকুন্তলা বিচলিত হয়ে বললো, তাত, সখীরাও কি এখান থেকে ফিরে যাবে? ওরা আমার সঙ্গে যেতে পারে না?

কণ্ব বললেন, না, বৎসে। তোমার সখীরা কুমারী কন্যা, রাজালয়ে ওদের যাওয়া শোভা পায় না। এবার ফিরে গিয়ে আমি ওদেরও উপযুক্ত পাত্রস্থ করার ব্যবস্থা করবো। আর্যা গৌতমী তোমার সঙ্গে যাবেন।

শকুন্তলা পিতা কণ্বকে আলিঙ্গন করে বললো, পিতার কোল থেকে ছিন্ন হয়ে, মলয়তট থেকে তুলে নেওয়া চন্দনলতার মতন, অন্য কোথাও গিয়ে কী করে আমি বেঁচে থাকবো?

মহর্ষি কণ্ব কন্যার মাথায় হাত রেখে বললেন, বৎসে, এমন কাতর হয়ো না। প্রখ্যাত বংশের গৃহিণী হবে তুমি, কত সুনাম হবে তোমার, প্রচুর ধন সম্পদের মধ্যে নানান কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকবে তুমি এবং পূর্ব দিগন্ত যেমন সূর্য প্রসব করে, সেই রকমই অবিলম্বে তুমিও পবিত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে আমাদের বিচ্ছেদের দুঃখ অনেকখানি ভুলে যাবে।

শকুন্তলা পিতার চরণ স্পর্শ করলে তিনি বললেন, বৎসে, আমার মনোবাসনা যেন পূর্ণ হয়।

শকুন্তলা এবার সখীদের কাছে গিয়ে বললো, ওরে, তোরা দু'জনে একসঙ্গে আমায় জড়িয়ে ধর, আমায় আর ছাড়িস না!

শখীরা শকুন্তলাকে অনেক আদর করতে লাগলো। গৌতমী একবার তাড়া দিলেন তাদের।

তখন সখীরা শকুন্তলাকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললো, শোন, রাজা যদি তোকে প্রথমেই চিনতে না পরেন, তাহলে তাঁকে তাঁর নাম লেখা অঙ্গুরীয়টি দেখাবি।

শকুন্তলা অমনি আশঙ্কায় কেঁপে উঠে বললো, একথা বললি কেন? আর্যপুত্র আমায় চিনতে পারবেন না? এ কী বলছিস!

দুই সখী অমনি সমস্বরে বললো, না, না, সে কথা বলিনি। ওটা এমনি কথার কথা। অতি প্রিয়জন সম্পর্কেই মানুষ বেশি অমঙ্গলের ভয় পায়।

শার্ঙ্গরব দূর থেকে বলে উঠলেন, সূর্য যে মাথার ওপর উঠে এলো। এবার আপনারা শেষ করুন।

শকুন্তলা আবার পিতা কণ্বকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো, তাতঃ

আবার কবে আমি তপোবনে আসবো? আবার কবে সবাইকে দেখবো?

কণ্ব বললেন, নিশ্চয়ই আসবে। সসাগরা এই পৃথিবীর অধীশ্বরের পত্নী হয়ে দীর্ঘদিন কাটিয়ে, অপ্রতিদ্বন্দ্বী পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করে এবং তার হাতে সমস্ত প্রজাদের পালনের ভার তুলে দিয়ে তারপর তুমি এবং তোমার স্বামী এই শান্ত স্নিগ্ধ তপোবনে বসবাসের জন্য চলে এসো।

গৌতমী বললেন, এমন করলে আর কিছুতেই কথা শেষ হবে না। এদিকে যে বেলা দু' প্রহর পেরিয়ে গেল শকুন্তলা, তোমার পিতাকে এবার ফিরে যেতে বলো। চলো, আমরা যাত্রা করি।

খানিকদূর গিয়েও শকুন্তলা আবার ফিরে এসে মহর্ষি কণ্বকে জড়িয়ে ধরে বললো, কঠোর তপশ্চর্যায় আপনার শরীর ক্ষীণ। তাত, আপনি আমার জন্য চিন্তা করবেন না।

কণ্বমুনি শকুন্তলাকে বুক থেকে ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে বললেন, বৎসে কুটিরের সামনে তুমি যে নীবার কণা বপন করেছিলে, তাতে অঙ্কুর এসেছে আজ দেখলাম। সেদিকে তাকিয়ে আমি তোমার কথা ভুলবো। যে কোনো দিকে তাকালেই তোমার কথা মনে পড়বে। যাও, আর দেরি করো না, তোমার যাত্রাপথ শুভ হোক।

গৌতমী এবার শকুন্তলার হাত ধরে নিয়ে গেলেন। শকুন্তলা বারবার পিছু ফিরে ফিরে চাইতে লাগলো। একটু পরে অরণ্যের মধ্যে তাকে আর দেখা গেল না।

সখী দুজন দৌড়ে শকুন্তলাকে অনুগমন করতে যাচ্ছিল, কণ্ব তাদের নিবৃত্ত করে বললেন, অনসূয়া তোমাদের সহচরিণী চলে গেছে, আর তা ফেরাতে পারবে না! বিষাদ নিবারণ করে চলো এবার আশ্রমে আমার সঙ্গে।

অনসূয়া বললো, তাত, শকুন্তলা নেই, আশ্রম যে একেবারে শূন্য মনে হচ্ছে, কেমন করে সেখানে আমরা থাকবো।

কণ্ব বললেন, প্রিয়জন চলে গেলে এমনই মনে হয় বটে।

তারপর মহর্ষি কণ্ব বুক শূন্য করা এক সুদীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, শকুন্তলাকে স্বামী-সন্দর্শনে পাঠিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি। কন্যা তো পরেরই ধন। পর-গচ্ছিত ধন অধিকারীর কাছে যেন প্রত্যর্পণ করেছি আজ আমার মন সেই রকম ভার মুক্ত হলো।

॥ ৫ ॥

রাজসভার কাজকর্ম সেরে রাজা দুষ্মন্ত উদ্যানে এসে ঘনিষ্ঠ পাত্র মিত্র ও বিদুষকের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করছেন। তাঁর রাজ্যে এখন কোনো যুদ্ধবিগ্রহ নেই, বহিঃশত্রুর উৎপাত নেই, প্রজারা সুখী, সুতরাং নিশ্চিন্ত হয়ে আনন্দ সম্ভোগে জীবন যাপন করছেন তিনি।

এক সময় রাজ অন্তপুর থেকে বীণাধ্বনি ভেসে এলো। রাজার এক মহিষী হংসপাদিকা সঙ্গীত সাধনা করছেন।

কথাবার্তা থামিয়ে রাজা এবং তাঁর পারিষদরা মন দিয়ে শুনতে লাগলেন সেই সঙ্গীত।

হংসপাদিকা গাইছেন ঃ

ওহে মধুকর নতুন নতুন মধুতে তোমার লোভ
আমের মুকুলে চুম্বন দিয়ে যেই উড়ে গেলে পদ্মফুলের দিকে
অমনি কি সব ভুলে গেলে, আর মনেও পড়ে না আমের মঞ্জরীকে ?

রাজা তারিফ করে বললেন, আহা, কী আবেগ-মাখা গান।

রাজার বিদূষক মাধব্য বললো, গান তো ভালো। কিন্তু বয়স্য, গানের কথাগুলির অর্থ বুঝতে পারলে না ?

সস্মিত মুখে রাজা বললেন, তা বুঝেছি, ঐ গানের মধ্য দিয়ে রাণী আমায় তিরস্কার করছেন। একবারই তাঁকে প্রণয় নিবেদন করে তার-পর সব ভুলে আছি। তাঁকে ভুলে আমি বসুমতীকে নিয়ে এখন মত্ত আছি, এই ইঙ্গিত করতে চাইছেন। মাধব্য, তুমি আমার হয়ে একটা কাজ করবে ? হংসপাদিকাকে বলে এসো, খুব সুকৌশলেই তিনি ধিক্কার দিয়েছেন আমাকে।

মাধব্য উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তা যাচ্ছি, কিন্তু তোমার বদলে আমি গেলে কি আর বিশেষ কিছু বদলাবে ? বরং রেগে গিয়ে তিনি সখীদের হাত দিয়ে আমায় মার খাওয়াবেন।

রাজা বললেন, সে রকম মার খেতে তোমার খুব আপত্তি আছে বলে তো মনে হয় না।

মাধব্য বললো, অপ্সরাদের কাছে নিষ্কাম ঋষিরাও যেমন নিস্তার পায় না, আমরাও সেই দশা হবে আর কি।

রাজা বললেন, তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে ? যাও, রাণীকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে এসো।

মাধব্য সেই যে অন্তঃপুরে চলে গেল, আর সহসা ফিরে এলো না। একেই বলে নিয়তির প্রতিবন্ধ। সে রাজার পাশে এই সময় উপস্থিত থাকলে বোধহয় পরবর্তী কাহিনী অন্য রকম হতো।

রাজা একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। গানের কথাগুলির কথা ভেবে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন, কিন্তু ঠিক তার কারণটা বুঝতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, সুন্দর কিছু দেখে, সুন্দর কিছু শ্রবণ করে অনেক সময় মানুষের মন কেমন করে; তা কি পূর্ব জন্মের কোনো স্মৃতির জন্য? অনেক মধুর স্মৃতি মনের একেবারে গভীরে গাঁথা হয়ে থাকে, সব সময় ওপরের স্তরে আসে না।

এই সময় কঞ্চুকী এসে প্রবেশ করলো সেখানে। রাজাকে চিন্তামগ্ন দেখে সে প্রথমে কিছুটা ইতস্তত করলো, এই কিছুক্ষণ আগে রাজা উঠে এসেছেন সভা থেকে, তিনি এখন ক্লান্ত, এরই মধ্যে তাঁকে বিব্রত করা উচিত নয়। রাজাদের বিশ্রামের কোনো সময় নেই। সূর্য যেমন একবারই রথের অশ্ব সংযোজন করেছেন, বায়ু যেমন অনন্তকাল ধরে প্রসারিত হয়ে চলেছেন, বাসুকী যেমন সব সময় পৃথিবীকে মস্তকে ধারণ করে রয়েছেন, সেই রকম শস্যের ষষ্ঠাংশ ভাগের অধিকারী রাজাদেরও সব সময় কর্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

এই রাজা নিজের সন্তানদের প্রজাজ্ঞানে দেখেন। অত্যন্ত রোদের তাপে দগ্ধ হয়ে গজরাজ যেমন শীতল গুহায় আশ্রয় নেয়, তেমনই শাসনকার্যে ক্লান্ত রাজা উদ্যানে একটু বিশ্রাম নিতে এসেছেন। এখন আবার তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করতে হবে।

কিন্তু উপায়ও তো নেই। অন্য কোনো দর্শনপ্রার্থী হলে না হয় তাদের কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যেত, কিন্তু এই অতিথিরা যে অতি বিশিষ্ট।

কঞ্চুকী উচ্চস্বরে বললো, মহারাজের জয় হোক। হিমগিরির উপত্যকার তপোবন থেকে একদল ঋষি এসেছেন মহর্ষি কণ্বের বার্তা নিয়ে। তাঁদের সঙ্গে নারীও রয়েছেন।

রাজা চমকিত হয়ে মুখ তুললেন। তাঁর যেন ঠিক বিশ্বাস হলো না। তিনি প্রতিপ্রশ্ন করলেন, মহর্ষি কণ্বের কাছ থেকে বার্তা এনেছেন ঋষিরা? সঙ্গে রয়েছে স্ত্রীলোক?

কঞ্চুকী বললো, হ্যাঁ মহারাজ।

রাজা বললেন, তবে তাঁদের উপযুক্ত অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করতে বলো আমার পুরোহিত সোমরাতকে। তিনি নিজেই যেন তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। কিন্তু ঋষিদের সঙ্গে এখানে সাক্ষাৎ করা যায় না। তাঁদের জন্য আমি উপযুক্ত স্থানে অপেক্ষা করছি।

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি অন্য এক প্রহরিণীকে বললেন, বেত্রবতী, চলো, অগ্নিগৃহের দিকে চলো।

অগ্নিগৃহে যজ্ঞ ও পুজা-আর্চা হয়। ঋষিদের সম্বর্ধনা জানাবার জন্য সেটিই যোগ্য স্থান।

রাজা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেইদিকে চললেন। রাজ্য জয়েও পরিপূর্ণ সুখ নেই, রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি আরও বেশি কঠিন। রোদের তাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য একটি বড় ছাতা হাতে নিলে কিছুক্ষণ পর সেই ছাতাটি ধরে থাকাই বেশি কষ্টদায়ক হয়, সেই রকম রাজদণ্ড হাতে নেবার পর তাতে আরামের চেয়ে পরিশ্রমের ক্লান্তিই বেশি যেন।

রাজাকে আসতে দেখে বৈতালিকরা বন্দনা গান শুরু করলো। তারা রাজার প্রতি স্বস্তিবচন উচ্চারণ করে প্রথমে একজন বললো, মহারাজ, আপনি আত্মসুখের দিকে দৃষ্টি দেননি, প্রজাদের সুখের জন্য নিজেকে সমর্পিত করেছেন। এই তো আপনার যোগ্য স্বভাব। বড় বৃক্ষ নিজের মাথায় তীব্র উত্তাপ সহ্য করেও আশ্রিতদের শান্তি দেবার জন্য ছায়া বিছিয়ে রাখে।

অন্যজন বললো, হে মহারাজ, আপনি বিপন্নের প্রতিপালক, বিপথগামীদের নিয়ন্ত্রক, আপনার সুশাসনে রাজ্যে কেউ অনর্থক কলহ করে না। সম্পদ ও সুখের সময় মানুষের অনেক আপনজন দেখা দেয়, কিন্তু আপনি বিপদে-আপদে সব সময় প্রজাদের বন্ধু। আপনার জয় হোক।

এই সব ধরাবাঁধা কথা রাজার মন স্পর্শ করলো না। তিনি নিজের নিয়ম রক্ষার খাতিরে বৈতালিকদের উদ্দেশে হাত তুলে বললেন, আমার মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, আপনাদের কথায় আবার সঞ্জীবিত হলাম।

অগ্নিগৃহটি সদ্য পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। এক পাশে বাঁধা আছে হোমধেনু। অন্যদিকে একটি উঁচু অলিন্দ, সেইখানে রাজার বসার স্থান।

রাজা উঠে এলেন সেই অলিন্দে। ঋষিরা অসময়ে অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হলে নানা রকম আশঙ্কা জাগে। সারা রাজ্যে একমাত্র অরণ্য-চারী তপস্বীরাই রাজার আজ্ঞাধীন নয়। তপশ্চর্যায় কৃশ এবং পুণ্যবলে বলীয়ান এই ঋষিদের অসাধ্য কিছু নেই।

বেত্রবতীর কাঁধে ভর দিয়ে রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার বল তো? কাশ্যপপুত্র কণ্ব হঠাৎ আমার কাছে ঋষিদের পাঠালেন কেন? কোথাও অসমীচীন কিছু ঘটেছে কি? কেউ তাঁদের তপস্যা পণ্ড করেছে? তপোবনের প্রাণীদের হত্যা করেছে কি কেউ? অথবা আমারই কোনো অপরাধে কি বৃক্ষলতায় আর ফুল ফোটে না? নানা রকম চিন্তায় সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছি আমি। অথচ সঠিক কারণটিও বুঝতে পারছি না। বেত্রবতী বললো, আমার মনে হয় সে রকম কিছুই নয়। আপনি বৃথা অস্থির হচ্ছেন। আপনার সুশাসনে সারা রাজ্যেই শান্তি বিরাজ করছে। দেখুন, সেই জন্যই হয়তো ঋষিরা খুশি হয়ে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছেন।

রাজা তবু উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলেন।

পুরোহিত এবং কঞ্চুকী ঋষিদের রাজপ্রাসাদের মধ্য দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতে লাগলো। শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত ঘাড় ঘুরিয়ে চতুর্দিক দেখছেন। রাজপুরীর আড়ম্বর ও বিলাসবাহুল্য তাঁদের মোটেই পছন্দ হলো না।

শার্ঙ্গরব বললেন, যতদূর জানি এই রাজা কখনো কর্তব্য থেকে বিমুখ হননি। ইনি নিম্নশ্রেণীর লোকদেরও সংযত রেখেছেন। কিন্তু আমরা নির্জন অরণ্যবাসী। চতুর্দিকে এত মানুষে ভরা গৃহ-গুলি দেখে মনে হচ্ছে যেন চতুর্দিকে আগুন লেগেছে।

শারদ্বত বললেন, তোমার তো ও রকম মনে হচ্ছে। আমার কী রকম অনুভূতি হচ্ছে জানো? সদ্য স্নান সেরে উঠে আসার পর কোনো তৈলাক্ত ব্যক্তিকে দেখলে যেমন অশুচি মনে হয়, জাগ্রত লোক কোনো নিদ্রিতকে দেখলে যেমন ভাবে, মুক্তপুরুষ কোনো বদ্ধ আত্মাকে যে-চোখে দেখে, এই ভোগবিলাসীদের দেখে আমার ঠিক সেই রকমই মনে হচ্ছে।

শকুন্তলা রাজার খুব কাছে এসে পড়েছেন ভেবেই বিহ্বল হয়ে গৌতমীর হাত চেপে ধরলো। অস্ফুটস্বরে বললো, আমার ডান চোখ কাঁপছে কেন? এ কি কোনো দুর্লক্ষণ?

গৌতমী বললেন, ও কিছু নয়, ও কিছু নয়। তোমার স্বামীর কুলদেবতারা তোমার সৌভাগ্য বর্ধন করুন।

রাজা যে অলিন্দের ওপর দাঁড়িয়েছিলেন, ওঁরা এসে পৌঁছোলেন তার নিচে।

পুরোহিত বললেন, হে ঋষিগণ, এবার রাজাকে অবলোকন করুন। বর্ণাশ্রমের রক্ষক, মহামান্য রাজা দুষ্মন্ত আপনাদের জন্য আগেই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

শার্ঙ্গরব বললেন, হে ব্রাহ্মণ, রাজার এই বিনয় প্রদর্শন নিশ্চয়ই খুব শ্লাঘনীয়, তবে আমাদের কাছে এটাই স্বাভাবিক মনে হয়। ফলবান বৃক্ষ আপনিই নুয়ে পড়ে, জলভরা নবীন মেঘ আপনি নত হয়, অর্থ-সমৃদ্ধি লাভ করেও যাঁরা সৎ, তাঁরা কখনো উদ্ধত হন না। পরোপ-কারীদের এই-ই তো উচিত ব্যবহার।

বেত্রবতী বললো, মহারাজ, আপনি মিছেই দুশ্চিন্তা করছিলেন। ঋষিদের তো বেশ প্রসন্নই মনে হচ্ছে।

রাজা তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগলেন দলটিকে। দুই তরুণ ঋষির সঙ্গে এক প্রবীণা নারী ও এক তন্বী যুবতী। যুবতীটির দিকেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইলো। যুবতীটির মুখ অবগুণ্ঠনে ঢাকা।

রাজা বেত্রবতীকে জিজ্ঞেস করলেন, এই যুবতীটি কে, কেনই বা ইনি এসেছেন? শুকনো শুকনো পাতার মধ্যে সবুজ মঞ্জরীর মতন ঋষিদের মাঝখানে উনি দাঁড়িয়ে। মুখখানি ঢাকা বলে এঁর রূপ ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

বেত্রবতী বললো, মহারাজ, এই মহিলা কে বা কেন এসেছেন তা বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু এঁর দেহের গড়নটি দেখবার মতন!

রাজা শকুন্তলার দিকে আর এক পলক দেখেই বুঝে গেলেন যে, এই নারীটি গর্ভবতী। মুখে অবগুণ্ঠন, তাতেও প্রমাণ হয় যে ইনি বিবাহিতা।

রাজা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আপন মনে বললেন, পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়।

শকুন্তলা তখনো দেখতে পায়নি রাজাকে। তার বুক অসম্ভব কাঁপছে! সে দু হাত বক্ষে স্থাপন করে মনে মনে বলতে লাগলো, কেন এত ভয় লাগছে আমার মনে? মন শান্ত হও। আর্যপুত্রের সেই প্রণয়ের কথা স্মরণে আনো।

এবার পুরোহিত রাজার সামনে এসে রাজার প্রতি স্বস্তিবচন উচ্চারণ করে জানালেন যে, এই ঋষিদের যথোচিতভাবে অভ্যর্থনা করা হয়েছে। এঁরা উপাধ্যায় কণ্বের কাছ থেকে বিশেষ বার্তা এনেছেন।

রাজা উন্মুখভাবে ঋষিদের দিকে তাকালেন।

ঋষিদ্বয় একসঙ্গে বললেন, মহারাজের জয় হোক।

রাজা মাথা নিচু করে বললেন, আপনারা আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

ঋষিদ্বয় আশীর্বাদ করে বললেন, আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হোক।

রাজা এবার প্রশ্ন করলেন, আপনাদের তপস্যায় কোন বিঘ্ন ঘটেনি তো?

ঋষিদ্বয় বললেন, আপনি স্বয়ং রক্ষকর্তা, তাই আমাদের তপশ্চর্যায় কোনোই বিঘ্ন ঘটে না। সূর্য আকাশে থাকলে তো অন্ধকার থাকতে পারে না।

রাজা বললেন, তা হলে আমার রাজা হওয়া সার্থক হলো। এবার বলুন, লোকের মঙ্গলের জন্য ভগবান কণ্ব কুশলে আছেন তো?

শার্ঙ্গরব এ কথার উত্তরে জানালেন যে, তাঁর গুরু মহর্ষি কণ্বের মতন সিদ্ধপুরুষদের কুশল-অকুশল তাঁদের ইচ্ছার অধীন। তিনি আপনার কুশল কামনা করে আপনার প্রতি একটি বার্তা পাঠিয়েছেন।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, কী তাঁর আজ্ঞা, বলুন।

শার্ঙ্গরব বললেন, মহর্ষি কণ্ব জানিয়েছেন, 'আপনি আমার অনুপস্থিতিতে এবং আমার কন্যার সম্মতি নিয়ে আপনি যে তাকে বিবাহ করেছেন, আমি তা সানন্দে অনুমোদন করেছি। কারণ, যোগ্য পুরুষদের মধ্যে আপনাকে আমরা প্রধান বলে মনে করি এবং শকুন্তলাও মূর্তিমতী সৎক্রিয়া। প্রজাপতি ব্রহ্মার সম্পর্কে এই অপবাদ আছে যে, অধিকাংশ সময়েই সমগুণসম্পন্ন পাত্র-পাত্রীর বিবাহ হয় না। কিন্তু আপনাদের মিলনে তাঁর সেই অপবাদ দূর হলো। এবার আপনি আপনার আসন্নপ্রসবা পত্নীকে গ্রহণ করুন।

রাজা বজ্রাহতের মতন বিস্ময়ে বিস্ফারিত চক্ষে তাকিয়ে রইলেন। এরা কী বলছে কী? তিনি সহসা কোনো উত্তরই দিতে পারলেন না।

রাজাকে নীরব দেখে গৌতমী বললেন, আর্য, আমারও কিছু বলার ছিল, অবশ্য না বললেও চলে। আপনারা নিজেরাই পরস্পরকে বরণ করে নিয়েছেন। শকুন্তলাও গুরুজনদের মতামত নেয়নি। আপনিও

আপনার স্বজনদের কিছু জানাননি। সুতরাং নিজেরাই যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন অন্যের আর কী বলার থাকতে পারে?

রাজা তবুও নীরব।

শকুন্তলা দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করতে লাগলো রাজার উত্তর শোনার জন্য! তার স্বামী তাকে গ্রহণ করতে এমন দেরি করবেন, সে কল্পনাও করেনি।

রাজা হঠাৎ বলে উঠলেন, এসব আপনারা কী বলছেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

শকুন্তলা সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত কানে চাপা দিল। রাজার এই কথা যেন আগুন বলে মনে হলো তার।

শার্ঙ্গরব বললেন, আপনি বুঝতে পারছেন না? এসব সাংসারিক রীতি তো আপনাদেরই ভালো জানা উচিত। বিবাহিতা নারী অত্যন্ত পতিব্রতা হলেও যদি সে বহুদিন একটানা পিতামাতার কাছে থাকে, তা হলে লোকে তার সম্পর্কে পাঁচ কথা বলতে শুরু করে। সেইজন্যই সে স্বামীর প্রিয়ই হোক, বা অপ্রিয়ই হোক, তার পিতৃকুলের আত্মীয়রা তাকে স্বামীগৃহেই পাঠিয়ে দিতে চান।

রাজা বললেন, তার মানে কি আপনারা বলতে চান এই নারী আমার পূর্বপরিণীতা?

শকুন্তলার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। মনের মধ্যে যে ক্ষীণ আশঙ্কাটা ঘোরাফেরা করছিল এখন সেটাই প্রকট সত্য হয়ে উঠলো।

শার্ঙ্গরবের সহ্য হলো না রাজার এ প্রকার ব্যবহার। তিনি কঠোরস্বরে বললেন, আপনি নিজেই যা করেছেন, তখন তা অস্বীকার করা কি রাজার পক্ষে ধর্মসঙ্গত?

রাজা বললেন, এই অলীক, অসৎ প্রস্তাবটি আমার সামনে তুলছেন কেন জানতে পারি কি?

শার্ঙ্গরব বললেন, যারা ঐশ্বর্য-ভোগবিলাসে মত্ত, তাদের মধ্যে প্রায়ই এ রকম বিকার দেখা যায় বটে।

অরণ্যচারী ঋষি ছাড়া এইভাবে আর কেউ রাজার সঙ্গে কথা বলার সাহস পায় না। রাজার ভুরু ক্রোধে কুঞ্চিত হলো, কিন্তু তিনি অতি কষ্টে সংযত হয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, আপনার কথায় আমি অকারণে বিশেষ তিরস্কৃত বোধ করছি।

গৌতমীও এসব কাণ্ড দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। রাজা যে এমনভাবে শকুন্তলার সঙ্গে বিবাহ ব্যাপারটিই অস্বীকার করবেন, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, রাজা তো এখনো শকুন্তলার মুখ দেখেননি। ঐ দেবদুর্লভ মুখশ্রী দেখলে রাজা নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন।

তিনি তাড়াতাড়ি শকুন্তলার মুখের অবগুণ্ঠন তুলে দিয়ে তাকে বললেন, বাছা, কিছুক্ষণের জন্য তোকে লজ্জা ত্যাগ করতে হবে। তোর স্বামীকে তোর মুখখানি দেখাতে চাই। মুখ দেখলেই চিনবেন তিনি।

রাজা শকুন্তলার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। কিন্তু তাঁর কিছুই মনে পড়লো না। তাঁর জীবনে তো নারী কম আসেনি, সকলকে মনে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে শকুন্তলার অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি দেখে তিনি পুনরায় মুগ্ধ হলেন। এমন রমণী-রত্ন সহজে মেলে না। স্বয়মাগতা এমন একটি রূপসীকে তিনি সাগ্রহেই গ্রহণ করতেন। কিন্তু এই নারীটি যে গর্ভবতী, একে নিয়ে তিনি কী করবেন এখন? ভোর-বেলা মিহিন তুষারে ঢাকা কুন্দকুসুম থেকে ভ্রমর যেমন মধুপান করতে পারে না, আবার সে ফুলটিকে ছেড়েও যেতে চায় না, শকুন্তলাকে দেখে রাজার মনও সেই রকম দোলাচলে দুলতে লাগলো।

রাজার স্বভাবের কথা প্রতিহারীরাও জানে। সুন্দরী রমণীতে রাজার কখনো অরুচি নেই। প্রায়ই তিনি নারী শিকারে বেরিয়েছেন। আর এখন নিজে থেকে কাছে আসা এমন একটি রূপবতী যুবতীকে দেখেও যে তিনি দ্বিধা করছেন, এতে সবাই বিস্মিত বোধ করলো। অন্য কোনো লোকই এমন ধর্মনিষ্ঠা দেখাতে পারতো না।

শার্ঙ্গরব জিজ্ঞেস করলেন, মহারাজ, এখনো চুপ করে আছেন কেন?

রাজা বললেন, হে ঋষিগণ, এই নারীকে যে কখনো আমি বিবাহ করেছি, তা কিছুতেই স্মরণে আসছে না। আপনাদের কথায় এই গর্ভিণী রমণীকে আমি কী করে গ্রহণ করি বলুন? সবাই আমাকে পরদারগামী বলবে যে। এমন পাপ করতে আপনারা আমাকে প্ররো-চিত করছেন, এ যে বড়ো আশ্চর্য!

শকুন্তলা নিজেকে ধিক্ ধিক্ করে উঠলো। রাজা তার বিবাহেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অথচ শকুন্তলার আশা কত ঊর্ধ্বমুখী হয়েছিল।

শার্ঙ্গরব বললেন, তা হলে আর কথা বাড়িয়ে কী লাভ? মহামতি কণ্বের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করে আপনি যোগ্য কাজই করলেন বটে। তিনি তাঁর কন্যার প্রতি আপনার নীতিহীন আচরণও মেনে নিয়েছিলেন, দস্যুকেই দানের যোগ্য মনে করে অপহৃত ধন তাকেই ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

শার্ঙ্গরবের তুলনায় শারদ্বতের মস্তিষ্ক কিছু শান্ত। তিনি শার্ঙ্গরবকে বাধা দিলেন এবার। তিনি বুঝলেন যে, শার্ঙ্গরব রাজার প্রতি যে রকম বিদ্রূপ করে কথা বলছেন, তাতে তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার চেয়ে বিফলতার সম্ভাবনাই বেশি।

শারদ্বত বললেন, শার্ঙ্গরব, তুমি এবার একটু থামো। শকুন্তলাকে বরং কিছু বলতে দাও। শকুন্তলা, আমরা রাজাকে আমাদের বক্তব্য জানিয়েছি। মান্যবর রাজা দুষ্মন্তও তাঁর উত্তর আমাদের জানিয়েছেন। এবার ওঁর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তুমিই যোগ্য প্রত্যুত্তর দাও।

শকুন্তলা রাজার মুখের দিকে তাকালো। সেখানে তার চেনা প্রণয়-অনুরাগের কোনো চিহ্নই সে দেখতে পেল না। অনুরাগই যেখানে নেই সেখানে আর জোর করে অধিকার আদায় করার চেষ্টা করে কী লাভ? তবু একেবারে চুপ করে থাকাও যায় না। তার গর্ভে সন্তান, তাকে অপবাদ স্খলন করতে হবে।

সে কম্পিত কন্ঠে বললো, আর্যপুত্র···

তারপরই থেমে গেল। বিবাহ যে হয়েছিল, সে ব্যাপারেই তো রাজা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, সুতরাং স্বামী বলে সম্বোধন করা তো যায় না!

একটু পরে শকুন্তলা আবার বললো, হে পুরুরাজ, এখান থেকে অনেক দূরে, তপোবনে এক জ্ঞানহীনা সরলা বালিকার কাছে আপনি নানারূপ শপথ করে তাকে গ্রহণ করেছিলেন। সেইসব শপথ কি তাকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে ছিল? আজ আপনি তাকে প্রত্যাখান করে কি আপনার বংশের উপযুক্ত ব্যবহার করছেন?

রাজা দু হাতে কান ঢেকে বললেন, ছি ছি, এসব কথা শোনাও পাপ। কুলপ্লাবিনী নদী যেমন নির্মল জলকে আবিল করে এবং দু পারের বৃক্ষগুলিকেও উৎপাটিত করে দেয়, আপনি সেই রকম নিজের কুলকে কলঙ্কিত করে আমার বংশকেও অধঃপতিত করতে চাইছেন।

শকুন্তলা বেদনার্ত কণ্ঠে বললো, আমি সত্যি বলছি, না মিথ্যা বলছি, সে বিচারে আপনার অন্তঃকরণই সাক্ষী। যে কাজ আপনি গোপনে করেছেন, সে কাজও অন্তর্যামী ঠিক টের পান।

একটু চুপ করলো শকুন্তলা। তার হঠাৎ মনে পড়লো সখীরা একবার বলেছিল, রাজা যদি চিনতে না পারেন তাহলে রাজার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টি দেখাতে।

শকুন্তলা বললো, আপনি যদি সত্যিই পরস্ত্রী গমনের ভয়ে আমাকে চিনতে অস্বীকার করে থাকেন, তাহলে আপনাকে আমি এই অভিজ্ঞান দেখাচ্ছি। এবার হয়তো আপনার সব সন্দেহ দূর হবে।

রাজা বললেন, বেশ তো। দেখা যাক। আঁচলের আড়াল থেকে শকুন্তলা বার করলেন তাঁর বাম হাত। সকলের উৎসুক দৃষ্টির সামনে সেই হাতটি মেলে ধরলেন। সেখানে রাজ-অঙ্গুরীয় নেই!

শকুন্তলা ব্যাকুলভাবে বললেন, একী! আংটি কোথায় গেল?

গৌতমী বলে উঠলেন, নিশ্চয়ই কোথাও পড়ে গেছে। শচীতীর্থের জলে দাঁড়িয়ে তুই যখন প্রণাম করছিলি তখনই পড়ে গিয়ে থাকবে।

রাজা উচ্চহাস্য করে বললেন, একেই বলে স্ত্রীজাতির প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব! সঙ্গে সঙ্গে একটা কারণ দেখানো হয়ে গেল!

গৌতমী অসহায়ভাবে বললেন, রাজন্! স্বামী-চিন্তায় শকুন্তলা এই ক'মাসে শীর্ণ হয়ে গেছে। তার আঙুল থেকে অঙ্গুরীয় খসে পড়তেই তো পারে।

রাজা তবু বিদ্রূপ হাস্য করতে লাগলেন।

শকুন্তলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, নিয়তির প্রভুত্বেই বুঝি এমন হলো। আচ্ছা, আমি কি আর একটি প্রমাণের কথা বলবো?

রাজা বললেন, আপত্তি কি? শোনা যাক, যদি শোনবার মতন হয়।

শকুন্তলা মুখ নিচু করে ধীরস্বরে বললো, একদিন বেতস কুঞ্জে আপনি একটি জলভর্তি পদ্মপাতা হাতে ধরে বসেছিলেন—

আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল শকুন্তলার। সে আর বলতে পারলো না।

রাজা বললেন, তারপর? আমি শুনছি—

শকুন্তলা নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, দীর্ঘাপাঙ্গ নামে একটি হরিণশিশু....তাকে আমি পালন করেছি....আপনি তাকে জলপান করাতে

চাইলেন। কিন্তু সে আপনাকে চেনে না, তাই আপনার কাছে গেল না...তারপর আমি যখন পদ্মপাতাটি আমার হাতে নিয়ে ওকে ডাকলাম....ও ছুটে এলো···তখন আপনি হেসে উঠলেন....আপনি বললেন, তোমরা দুজনেই তো এক জাতির...তুমিও একটি বনহরিণী। তাই ও তোমায় এত বিশ্বাস করে...

বলতে বলতে কেঁদে ফেললো শকুন্তলা।

রাজার হৃদয় তাতে একটুও গললো না। তিনি শ্লেষের সঙ্গে বলে উঠলেন, গল্পটি চমৎকার। বিষয়ী লোকদের মন কাড়াবার জন্য স্ত্রীলোকেরা এ রকম অনেক মধুর মিথ্যে গল্প বানাতে পারে।

গৌতমী শিহরিত হয়ে বললেন, ছিঃ ছিঃ এমন কথা বলবেন না। হে ঋদ্ধিমান, শকুন্তলা আবাল্য তপোবন পালিতা, মিথ্যা বা ছলনা ও কিছুই জানে না।

রাজা বললেন, বৃদ্ধা তাপসী, আমি সব জানি! মানুষ কেন, পশুপাখিদের মধ্যেও স্ত্রী-জাতীয়েরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য এমন স্বভাবপটু হয়। আর যে নারীর একটু বুদ্ধি আছে, সে তো সবই পারে। নারী কোকিল উড়তে শেখার আগেই বলতে গেলে নিজের শাবকদের অন্য পাখির বাসায় লালন-পালনের জন্য রেখে যায়।

লজ্জায় ও দুঃখে শকুন্তলা মূর্তির মতন স্থির হয়ে রইলো একটুক্ষণ। রাজার বিদ্রূপ-বাণ অকস্মাৎ তার হৃদয় জ্বলে উঠলো। সততা থেকে বেরিয়ে আসে যে ক্রোধ, তা অনেক বেশি তীব্র হয়। সে বক্র নয়নে রাজার দিকে এমনভাবে চাইলো যেন বোধহয় তার দৃষ্টির আগুনে রাজা একেবারে ভস্মীভূত হয়ে যাবেন। ক্রোধ সংবরণের চেষ্টা করেও সে পারলো না।

সে রাজাকে সম্বোধন করে বললো, আশ্চর্য! আপনি নিজের মতন করেই সকলকে দেখছেন। আপনি ভাবছেন, আপনার মতন নীচ আচরণ সকলেই করে? ভূমিতে ফাঁদের ওপর তৃণ বিছিয়ে সবাই আপনার মতন ধার্মিক সেজে থাকে? আপনি সর্ষপপ্রমাণ পরদোষও ধরতে চান, আর বেলফলের পরিমাণ আত্মদোষ দেখতে পান না। যে ব্যক্তি নিজেই দুর্জন, সেও সজ্জনকে দুর্জন বলে—এর চেয়ে হাস্যকর আর কী আছে?

রাজা একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন শকুন্তলার দিকে। শকুন্তলা মুহূর্তের জন্যও তাঁর চক্ষু থেকে চক্ষু সরালো না। স্ফুরিতধরা,

তেজস্বিনী এই তন্বীকে দেখে রাজার খটকা লাগলো। এই যে ক্রোধের প্রকাশ, এ কি অভিনয় হতে পারে?

অথচ মেয়েটির মুখে এতখানি কথা শুনেও তো রাজার কিছুই মনে পড়ছে না। এই গর্ভিণী নারীকে তিনি গ্রহণই বা করেন কী করে? তাতে লোকনিন্দা হবে।

রাজা বললেন, আপনি যতই অপবাদ দিন, সকলেই জানে যে, পুরু-বংশীয় রাজা দুষ্মন্ত কখনো দুর্জনের মতন কোনো কাজ করে না। এমন কি আমার রাজ্যেও কেউ পরস্ত্রী-গমন করে না।

শকুন্তলা বললো, অর্থাৎ আপনি বলতে চান আমি স্বৈরিণী। ধিক, আমাকে ধিক্। আপনার উচ্চ বংশের কথা শুনে আমি আপনাকে বিশ্বাস করেছিলাম, এই তার পুরস্কার। তখন বুঝিনি, আপনার মুখের কথা এত মধুর, কিন্তু অন্তরে ভরা প্রতারণা।

শার্ঙ্গরব শকুন্তলাকে বললেন, যেমন নিজের চাপল্যে অসংযমী হয়েছিলে, এখন তার ফলভোগ করো। তখন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করোনি কেন? এইজন্যই বলে গান্ধর্ব বিবাহ যার-তার সঙ্গে চলে না। খুব ভালো করে মন জানাজানি না হলে ক্ষণিকের উন্মাদনায় যাকে বন্ধু বলে মনে হয়, সেও পরে শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

রাজা বললেন, একী, আপনি শুধু আমাকেই দোষ দিচ্ছেন কেন? এই রমণীর সমস্ত কথা বিশ্বাস করে যাবতীয় অভিযোগ ছুঁড়ে দিলেন আমার দিকে?

শার্ঙ্গরব উপহাস করে বললেন, চমৎকার প্রশ্ন। জন্ম থেকেই যে ছল-চাতুরি কিছুই জানে না, তার কথা বিশ্বাস করবো না, আর পর-প্রতারণাকে যারা বিদ্যাবলে শিক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁদের কথাই প্রমাণ বলে ধরতে হবে!

রাজাও সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের সঙ্গে বললেন, আপনি ঋষি, আপনি সব সময়ই যথার্থ কথা বলেন। না হয় মেনেই নিলাম প্রতারণা আমাদের শিক্ষা করতে হয়, তাহলে বলুন তো এই যুবতীকে প্রতারণা করে আমার কী লাভ?

জলদগম্ভীর স্বরে শার্ঙ্গরব বললেন, নিপাত!

রাজাও তেজের সঙ্গে উত্তর দিলেন, পুরুবংশীয়রা নিপাত যাবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, একথা কেউ বিশ্বাস করবে না। এ যুক্তি অশ্রদ্ধেয়।

শারদ্বত ঋষি দেখলেন যে তাঁর সঙ্গী ও রাজার বাক্‌যুদ্ধ চরম দিকে চলেছে। তিনি তাড়াতাড়ি সামনে এসে বললেন, শাঙ্গর্রব, এ রকম তর্কাতর্কি করলে কোনো লাভ হবে কি? গুরুর আদেশে আমরা এখানে এসেছি। আমাদের কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে, চলো আমরা এবার ফিরি।

রাজার উদ্দেশে শারদ্বত বললেন, মহারাজ, ইনি আপনার পত্নী। ইচ্ছে হয় এঁকে গ্রহণ করুন, ইচ্ছে হয় ত্যাগ করুন। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার সর্বতোমুখী। আপনি যা ভালো বুঝবেন করবেন।

তারপর গৌতমীকে বললেন, আপনি আগে আগে চলুন।

তিনজন পিছন ফিরে বেরিয়ে চলে যেতে লাগলেন। কয়েক মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে গেল শকুন্তলা। তারপর ক্রন্দনমিশ্রিত স্বরে চিৎকার করে বললেন, একী। এই লোকটি আমার সঙ্গে শঠতা করেছে। আর তোমরাও আমায় ফেলে চলে যাচ্ছো? তাহলে আমি কোথায় যাবো?

শকুন্তলা ছুটে গিয়ে চেপে ধরলো গৌতমীর আঁচল।

গৌতমী বললেন, শাঙ্গর্রব, ওকে আমরা এমনভাবে ফেলে যাই কী করে? ওর কান্না যে আমি সইতে পারছি না। ওর স্বামী ওকে নিল না, ও এখানে থেকে কী করবে? ও আমাদের সঙ্গেই চলুক বরং।

শার্ঙ্গরব বললেন, না!

শকুন্তলাকে প্রবল ধমক দিয়ে বললেন, দুষ্টা বালিকা, তোমার যা খুশি তাই করতে চাও!

সেই গর্জন শুনে শকুন্তলা ভয়ে কাঁপতে লাগলো।

গৌতমী এবং শারদ্বত শাঙ্গর্রবকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

তখন শাঙ্গর্রব শকুন্তলাকে আবার বললেন, শোনো, মহারাজ যা বললেন, তা যদি সত্যি হয়, তা হলে তুমি তো স্বৈরিণীই, তাত কন্ব তোমাকে তপোবনে আর কী করে রাখবেন? আর যদি তুমি সত্যিই নিজেকে পবিত্র পতিব্রতা বলে মনে করো, তা হলে পতিগৃহে দাসীবৃত্তি করাও তোমার পক্ষে ভালো। সুতরাং এখানেই তুমি থাকবে, আমরা চললাম।

শকুন্তলাকে ফেলে অন্যরা চলে যাচ্ছেন দেখে রাজা ডেকে বললেন, হে মহাত্মন,এবার আপনিই একে মিথ্যে প্রতারণা করছেন কেন? দেখুন,

চন্দ্র প্রফুল্ল করেন কুমুদিনীকে আর সূর্য প্রস্ফুটিত করেন কমলিনীকে। পুরুবংশীয়রা কেউ কখনো পরস্ত্রীলোলুপ নয়। এবং আপাতত এ গৃহে দাসীরও কোনো প্রয়োজন নেই।

শার্ঙ্গরব এক মুহূর্ত থেমে ক্রোধ সংযম করলেন। আর মাথা গরম করে কোনো লাভ নেই। এবার তিনি খানিকটা কাতর গলায় বললেন, মহারাজ, সবাই জানে, আপনি ধর্মপরায়ণ। আপনি সদা ব্যস্ত, বহু রকম কাজের মধ্যে আপনাকে ডুবে থাকতে হয়। আপনি একবারও কেন ভাবছেন না যে, আপনার কোনো ভুল হতে পারে। এই বালিকাকে কোনো এক সময় গোপনে বিবাহ করে তারপর আপনি এখন তা বিস্মৃত হয়েছেন! যদি তাই হয়, তা হলে আপনার সন্তান-সম্ভবা ধর্মপত্নীকে পরিত্যাগ করা কি ঘোরতর অন্যায় হবে না?

শার্ঙ্গরবের যুদ্ধং দেহি ভাবটা চলে গেছে দেখে রাজাও একটু নরম হলেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে, আপনার কাছেই আমি ন্যায় অন্যায়ের বিচার চাই। আমি পূর্ব ঘটনা বিস্মৃত হতে পারি, আবার ইনিও তো মিথ্যাবাদিনী হতে পারেন? দু'দিকেই যদি এ রকম সন্দেহ থেকে যায়, সে ক্ষেত্রে আমার পক্ষে পত্নীত্যাগ বেশি অন্যায়, না পরস্ত্রীস্পর্শে পাতকী হাওয়াই সঙ্গত? বলুন!

শার্ঙ্গরব সহসা উত্তর না দিতে পেরে চুপ করে রইলেন।

তখন রাজার পুরোহিত সোমরাত বললেন, মহারাজ, আমি একটা প্রস্তাব দেবো? যদি এমন হয়—

রাজা বললেন, হ্যাঁ, বলুন।

পুরোহিত বললেন, যতদিন না প্রসব হয়, ততদিন এই রমণী না হয় আমার গৃহে থাকুন। এ কথা কেন বলছি, তার একটা কারণ আছে। সিদ্ধ পুরুষেরা ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে আপনার প্রথম সন্তানের শরীরে রাজচিহ্ন থাকবে। যদি মুনি-দৌহিত্রের সে রকম লক্ষণ দেখা যায়, তা হলে আপনি এঁকে সাদরে রাজঃঅন্ত-পুরে নিয়ে যাবেন। আর যদি তেমন না হয়, তা হলে সন্তান-সমেত এঁকে পিতার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

রাজা বললেন, আপনি যদি চান, এতে অবশ্য আমার আপত্তি নেই।

গৌতমী এবং অন্য ঋষিরাও এই ব্যবস্থা সঙ্গত মনে করলেন। রাজপুরোহিত শকুন্তলাকে ডেকে বললেন, বৎসে, আমার সঙ্গে এসো।

অপমানে শকুন্তলার সারা শরীর ক্লিন্ন মনে হলো। তাকে কেউ বিশ্বাস করেনি, তাকে আবার একটি পরীক্ষার মধ্যে ফেলা হচ্ছে। পুত্রের বদলে তার যদি কন্যা সন্তান জন্মায়, তবে তার অঙ্গেও কি রাজলক্ষণ দেখা যাবে? অথবা কন্যা সন্তান জন্মালেই অপ্রমাণ হয়ে যাবে তার সব কথা?

ডাক ছেড়ে কেঁদে শকুন্তলা সাতীর মতন ধরিত্রীর উদ্দেশে বললেন, হে ভগবতী বসুধা, দ্বিধা হও, তোমার কোলে আমায় আশ্রয় দাও!

কিন্তু শকুন্তলা ধরিত্রীর কন্যা নয় বলেই সম্ভবত ধরিত্রী সাড়া দিলেন না। রোদন করতে করতে শকুন্তলা সকলের সঙ্গে বেরিয়ে গেল অগ্নিগৃহ থেকে। তারপর দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড় লাগালো।

এর পর একটি আশ্চর্য কাণ্ড ঘটলো।

আকাশ নীল ছিল, তবু হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এলো ঝড়। শকুন্তলা তারই মধ্যে ছুটতে ছুটতে চলে এলো অপ্সরাতীর্থ নামে নিকটবর্তী এক সরোবরের কাছে। সেখানে ঝড়ের মধ্যে শুকনো পাতা ও ধুলো-বালিতে অন্ধকার হয়ে আছে, তার মধ্যে মিলিয়ে গেল শকুন্তলা। একটু পরে ঝড় থামলে তাকে আর দেখা গেল না।

রাজপুরোহিত এবং সঙ্গের অন্যান্য লোকজনের মনে হলো, যেন ঐ ঝড়ের মধ্যেই আকাশ থেকে নেমে এসেছিল এক অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী দিব্যাঙ্গনা। সে এসে যেন শকুন্তলাকে কোলে তুলে নিয়ে আবার মিলিয়ে গেল অন্তরীক্ষে।

গৌতমী এবং ঋষি দুজন শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত জানেন। তাঁরা মনে করলেন যে শকুন্তলার ডাকে ধরণী সাড়া দিয়ে দ্বিধা হন নি বটে, কিন্তু সুরলোক থেকে শকুন্তলার জননী অপ্সরা মেনকা এসে এই অপমান থেকে তার কন্যাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল।

এবার তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে তপোবনের পথ ধরলেন।

রাজপুরোহিত ছুটে গিয়ে এই অলৌকিক বৃত্তান্ত জানালেন রাজাকে।

রাজা দুষ্মন্ত তখনও ঠিক একই জায়গায় বসেছিলেন চুপ করে।

উত্তেজিত পুরোহিতের মুখে সব কথা শুনেও রাজা কোনো ব্যাকুলতা বা বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বিরস

মুখে বললেন, আর্য, ঐ যুবতীটিকে আমি আগেই প্রত্যাখ্যান করেছি। সে কোথায় গেল কিংবা থাকলো, তাতে আমার আর কোনো আগ্রহ নেই। দয়া করে আমার কাছে আর শকুন্তলা-প্রসঙ্গ উত্থাপন করবেন না। আপনি এবার গিয়ে বিশ্রাম করুন।

পুরোহিত বললেন, মহারাজের জয় হোক।

রাজা পরিচারিকার দিকে ফিরে বললেন, বেত্রবতী, আমার কিছুই ভালো লাগছে না, আমাকে শয়ন গৃহের দিকে নিয়ে চলো।

যেতে যেতে রাজা একবার ফিরে তাকালেন। ঠিক যেখানটিতে শকুন্তলা দাঁড়িয়েছিল, সেখানে দৃষ্টিপাত করলেন তিনি। এই ঋষি-কন্যাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন, কারণ তিনি ওকে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য। ওকে তিনি কখনো বিবাহ করেছেন, এ কথা কিছুতেই তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি।

তবু রাজার বুকের মধ্যে এখন একবার যেন একটা মোচড় লাগলো। ওকে প্রত্যাখ্যান না করলে কী হতো? যদি ওকে গ্রহণ করা যেত?

॥ ৬ ॥

এরপর প্রায় ছ'বছর কেটে গেছে।

রাজা দুষ্মন্ত আরও অনেক অভিযানে বেরিয়েছেন, আরও অনেক নারী সম্ভোগ করেছেন। শকুন্তলার কথা তাঁর আর একবারও মনে পড়েনি।

এখন ভোগবিলাসে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন মাঝে মাঝে। শরীরে আর সে জোর নেই, যৌবন চলে পড়েছে। তাঁর কোনো কিছুরই অভাব নেই, শুধু একটি মর্মপীড়া তাঁকে সইতে হয় সর্বক্ষণ।

এ পর্যন্ত তাঁর একটিও পুত্র-সন্তান জন্মায়নি। তাঁর কোনো ভার্যাই তাঁকে উপহার দিতে পারেনি তাঁর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। তাই সব কিছুই এক এক সময় তাঁর উদ্দেশ্যহীন মনে হয়। তিনি যন্ত্রের মতন রাজকার্য করে যান।

তারপর আবার একদিন একটি সামান্য ঘটনায় সব কিছু বদলে গেল।

রাজধানীর এক স্বর্ণকারের কাছে একদিন একটি লোক এলো একটি আংটি বিক্রয় করতে। লোকটির খালি গা এবং চেহারা দেখলেই বোঝা যায় সে সামান্য মানুষ। কিন্তু আংটিটি বহুমূল্য, অনেক মণি-মাণিক্যখচিত। ঐ লোকটির কাছে ও রকম একটি আংটি দেখেই সন্দেহ হলো স্বর্ণকারের। সে ডেকে আনলো দু'জন রাজরক্ষী।

রক্ষী দু'জন এক নজর দেখেই লোকটিকে চোর বলে ধরে নিয়ে শুরু করলো প্রহার। আংটিটি যে খুবই মূল্যবান, তা শুধু নয়, তাতে রাজার নাম খোদাই করা আছে। লোকটি চিৎকার করে আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলতে চায়, কিন্তু রক্ষীরা তা শুনবে না।

দৈবাৎ সেই সময় নগর-কোটাল যাচ্ছিলেন সেই পথ দিয়ে। কোলাহল শুনে তিনি দেখতে এলেন এবং রাজার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখে তিনি চমকে উঠলেন। এ অঙ্গুরীয় ধারণ করার সৌভাগ্য এমন কি নগর কোটালেরও নেই, যদিও তিনি সম্পর্কে রাজার শ্যালক।

কোটালকে দেখে লোকটি বললো, হুজুর, আমি চোর নেই, আমি নদীতে পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরি, মাছ ধরাই আমার পেশা।

প্রহরীরা তার পিঠে আরও গোটা দুই কিল মেরে বললো, মাছ-ওয়ালারাও মহাচোর হয়! জেলে বলেই তুই সাধারণ চোরদের চেয়েও ভালো হলি কিসে?

লোকটি তখনও বিনীত অথচ দৃঢ় গলায় বললো, আমাকে আপনারা যত খুশি মারুন, কিন্তু আমার পেশাকে নিন্দা করবেন না। জন্মগত ভাবে যার যা পেশা, তাকে তাই করতেই হয়। পেশার ক্ষেত্রে কসাই আর ব্রাহ্মণে তফাত কী!

প্রহরীরা আবার আরও জোরে দুই কিল মেরে বললো, তোর এত স্পর্ধা, তুই কসাইয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণের তুলনা করিস!

লোকটি বললো, দেখুন, ব্রাহ্মণরা বেদ পাঠ করেন, তাঁদের মনে কত দয়ামায়া, কিন্তু যজ্ঞের সময় তাঁরাও তো পশুবধ করেন নিষ্ঠুর-ভাবে!

রাজশ্যালক নগর-কোটাল বললেন, ওসব বড় বড় কথা তোর মুখ থেকে শুনতে চাই না। এই আংটিটা কোথা থেকে পেয়েছিস বল?

লোকটি বললো, আমার বাড়ি শক্রাবতারে। সে জায়গার নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। বড় মনোরম জায়গা, আর সেখানকার মিষ্টি

জলের মাছের স্বাদও অপূর্ব। সেই মাছ খাবার জন্যই অনেকে শক্রাবতারে ছুটে যায়।

কোটাল ধমক দিয়ে বললেন, আরে তোর মাছের গল্প কে শুনতে চায়, আংটি কোথা থেকে পেলি শীঘ্র বল।

লোকটি বললো, সেই কথাই তো বলছি। সেখানে শচীতীর্থ নামে গঙ্গার একটি ঘাট আছে। তীর্থস্থানের মাছগুলো এমনিতেই বড় হয়, তিন দিন আগে যে রুই মাছটি অর্থাৎ আপনারা যাকে রোহিন মৎস্য বলেন, সেই মাছটি ধরেছি, সে রকম বড় মাছ আমিও আগে দেখি নি। ভাবলাম, সেই মাছেই আমার ভাগ্য ফিরবে।

একজন রক্ষী কোটালকে বললো, হুজুর, এ কিছুতেই আসল কথাটা বলতে চাইছে না, একে শূলে চড়াবার জন্য আমার হাত নিশ-পিশ করছে।

ধীবরটি বললো, আসল কথা তো বলাই হয়ে গেছে। সেই রুই মাছটি কাটবার পর তার পেটের মধ্যে এই মণি-মাণিক্য বসানো সোনার আংটি চকচক করে উঠলো। মাছ যে ধরে, মাছের মালিক সে। মাছের পেটের মধ্যে যা পাওয়া যায়, তার মালিক কি অন্য কেউ হবে? এ রকম কখনো শুনিনি! এই আংটিটি আমারই সম্পত্তি ভেবে আমি এটা বিক্রি করতে এসেছি, এতে অন্যায়টা কী হয়েছে তা তো বুঝতে পারছি না!

নগরপাল অঙ্গুরীয়টি নিয়ে নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকলেন। অঙ্গুরীয়টিতে কাঁচা মাছের গন্ধ। হয়তো এই ধীবরটির কাহিনী সত্য হতেও পারে।

তিনি প্রহরীদের কাছে ধীবরটিকে জিম্মা রেখে অঙ্গুরীয়টি নিয়ে গেলেন রাজসন্নিধানে।

রাজা দুষ্মন্ত তখন উদ্যানে নিভৃতে বসেছিলেন, অঙ্গুরীয়টি দেখা-মাত্র তাঁর শরীরে যেন বিদ্যুৎস্পর্শ হলো। তিনি সেটি প্রায় কেড়ে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করলেন, এ অঙ্গুরীয় তুমি কোথায় পেলে?

শ্যালক তাঁকে আনুপূর্বিক কাহিনী জানালো।

শুনতে শুনতে রাজা অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, শচীতীর্থ!

তারপর শ্যালককে বললেন, যাও, রাজকোষ থেকে এক সহস্র মুদ্রা

নিয়ে সে ধীবরটিকে পারিতোষিক দাও। এই অঙ্গুরীয়টির মূল্য আমার জীবনে যে কতখানি, তা সে বা তুমি কিছুই বুঝবে না!

শ্যালক চলে যাবার পর রাজা অংগুরীয়টি চুম্বন করলেন একবার। তাঁর চক্ষু সজল হয়ে এলো। তার পরই তিনি অসম্বৃতভাবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন!

সব কথা মনে পড়ে গেল রাজার।

এর পর রাজা দুষ্মন্তের জীবনে এবং রাজধানীতে এক বিরাট পরিবর্তন এলো। যুদ্ধবিগ্রহহীন শান্তির সময়ে রাজধানীতে নানা প্রকার উৎসব লেগেই থাকে। বসন্ত ঋতু সমাগত, আসন্ন বসন্ত-উৎসবের জন্য নাগরিকরা সব প্রস্তুত হচ্ছিল, রাজার আদেশে সেই বিরাট উৎসব এবার সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। রাজার মন ভালো নেই, তাই রাজপুরীতে নৃত্য, গীত, বাদ্য স্তব্ধ।

রাজা সব সময় উদ্যানে বসে কাটান। রাজকার্যে তাঁর মন নেই। বিরলে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে তিনি মাঝে মাঝে বলে ওঠেন, হা শকুন্তলা, কোথা শকুন্তলা!

রাজার ছবি আঁকার বেশ হাত আছে। অনেকদিন চর্চা করেননি। এখন আবার তুলিকা হাতে নিয়ে তিনি একটি পটের ওপর শকুন্তলার ছবি আঁকেন। আঁকতে আঁকতে তিনি নিবিষ্ট হয়ে যান, তাঁর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে চিত্রপটের ওপর। সেই সময় রাজসভা থেকে কোনো গুরুতর কার্যের ডাক এলেও তিনি ফিরিয়ে দেন। বস্তুত অন্য কারুর সংসর্গও আর তাঁর পছন্দ হয় না।

একমাত্র মাধব্য ছাড়া। রাজার বন্ধু ও বিদূষক মাধব্যই শুধু পারে তার কথা দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য রাজার মন ভোলাতে। কার্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় মাধব্য কয়েকদিন আসেনি রাজপুরীতে। যেদিন সে এলো, সেদিন সকলেই তাকে অনুরোধ জানালো, যদি সে কথায় কথায় রাজাকে ভুলিয়ে আবার রাজার মন ফেরাতে পারে রাজকার্যে।

সেদিনই অপ্সরা মেনকার এক সখীও এসেছে রাজা দুষ্মন্তের বর্তমান অবস্থা দেখে যাবার জন্য। সখীটির নাম সানুমতী, সে তিরস্করিণী বিদ্যা জানে বলে নিজেকে সবার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য রাখতে পারে। সে সবকিছু দেখতে পাবে, কিন্তু তাকে কেউ দেখতে পাবে না।

সানুমতী এসে দেখলো, রাজপুরীতে বিরাজ করছে এক অস্বস্তি-কর নীরবতা। পরিচারিকারা কথা বলে ফিসফিস করে। রাজার

এই আকস্মিক ভাবান্তরের কারণ অনেকেই জানে না। তারা কৌতূহলে বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ভাবে, কেন এমন হলো? রাজা তাঁর সচিবদের সঙ্গে দেখা করেন না। আহার-পানীয়তে তাঁর রুচি নেই, তার প্রতিটি নিঃশ্বাসই যেন দীর্ঘশ্বাস। কোনো কোনো পরিচারিকা দেখেছে যে রাজা সারারাত বিছানায় শুয়ে ছটফট করেন, বিনিদ্র অবস্থাতে তাঁর রাত্রি কেটে যায়। রাজার পূর্বপ্রিয় রমণীরা কেউ কেউ তাঁর মনোরঞ্জন করতে এলে রাজা দাক্ষিণ্য দেখিয়ে তাদের সঙ্গে দু-একটা শোভন বাক্য বলেন বটে, কিন্তু অনেক সময়ই তাদের নাম ভুলে যান। একজনকে অন্যের নাম ধরে ডাকেন। এমনটি আগে কখনো হতো না।

কোনো কোনো পরিচারিকা কিছু কিছু টুকরো টুকরো সংবাদ রাখে। দু-একজন দেখছে যে রাজার এক রক্ষিতার ভাই, যে নগর-পাল, সে এসে একদিন একটি অঙ্গুরীয় দেবার পর থেকেই রাজার এই পরিবর্তন। কেউ দেখেছে, রাজা প্রায় সময়ই এক আশ্রমকন্যার ছবি আঁকেন। কারুর কারুর মনে পড়ে, কয়েক বছর আগে রাজা এক স্বয়মাগতা ঋষিকন্যাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই সব টুকরো টুকরো ঘটনা জোড়া দিয়ে কেউ একটা কাহিনী খাড়া করার চেষ্টা করে, অমনি তাকে ঘিরে সব পরিচারিকারা উৎসুকভাবে ঘিরে দাঁড়ায়।

বসন্ত উৎসবে প্রতি বৎসর এ সময় অফুরন্ত প্রমোদের স্রোত বয়ে যায়। ভোগ-সম্ভোগ ও কামলীলার কোনো মাত্রা থাকে না। রাজার অন্য এক শ্যালক, মিত্রাবসু, এই উপলক্ষে দুটি অতি রূপসী কামকলা-পটিয়সী যুবতীকে রাজার কাছে পাঠিয়েছেন উপঢৌকন হিসেবে। মধু-করিকা ও পরভৃতিকা নামে সেই যুবতী দুটি এখানে এসে হকচকিয়ে গেছে। সে বেচারারা কিছুই জানে না, তারা রাজপুরীতে এসে দেখছে, কোথায় উৎসব, কোথায় কী! সব জায়গায় যেন শোকের নীরবতা। রাজা তাদের দিকে ফিরেও তাকান না। তারা রতিরঙ্গ ও প্রণয়-বন্দনার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে, এই স্বভাববশত তারা ফুলশোভিত উদ্যানে গিয়ে আপন মনে নেচে গেয়ে মদনদেবকে আহ্বান জানায়, অমনি কোথা থেকে কঞ্চুকীরা ছুটে এসে তাদের বকুনি দিয়ে চুপ করতে বলে।

সানুমতী সবার অলক্ষ্যে ঘুরে ঘুরে এইসব দেখতে ও জানতে

লাগলো। শুধু যে পরিচারিকারাই উৎসব দমন করে আছে তা নয়, বিরহী রাজার প্রতি সমব্যথী হয়ে আছে প্রকৃতিও। বাগানের ফুলগুলি উদ্‌গত হতে গিয়ে যেন কুঁড়ি হয়ে থমকে আছে। শীত চলে গেছে, তবু কোকিলরা ডাকছে না প্রাণ খুলে। কামদেবও যেন তার বাণ অর্ধেক তুলে আছেন। তারপর সানুমতী চলে এলো কাননের অভ্যন্তরে, যেখানে মণিময় শিলাসনে বসে আছেন রাজা দুষ্মন্ত।

সানুমতী দেখলো, রাজার সর্বাঙ্গে অলঙ্কার থাকার কথা, কিন্তু সব-কিছু পরিত্যাগ করে তিনি শুধু রাজচিহ্ন হিসেবে বাম বাহুতে একটি স্বর্ণবলয় ধারণ করে আছেন। তাঁর শোকজর্জর শরীরটি যেন ঈষৎ ক্ষীণ অথচ দীপ্তিমান। ঘনঘন উষ্ণ নিঃশ্বাস ফেলার জন্য তার ওষ্ঠ রক্তিম বর্ণ, অনিদ্রার কারণে চক্ষু দুটি তাম্র বর্ণ বলে মনে হয়। সানুমতী তবু ভাবলেন, শকুন্তলা যতখানি কষ্ট পেয়েছে ও পাচ্ছে তার তুলনায় রাজার কষ্ট এমন কিছুই নয়।

রাজার দু পাশে দাড়িয়ে আছে দুজন একান্ত পরিচারিকা। রাজা এক সময় মুখ তুলে বললেন বেত্রবতী, তুমি যাও, রাজসভায় গিয়ে খবর দাও আজও আমার বিচারাসনে বসবার ইচ্ছে নেই।

অন্য পরিচারিকাটিকেও তিনি বললেন, বাতায়ন, তুমিও তোমার অন্য কাজে যাও। আমি এখন একা থাকতে চাই।

এই সময় এসে দাঁড়ালো বিদূষক মাধব্য। প্রথমেই সে কাছে না এসে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো রাজাকে।

পরিচারিকারা চলে যাবার পর রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, মৃগ–নয়না সেই আমার প্রিয়া একদিন আমার কাছে এসে আমার এই ঘুমন্ত হৃদয়কে জাগাবার জন্য কত অনুনয় করেছিল। তখন আমি জাগিনি। এতকাল পরে স্মৃতি যে জাগ্রত হলো! তা শুধু অনুতাপের অনলে ধিকিধিকি করে জ্বলবার জন্য!

মাধব্য আপন মনে বললো, হুঁ, রোগ বেশ কঠিন দেখছি!

তারপর কয়েক পা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, বয়স্য, আমি আসতে পারি কি?

রাজা মুখ তুলে তাকে দেখলেন। একমাত্র মাধব্যের কাছেই মনের সব কথা বলা যায় বলে তিনি বললেন, এসো! তোমার আবার বাধা কী?

মাধব্য কাছে এসে বললো, যেমনভাবে শেষ মাছিটিকেও তাড়ালেন, তাতে মনে হচ্ছিল কারুরই এখানে প্রবেশ অধিকার নেই।

চারদিকে একবার তাকিয়ে মাধব্য বললো, আজ শীতও বেশি নেই আবার রোদ্দুরের তাপও নেই, দিনটি চমৎকার। জায়গাটিও অতি মনোরম, এখানে বসে থাকলে দিব্য সময় কেটে যায়।

রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বয়স্য, কথায় বলে না, একটু ছিদ্র পেলেই বিপদ সদলবলে সেখান দিয়ে ঢুকে পড়ে! আমার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। মোহের বশে আমি সেই আশ্রম দুহিতাকে ভুলে গিয়েছিলাম, সেই মোহ যেই কেটে গেল, অমনি আমি প্রবল দুঃখে পীড়িত হচ্ছি। তার ওপর দ্যাখো, সময় বুঝে কামদেব আমাকে বিদ্ধ করবার জন্য তাঁর ধনুকে তীর যোজনা করেছেন। এই আমের মুকুলের দিকে চেয়ে দ্যাখো, ঠিক মনে হয় না, উদ্যত কামদেবের শর?

মাধব্য বললো, কামদেবের এ তো ভারী অন্যায়! তিনি আর সময় পেলেন না! বিরহ আর কামজ্বালা কি কেউ একসঙ্গে সহ্য করতে পারে! দাঁড়ান, আমার লাঠি দিয়ে আমি কামের ধনুটি ভেঙে দিচ্ছি এক্ষুনি!

এই বলে মাধব্য লাফিয়ে লাফিয়ে আমের বোলে লাঠির বাড়ি মারতে লাগলো।

তার ভাবভঙ্গিতে রাজা একটু না হেসে পারলেন না। তিনি বললেন, থামো, খুব হয়েছে, তোমার ব্রহ্মতেজ দেখালে বটে! বয়স্য, তুমি তো সব পারো, আমার মন ভালো করে দিতে পারো?

মাধব্য বললো, আমি চেষ্টার কখনো ত্রুটি করি না।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে বলো তো, কী করে এখন আমি আমার প্রেয়সীর সান্নিধ্য অনুভব করতে পারি?

মাধব্য বললো, হ্যাঁ, তাও আমি বলে দিতে পারি। কিন্তু তা হলে এখানে বসা চলবে না। এখানে আমগাছটা যেন সত্যিই তীর উঁচিয়ে আছে। মাধবী কুঞ্জে চলুন। মাধবী লতার সঙ্গে কি সেই আশ্রম কন্যার সাদৃশ্য নেই?

রাজা বললেন, ঠিক বলেছো। তুমি তাও জানো?

মাধব্য বললো, মাধবী কুঞ্জে গিয়েই বসা যাক। তারপর শকুন্তলার যে প্রতিকৃতিটি আপনি এঁকেছেন, সেটিকেও যদি সেখানে আনা যায়, তা হলে তো অনেকখানিই প্রিয়ার সান্নিধ্য পাওয়া হবে।

রাজা উঠে দাঁড়িয়ে সংগে সঙ্গে বললেন, চলো, তাই চলো।

মাধব্য উচ্চ কণ্ঠে একজন প্রতিহারিণীকে ছবিটি পাঠিয়ে দেবার আদেশ জানিয়ে রাজাকে নিয়ে চললেন মাধবী কুঞ্জের দিকে। অদৃশ্য সানুমতীও চললো ওদের পিছু পিছু। রাজা কেমন শকুন্তলার ছবি এঁকেছেন, সেটি দেখবার জন্য তারও ঔৎসুক্য খুব।

স্নিগ্ধ শীতল মাধবী মণ্ডপের মধ্যে শ্বেত পাথরের আসনে বসলেন রাজা। আবার তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠলো, দীর্ঘশ্বাস পড়তে লাগলো ঘনঘন।

উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি বললেন, এই রকমই এক লতা-কুঞ্জে শকুন্তলার সঙ্গে একদিন আমার মিলন হয়েছিল। এখন সব মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। হায়, কেন এতদিন ভুলে ছিলাম তাঁকে!

তারপর মাধব্যের দিকে ফিরে তিনি অভিযোগের উষ্মায় বললেন, বয়স্য, বলিহারি তোমাকে! আমি না হয় শকুন্তলাকে ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি কেন মনে করিয়ে দাওনি? শিকার থেকে ফেরবার পর, তুমি কেন একবারও তার নাম উচ্চারণ করোনি আমার কাছে? তুমিও কি তাকে ভুলে গিয়েছিলে?

মাধব্য আঙুলের নখ খুঁটতে খুঁটতে বললো, না, আমি সেই বন-বালাকে একদিনের জন্যও ভুলিনি!

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, তবে কেন মনে করিয়ে দাওনি আমাকে?

মাধব্য বললো, অরণ্য শিবির থেকে আমাকে পাঠিয়ে দেবার পর আপনি যে বলেছিলেন, শকুন্তলার ব্যাপারটি তেমন কিছু নয়, সবটাই পরিহাস, কারুকে আর ও সম্পর্কে কিছু বলার দরকার নেই। আমি সেজন্যই আর কিছু বলিনি।

রাজা বললেন, তুমি আমার সেই কথাই মেনে নিলে? আমি যে সত্যি বলিনি, তা বোঝার মতন বুদ্ধি তোমার হয়নি?

মাধব্য বললো, আমার মাথায় মাটির ঢেলা পোরা আছে বোধহয়, তাই সব সময় কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে তা বোঝার মতন বুদ্ধি থাকে না।

রাজা হাহাকার করে বলে উঠলেন, আর রাজসভায় আমি যখন শকুন্তলাকে প্রত্যাখান করলাম, সে গর্ভবতী ছিল, তখনও কি তুমি বুঝলে না যে পরিহাস নয়! আমার মতিভ্রম হয়েছে বলেই আমি আমার আপন সন্তানের জননীকে ফিরিয়ে দিচ্ছি।

মাধব্য বললো, সে সময় নিশ্চয়ই আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতাম। আপনাকে আবার মুক্ত করতাম।

রাজা বললেন, তা হলে করোনি কেন? তুমি আমার বন্ধু।

মাধব্য বললেন, তার ঠিক একটু আগেই আপনি আমায় একটা কাজের ভার দিয়ে অন্তঃপুরে পাঠিয়েছিলেন। আমি সে সময় উপস্থিত থাকলে নিশ্চয়ই সবকিছু অন্য রকম হতো। কিন্তু এখন আর এসব কথা বলে লাভ কী, নিয়তিই সবকিছুর ওপর প্রভুত্ব করেছেন! এ নিয়তির খেলা।

রাজা বললেন, তাই বটে! তোমার দোষ নেই, সবই আমার নিয়তি!

মাথা নিচু করে বসে রইলেন রাজা। একটু পরে আর্তস্বরে কেঁদে উঠে বললেন, আমায় রক্ষা করো, আমায় রক্ষা করো!

মাধব্য রাজার বাহু স্পর্শ করে বললো, এ আপনি কী করছেন! বয়স্য, এমন ভেঙে পড়া তো আপনাকে মানায় না। বীরেরা তো কখনো শোকের কাছে পরাভূত হয় না। প্রচণ্ড ঝড়েও বনস্পতি মাথা উঁচু করে থাকে।

রাজা বললেন, বন্ধু, আমি আর পারছি না! রাজা হলেও আমি মানুষ তো। আমি প্রত্যাখান করার পর শকুন্তলার মুখের অবস্থাটা যতবার আমার মনে পড়েছে, আমি যেন সহ্য করতে পারছি না আর। আমি তাকে গ্রহণ করতে চাইলাম না, তার সঙ্গীরাও তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে রাজি হলো না, কঠোরভাবে বললেন, এখানেই থাকো। আমি তখনও নিষ্ঠুরভাবে দৃঢ় রইলাম। তখন অশ্রুবর্ষণ করতে করতে অপমানিতা শকুন্তলা যে তীব্র দৃষ্টি হেনেছিল আমার দিকে, সে দৃষ্টি যেন বিষাক্ত শেল হয়ে এখন আমার হৃদয়কে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। আমি আর পারছি না!

প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত সানুমতীর দয়া হল না রাজার এই ছটফটানি দেখে। রাজা শুধু নিজের দুঃখের কথাই ভাবছেন। আর শকুন্তলা যে এই ক'বছর ধরে কী অসহ কষ্টে দিন কাটাচ্ছে, রাজা তা তো কিছুই জানেন না। রাজার আরও শাস্তি পাওয়া উচিত।

রাজা শিশুর মতন আবদার ধরে বললেন, মাধব্য, সে কোথায় গেছে, তুমি তাকে খুঁজে এনে দাও!

মাধব্য বললো, লোকমুখে তো শুনেছি আকাশপথে কে যেন তাকে হরণ করে নিয়ে গেছে। আকাশপথে খোঁজাখুঁজি করা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব ?

রাজা রেগে উঠে বললেন, কে তাকে হরণ করবে ? কার এমন সাহস যে সেই পতিব্রতা দুষ্মন্ত-প্রিয়াকে স্পর্শ করবে ? তবে এই হতে পারে, তার মা একজন অপ্সরা, তিনি নিজে কিংবা কোনো সহ-চরিণী পাঠিয়ে শকুন্তলাকে নিয়ে গেছেন আকাশপথে। অপ্সরাদের পক্ষে আকাশপথে বিচরণ করা সম্ভব।

মাধব্য বললো, তাহলে তো বিশেষ চিন্তার কিছু নেই। আবার আপনাদের মিলন হবে নিশ্চিত।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, কী করে ?

মাধব্য বললো, তার মা কতদিন মেয়েকে নিজের কাছে রাখবেন ? বাপ-মায়েরা পতিবিরহকাতরা কন্যাকে স্বামী-গৃহে পাঠাবার জন্য ব্যস্ত হয়েই তো থাকেন।

রাজা বললেন, শকুন্তলার প্রতি আমি যে ব্যবহার করেছি, তারপর সে-ই বা আর ফিরে আসবে কেন আর তার জননীই বা পাঠাতে চাইবে কেন ?

মাধব্য বললো, ওঁরা আকাশপথে উড়তে পারেন, আর মানুষের মনের কথা জানবেন না ? আপনার মতি সঠিক পথে ফিরে এসেছে, এবার শীঘ্র আপনার দয়িতার সঙ্গে আপনার মিলন ঘটবে।

রাজা দু'দিকে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বিষাদাচ্ছন্ন কণ্ঠে বললেন, তুমি মিথ্যেই আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছো। সে কি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম, না যাবজ্জীবনের নিঃশেষিত পুণ্যফল ? বৃথা আশা, একবার যে যায়, সে আর ফেরে না। এ আশা যেন নদীর দু'দিকের আলগা পাড়ের মতন, যখন-তখন ভেঙে পড়বে।

মাধব্য তবু রাজার মন ফেরাবার জন্য বললো, দেখি, আংটিটা দেখি ! এই যে আংটিটা হঠাৎ আপনার কাছে ফিরে এলো, এতেই সূচিত হচ্ছে যে এরকম অপ্রত্যাশিতভাবে তিনিও আপনার কাছে ফিরে আসবেন।

রাজার এখন যত রাগ হলো অঙ্গুরীয়টির ওপরে, এর জন্যই তাঁর এত দুর্দশা। তিনি অঙ্গুরীয়কে সম্বোধন করে বললেন, দুর্ভাগা

অঙ্গুরীয়, তোর কোনো পুণ্য নেই, তাই তুই অমন রক্তিম নখ—সম্বলিত কুসুম পেলব অঙ্গুলি থেকে খসে পড়লি !

বিদূষক বললো, আংটিতে আপনার নাম লেখা, এটি তাঁর হাতে পরিয়ে দেবার সময় আপনি কি কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ?

রাজা বললেন, বন্ধু, আমি যখন তাকে ছেড়ে চলে আসি, সে সময় সে জলভরা দুটি চোখ তুলে জানতে চেয়েছিল, 'আর্যপুত্র, কতদিন পর আপনি আমাকে স্পর্শ করবেন ?'

মাধব্য বললো, তারপর ?

রাজা উদাসীনভাবে বললেন, তখন আমি এই অঙ্গুরীয়টি নিজ হাতে তার চম্পক অঙ্গুলিতে পরিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, আমার নামের একটি করে অক্ষর গণনা করো প্রতিদিন, দেখো, তোমার গোনা শেষ হবার আগেই আমার দূত আসবে তোমায় নিয়ে যাবার জন্য !

আড়াল থেকে সানুমতী মনে মনে ভাবলেন, তবে কেন রাজা সেই সময়ের মধ্যে নিয়ে গেলেন না শকুন্তলাকে ? সেও কি নিয়তির খেলা নাকি ?

মাধব্য জিগ্যেস করলো, কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, আংটিটি সেই বরণীয়া নারীর আঙ্গুলি থেকে একটা রোহিত মৎস্যের পেটে গেল কী করে ?

রাজা বললেন, তোমোর সখী শচীতীর্থে গঙ্গাকে বন্দনা করছিলেন, সেই সময় এটি খুলে স্রোতের মধ্যে পড়ে যায় বলে শুনেছি ।

মাধব্য বললো, তা হতে পারে অবশ্য ।

সানুমতী আবার ভাবলো, গভীর প্রেম যদি থাকে, তা হলে আবার পরস্পরকে চেনবার জন্য কোনো অভিজ্ঞান দেখাবার দরকার হয় নাকি ? শকুন্তলার হাতে আংটি ছিল না বলেই রাজা তার পরিণয়ে সন্দেহ করলেন ।

রাজা বললেন, যত দোষ সব এই আংটিটার । একে এখন আমি ভর্ৎসনা করবো ।

মাধব্য মনে মনে বললেন, পাগল হতে দেখছি আর দেরি নেই ।

রাজা অঙ্গুরীয়টি চোখের সামনে ধরে বললেন, বল্, কেন তুই সেই কান্ত-কোমল অঙ্গুলি ছেড়ে জলে পড়তে গেলি ? বল ! কিংবা তোকেই বা এসব কথা জিজ্ঞেস করছি কেন ? তোর কি প্রাণ আছে যে তুই মানুষের

দুঃখ বুঝবি ? আমার প্রাণ থেকেও কেন আমি আমার প্রিয়াকে ফিরিয়ে দিলাম ?

মাধব্য ঈষৎ গলা খাঁকারি দিয়ে ডাকলো, বন্ধু !

রাজা তো খেয়াল করলেন না। তিনি আপন মনেই বলে চললেন, দেখা দাও ! দেখা দাও ! আমি তোমায় অকারণে বিমুখ করেছিলাম, আজ যে আমি সেজন্য কতখানি অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছি, তা কি তুমি বুঝতে পারছো না ! একবার দেখা দিয়ে আমায় ধন্য করো !

এই সময় চতুরিকা নাম্নী এক পরিচারিকা এসে ডাকলো, প্রভু !

রাজা নারীকণ্ঠ শুনে চমকে উঠে ভাবলেন বুঝি শকুন্তলাই এসেছে দ্রুত পেছন ফিরে চেঁচিয়ে উঠলেন, কে ?

তারপর পরিচারিকাকে দেখে তাঁর মোহভঙ্গ হলো, তিনি বুক খালি করা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

চতুরিকা বললো, প্রভু, এই যে চিত্রফলকটি এনেছি।

মাধব্য সেটি দেখে বললো, এ যে অতি চমৎকার ছবি। বয়স্য, আপনি অতি নিপুণ শিল্পী ! এর সুন্দর ভাবব্যঞ্জনা দেখেই বোঝা যায় আপনি কত গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এটি এঁকেছেন। এত প্রাণবন্ত ছবি, যেন ইচ্ছে করছে এখুনি ওঁদের সঙ্গে কথা বলি।

আড়াল থেকে এগিয়ে এসে সানুমতী চিত্রফলকটি দেখে আপন মনে বললেন, সত্যিই তো। এ যে হুবহু শকুন্তলা।

ছবিতে শকুন্তলাকে চোখের সামনে পেয়ে রাজা যেন একটু আত্মস্থ হলেন। মাধব্য তাঁর অঙ্কন দক্ষতার প্রশংসা করেছে বলে তিনি ঈষৎ লজ্জা পেয়ে বললেন, এখনো পুরোপুরি ঠিক হয়নি, আরও আঁকতে হবে। তার রূপলাবণ্যের অতি সামান্যই ফুটেছে এখানে।

মাধব্য বললো, ছবিতে তিনজন রমণীকে দেখছি, তিনজনই অতি সুন্দরী। এঁদের মধ্যে কোন্ জন শ্রদ্ধেয়া শকুন্তলা ?

সানুমতী মাধব্যের দিকে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে বললো, সত্যিই দেখছি এর বুদ্ধিও নেই, দৃষ্টিও নেই। শকুন্তলাকেও চিনিয়ে দিতে হয় ?

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ভালো করে দেখে বলো তো কোন জন ?

মাধব্য খুব মনোযোগ দিয়ে ছবিটি দেখলো। তারপর বললে, আমার মনে হচ্ছে অসম্বৃত কেশদাম থেকে ঝরে পড়ছে ফুল, চন্দন-

সজ্জার মতন যাঁর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম, যাঁর বাহু দুটি কোলের ওপর রাখা, মনে হচ্ছে যেন কাছের গাছগুলিতে জল-সিঞ্চনের পর পরিশ্রান্ত হয়ে নব মুকুলিত আম্রবৃক্ষের গায়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন, ইনিই শকুন্তলা, তাই না? আর দু'জন ওঁর সখী!

রাজা বললেন, ঠিক! তোমার শিল্পরুচি আছে বটে!

মাধব্য ছবিটি উপলক্ষ্য করে রাজার মন ভোলাবার জন্য আরও খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগলো।

রাজা বললেন, ইস্, আমি কোনো সময় ঘর্মাক্ত আঙুল দিয়ে চিত্রফলকটি ধরেছিলাম, তাই পাশে একটা কালো দাগ পড়ে গেছে।

মাধব্য জিগ্যেস করলো, আর শকুন্তলার কপালের কাছে রঙটাও যেন এক জায়গায় হঠাৎ ফিকে হয়ে গেছে।

রাজা বললেন, ওখানে ঝরে পড়েছিল আমার চোখের জলের বিন্দু।

তারপরই তিনি পরিচারিকার দিকে ফিরে বললেন, চতুরিকা, ছবিটি আরও ভালো করে আঁকতে হবে, তুমি রঙ তুলির পেটিকাটি নিয়ে এসো তো!

পরিচারিকা চিত্রফলকটি রাজার হাতে দিয়ে চলে গেল।

রাজা সেটি নিজের চোখের সামনে তুলে ধরে ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে তদ্‌গতভাবে বললেন, তুমি যখন সশরীরে এসেছিলে, তখন আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তোমাকে, আর এখন আমি তোমার ছবিকে এত সম্মান করছি! আসার পথে সুমিষ্ট জলে ভরা নদীর দিকে আমি ফিরে চাইনি, এখন আমি বন্দনা করছি মরীচিকার!

মাধব্য মনে মনে বললেন, নদী ফেলে এসে মরীচিকাকেই যে এখন ইনি আদর করছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রাজা আবার বেশি চঞ্চল হয়ে পড়ছেন দেখে মাধব্য জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আর কী কী আঁকবেন বলছিলেন?

রাজা বললেন, দ্যাখো, এখানে মালিনী নদীটিই আঁকা হয়নি! যে দৃশ্য আমার চোখে লেগে আছে, তা তো যথাযথ ফুটিয়ে তোলা দরকার। দূরে একটা পাহাড়ও আঁকা দরকার, যেখানে হরিণের পাল নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর এইখানেই ছিল একটি খুব বড় আম্রবৃক্ষ, যার শাখায় ঋষিদের বল্কল ঝোলে, এর তলায় বসেছিল একটি কৃষ্ণ-মৃগ আর একটি বাচ্চা হরিণ, পরস্পর খেলা করছিল তারা, এগুলোও সব আঁকতে হবে।

মাধব্য মনে মনে বললো, সর্বনাশ! এর পর লম্বা দাড়িওয়ালা বুড়ো বুড়ো ঋষিদের ভরিয়ে দিয়ে ইনি ছবিটি একেবারে নষ্ট করে ফেলবেন দেখছি।

রাজা বললেন, ও, আর একটি জিনিস ভুলে গেছি। শকুন্তলার অতি প্রিয় অলঙ্কারই তো আঁকা হয়নি এখনো।

মাধব্য ঈষৎ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, অলঙ্কার?

রাজা বললেন, হ্যাঁ, তার দু' কানের শিরীষ ফুলের দুল দুটি আঁকা হয়নি, যে ফুলের কেশর তার গালে এসে লাগে। আর শারদ শশীর জ্যোৎস্নার মতন কোমল মৃণাল সূত্রটিও দুলিয়ে দেওয়া হয়নি তার দুই স্তনের মাঝখানে।

মাধব্য বললো, ইনি রক্তকমলের মতন করতল দিয়ে মুখ ঢেকে আছেন কেন? মনে হয় যেন কিছুতে ভয় পেয়েছেন। এদিকে একটা ভ্রমরও ছুটে আসছে ওঁর মুখের দিকে। ও বুঝি ঐ সুন্দর মুখখানিকে মধুভরা চাক মনে করেছে।

রাজা বললেন, এই দুষ্ট ভ্রমরটাকে নিষেধ করো তো!

মাধব্য হেসে বললো, আপনি দুষ্টের দমনকারী, আপনিই পারবেন ওকে তাড়িয়ে দিতে।

রাজা বললেন, তবে আমিই বলছি। ওহে, কুসুমদলের প্রিয় অতিথি, তুমি এখানে কেন এত দেরি করছো? তোমার প্রিয় ভ্রমরী যে অন্য এক ফুলে বসে আছে তোমার অপেক্ষায়। তুমি না গেলে সে মধুপান করবে না বলে তৃষ্ণার্ত হয়ে বসে আছে।

মাধব্য বললো, এত নরম আর ভদ্র বকুনি কি ও শুনবে? ভ্রমররা বড়ো অবাধ্য হয়।

রাজা বললেন, তাই তো শুনছে না দেখছি। দাঁড়াও, এবার ওকে দেখাচ্ছি! ওরে ভ্রমর, আমার প্রিয়ার অম্লান কিশলয়ের মতন যে অধরোষ্ঠের মধু আমি পান করেছি, তুই যদি তা স্পর্শ করিস তাহলে তোকে পদ্মের নালের মধ্যে নির্বাসন দেবো।

মাধব্য বললো, কি রে ভ্রমর, এমন কঠিন দণ্ডের কথা শুনেও তুই ভয় পেলি না?

তারপর উচ্চহাস্য করে উঠলো। সে ভাবলো, রাজার সঙ্গে থেকে তারও বোধহয় পাগল হবার অবস্থা হয়েছে। নইলে ছবির নারী আর ছবির ভ্রমর নিয়ে এত কাণ্ড!

সে প্রকাশ্যে বললো, বন্ধু, আপনার শত বকুনিতেও ও যাবে না। এ যে ছবি !

রাজা বললেন, ছবি ! হা বয়স্য, কেন তুমি আমার এই সর্বনাশ করলে ? যেন শকুন্তলা সত্যিই আমার সামনে আছে, তন্ময় হয়ে গিয়ে আমি তার সান্নিধ্য-সুখ ভোগ করছিলাম, তুমি কেন সেই-ঘোর ভেঙে দিলে ? আবার সে ছবি হয়ে গেল !

রাজার শোক আবার উদ্বেল হয়ে উঠলো। তিনি হা-হুতাশ দমন করতে পারলেন না। মাধব্যের হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, বয়স্য বলো, বলো, কী করে ভুলবো দুঃখ ? এ যে সব সময়ে আমায় ঘিরে আছে। রাত্রে ঘুমোতে পারি না, তাই স্বপ্নেও তার সঙ্গে আমার মিলন হয় না, এখন অশ্রু এসে আমার দৃষ্টি ঝাপসা করে দিচ্ছে, আমি তাকে এই চিত্রফলকেও দেখতে পাচ্ছি না !

রাজার কান্না দেখে সানুমতীর মনও দ্রবীভূত হয়ে এলো, এখানে শকুন্তলা যদি এখন উপস্থিত থাকতো, তা হলে রাজার এই অবস্থা দেখে সে ভুলতে পারতো প্রত্যাখ্যান-দুঃখ।

সানুমতী ইচ্ছে করলে তখুনি রাজার শোক নিবারণ করতে পারে। সে সশরীরে আত্মপ্রকাশ করে বলে দিতে পারে, কোথায় রয়েছে শকুন্তলা। তা হলেই রাজার সঙ্গে আবার শকুন্তলার মিলন হবে।

সানুমতী সশরীর ধারণ করবার আগেই সেখানে ছুটতে ছুটতে এলো পরিচারিকা চতুরিকা। সে চকিতভাবে বারবার পিছন দিকে তাকাচ্ছে তার হাত শূন্য।

সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, জয় হোক মহারাজের !

রাজা অশ্রু মুছে বললেন, কই, রঙ-তুলির পেটিকা আনোনি ?

চতুরিকা বললো, আনছিলাম মহারাজ, কিন্তু মহিষী বসুমতীও এদিকে আসছিলেন তরলিকাকে নিয়ে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমার হাতে ওটা কী ? তারপর বললেন, আচ্ছা, ওটা আমি নিজেই নিয়ে যাচ্ছি, তুই যা !

রাজা শঙ্কিত ভাবে মাধব্যের দিকে তাকালেন।

মাধব্য চতুরিকাকে বললো, প্রতিহারিণী, তোমার নাম সার্থক ! ভাগ্যিস তুমি আগে এসে খবরটি জানাতে পেরেছো।

চতুরিকা বললো, দেবীর গায়ের ওড়না জড়িয়ে গিয়েছিল গাছের

শাখায়, তরলিকা সেটি ছাড়িয়ে দিচ্ছিল, সেই ফাঁকে আমি এদিকে চলে এলাম।

রাজা মাধব্যকে বললেন, বয়স্য, দেবী এসে এই চিত্রফলকটি দেখা পছন্দ করবেন না। তিনি বহুমান গর্বিতা। তুমি এটা রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে পারো?

মাধব্য তৎক্ষণাৎ ছবিটি নিয়ে পেছনে লুকিয়ে বললো, শুধু এটি রক্ষা করলে তো চলবে না, আমায় নিজেকেও রক্ষা করতে হবে। আমি পালাই!

দু-এক পা গিয়ে ফিরে এসে সে আবার ফিসফিস করে বললো, আমি মেঘ প্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদের একেবারে চূড়ায় এটি নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখছি, সেখানে পাখি ছাড়া আর কেউ যায় না। অন্তঃপুরের জটিল জাল থেকে যদি কোনোক্রমে ছাড়া পান, তাহলে সেখান থেকে আমায় ডেকে পাঠাবেন।

অন্য সবাই চলে গেলেও কৌতুক দেখার জন্য অদৃশ্য অবস্থায় সেখানে রয়ে গেল সানুমতী। রাজা তাঁর এক মহিষীর আগমন বার্তা শুনে ভয় পাচ্ছেন দেখে রাজার ওপর সানুমতীর শ্রদ্ধাই হলো। রাজাকে বেশ ভদ্র বলতে হবে। বোঝাই যাচ্ছে, এই রানীর প্রতি রাজার এখন আর আগেকার মতন অনুরাগ নেই, তাঁর মনপ্রাণ এখন অন্য আর একজনের প্রতি সমর্পিত, তবু রাজা এঁকে সম্মান প্রদর্শন করছেন।

রাজা ভালো করে চক্ষু মুছে রানী বসুমতীর জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে রইলেন।

কিন্তু রানীর বদলে এলো বেত্রবতী।

সে মহারাজের জয় ঘোষণা করে সসঙ্কোচে বললো, মহারাজ, মার্জনা করবেন, বিশেষ একটি রাজকার্যের জন্যই আপনার ব্যাঘাত ঘটাতে হলো।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, দেবী বসুমতী এদিকে আসছিলেন না? তুমি তাঁকে দেখোনি?

বেত্রবতী বললো, হ্যাঁ, মহারাজ, তিনি এদিকেই আসছিলেন, কিন্তু আমার হাতে পত্র দেখে তিনি মধ্যপথে ফিরে গেলেন।

রাজা বললেন, রাজকার্যের মূল্য তিনি জানেন, তাই তিনি বুঝেছেন এখন বিস্রম্ভালাপের সময় নয়। হ্যাঁ, বলো তো, কী বার্তা?

বেত্রবতী বললো, মহারাজ, অমাত্য পিশুন আমায় পাঠালেন। রাজকোষের কিছু হিসাবপত্রের ব্যাপার, এই পত্রে সব লেখা আছে, আপনি পাঠ করে দেখুন।

রাজা পত্রটি হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন। পত্রটিতে একটি দুঃসংবাদ আছে। রাজ্যের বিখ্যাত বণিক ধনমিত্র মধ্য সমুদ্রে জাহাজ সমেত নিমগ্ন হয়ে মারা গেছেন। বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী হলেও ধনমিত্র ছিলেন নিঃসন্তান। নিঃসন্তানের সব সম্পত্তির ওপর রাজারই অধিকার, সেই জন্যই প্রধান অমাত্য রাজার অনুমতি চেয়েছেন এখনই সেই সম্পত্তির দখল নেবার জন্য।

রাজা একটা দীর্ঘশাস ফেলে বললেন, যে নিঃসন্তান, তার সব থেকেও কিছুই নেই।

তারপর তিনি প্রতিহারিণীকে প্রশ্ন করলেন, বেত্রবতী, এই বণিক ধনমিত্রের অর্থও প্রচুর, এঁর স্ত্রীর সংখ্যাও অনেক হওয়াই স্বাভাবিক। এমন কি হতে পারে না যে এঁর কোনো একজন স্ত্রী এখন গর্ভবতী অবস্থায় আছেন?

বেত্রবতী বললো, মহারাজ, আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, আপনার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তিতে কিছুই অজানা থাকে না। সাকেতের এক বণিক দুহিতা আমার সখী, সে এই ধনমিত্রের অন্যতমা পত্নী। আমি জানি, আমার সেই সখী সদ্য সন্তানসম্ভবা।

রাজা বললেন, তবে আর কি। তা হলে সেই গর্ভের সন্তানই পিতার সব সম্পত্তির অধিকারী হবে। অমাত্যকে এই কথা জানিয়ে দাও।

বেত্রবতী বললো, মহারাজের সুবিচারেই এ দেশ এমন পুণ্যক্ষেত্র হয়েছে। প্রার্থিত সময়ে বৃষ্টিপাত হলে মানুষ যেমন খুশি হয়, আপনার এই আদেশে সবাই সে রকম খুশি হবে। আমি অমাত্যকে জানিয়ে আসছি—

রাজা তাকে আবার ডেকে বললেন, আর শোনো, প্রজাদের মধ্যে একথাও ঘোষণা করে দিতে বলো, আজ থেকে যার যে প্রিয়জন বিচ্ছেদ হবে, আমি তার স্থান গ্রহণ করবো। যার ভাই নেই, আমি হবো তার ভাই। যার পুত্র নেই, আমি হবো তার পুত্র, যার পিতা নেই, আমি হবো তার পিতা, যার বন্ধু নেই, আমি হবো তার বন্ধু—

বলতে বলতে রাজা হঠাৎ থেমে গেলেন। আবার তাঁর চোখে জল এসে গেল। তিনি বাষ্পাচ্ছন্ন কণ্ঠে বললেন, যার স্বামী নেই, আমি তো তার স্বামী হতে পারবো না। নারীর কাছে স্বামীর কোনো বিকল্প হতে পারে না।

মুহূর্তে আবার অধীর হয়ে উঠলেন তিনি। সন্তানহীনতার দুঃখ তাঁর বুকে শেলের মতন বাজলো। তিনি উচ্চস্বরে বিলাপ করতে করতে বলতে লাগলেন, সন্তান না থাকলে বংশ লোপ হয়, সম্পদ পরের হাতে চলে যায়। আমারও তাই হবে, আমার মৃত্যুর পর পুরু-বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি কী করেছি? আমি কী করেছি?

রাজাকে এমন ব্যাকুল হতে দেখে বেত্রবতী আর চতুরিকা বিহ্বল হয়ে পড়লো। কী ক'রে রাজাকে সান্ত্বনা দিতে হবে, তারা জানে না।

বেত্রবতী মৃদু স্বরে বললো, মহারাজ, আপনি এত চিন্তা করবেন না, আপনার বংশ থেকে এ অমঙ্গল কেটে যাবে!

রাজা বললেন, না, না, তোমরা জানো না! কী ভুল করেছি! নিজে থেকেই যে মঙ্গল আমার কাছে এসেছিল, আমি নিজেই তাকে অবহেলা করে ফিরিয়ে দিয়েছি। প্রচুর শস্য পাবার আশায় মানুষ ভূমিতে বীজ বপন করে, আমিও তাই করেছিলাম, শকুন্তলার গর্ভে আমি আমার আত্মজকে স্থাপন করেছিলাম। শকুন্তলা আমার বংশের প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ, সে আমার ধর্মপত্নী, তাকে আমি প্রত্যাখ্যান করেছি! উর্বর ভূমিতে সুসময়ে বীজ বপন করে ফসল ফলাবার আগেই কেউ সেই ভূমি পরিত্যাগ করে চলে যায়? আমি মূঢ়, আমি তাই করেছি!

চতুরিকা বেত্রবতীকে চুপিচুপি বললো, প্রভু মনের যাতনায় ভুগছেন, তুই এই সময় আবার ঐ আঁটকুড়ো বণিকের কথা ওঁকে বলতে গেলি! এখন ওঁকে কী করে সামলানো যায় বল্ তো? ওঁকে সান্ত্বনা দেওয়া আমাদের কর্ম নয়! তুই এক কাজ কর্, আমি ততক্ষণ ওঁকে দেখছি, তুই মেঘ প্রতিচ্ছন্দ-প্রাসাদ থেকে আর্য মাধব্যকে দৌড়ে ডেকে নিয়ে আয়!

বেত্রবতী বললো, এক্ষুনি যাচ্ছি।

রাজা তখনও আপন মনে হাহাকার করে বলতে লাগলেন, আমার পূর্বপুরুষরা উপর থেকে কি এখনো দেখছেন আমাকে! আমার ওপর কীভাবে বিশ্বাস রাখবেন তাঁরা! আমার মৃত্যুর পর কে তাঁদের বেদ-

বিধিমত পিণ্ডদান করবে ? তাঁদের উদ্দেশে আমিই বা জলদান করবো কীভাবে, নিঃসন্তান আমি, চোখের জল ছাড়া আমার তো কিছু দেবার নেই !

এমন বলতে বলতে রাজা হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে শুয়ে পড়লেন মাটিতে।

চতুরিকা তাড়াতাড়ি রাজার মাথাটি নিজের কোলে তুলে নিয়ে তার কপালে করতল বুলিয়ে দিতে দিতে ব্যাকুলভাবে বলতে লাগলো, প্রভু ! প্রভু !

অদৃশ্য সানুমতীও আর পারলো না। সে ভাবলো, যথেষ্ট হয়েছে, রাজার আর যন্ত্রণা পাওয়া উচিত নয়। প্রদীপ থাকতেও ইনি অন্ধকারের মধ্যে রয়ে গেছেন। আমি এঁর সব দুঃখের অবসান করে দিতে পারি এখুনি।

কিন্তু আত্মপ্রকাশ করতে গিয়েও থমকে গেল সানুমতী। তাকে তো রাজা দুষ্মন্তের কাছে শকুন্তলার সব সংবাদ জানানোর কথা বলে দেওয়া হয়নি ! তাকে তো পাঠানো হয়েছে শুধু রাজা দুষ্মন্তের বর্তমান অবস্থা দেখে আসবার জন্য ! নিজের থেকে এরকম একটা দায়িত্ব নেওয়া কি ঠিক হবে ? শকুন্তলা এখন দেবতাদের অনুগৃহীতা, দেবতারা তার একটা কিছু ব্যবস্থা করবেন নিশ্চয়ই !

আমার দরকার নেই বাবা, এই বলে একটা নাচের ঝলক তুলে সানুমতী শূন্যে উড়ে গেল।

চতুরিকা নানা রকম শুশ্রূষা করে রাজার জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করছে, এই সময় কিছু দূরে অকস্মাৎ একটা তুমুল গোলযোগ শোনা গেল। তাতেই রাজা চেতনা ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন এবং প্রশ্ন করলেন, কে চিৎকার করছে ?

আবার চিৎকার শুনে নিজেই তিনি বুঝতে পারলেন সেটি মাধব্যের কণ্ঠস্বর। মনে হচ্ছে যেন মাধব্য কোনো বিপদে পড়েছে।

এবার শোনা গেল, বাঁচান বাঁচান, হে বন্ধু, আমায় রক্ষা করুন।

রাজা ভাবলেন, তবে কি মাধব্য রানী বসুমতীর কাছে ধরা পড়ে গেল ?

চতুরিকা বললো, মহারাজ, মনে হচ্ছে, আপনার বয়স্যকে কেউ আক্রমণ করেছে। শব্দটা আসছে মেঘ প্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদের চূড়া থেকে।

রাজা বললেন, আমার প্রাসাদে এসে কে আক্রমণ করবে? এ যে অসম্ভব কথা! রাজকার্যে কি আমি এতই অমনোযোগী হয়েছি যে আমার রাজ্যে এমন অনাচার ঘটছে?

মাধব্য আবার চিৎকার করে উঠলো, হে বন্ধু, গেলাম, গেলাম।

রাজাও উচ্চকণ্ঠে বললেন, ভয় নেই। ভয় নেই, আমি আসছি!

মাধব্য এবার আর্তভাবে বললো, হে বন্ধু, তুমি আসবার আগেই আমি বোধহয় শেষ হয়ে যাবো। এই শত্রু ইক্ষুদণ্ডের মতন আমার শিরদাঁড়াটা ভেঙে দিতে চাইছে!

রাজা গর্জন করে উঠলেন, ধনুক! আমার ধনুক কোথায়?

তৎক্ষণাৎ অস্ত্রবাহিকা যবনী উপস্থিত হয়ে বললো, জয় হোক মহারাজ। এই যে আপনার ধনুক আর বাহু কবচ!

রাজা কবচ পরিধান করছেন, এই সময় ওপর থেকে শোনা গেল এক বীভৎস স্বর। কে যেন বলছে, শেষ করবো তোকে আমি। টাটকা রক্ত পান করার জন্য বাঘ যেমন ছটফট করে জানোয়ারদের মারে, সেই রকম আমিও তোর ঘাড় ভাঙবো। দেখি কোথায় আছেন রাজা দুষ্মন্ত, তাঁর সাধ্য থাকে তিনি তোকে রক্ষা করুন তো দেখি!

রাজা এবার ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। সমগ্র পৃথিবীতে এমন সাধ্য কার আছে যে রাজা দুষ্মন্তের বাহুবল নিয়ে ব্যঙ্গ করে?

ধনুকে বাণ যোজনা করে তিনি ছুটলেন মেঘ প্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদের চূড়ার দিকে। দ্রুত উঠে এলেন সেখানে। কিন্তু সেখানে কারুকেই দেখতে পেলেন না।

রাজা বললেন, একী, সব শূন্য যে!

রাজার পিছন পিছন প্রতিহারিণীরাও এসেছে, তাদের একজন বললো, মহারাজ এ নিশ্চয়ই কোনো অপদেবতার কাজ!

তখন হাওয়া থেকে মাধব্যের করুণ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, গেলাম। গেলাম! আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু আমি পাচ্ছি! বিড়ালের মুখে ইঁদুরের মতন এ আমাকে নিয়ে যাচ্ছে, আমার আর জীবনের আশা নেই!

রাজা বললেন, কী, আমাকে তিরস্করিণী বিদ্যা দেখাতে এসেছে! আমি না দেখলেও আমার অস্ত্র ঠিক শত্রুকে দেখতে পায়।

রাজা তাঁর ধনুক ওপরের দিকে তুলে বললেন, এই আমি শর

নিক্ষেপ করছি, ঠিক বধ্যকে বধ করবে আর আমার বন্ধু ব্রাহ্মণকে রক্ষা করবে। হাঁস যেমন জলমিশ্রিত দুধে শুধু দুধটুকুই পান করে, জলটুকু বর্জন করে, আমার অস্ত্রও সে রকম ভুল করে না কখনো।

কিন্তু অস্ত্র নিক্ষেপ করবার আগেই রাজার সামনে আবির্ভূত হলেন একজন দিব্য আভরণভূষিত রূপবান পুরুষ, তাঁর পাশে মাধব্য! পুরুষটি মাধব্যের কাঁধে হাত রেখে সহাস্যে বললেন, রাজা দুষ্মন্ত, যাঁরা সজ্জন, তাঁরা তো বন্ধুর দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিই নিক্ষেপ করেন, ধারালো তীর তো বর্ষণ করেন না। আপনার অস্ত্র রাক্ষস দানবদের ধ্বংস করবার জন্যই উদ্যত থাক!

রাজা সসম্ভ্রমে ধনুক নামিয়ে নিয়ে বললেন, একী, এ যে ইন্দ্রসারথি মাতলি! সুস্বাগতম। সুস্বাগতম।

মাধব্য বললো, বাঃ! আমাকে যিনি যজ্ঞের পশুর মতন বধ করতে যাচ্ছিলেন, তাঁকেই আপনি স্বাগত সম্ভাষণ করছেন!

মাতলি একটু হেসে মাধব্যকে বললেন আপনাকে একটু কষ্ট দিয়েছি বটে।

তারপর রাজার দিকে ফিরে বললেন, আয়ুষ্মন, একটি বিশেষ প্রয়োজনে ইন্দ্র আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে!

রাজা বললেন, ইন্দ্রের কী বার্তা বলুন!

মাতলি বললেন, কালনেমির বংশধর দুর্জয় নামে একদল দানব আছে, আপনি জানেন?

রাজা বললেন, হ্যাঁ, জানি। নারদের মুখে শুনেছি ওদের কথা।

মাতলি বললেন, সেই দানবেরা স্বর্গ আক্রমণ করেছে। আপনার সখা ইন্দ্র তাদের দমন করতে পারছেন না। তাই তিনি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করে যুদ্ধের সম্মুখভাগে আপনাকে অংশ নিতে আহবান জানিয়েছেন।

রাজা বললেন, ইন্দ্র পারছেন না, আর আমি পারবো, এও কি হয়?

মাতলি বললেন, রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত করেন চন্দ্র, সূর্য তা পারেন না। সেইজন্যই আপনার ডাক পড়েছে। আর বিশেষ অপেক্ষা করবার সময় নেই।

রাজা বললেন, ইন্দ্র যে আমাকে এই সম্মান দিয়েছেন, সেজন্য আমি ধন্য হলাম। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আপনি এই দুর্বল বিলাসপ্রিয় মাধব্যের প্রতি হঠাৎ ও-রকম আচরণ করলেন কেন?

মাতলি সহাস্যে বললেন, হ্যাঁ, সেটাও বুঝিয়ে বলা দরকার। আমি এখানে এসে অলক্ষ্য থেকে দেখলাম, কোনো কারণে আপনি মনস্তাপে জর্জরিত হয়ে আছেন। মনের এই রকম জড়তা থাকলে তো আপনি পূর্ণ বিক্রম দেখাতে পারবেন না। তাই আপনাকে রাগিয়ে তুলবার জন্যই নিরীহ মাধব্যের প্রতি আমাকে এ রকম আচরণ করতে হলো। আগুনকে একটু নাড়াচাড়া দিলে তার শিখা লক-লক করে ওঠে, খোঁচা দিলে সাপ ফণা তোলে, সেই রকম ক্রোধে কিংবা দর্পে মানুষের পূর্ণ শৌর্যবীর্যের প্রকাশ হয়। এবার অস্ত্র গ্রহণ করে আমার সঙ্গে চলুন। আপনার জন্য ইন্দ্র-রথ প্রস্তুত, শুরু হোক আপনার বিজয়যাত্রা।

রাজা মাধব্যকে বললেন, বয়স্য, ইন্দ্র আজ্ঞা করেছেন, আমি আর বিলম্ব করতে পারি না। তুমি অমাত্য পিশুনকে খবর দিয়ো, আমার অনুপস্থিতিতে নিজ বুদ্ধিতে রাজকার্য দেখতে। আমার অস্ত্র এখন অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকবে।

তারপর রাজা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে রথে উঠে বসলেন। মাতলি তাঁকে নিয়ে চলে গেলেন স্বর্গের দিকে।

॥ ৭ ॥

দুরাত্মা দানবদের প্রবল যুদ্ধে দমন করলেন রাজা দুষ্মন্ত। সেজন্য স্বর্গে দারুণ সংবর্ধনা পেলেন তিনি। দেবসভায় ইন্দ্র তাঁকে বসালেন নিজের আসনের অর্ধাংশে, নিজের কণ্ঠের চির অম্লান মন্দার ফুলের মালাটি পরিয়ে দিলেন রাজার গলায়। অন্য দেবতারা উচ্চারণ করলের রাজা দুষ্মন্তের নামে শ্লোক।

কিন্তু রাজা দুষ্মন্তের মন পড়ে আছে পৃথিবীতে। অবিলম্বে তিনি মাতলির সঙ্গে রথারোহণ করে যাত্রা করলেন স্বর্গ ছেড়ে নিজ রাজ্যের দিকে।

যাওয়ার সময় যুদ্ধ-চিন্তাই মন জুড়ে ছিল, তাই দুপাশের দৃশ্য দেখতে পাননি, এখন মহাশূন্যের অনন্ত মহিমা দেখে তাঁর চোখ জুড়িয়ে গেল। জ্যোতির্ময়লোকের একটির পর একটি স্তর পেরিয়ে আসতে লাগলো রথ।

এক সময় রথের চাকার দিকে তাকিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন, এবার মেঘলোকে এসে পৌঁছেছেন। শলাকাগুলির ফাঁক দিয়ে উড়ে

যাচ্ছে ছোট ছোট চাতক পাখি, বিদ্যুতের প্রভায় লোহিত বর্ণ দেখাচ্ছে অশ্বগুলিকে আর মিহি জলকণা এসে লাগছে তাঁদের গায়ে।

আরও কিছু নিচে নেমে মাতলি বললেন, আয়ুষ্মন, এবার তাকিয়ে দেখুন, ঐ নীচে আপনার অধিকৃত পৃথিবী!

রাজা সেদিকে তাকিয়ে শিহরিত হলেন। চোখের সামনে যেন হঠাৎ ফুটে উঠলো ষড়ৈশ্বর্যময়ী বসুধা। তিনি বললেন, দেখুন, দেখুন, পাহাড়গুলি যেন উঁচু হয়ে উঠে আসছে ওপরের দিকে, আর তাদের চূড়ার কাছ থেকে দ্রুত পৃথিবী নেমে যাচ্ছে নিচে। গাছগুলির শরীর দেখা যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, যেন তারা পাতাল আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। নদীগুলি অদৃশ্য ছিল, হঠাৎ তারা দৃশ্যমান হলো, দেখতে দেখতে তারা বিস্তৃত হয়ে পড়লো। বলবো কি, মনে হচ্ছে যেন গোটা পৃথিবীটাকে কেউ ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে!

মাতলি বললেন, আয়ুষ্মন, আপনার পর্যবেক্ষণ শক্তি সত্যি প্রশংসনীয়।

পৃথিবীর আরও কাছে আসার পর রাজা দেখতে পেলেন, পশ্চিম থেকে পূর্ব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এক পর্বতমালা, অপরাহ্ণের আলোয় তাদের মনে হচ্ছে যেন স্বর্ণময় মেঘের প্রাচীর।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন্ পর্বত? আগে তো কখনো দেখিনি মনে হয়।

মাতলি বললেন, ঐ হচ্ছে হেমকূট নামে কিন্নর পর্বত। ঐ স্থান সাধারণ মানুষের অগম্য। মহা মহা ঋষিরা ওখানে থাকেন। আর থাকেন মারীচিপুত্র প্রজাপতি কশ্যপ মারীচি, ব্রহ্মার পরেই যাঁর স্থান, এবং যিনি সমগ্র দেবতা ও দানব বংশের জনক। সঙ্গে আছেন তাঁর পত্নী অদিতি।

মারীচির কথা শুনে রাজা ভাবলেন, এমন মহাপুণ্য ব্যক্তিকে তো লঙ্ঘন করে যাওয়া কখনই উচিত নয়। তাই তিনি সেখানে নেমে, তাঁকে একবার প্রণাম করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

মাতলি রথ থামালেন হেমকূটে, ভগবান মারীচির আশ্রমের কাছে। আশ্রম-মুখে এক তপস্বীর কাছ থেকে তিনি শুনলেন যে, মারীচি তখন নিজ পত্নী এবং অন্যান্য মহর্ষি-পত্নীদের পাতিব্রত্য ধর্ম বিষয়ে কিছু উপদেশ দিচ্ছেন। সুতরাং একটু দেরি করতে হবে।

মাতলি রাজাকে বললেন, আপনি ততক্ষণ আশ্রম-সংলগ্ন তপোবন একটু ঘুরে দেখুন, আমি ইন্দ্রপিতা কাশ্যপের কাছে আপনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করার ব্যবস্থা করছি।

তপোবনে এসেই রাজার মন আবার উতলা হয়ে পড়লো। মনে পড়ে গেল আর এক তপোবনের কথা। তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ধীর পদক্ষেপে সেই পবিত্র অরণ্য পরিভ্রমণ করতে লাগলেন।

অকস্মাৎ এক জায়গায় তিনি শুনতে পেলেন নারী ও শিশুকণ্ঠের কলকোলাহল।

কে যেন একজন বললো, উঃ, আর দুষ্টুমি করিস না! তোকে নিয়ে আর পারা যায় না। তোর কি স্বভাব একটুও বদলাবে না?

রাজা খুবই বিস্মিত হলেন। এই পুণ্যক্ষেত্রে কে আবার অশিষ্ট আচরণ করবে? কে কাকে মানা করছে?

সেই শব্দ অনুসরণ করে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটি দৃশ্য দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন!

তিনি দেখলেন, এক বিশাল সিংহীর স্তন্য পান করছে তার শাবক, আর একটি পাঁচ-ছ' বছর বয়সের বালক জোর করে সেই শাবকটিকে টেনে আনতে চাইছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে বালকটিকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছেন দুজন তাপসী।

বালকটি সবলে সিংহ-শিশুটিকে ছিনিয়ে কোলে তুলে নিয়ে এদিকেই ছুটে এলো। সিংহ-শিশুটি প্রায় তারই সমান। সাধারণ কোনো বালকের এতখানি শক্তি অকল্পনীয়!

তাপসী দুজনও দৌড়ে এলেন ঐ বালকের পেছন পেছন! বালকটি কিছুতেই ধরা দেবে না। সে সিংহ শাবকটির মুখখানা ফাঁক করার চেষ্টা করে বললো, এই, মুখ খোল্, দেখি তোর ক'টা দাঁত উঠেছে।

একজন তাপসী বললেন, ওরে ছাড়, ওর ব্যথা লাগছে। এ আশ্রমে আমরা সব পশুদের নিজের সন্তানের মতন দেখি, আর তুই তাদের সব সময় কষ্ট দিস! ঋষিরা তোর নাম রেখেছিলেন বটে। সর্বদমন! দেখেছো, দেখেছো, আবার ওর ঘাড়টা ধরে মাচড়াচ্ছিস!

দ্বিতীয় তাপসী বললেন, এইবার ওর মা সিংহীটা এসে কামড়ে দেবে, দ্যাখ না!

বালকটি ঠোঁট উল্টে বললো, ইস, ভারি একেবারে ভয়ে মরে গেলুম।

রাজা এই মহা তেজস্বী বালকের দিকে মুগ্ধভাবে চেয়ে রইলেন। তাঁর অন্তর স্নেহরসে সিক্ত হয়ে গেল।

একজন তাপসী বালকটিকে বললেন, তুই ওকে ছেড়ে দে, আমি তোকে অন্য খেলনা দিচ্ছি।

বালকটি অমনি এক হাত বাড়িয়ে বললো, কই দাও।

রাজা দেখলেন, বালকটির করতল রক্তাভ, তাতে স্পষ্ট রাজ-চক্রবর্তী লক্ষণ রয়েছে।

শুধু কথায় বালককে ভোলানো যাবে না দেখে একজন তাপসী অন্য জনকে আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন ঋষিকুমার মার্কণ্ডেয়ের তৈরি করা একটি রঙিন মাটির ময়ূর আনবার জন্য।

বালকটি বললো, যতক্ষণ খেলনা না পাই, ততক্ষণ ওকে নিয়েই খেলবো।

এই বলে সে সিংহ শাবকটিকে নিয়ে লোফালুফি করতে লাগলো। তাপসীটি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠে বললেন, অমন করে না। ওগো, এখানে ঋষিকুমাররা কেউ কি নেই যে সিংহের বাচ্চাটাকে বাঁচাবে?

রাজা এবার কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে তাপসীটি বললেন, ভদ্র, বালকটির হাত থেকে সিংহ কটিকে মুক্ত করে দিন না!

রাজা সহাস্যে সস্নেহে বললেন, ছিঃ, অমন করতে নেই, ওকে ছেড়ে দাও। তুমি ঋষিকুমার, তোমার এমন ব্যবহার মানায় না, তোমার বাবাকেও লোকে নিন্দে করবে যে।

তাপসী বললেন, ভদ্র, এই বালক কোনো ঋষির সন্তান নয়!

রাজা বললেন, চেহারা দেখে সে রকমই মনে হয় বটে। তবে আমি ভাবছিলাম, এ রকম জায়গায় আর অন্য কার পুত্র আসবে!

তিনি বালকটিকে স্পর্শ করেই নিজের শরীরে এক আশ্চর্য সুখ অনুভব করলেন। তিনি ভাবলেন আমারই যদি এ রকম হয়, তাহলে যারা নিজের সন্তানকে আদর করে তারা না জানি কী সুখ পায়।

তাপসী বললেন, আপনার কথায় তবু দেখছি ও একটু শান্ত হলে, সিংহ-শিশুটিকে ছেড়ে দিয়েছে।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, যদি এ ঋষিকুমার না হয়, তাহলে এই বালকের পিতা কে?

তাপসীটি এবার একটু রাগতভাবে বললেন, সে কথা আমায় জিজ্ঞেস

করবেন না। ধর্মপত্নীত্যাগী সে-রাজার নাম আমি উচ্চারণ করতে চাই না।

রাজা আমূল কেঁপে উঠলেন। একি সত্যি হতে পারে যে তাপসী তাঁর সম্পর্কেই এত ক্রোধ দেখাচ্ছে? তিনি একবার ভাবলেন, তাপসীর কাছে এই বালকের মায়ের নাম জানতে চাইবেন, কিন্তু কোনো বিবাহিতা নারী সম্পর্কে এতখানি কৌতূহল দেখানো ভদ্রতাবিরুদ্ধ হবে।

এই সময় অন্য তাপসীটি মাটির ময়ূরটি নিয়ে ফিরে এলেন। বালকটিকে ডেকে বললেন, সর্বদমন, দ্যাখ, দ্যাখ, কী সুন্দর এই শকুন্তের লাবণ্য।

বালকটি অমনি বলে উঠলো, মা? কোথায় মা?

দুই তাপসীই হেসে ফেললেন। একজন বললেন, অমনি মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। তোর মায়ের কথা কে বলেছে? শকুন্ত মানে যে পাখি, তুই তাও জানিস না? পাখিটা সুন্দর নয়?

উত্তরোত্তর বিস্ময়ে রাজার প্রায় স্তম্ভিত হবার মতন অবস্থা। তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন? তিনি ছেলেটির হাত শক্ত করে ধরে রইলেন।

বালকটি বললো, আমায় ছেড়ে দাও! আমার খেলনা চাই না, আমি মায়ের কাছে যাবো।

রাজা তাকে আলিঙ্গন করে কোমল স্বরে বললেন, পুত্র, আমরা দুজনেই একসঙ্গে যাবো তোমার মায়ের কাছে।

বালকটি বললেন, পুত্র পুত্র বলছো কেন? তুমি কি আমার বাবা নাকি? আমার বাবা মহাবীর, এই পৃথিবীর রাজা দুষ্মন্ত!

রাজার মনে হলো, এমন মধুর কথা তিনি ইহজীবনে কখনো শোনেননি। এই বালকের কণ্ঠস্বরে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার পেলেন। তাহলে আর কোনো সংশয় রইলো না।

এই সময় পুত্রের সন্ধানে শকুন্তলা দ্রুত এলো সেখানে। হঠাৎ রাজাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো পাষাণমূর্তির মতন।

শকুন্তলার কেশরাশি অযত্নে অসংবৃত। অঙ্গে ধূলিমলিন বসন, শুদ্ধ তপশ্চর্যায় তার কৃশ শরীরটি দেখাচ্ছে একটি দীপশিখার মতন।

রাজা এক নজরেই শকুন্তলাকে চিনতে পারলেও শকুন্তলা সহসা রাজাকে চিনতে পারলো না। অনেক বছর কেটে গেছে, এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে রাজার। শরীরে সেই উজ্জ্বল দীপ্তি নেই,

সর্বজয়ী অহঙ্কারের ভাবটিও অন্তর্হিত, বিরহকাতর রাজার মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ।

বালকটি বললো, মা, দ্যাখো না, ইনি পুত্র পুত্র বলে বারবার আমায় জড়িয়ে ধরছেন। ইনি কে?

রাজা কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, শকুন্তলা, তুমি আমায় চিনতে পারোনি?

কণ্ঠস্বর শুনে শকুন্তলার আর কোনো সন্দেহ রইলো না, তবু সে নীরব হয়ে রইলো।

রাজা আবার বললেন, আমার মোহের অন্ধকার দূর হয়ে গেছে। মূর্তিমতী স্মৃতির মতন তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছো। প্রিয়তমে, আমাকে পরিচয়ের স্বীকৃতি দাও! গ্রহণের পর রোহিণী আর চন্দ্রের কি আবার মিলন হতে পারে না?

শকুন্তলা কোনোক্রমে বললো, আর্যপুত্রের জয়—

তারপরই বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গেল তার কণ্ঠ।

রাজা বললেন, হে কল্যাণী, জয় শব্দের পর অশ্রুর আবেগে তুমি আর কিছু উচ্চারণ করতে পারলে না, তবু আমি জয়ী হয়েছি। তোমার প্রসাধনহীন রক্তিম ওষ্ঠাধরে তুমি যেটুকু বলবে, তাতেই আমি ধন্য।

সর্বদমন জিজ্ঞেস করলো, মা, ইনি কে? শকুন্তলা ধরা গলায় বললো, বাছা, সে কথা তোর ভাগ্যকে জিজ্ঞেস কর।

রাজা এবার শকুন্তলার একেবারে কাছে এসে বললেন, কী এক দুর্জয় মোহের বশে আমি অন্ধ হয়েছিলাম, তাই আমার শুভাশুভ বোধ চলে গিয়েছিল। মাথায় ফুলের মালা দিলেও অন্ধ লোক সেটিকে সাপ ভেবে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তেমনভাবেই আমি তোমায় প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। সুতনু, তোমার হৃদয় থেকে সে দুঃখ মুছে ফেল।

রাজা বসে পড়ে শকুন্তলার পা দু'টি চেপে ধরলেন।

শকুন্তলা অমনি আকুল হয়ে রাজার হাত ধরে বললো, আর্যপুত্র, ওকী করছেন! উঠুন, উঠুন! আমার পূর্বজন্মে কোনো পাপ ছিল, তাই আমাকে এমন সইতে হলো। হয়তো আপনার কোনো দোষ নেই।

রাজা উঠে দাঁড়াবার পর শকুন্তলা জিজ্ঞেস করলো, এতদিন পর এই দুর্ভাগিনীকে আর্যপুত্রের হঠাৎ কেন মনে পড়লো?

রাজা বললেন, সে সব কথা পরে জানাবো। তার আগে আমার

একটি কাজ বাকি আছে। রাজসভায় তোমার চোখে উদ্‌গত অশ্রু দেখেও আমি মোহবশে উপেক্ষা করেছিলাম, আজ তোমার চোখের পাতায় যে-অশ্রুবিন্দু লেগে আছে, তা নিজের হাতে মুছে দিতেচাই।

রাজা হাত তুলে শকুন্তলার চোখ মুছে দিতে লাগলেন। তখন শকুন্তলা দেখতে পেল রাজার আঙুলে তার চেনা সেই অঙ্গুরীয়।

এই সময় মাতলি এসে রাজা দুষ্মন্তকে শকুন্তলার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করতে দেখে মৃদু হাসলেন।

রাজা বললেন, মাতলি, কী সুক্ষণেই যে আপনি আমাকে এখানে এনেছেন, তা কী বলবো! আমি আমার হৃতসর্বস্ব ফিরে পেলাম। ভগবান কশ্যপ কি এঁদের কথা কিছু জানেন?

মাতলি বললেন, যাঁরা সর্বজ্ঞ, তাঁদের কি কিছু জানতে বাকি থাকে? এবার চলুন, তিনি আপনাকে দর্শন দেবেন বলেছেন।।

পত্নী ও পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে দুষ্মন্ত গেলেন কশ্যপের আশ্রমে। একটি বেদীর ওপর ত্রিকালাতীত সেই দম্পতি বসে আছেন।

রাজাকে আসতে দেখেই ভগবান কশ্যপ অদিতিকে বললেন, দাক্ষায়নী, তোমার পুত্র ইন্দ্রের সকল সংগ্রামে ইনি সহায়ক, ইনি পৃথিবীর রাজা, এঁর নাম দুষ্মন্ত!

দেবী অদিতি বললেন অবয়ব দেখেই বোঝা যায় ইনি প্রভাবান।

মাতলি আরো এগিয়ে এসে রাজার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, আয়ুষ্মন, এই সেই দক্ষ ও মরীচিসম্ভূত দম্পতি, যাঁদের জন্য সূর্য তেজ পেয়েছেন, স্বয়ং বিষ্ণুও জন্মলাভের জন্য এঁদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন! দেবতাকুলের জনক ও জননী আপনার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করেছেন।

রাজা তাঁদের প্রণাম করে বললেন, মহেন্দ্রর ভৃত্য দুষ্মন্ত আপনাদের প্রণতি জানাচ্ছে।

ভগবান কশ্যপ বললেন, বৎস, দীর্ঘজীবী হয়ে পৃথিবী পালন করো।

দেবী অদিতি বললেন, বৎস, অপ্রতিদ্বন্দ্বী হও!

এবার পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে শকুন্তলা ওঁদের দুজনকে প্রণাম করলো।

ভগবান কশ্যপ তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, বৎসে, ইন্দ্রের তুল্য তোমার স্বামী, জয়ন্তের মতো তোমার পুত্র, তোমাকে আর অন্য আশী-র্বাদ কী দেবো। তুমি পৌলমীর মতো মঙ্গলময়ী হও।

দেবী অদিতি বললেন, বৎসে, স্বামীর সমাদর লাভ করো। তোমার

পুত্রও দীর্ঘজীবী হয়ে পিতা মাতার বংশের সৌভাগ্য অর্জন করুক।

তারপর তাঁরা ওদের সকলকে বসতে বললেন। এবং নানাবিধ মঙ্গল সংবাদ জানতে চাইলেন। কথায় কথায় কশ্যপই রাজাকে জানালেন যে দুর্বাসার অভিশাপেই রাজা ও শকুন্তলার এই দীর্ঘ দুর্ভোগ।

রাজা এবং শকুন্তলা দুজনের কেউই অভিশাপের বৃত্তান্তটি জানতেন না। রাজা এবার বুঝলেন যে, কেন তিনি শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্যবহার করা সত্ত্বেও শকুন্তলার পিতা কন্ব তাঁকে কোনো শাস্তি দেননি। তিনিও নিশ্চয়ই ভগবান কশ্যপের মতন যোগবলে সব জানতে পেরেছিলেন। স্বেচ্ছায় তিনি যে কোনো অন্যায় করেননি, এটা জানতে পেরে রাজার পাষাণভার কেটে গেল। শকুন্তলারও কোনো ক্ষোভ রইলো না।

ভগবান কশ্যপ শকুন্তলার পুত্রের জন্মবৃত্তান্তও বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, ভবিষ্যতে এ বালক একচ্ছত্র অধিপতি হবে। তোমাদের এই সন্তান প্রতিদ্বন্দ্বীহীন হয়ে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে জয় করবে। এখানে সমস্ত পশুকে দমন করে বলে ওর নাম সর্বদমন। ভবিষ্যতে জগতের ভরণ করবে বলে ওর নাম হবে ভরত।

তারপর এক সময় তাঁরা রাজাকে বললেন, তোমরা আর দেরি করো না। এবার পৃথিবীতে ফিরে যাও।

সকলকে আবার প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন রাজা।

ভগবান কশ্যপ বললেন, তোমার প্রজাদের জন্য ইন্দ্র প্রচুর বৃষ্টি দান করুন। তুমি সবরকম যজ্ঞ-সম্পাদন করে দেবতাদের প্রিয় সাধন করো। শত শত যুগ ধরে সুখে কর্তব্য পালন করে তুমি বিজয়ী থাকো।

রাজা নত মস্তকে বললেন, আমি আপনাদের আশীর্বাদের উপযুক্ত হয়ে যথাসাধ্য মঙ্গলাচরণের চেষ্টা করবো।

কশ্যপ বললেন, বৎস, তুমি আমার কাছে বর চাও। আর কোন্ প্রিয় উপহার তোমায় দিতে পারি ?

রাজা বললেন, ভগবন, আপনি যে আমাকে বর দেবার যোগ্য মনে করেছেন, তাতেই আমি কৃতার্থ। এখানে এসে আমি যা পেয়েছি, তার চেয়ে প্রিয়তর আর কী থাকতে পারে।

রাজা এবং শকুন্তলা পরস্পরের প্রতি তাকালেন প্রগাঢ় দৃষ্টিতে। তারপর পুত্রকে মধ্যখানে রেখে এগিয়ে গেলেন রথের দিকে।

গল্প

রাণী ও অবিনাশ

অবিনাশের চেহারাটা এমনিতেই বেশ লম্বা, পা ফাঁক করে দাঁড়ালে অনেকটা বড় ছায়া পড়ে। কিন্তু এখন ছায়াটা একটু বেশি লম্বা—রাস্তা পেরিয়ে গেছে। সকাল সাড়ে দশটা বাজে, এখন সকলেরই ছায়া ছোটো-ছোটো, আর একটু বাদেই বিন্দু হয়ে যাবে—অথচ অবিনাশের ছায়াটা এমন বিচ্ছিরি লম্বা হল কী করে? রাত্তিরের দিকে পিছন থেকে আলো পড়লে ছায়া আপনি লম্বা হয়ে যায়, অনেক সময় অতিকায়, পঞ্চাশ ষাট ফুট পর্যন্ত, কিন্তু এখন সূর্য প্রায় মাথার ওপরে। অবিনাশ এদিক ওদিক তাকিয়ে আলাদা কোনো আলোর খোঁজ করলো—কিছুই নেই। তা হলে কী করে এতবড় ছায়া—পিচের রাস্তা পেরিয়ে ওপাশের গ্যাসপোস্ট পর্যন্ত পেঁছিছে তার মাথা। যাই হোক, ও নিয়ে আর অবিনাশ ব্যস্ত হলো না, বিজ্ঞানের আবিষ্কার-ফাবিস্কার যত বেশি হচ্ছে—ততই অলৌকিকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে—সে ভাবলো।

ভারী ভারী বাসগুলো তার ছায়ার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, অনেক ব্যস্ত মানুষ, রিক্‌শা, এমনকি ঠেলাগাড়িও চলে যাচ্ছে তার ছায়ার বা কাঁধের ছায়া মাড়িয়েই, যাই হোক, ব্যথা তো আর লাগছে না। তবু, অবিনাশ কয়েকবার সরে সরে দাঁড়ালো।

প্রজাপতি-রঙা ছোটো ছোটো মেয়েরা স্কুল ছুটির পর বেরিয়ে আসছে—অবিনাশ দ্রুত চোখ চালিয়ে দিচ্ছে ওদের মধ্যে একবার করে—না, সর্দারনীরা এখনো বেরোয়নি। মেয়েদের সাইজ ক্রমশ বড় হচ্ছে। কচি কচি মেয়েদের পর এখন আসছে ডাঁসা মেয়েরা। ওয়ান-টু থেকে ক্লাস নাইন-টেনের মেয়েদেরও ছুটি হয়ে গেল। এমনকি দু' একটা মেয়ের চেহারা দেখে এখন আর ছাত্রী কি মাস্টারনী বোঝা যায় না। তবে, চশমা-পরা কালো ঠোঁট দু'জন শিক্ষয়িত্রী না হয়ে যায় না। এমনও হতে পারে, রাণী আজ স্কুলে আসেনি। অথবা অন্য স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে গেছে। কতদিন আগেকার শোনা খবরে এসেছে অবিনাশ। অথবা, রাণী হয়তো এখন আর চাকরি-টাক্‌রি করে না। ওর

স্বামীর এতদিনে যথেষ্ট পদোন্নতি হবার কথা। অফিসারদের বউদের কি আর মাস্টারি করলে মানায়! কিন্তু অবিনাশ শেষ পর্যন্ত দেখে যাবে। আর ক' মিনিট—এর পরই তো দুপুরের ছেলেদের স্কুল শুরু হয়ে যায়—সুতরাং আর বেশিক্ষণ নিশ্চিত ভিতরে বসে থাকবে না রাণী, যদি স্কুলে এসে থাকে।

প্রথমে যেমন জাহাজের মাস্তুলটুকু শুধু দেখা যায়, তেমনি দূরে অবিনাশ দেখতে পেল রঙিন প্যারাসোল, একটি সুডৌল হাত—মুখ না দেখতে পেলেও অবিনাশ চিনতে পেরেছে—ঐ হাঁটার ভঙ্গিটা তার খুব চেনা। হুঁ, এখনও বেশ শৌখিন আছে দেখছি, চমৎকার কায়দায় শাড়িটা পরেছে, ফুলহাতা মিডভিকটোরিয়ান ব্লাউজ, শান্তিনিকেতনের চটি। ইস্কুলে কাজ করলে তো এসব শখ বেশিদিন থাকে না। দিদিমণি দিদিমণি দেখাচ্ছে না যা হোক। তবে একটু মোটা হয়েছে। ঠিকই।

অবিনাশ এগিয়ে গেল না। আর একটা সিগারেট ধরালো। আগে চোখাচোখি হোক না। আধ ঘণ্টার ওপর অবিনাশ দাঁড়িয়ে আছে, লোকেরা কি তাকে লক্ষ করছে? পাড়ার ছোঁড়ারা না আবার আওয়াজ দেয়। যাক্‌গে। বাসে উঠে পড়বে না তো টপ করে!

রাণী কিন্তু এদিকে তাকালো না। ছাতা না বন্ধ করে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো। সুতরাং অবিনাশই এগিয়ে গিয়ে ঘুরে কোনো কথা না বলে ওর সামনে দাঁড়ালো। বললো, চিনতে পারো?

—একী, তুমি? রাণী যেন খুব বেশি অবাক হয়নি। কিন্তু প্রকাশ্য রাস্তাতেই অবিনাশের হাত চেপে ধরলো। এতদিনে মনে পড়লো অভাগিনীকে? একটু দয়ামায়া নেই শরীরে তোমার। মেয়েটা বেঁচে আছে কি মরে গেছে একটা খবরও নিলে না!

—সত্যি, কতদিন পর তোমাকে দেখলুম, রাণী।

—পাঁচ বছর আট মাস।

অবিনাশ চমৎকৃত হয়ে গেল। রাণী কি প্রতিটি দিন, প্রতিটি মাস গুনছে নাকি? না টপ করে মুখে যা এলো বলে দিল। পরে মিলিয়ে দেখতে হবে। শেষ কবে দেখা হয়েছিল—সেই আলিপুরের ট্রামে না শশাঙ্কর বিয়ের সময়, না—যাক্‌গে যাক্। রাণী ওর বাহু ছুঁয়ে আছে, অবিনাশেরও ইচ্ছে করলো রাণীর কাঁধে হাত রাখে—কিন্তু এভাবে রাস্তায় ওর ছাত্রী-ফাত্রি বোধহয় দেখে অবাক হবে। থাক্। তুমি কেমন আছো রাণী?

—ভালো নেই। তোমার জন্য সবসময় মন কেমন করে। বলেই রাণী হেসে

ফেললো। তারপর হাসতে হাসতেই দুষ্টুমির হাসি, গোপন করতে না পেরে, বললো, বিশ্বাস হলো না তো ? সত্যিই কিন্তু হেসে ফেললো, কী হবে, তোমার জন্য খুব মন কেমন করে !

—থাক্ আর ইয়ার্কি করতে হবে না ? শরীরটা নষ্ট করলে কেন ? এরকম মোটা হতে হয় ? কী সুন্দর ফিগার ছিল তোমার। এখন অত বড় বড়…

—এই, অসভ্যতা করো না, লোকে শুনতে পাবে। কী হবে আর এই পোড়া শরীরের দিকে নজর দিয়ে। আর তো আমার কেউ স্তুতি করার লোক নেই। আমি ঘরের বউ।

—কেন, স্কুলের সেক্রেটারি ? তিনি বাড়িতে মাঝে মাঝে চা খেতে ডাকেন না ? কিংবা, পাড়ার ছেলেরা, স্বামীর বন্ধু, অথবা পাশের ফ্ল্যাটের কোনো সঙ্গীতরসিক, তোমার স্তাবক নিশ্চিত এখনও অসংখ্য।

—না, রাণী ছদ্মম্লান গলায় বললো, আবিসিনিয়ার রাজকুমার ছাড়া আমার রূপের প্রশংসা আর কেউ করেনি !

এটা একটা পুরনো ঠাট্টা। রাণীর চেহারাটা ছেলেবেলায় ছিল ভারী সুন্দর, খুব কোঁকড়ানো চুল আর ফর্সা রঙের জন্য ওকে অনেকটা রাণী এলিজাবেথের (প্রথম) মতই দেখাতো। ওর নাম আসলে প্রতিমা, কিন্তু সবাই 'রাণী রাণী' বলেই ডাকে। কিন্তু অবিনাশকে কোনোক্রমেই রাজা বা রাজকুমার বলা যেতো না ছেলেবেলায়। ছেলেবেলা থেকেই ওর চেহারাটা চোয়াড়ে, কাঠখোট্টা, রঙ বেশ কালো। তাই রাণী ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতো, 'আহা, সব রাজকুমারই কি সুন্দর হবে নাকি ? আফ্রিকার রাজকুমাররা, যত বড় রাজার ছেলেই হোক না—কালো কুচ্ছিত তো হবেই ! তুমি আমার আবিসিনিয়ার রাজকুমার !'

রাণী জিজ্ঞেস করলো, এখন কি চাকরি-টাকরি করছো ?

—কিচ্ছু না। বিদেশে গিয়েছিলুম, ফিরে এসে আবার বেকার !

—ফিরলে কেন ?

—আমি বিদেশে গিয়েছিলুম, তুমি জানতে ?

—জানতুম না ? সব খবর রাখি। দেখা না হলে কী হয় ? ফিরলে কেন এত তাড়াতাড়ি ?

—তোমার জন্য মন কেমন করছিল !

দু'জনেই আবার হেসে উঠলো অনেকক্ষণ। রাণী বললো, জানো, আমার এখন সাড়ে তিনশো-চারশো টাকা রোজগার। আমাকে বিয়ে করলে এখন

তোমাকে বসিয়ে খাওয়াতুম। কী, আমাকে বিয়ে না করার জন্য এখন তোমার অনুতাপ হয় না ?

—মোটেই না। খুব বেঁচে গেছি। প্রথম প্রথম, তুমি যখন ঐ হুতকোটাকে বিয়ে করলে, প্রথম দু'তিন মাস বিষম কষ্ট হয়েছিল। মনে হতো, অবিশ্বাসিনী, ছলনাময়ী নারী। বুক ফেটে যেত। মনে হত, সব মেয়েই এইরকম। তারপর বুঝতে পারলুম, খুব বেঁচে গেছি! ওফ! বন্ধু-বান্ধবদের তো দেখেছি—বিয়ে করে এক একজন লেধরুস্ হয়ে যাচ্ছে, কী রকম বোকা বোকা তেলতেলে মুখ হচ্ছে এক একজনের। আমি কত খোলা হাত পা আছি—যখন খুশি বাড়ি ফিরতে পারি, জামার তলায় ময়লা গেঞ্জি পরলে ক্ষতি নেই, পকেটে পয়সা থাকলো বা না থাকলো, যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে পারি!

—কী নিষ্ঠুর বাবা। অন্তত মিথ্যে করেও বলতে পারতে আমার জন্য কষ্ট হয় তোমার।

—মিথ্যে কথা বলার কি আর বয়স আছে! বুড়ো হয়ে গেলুম প্রায়, আমার বয়েস বত্রিশ, তোমারও তো আটাশ! নাকি আরও বেশি, তখন বয়েস ভাঁড়িয়েছিলে!

—এখন সে-সন্দেহ হচ্ছে কেন?

—বাঃ, পাঁচ বছরে যদি কারুকে দশ বছরের বুড়ি হতে দেখি, তবে সন্দেহ হবে না!

—যাঃ মিথ্যে! মোটেই দশ বছর নয়! দু'বছর ভাঁড়িয়েছিলুম, এখন আমার তিরিশ। আর প্রেম করা—বাহাদুরি তো জানি, লাজুক কোথাকার—এখনও নিশ্চয়ই মেয়েদের গায়ে হাত দিতে হাত কাঁপে। আমিই তো তোমাকে প্রথম সিডিউস করেছিলুম। তাও কী ভয়—

সেদিন আর নেই! বিদেশে অন্তত শ'খানেক মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছি।

—ওসব বীরত্ব আমার কাছে দেখাতে হবে না। আমার চেয়ে আর কেউ বেশি চেনে না তোমাকে।

একটু থেমে রইলো দু'জনেই। অবিনাশ রাণীর সারা শরীরে চোখ ঘোরায়। রাণী পাশ-চোখে তা লক্ষ ক'রে হাসে।

—সত্যিই বুড়ি হয়ে গেলুম। ইস্কুলে যখন মাস্টারনী সেজে বসে থাকি গম্ভীর হয়ে, এক এক সময় কী রকম হাসি পায়। জীবন কাটিয়ে দেওয়া তা'হলে এত সহজ! কালকে জানো—একটা মজার ঘটনা হয়েছিল। ক্লাস টেনের মেয়েরা একটা কাগজ গোপনে চালাচালি করছিল, আমি ধরে ফেললুম।

প্রেমপত্র। একজন লিখেছে, বাকিরা সেটা কপি করে নিচ্ছে। খুব বকুনি দিলুম, আসলে কিন্তু মনে মনে খুক্ খুক্ হাসছিলুম। বেশ লিখেছে, আমারও কপি করে নিতে ইচ্ছে করছিল। এক জায়গায় কী লিখেছে জানো, 'তোমার জন্য আমার বুকের মধ্যে ব্যথা করে, যেন অসম্ভব জ্বর হয় আমার।'

—কী রকম অসভ্য! আমাদের সময় আমরা লিখতুম 'হৃদয়', এখনকার মেয়েরা লেখে 'বুক' একটু দুঃখও হল আমার, আর কেউ নেই যাকে আমি আজ আর প্রেমপত্র পাঠাতে পারি।

—কেন, আমার ঠিকানা জানতে না?

—ইস্! শখ্ কম নয়! জানো, চিঠিতে একটা রবীন্দ্রনাথের কোটেশান পর্যন্ত দেয়নি। তার বদলে কোন্ আধুনিক কবির। কী জানি, তোমারই হয়তো।

—কেন, আমার কবিতা চেনো না? পড়ো না বুঝি আজকাল?

—যা তা রাবিশ্ লিখছো তো এখন! কে পড়ে ওসব!

— তোমার ইস্কুলের দু'একটা কচি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও না!

—ফাজলামি করতে হবে না। বাড়ি যাই।

— রাণী, তোমার সঙ্গে একটা দরকারী কথা ছিল।

—আর দরকারে কাজ নেই। ঢের বেলা হল, তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিলে আমার বাড়িতে হাঁড়ি ঠেলবে কে?

—ও, এবার বুঝি রাগ হল?

—না রে, পাগ্‌লা, সত্যি বাড়ি যেতে হবে। এগারোটায় ঝি চলে যাবে—তারপর ছেলেটাকে ধরতে হবে না!

—দ্যাখ্, খুকি, চালাকি করিস্ না। এতদিন পর দেখা হল, অমনি বাড়ি আর বাড়ি! আচ্ছা, ঠিক আছে, আমিও তোর সঙ্গে বাড়িতে যাই।

—অত খাতির নয়। আমার কত্তা ছুটি নিয়ে বাড়িতে আছে। দেবে গলাধাক্কা।

—তবে চল্ কোনো চায়ের দোকানে বসি। সত্যি একটা খুব দরকারী কথা আছে তোর সঙ্গে।

—আবার তুই-তুকারি শুরু করছিস!

—তুই-তো প্রথম আরম্ভ করলি। তোর ছেলের কী নাম রেখেছিস?

—তোর নামে নয়। ভাবছি অবিনাশ নাম দিয়ে একটা বাচ্চা কুকুর পুষবো, সব সময় বুকে জড়িয়ে থাকবো তাকে।

—রাণী তোকে খুব জরুরী একটা কথা বলতে এসেছিলুম !

— কোনো দরকার নেই ।

— সত্যি, একটা বিশেষ কথা আছে ।

—না, অবি, কেন এসেছিস এতদিন পর ? কেন ভেঙে-চুরে দিতে এসেছিস ? বেশ তো আছি সংসার পেতে, চাকরি করছি, স্বামী-পুত্র নিয়ে ছেলেবেলার পুতুল খেলার মতো বৌ-বৌ খেলছি । তুই চাস, সব টান্ মেরে ফেলে দিই আবার ? কিন্তু তুই তো পাগল, তুই তো আমার পাশে থাকবি না জানি । কেন এসেছিস আমার সর্বনাশ করতে ? তুই যা ।

—না রে, আমি এসেছি মাত্র একদিনের জন্য । শুধু একদিন । চল, কোথাও গিয়ে একটু বসে কথা বলি ।

—উপায় নেই যে । সবাই ব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করবে । এত দেরি করে তো কোনোদিন ফিরি না ! ঐ বাস্টায় উঠি ।

—একটু দাঁড়া । আচ্ছা মনে কর খুব ট্র্যাফিক-জ্যাম । বাসে ওঠার কোনোক্রমে উপায় নেই । তাহলে কী করতি, দেরি তো হতোই !

—তা হলে হেঁটে যেতাম ।

—আচ্ছা চল্, হেঁটেই যাই । এইটুকু সময়ে তোকে একটা কথা বলি । এখনো শীত যায়নি, রোদ্দুরের তাত নেই ।

অবিনাশ এতক্ষণ লক্ষ করেনি যে, রাণী ওর ছায়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে । বস্তুত, সূর্য এখন মাথার কাছে এসেছে, স্বাভাবিক এবং ছোটো হয়ে গেছে অবিনাশের ছায়া । অবিনাশ ঘুরে এসে রাণীর ছায়ার ওপরে দাঁড়ালো, দাঁড়িয়ে বেশ আরাম পেল ।

রাস্তার লোকজন অনেক কমে গেছে । কোথায় পরের বাড়ি জলের দরের মতো নিলাম হচ্ছে, অধিকাংশ লোক সেখানেই ছুটে যাচ্ছে সন্দেহ কী ! দু'জনে দু'জনের ছায়া সরিয়ে হাঁটতে লাগলো ।

রাণী ওর রঙিন ছাতাটা অল্প অল্প দোলাচ্ছে । অবিনাশ ওর সুন্দর কারুকাজ করা হাতব্যাগটা টেনে নিয়ে বললো, দেখি কী আছে ? ঠোঁট উল্টে রাণী বললো, কিছুই নেই, কী আর থাকবে—বাড়ি থেকে ইস্কুল, আর ইস্কুল থেকে বাড়ি যাই । ক'টা খুচরো পয়সা আছে ।

—ভেবেছিলুম, কটা টাকা চুরি করবো ।

—এক সময় তো অনেক চুরি করেছো বাপু ।

—তা সত্যি । অনেক টাকা নিয়েছি তোর কাছ থেকে, রাণী ।

—কেন আজ দেরি করিয়ে দিলি, এতক্ষণে কবে বাড়ি পেঁছে যেতুম ।

—সত্যিই তোর ইচ্ছে করছে না আমার সঙ্গে থাকতে ? একসময় তো আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ছটফট করতি।

—ছেলেবেলায় ওরকম হয়। আগে তো বৃষ্টির জন্যও ছটফট করতুম! এখন বৃষ্টি পড়লে বিরক্ত লাগে।

অবিনাশ হঠাৎ গম্ভীর গলায় ডাকলো, রাণী!

রাণী তখুনি জল কুলকুচি করার মতো হেসে বললো, এবার বুঝি বোকা-বোকা প্রেমের কথা শুরু করবি ? খবর্দার! এখন আর কচি খুকিটি নেই যে ভোলাতে পারবে!

—কবেই বা তোকে ভোলাতে পেরেছি। ছেলেবেলা থেকেই তো তুই পাকা একটি। প্রেমের কথা তো তুই-ই আমায় শিখিয়েছিস। তোর ওপরের ঠোঁটে পাতলা পাতলা ঘাম জমেছে। খুব ইচ্ছে করছে একটা চুমু খাই। এতক্ষণ কথা বলছি, অথচ একটাও চুমু খাইনি তোকে, এরকম আগে কখনও হয়েছে ?

—তবে আর কী, রাস্তার মধ্যেই শুরু করো। হাজারটা ক্যামেরায় ছবি উঠুক্।

—ঐ জন্যই তো বলছিলুম কোথাও গিয়ে বসি।

—ইস্, কোথাও বসলেও যেন দিতাম আর কি! এখন থেকে কোথাও বসলে আমরা বসবো টেবিলের দু'পাশে।

—দেখিস চেষ্টা করে। তোর স্বামী যখন থাকবে না, দুপুরে একদিন বাড়িতে গিয়ে হাজির হবো।

—শাশুড়ি থাকে।

—থাকুক্। শাশুড়ি যেদিন গঙ্গায় স্নান করতে যাবে, আমি তক্কে তক্কে থাকবো।

—আমি দরজায় খিল দিয়ে থাকি। খুলবো না। কেন খুলবো ? তুই আমার কে ?

—আমি জলের পাইপ বেয়ে উঠবো।

—কেন ? তুই আমার কে ?

—আমি তোর সর্বস্ব! তুই-ই তো বলতিস।

—ইস, কোথাকার সর্বস্ব রে! দেখি মুখখানা!

—তুই আমাকে একেবারে গ্রাহাই করিস না রাণী। আমি বিলেত ঘুরে এলুম, হাজার হোক আমি এখন একটা বিলেতফেরত।

—ওরকম বিলেতফেরত গণ্ডায় গণ্ডায় রাস্তায় ঘুরছে। তুই আমাকে এতদিন পর বিলেত দেখিয়ে ইম্প্রেস করতে এসেছিস! কী অধঃপতন তোর।

—রাস্তা থেকে একদিন জোর করে ধরে নিয়ে যাবো।

—চেষ্টা করে দেখিস। আমার গায়ে এখনও জোর আছে। তা ছাড়া এমন চেঁচাবো যে রাস্তার হাজারটা লোক এসে গাঁট্টা মেরে তোর মাথা ফাটিয়ে দেবে। বেশ হবে।

—ওসব লোকফোক আমাকে দেখাসনি। আমি অবিনাশ মিত্তির, ছেলেবেলা থেকেই গুণ্ডা। একটা গাড়ি নিয়ে এসে চলতি রাস্তা থেকে তোকে টেনে তুলে নিয়ে যাবো।

—নিয়ে গিয়ে কী করবি?

—তোর পায়ের তলায় আমার মুখ ঘসবো।

রাণী হঠাৎ থেমে গিয়ে বললো, এখুনি ঘস্ না, এই যে দাঁড়িয়েছি লোকে দেখুক, ক্ষতি নেই।

—তারপর তোর মুখও ঘসবি, আমার পায়ে?

—তার দরকার নেই। তোর ঐ কুচ্ছিত পা-জোড়া সব সময় রাখা আছে আমার বুকের মধ্যে।

—ও, তা হলে রাণী সান্যালও রোমান্টিক হতে জানে!

—সান্যাল নয়, রায়চৌধুরী এখন। পরস্ত্রী, মনে থাকে না বুঝি?

—বাঃ, পরস্ত্রী। আয় না রাণী, আমরা লুকিয়ে অবৈধ প্রেম করি। পরকীয়া প্রেম খুব ফাসক্লাশ জিনিস।

—অবৈধ প্রেমই যদি করবো, তবে পুরোনো প্রেমিকের সঙ্গে কেন? আমি বুঝি নতুন একজন জোগাড় করতে পারি না?

—করেছিস নাকি এর মধ্যেই!

অবিনাশ রাণীর ছাতার একটা খোঁচা খেলো। ছাতার বাঁটের নিচে কাদা ছিল, অবিনাশের জামায় একটা গোল দাগ পড়লো। অবিনাশ যে সে দাগটা তোলার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে আর একটা সিগারেট ধরালো—তাতেই খুশি ছড়িয়ে পড়লো রাণীর মুখে। ঈশ্বরের রাজত্বে কে কিসে খুশি হয় বোঝা যায় না। খুশি হয়ে রাণী বললো, আজকাল এত বেশি সিগারেট খাস কেন?

—তুই খাবি নাকি? আগে তো দু'একটা খেয়েছিস।

—হ্যাঁ, আমি পরপুরুষের সঙ্গে দিনের বেলায় সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে রাস্তা দিয়ে যাই। তা হলে আর আমার বাকি থাকে কী?

অবিনাশ একটু চুপ করে রইলো। তাকিয়ে দেখলো, ওদের ছায়া-টায়া কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। এমন বিশ্রী রাস্তা—কোথাও একটা গাছ পর্যন্ত নেই যে ছাড়া পড়বে। নিছক রোদ্দুর, কোনো মানে নেই। সিগারেটে জোরে টান দিয়ে অবিনাশ বললো, সত্যি রাণী, আমরা অনেক দূর সরে গেছি—অথচ মাত্র ছ'সাত বছর। তোর মুখ থেকে 'পরপুরুষ' শব্দটা কী রকম অদ্ভুত শোনালো, যেন একটা বিদেশী শব্দ, যেন আমি একটা লৌহমানব, হাতে তলোয়ার নিয়ে তোর পাশে দাঁড়িয়ে আছি। অথচ, মনে আছে, প্রত্যেকদিন সকালে—তুই যখন কলেজে যেতি—

—থাক, পুরোনো কথা। আমি ভালো আছি অবিনাশ।

—আমিও খুব ভালো আছি। বিশ্বাস কর, আমি কোনো দুঃখের কথা বলতে আসিনি।

রাস্তাটা উঁচু হয়ে উঠে গেছে। ব্রীজের ওপর দিয়েও হাঁটা পথ আছে—নিচ দিয়েও আছে একটা সরু কাঠের রাস্তা। ওরা নিচ দিয়েই গেল। রেলিং ধরে দাঁড়ালো দু'জনে। নোংরা জলে অল্প স্রোত—অবিনাশ ওর সিগারেটের টুকরোটা ফেললো জলে, ব্রীজের নিচ দিয়ে ভেসে গেল। রাণী একেবারে জল ভালোবাসে না। অবিনাশ রাণীকেই পৃথিবীর একমাত্র মেয়ে জানে—জলের প্রতি যার বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই। যেমন রাণী এক্ষুনি ঐ জলে থুতু ফেললো।

রাণী বললো, এইবার শুনি কী দরকারটা? কী এমন দরকার আমার কাছে? ইস্ কত বেলা হয়ে গেল যে!

অবিনাশ জানতো, রাণী এইবার ও কথা বলবেই। কিন্তু অবিনাশ দ্বিধা করছে। ঠিক কী রকমভাবে আরম্ভ করবে বুঝতে পারছে না। রাণী ওর দিকে দুটো সম্পূর্ণ চোখ তুলে বললো, কী?

—তোকে একটা কথা বলবো রাণী। তুই কিন্তু কিছু মনে করতে পারবি না। দূরে সরে গেলেও আমি তোর সেই অবিনাশই আছি।

—অত ভনিতার দরকার কী? কী চাই বল্ না।

—রাণী তোর বুকে সেই তিলটা আছে এখনও?

—হুঁ। ওর খুব একা একা লাগতো—তাই পাশে আর একটা নতুন তিল উঠেছে। যাক্ বাজে কথা—দরকারী কথাটা কী? কী চাইতে এসেছিস এতদিন পর?

—মুক্তি। এক কথায় বলতে গেলে—

—সে আবার কী? তুই-ও আমাকে মুক্তি দিয়েছিস, আমিও তোকে দিয়েছি। বন্ধনটা আর কোথায়?

—সে রকম নয়। তুই আমার শরীরকে মুক্তি দিসনি। আমার মন ছাড়া পেয়ে গেছে কিন্তু—

রাণী অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। এই প্রথম অবিনাশের একটা কথা সে বুঝতে পারলো না। সেই জন্যই বোধ হয় অবিনাশের সারা মুখটা ও তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। কোনো সংকেত নেই। অবিনাশ আবার বললো, বেশ থেমে থেমে ঠাণ্ডা গলায় - তোর কথা ভুলে যাবার পর—আমি বেশ কয়েকটা মেয়ের সংস্পর্শে এসেছি, আর, ইয়ে, মানে শুয়েছিও কয়েকজনের সঙ্গে—কোথাও তৃপ্তি পাইনি ঠিক। কেন পাইনি জানিস, সব সময় মনে হয়েছে, সত্যিকারের রহস্য যেন তোর শরীরেই লুকিয়ে আছে! তোর শরীর তো আমি জানি না!

—এবার বাড়ি যাই।

—না, না, শোন্, আমার পক্ষে খুব জরুরী কথা। আমার জীবনমরণ সমস্যা। আমার পুরো ছেলেবেলাটা কেটেছে তোর সঙ্গে—তোর কথা, হাসি, পাগলামি, শরীরের গন্ধ—অর্থাৎ যা কিছু ফেমিনিন, তোর স্বাদ আমি তোর কাছেই পেয়েছি। তোকে মনে হত একটা রহস্যের সিন্দুক। তোকে চুমো খেয়েছি, তোর জামার বোতাম খুলে বুকে মুখ চেপে ধরেছি—কী অসম্ভব উথাল পাথাল করতো তখন মাথার মধ্যে। ছেলেবেলায় সকলেরই যা হয় আর কি। কিন্তু কোনোদিন তোর সঙ্গে শুইনি, সাহস পাইনি—ভাবতুম, অতখানি আমার সইবে না। ঐ অসম্ভব মাধুর্য আমাকে পাগল করে দেবে। আমি টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাবো। এইসব আর কি। এখন দেখ, কত বদলে গেছি। চোয়ালের কাছে শক্ত দাগ পড়েছে, প্রেম-ফ্রেম ঘুচে গেছে মন থেকে, মদ খেতে শিখেছি খুব, মেয়েদের এখন অন্যভাবে চাই। অর্থাৎ মেয়েদের জানতে দিতে চাই না ওদের কাছ থেকে আমি কতখানি পাচ্ছি - খুব গোপনে, ওদের একদম বুঝতে না দিয়ে—আমার যেটুকু বিষম দরকার আমাকে নিতেই হবে। ওরা ভাববে বুঝি সাধারণ কাণ্ড-কারখানাই হচ্ছে—আসলে কাক যেমন কোকিলের ছানাকে পালন করে না জেনে—তেমনি মেয়েরা সম্পূর্ণ নিজেদের অজ্ঞাতসারে ওদের শরীরটা পুষে রাখে। কিছুই মানে বোঝে না শরীরের। আমি চাই ওরা না জেনে আমাকে একটা দুর্লভ জিনিস দিয়ে যাবে -। ওদের কোনোদিন বলবো না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, আমি সম্পূর্ণ পাচ্ছি না কখনো—সব সময় মনে হয় কিছু বাকি থেকে যাচ্ছে, একটি সম্পূর্ণ মেয়েকে কখনো পাইনি। তখনই তোর কথা মনে পড়ে—তোর কত-কীই তো আমি জানি—প্রায় গোটা

জীবন—কিন্তু আমি তোর সম্পূর্ণ শরীর জানি না। তাই মনে হয়, সমস্ত রহস্য বা তৃপ্তি লেগে আছে তোর শরীরে, আমার জীবনের প্রথম নারীর কাছে। মানে, তুই কিছু মনে করছিস না তো—আমি অন্য মেয়ের সঙ্গে শুয়েছি এ কথা বললুম বলে। তুই-ও তো তোর স্বামীর সঙ্গে শুচ্ছিস—আমি কি আর কিছু মনে করছি! তুই নিশ্চয়ই আশা করিসনি—আমি সারা জীবন তোর বিরহে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকবো।

—বয়ে গেছে আমার মনে করতে। যাক্, এ সব প্রলাপ শুনে আমার লাভ কী। আমি কী করবো?

—তুই বুঝতে পারছিস না রাণী? তোর উচিত আমাকে সাহায্য করা।

—কী রকম সাহায্য? আমার কাছে কী চাইছিস।

—একটি দিন।

—তার মানে?

—আমি তোর সঙ্গে একবার।

—তাতে কী লাভ?

—আমি নিঃসন্দেহ হতে চাই যে—আসলে তুই-ও খুব সাধারণ। অন্য মেয়েদেরই মতো। তোর শরীরেও কোনো আলাদা রহস্য নেই। তোকে হারিয়ে অন্য মেয়েকে পেলেও আমি আসলে একটি সম্পূর্ণ মেয়েকেই পাবো। তার বেশি আর কিছু পাবার নেই।

রাণী হঠাৎ চোখ দুটো খুব নিচু করলো। যেন ওর চোখ দুটো একেবারে ঢুকে গেল মুখমণ্ডলের মধ্যে। কপালের নিচে আর কিছু নেই, সাদা। সেই রকমভাবেই বললো, অসভ্য, ইতর কোথাকার।

অবিনাশ বিষম অবাক হয়ে গেল। একটু দ্বিধা করে আলতোভাবে রাণীর কাঁধে একটা হাত রেখে বললো, একি রাণী, তুই রাগ করছিস? আমি কিন্তু তোকে আঘাত করার জন্য বলিনি। আসলে, ভেবে দ্যাখ, আমরা দু'জনেই তো খুব সাধারণ। অন্যদেরই মতো। আমি শুধু নিঃসংশয় হতে চাই।

রাণী ফুঁসে উঠে বললো, না, আমি সাধারণ নই। আমি অসাধারণ!

—এটা তো ছেলেমানুষি! আমাদের এত বয়েস হল, এখন তো আমরা জানি। তোকে না পেলে আমি সবটুকু রহস্য পাবো না, একি সম্ভব নাকি!

—হ্যাঁ তাই। তুই যেখানেই যা—তৃপ্তি পাবি না। তোর প্রাণ একটা কৌটোয় পোরা ভ্রমরের মতো আমার কাছেই থাকবে। আমি তাকে মুক্তি দেবো না।

—ওসব কিছু না, রাণী। জীবন অন্যরকম। মানুষ বিষম ভুলে যেতে পারে। অনেক বদলে যেতে পারে। তুই একবার—

—তারপর আমার কী হবে? একজন মাত্র মানুষের কাছেও আমি অসাধারণ থাকবো না? অবি, তোকেও তো আমি সম্পূর্ণ পাইনি। একদিন পেয়ে যদি দেখি, তুইও সাধারণ, আমার স্বামীরই মতো—তা হলে আর আমার জীবনে কী রইলো? তোকে দেখলে এখনও আমার বুক কেঁপে ওঠে। আজ প্রথম দেখে বিষম রক্ত ছলাত করে উঠলো। যদি দেখি,—তুইও তাহলে, আমার এই চাকরি-করা, স্বামী-সংসার, ছেলে মানুষ-করা—সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে না? আমার আর কী থাকবে তা হলে! আমার একটিও না-দেখা স্বপ্ন থাকবে না! একজনের কাছে অন্তত রাণী হয়ে থাকবো না? আমার জীবনে থাকবে না একজন অদেখা রাজকুমার? আমার আবিসিনিয়ার রাজকুমার! না, অবি, আমি সব কিছু জানতে চাই না। তুই দূর হয়ে যা।

—কিন্তু জানাই তো ভালো। নিশ্চিত হবার মতো এমন তৃপ্তি আর নেই। জীবন শেষ করার আগে জেনে যেতে হবে, জীবনে আমার কী কী প্রাপ্য ছিল। রহস্যের ভাবনায় কাটানো খুব কুচ্ছিত।

তুই আমার সামনে আসিস না। কোনোদিন না। সবচেয়ে ভালো হয় তুই যদি এখন মরে যাস্‌। তাহলে তোকে জেনে ফেলার কোনো ভয়ই আর থাকে না। তা হলেই তোকে আমি চিরকাল ভালোবাসতে পারবো।

—তুই ভুল করছিস। ওকে ভালোবাসা বলে না। কী দরকার ভালো-বাসার। ভালোবাসা ছাড়াও জীবন খুব সুন্দর কেটে যেতে পারে। বড় কথা হল জানা। যদি তোকে—

—আমি তোকে আর সহ্য করতে পারছি না, অবিনাশ। তুই আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা। তোর চোখে আমি ফের পাগলামি দেখতে পাচ্ছি। তোর জন্য আমার মায়া হয়।

পাশ দিয়ে যে সমস্ত লোক হেঁটে যাচ্ছে—তারা কিছুই বুঝতে পারছে না, এমন শান্তভাবে কথা বলছে রাণী! কিন্তু ওর মুখের একটি সামান্য রেখা দেখেও বোঝা যায়, ও দাঁড়িয়ে আছে ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতো। অবিনাশ সত্যি বুঝতে পারছে না, হঠাৎ রাণী কেন এমন রাগ করলো। রাণীর ওপর ওর জোর ছিল কত। কত হুকুম করেছে একসময়। ওর কথায় রাণী একবার একহাত চুল কেটে ফেলেছিল নিজের। কলেজের মাইনের টাকা দিয়ে দিয়েছে অবিনাশকে। আজ একটা সামান্য কথায়—

অবিনাশ বললো, আমি ঝোঁকের মাথায় বলছি না, রাণী। অনেক ভেবে-

চিন্তে এসেছি। আমরা দূরে সরে গেছি, কিন্তু আমাদের শারীরিক মুক্তি হয়নি। তোর সংসার আমি নষ্ট করতে চাই না মোটেই। আমাদের জীবন আলাদা হয়ে গেছে—আমরা দূরে দূরেই থাকবো। কিন্তু তার আগে—

হঠাৎ অবিনাশ দেখলো রাণী চলতে শুরু করেছে। পিছনে ফিরলো না, যেন ও একাই চলে যাবে। কী ভেবে অবিনাশ ওকে ডাকতে গিয়েও ডাকলো না। মনে মনে আন্তরিকভাবে বিদায় জোনালো রাণীকে। ওখানে দাঁড়িয়েই ও আর একটা সিগারেট ধরালো। একা একা কিছু না ভেবে সিগারেট শেষ করলো। সত্যি সেইটুকু সময় ওর কিছু মনে পড়ল না, রাণীর কথা তো নয়ই, সম্পূর্ণ সাদা মন, ও নিচের ময়লা জলের স্রোত দেখলো। পকেটে হাত দিয়ে একবার খুচরো পয়সাগুলো গুনে দেখলো অনাবশ্যক। তারপর একটা ট্রামের টিকিট পাকিয়ে কান খুঁচতে খুঁচতে রাণীর জন্য হঠাৎ ও খুব চিন্তিত হয়ে পড়লো, আমি কি রাণীকে অপমান করলুম? আমি তা মোটেই চাইনি। আসলে, যত বয়েস বাড়ছে, রাণী ততই ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছে। আবার বছর পাঁচেক বাদে রাণীকে এই কথাটা বুঝিয়ে বলা যায় কিনা—অবিনাশ পরে ভেবে দেখবে।

নীরার অসুখ

ডালহাউসি স্কোয়ারে ট্রাম থেকে নেমে সবেমাত্র একটা সিগারেট ধরিয়েছি, হঠাৎ মনে হল, পৃথিবীতে কোথাও কিছু গণ্ডগোল হয়ে গেছে। কিসের যেন একটা শোরগোল শুনতে পাচ্ছিলাম। তাকিয়ে দেখলাম দূরাগত একটা মিছিল। এ পাড়া থেকে কি একশো চুয়াল্লিশ ধারা উঠে গেছে ? সারাবছরই তো থাকে। উঠে যায়নি। অবিলম্বে পুলিশ এসে মিছিলের গতিরোধ করল। উত্তেজনা ও গোলমাল বাড়ল। তারপরই হুড়োহুড়ি। লোকজন ছুটোছুটি করছে চারিদিকে। ঠিক যেন ভিড়ের মধ্যে একটা পাগলা ষাঁড়কে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ধাবমান লোকগুলির কোন নির্দিষ্ট দিক নেই।

আমি গড্ডলিকা প্রবাহে গা না মিশিয়ে প্রাক্তন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গাড়ি-বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। কলেজ-জীবন থেকেই পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ার-গ্যাস চালানো এত বেশিবার দেখেছি যে এইসব গোলমালের চরিত্র বুঝতে আমার ভুল হয় না। লাঠি টিয়ার-গ্যাসের অবস্থায় এখনো আসেনি।

লোকজনের ছুটোছুটি ক্রমশ বাড়ছিল। তার ফলে লেগে গেল একটা বিশ্রী ট্র্যাফিক জ্যাম। কতক্ষণে এর জট ছাড়বে কে জানে। এর ওপর আবার আকস্মিকভাবে আরম্ভ হয়ে গেল বৃষ্টি। রীতিমতন জোরে।

বৃষ্টি আসার ফলে লোকজনের ছুটোছুটি, মিছিল ও পুলিশের তাণ্ডব সবই অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেল। বর্ষার তেজী বৃষ্টি অন্য কিছু সহ্য করে না। কয়েক মিনিট পরে আর সব কিছুই শান্ত, শুধু বৃষ্টির প্রবল প্রতাপ দেখা গেল।

আমি তখন আমার আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। যতদূর সম্ভব অন্যান্য গাড়ি-বারান্দাগুলোর তলা দিয়ে যাওয়া যায়। পুরোটা রাস্তায় সেরকম সুযোগ নেই, বেশ ভিজতে হল আমাকে। বুক পকেটটা শুধু চেপে রইলাম সিগারেট দেশলাই আর সামান্য যা টাকা-পয়সা আছে তা যেন না ভেজে।

বেশিদূর নয়, আমার যাবার কথা রাজভবণের পশ্চিমদিকের গেটের সামনে।

নীরা ওখানে আসবে, ঠিক সাড়ে চারটের সময়। আমার মাত্র পাঁচ মিনিট দেরি হয়েছে।

সিংহমূর্তির কাছেই একটা গাছতলায় দাঁড়ালাম। নীরা এখনো আসেনি। নীরা কোনদিন দেরি করে না।

কিন্তু সামনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বিরাট গাড়ির লাইন পড়েছে। ট্র্যাফিক জ্যাম ছড়িয়ে পড়েছে এদিকেও। এর মধ্যে নীরা আসবে কী করে? ট্রাম বাস সব অচল। নীরা যদি ট্যাক্সি নিয়েও থাকে, তবু এই জ্যাম ভেদ করে ট্যাক্সি আসতে পারবে না। ওরা আসতেও চায় না।

ভীষণ রাগ হল আমার। ঠিক এই সময়েই কি ট্র্যাফিক জ্যাম না হলে চলছিল না? এদিকে বৃষ্টিরও বিরাম নেই।

বৃষ্টির সময় গাছতলায় আশ্রয় নেওয়া খুব সুবিধের ব্যাপার নয়। প্রথম প্রথম জলের হাত থেকে বাঁচা যায়। তারপর গাছ নিজেই মাথা ঝাঁকিয়ে জল ঝরাতে থাকে।

আর একটা সিগারেট ধরাবার জন্য পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করলাম। সিগারেট ভেজেনি বটে কিন্তু দেশলাইটা নেতিয়ে গেছে। কয়েকটা কাঠি নিয়ে জ্বালাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম বার বার। ছাল চামড়া শুধু উঠে আসে!

আমার পাশে আরও কয়েকজন লোক দাঁড়িয়েছিলেন। একজনের মাথায় ছাতা। তবু তিনি আশ্রয় নিয়েছেন গাছের নিচে। তাঁর মুখে জ্বলন্ত সিগারেট।

খুব বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলুম, আপনার কাছে দেশলাই আছে?

লোকটি আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। নিজের মুখ থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

হয় ওঁর কাছে দেশলাই নেই অথবা উনি কাঠি খরচ করতে চান না।

সাবধানে ওঁর সিগারেটটা ধরে আমি আমারটা জ্বলিয়ে নিলাম। তারপর ওঁরটা ফেরত দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে আমি বললাম, ধন্যবাদ।

আমার ধন্যবাদের উত্তরে উনি বললেন, ফেলে দিন।

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। ওঁর সিগারেটটা মাত্র আধখানা পুড়েছে, উনি ফেরত নিতে চাইছেন না কেন? আমরা তো আরও অনেক দূর পর্যন্ত টানি।

আমি আবার বললাম, এই নিন।

উনি একই রকম গলায় বললেন, দরকার নেই, ফেলে দিন। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিলেন অন্যদিকে। আমার মুখখানা অপমানে কালি হয়ে গেল। এর মানে কী? আমি কি অচ্ছুত? আমার ছোঁয়া সিগারেট উনি স্পর্শ করবেন না? তা হলে দিতে গেলেন কেন? আমি তো সিগারেটের আগুন চাইনি। আর যদি ফেলতেই হয়, আমার কাছ থেকে নিয়েও তো নিজে ফেলতে পারতেন।

অথচ এই নিয়ে তর্ক করাও যায় না। অভদ্র লোকদের এই একটা সুবিধে, ভদ্রলোকেরা তাদের চ্যালেঞ্জ করে না। তারা নিজেরাই সহ্য করে যায়। আমি মনে মনে গজরাতে লাগলুম।

পাঁচটা বেজে গেল, নীরা এখনো এল না। ট্রাফিক জ্যামের জট ছেড়ে গেছে, বৃষ্টির তেজ একটু কম। নীরা তো কোনদিন এত দেরি করে না।

সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। আর কোন সন্দেহ নেই যে নীরা আজ আর আসতে পারবে না। নিশ্চয়ই আকস্মিক কোন অনিবার্য কারণে আটকে গেছে। আর অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না।

বৃষ্টি থেমে গেছে। আমি গাছতলা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। আর একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে অনেকক্ষণ ধরে, কিন্তু আমি কারুর কাছে দেশলাই চাইব না।

সবে মাত্র পা বাড়িয়েছি, এই সময় পটাং করে আমার একটা চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেল। চামড়ার চটি জলে ভিজে থ্যাসথেসে হয়ে গিয়েছিল।

এখন এই ছেঁড়া-চটি নিয়ে আমি কী করি। রাজভবনের সামনে মুচি খুঁজে পাওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার। অথচ ছেঁড়া-চটি ঘসটে ঘসটে হাঁটাও একটা অসম্ভব ব্যাপার। চটি জোড়া পুরনো, ফেলে দিলেও ক্ষতি নেই—কিন্তু খালি পায়ে হাঁটার মতন জোর নেই।

অগত্যা সেই চটি টেনে টেনেই হাঁটতে লাগলুম। অত্যন্ত বিশ্রী লাগছে। চটি ছিঁড়ে গেলে মানুষের সমস্ত ব্যক্তিত্ব চলে যায়।

খানিকটা এগোতেই কার্জন পার্কের মোড়ের কাছে দড়াম করে জোর একটা শব্দ হল। চোখ তুলে সেদিকে তাকালাম। না তাকালেই ভালো হত। একটা লরি ধাক্কা মেরেছে একটা টেম্পোকে। টেম্পো থেকে একটা লোক ছিটকে পড়েছে রাস্তায়। গল-গল করে রক্ত বেরুচ্ছে।

এতকাল কলকাতায় আছি, কিন্তু আমি নিজের চোখে কখনো কোন দুর্ঘটনা দেখিনি। আজই প্রথম। আজ বিকেল থেকে পর পর একটার পর একটা

খারাপ ঘটনা ঘটছে কেন ? পৃথিবীর যন্ত্রপাতিতে কি কোথাও কোন গণ্ডগোল হয়েছে ?

হঠাৎ আমার মনে হল, নীরার নিশ্চয়ই কোন অসুখ হয়েছে। সেই জন্যই আসতে পারেনি। কালকেও নীরাকে পরিপূর্ণ সুস্থ দেখেছি, আজ তার অসুখ হবার কোন কারণই নেই। তবু আমার ঐ কথাই মনে হল - সেই জন্যই আজ আমি একটার পর একটা কুচিহ্ন দেখছি। এইসব ঘটনার সঙ্গে নীরার অসুখের নিশ্চয়ই সম্পর্ক আছে। এই জগৎ তো মায়ার প্রতিভাস, আমার মনের অবস্থা অনুয়ায়ীই সব কিছু ঘটে থাকে।

নীরার অসুখ কতটা গুরুত্বপূর্ণ, আমার এক্ষুনি জানা দরকার। ওদের বাড়িতে সাধারণত আমি টেলিফোন করি না, আজ করতে হবে।

কোথায় টেলিফোন ? ট্রাম গুমটিতে। ছেঁড়া চটি পায়ে দিয়েই ছুটলাম সেই দিকে।

তিন চারজন আগে থেকেই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে। মেয়েরা টেলিফোন করতে অনেক সময় লাগায়। আমার ইচ্ছে হল, এদের কাছে হাত জোড় করে মিনতি করে বলি, আমাকে একটু আগে সুযোগ দিন. পৃথিবীর সমস্ত কাজের চেয়েও আমার কাজটা বেশি জরুরী।

কিন্তু এ-কথা মুখে বলা যায় না। নীরস মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম সবার পেছনে। মেয়েটি যথারীতি বহুক্ষণ সময় লাগাল। ও যেন কার সঙ্গে ঝগড়া করছে। তা তো করবেই! আজ এই মুহূর্তে, পৃথিবীতে কেউ সুখে নেই।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে আমার সুযোগ এল। ঠিক-ঠাক খুচরো পয়সা পকেটে আছে, আগেই দেখে নিয়েছিলান। কানেকশান হবার পর এনগেজড টোন পেলাম। তবু ফোন ছাড়লাম না। পর পর তিনবার চেষ্টা করলাম। একই অবস্থা। তখন টেলিফোন অফিসে লাইন ধরে জিজ্ঞেস করলাম, এই নম্বরটার কী অবস্থা দেখুন তো।

দূরভাষিণী জানালেন, ঐ নাম্বার এখন আউট অব অর্ডার হয়ে আছে।

খুব একটা আশ্চর্য হবার মতন ব্যাপার কিছু নয়। আজ বিকেল থেকে পর পর যা ঘটছে, তার সঙ্গে বেশ মিল আছে।

এরপর আমি একটা কাজই করতে পারি। পা ঘসতে ঘসতে চলে এলাম ধর্মতলার মোড়ে। সন্ধের পর কলকাতার রাস্তায় মুচি পাওয়া অসম্ভব—ঈশ্বর এ-রকম নিয়ম করেছেন। সুতরাং আমি আমার পুরনো চটি-জোড়া ফেলে দিয়ে ফুটপাথ থেকে একজোড়া রবারের চটি কিনে নিলাম। তারপর মিনিবাস ধরে দ্রুত নীরার বাড়িতে।

দরজা খুলল চাকর। কোন দ্বিধা না করে জিজ্ঞেস করলাম, দিদিমণি আছে ?

অন্যাদিন হলে নীরার বাবার সঙ্গে প্রথমে কথা বলতাম, একটা কোন জরুরী প্রসঙ্গ বানিয়ে নিতে হত। আজ আর ওরকম অছিলা খোঁজার কোনো মানে হয় না।

চাকরটি বলল, দিদিমণি ওপরে শুয়ে আছেন।

—অসুখ করেছে ?

— না, এমনিই শুয়ে আছেন।

— খবর দাও, সুনীলবাবু দেখা করতে এসেছেন। চাকরটি ওপরে চলে গেল। আমি বসবার ঘরে দাঁড়িয়ে ছটফট করতে লাগলাম। বসতেও ইচ্ছে করল না। টেবিলে অনেক পত্র-পত্রিকা পড়ে আছে, ছুঁয়েও দেখলাম না।

চাকর একটু পরে এসে বলল, দিদিমণির জ্বর হয়েছে।

আমার প্রচণ্ড চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল, আমি আগেই বলেছিলাম না ?

খুব শান্তভাবে বললাম, আমি একবার ওপরে যাব। দিদিমণির বাবা কিংবা মাকে একটু বলে এসো আমার কথা।

—বলেছি, আপনি আসুন।

চাকরটির আগে আগেই আমি সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে উঠে এলাম। নীরার ঘর আমি চিনি। তিনতলায় সিঁড়ির পাশেই।

নীরা শুয়ে আছে চিত হয়ে, গায়ে একটা পাতলা নীল চাদর, চোখ বোজা। ওর মা শিয়রের কাছে বসে কপালে জলপটি দিচ্ছেন।

নীরার মা আমাকে দেখে সামান্য একটু অবাক হলেন, কথায় তা প্রকাশ করলেন না অবশ্য। বললেন, ঐ চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসো।

আমাকে বলতেই হল যে নীরার বিশেষ বন্ধু স্নিগ্ধা, যে আমার মাসতুতো বোন, সে নীরাকে একটা খবর দিতে বলেছিল, আমি এ পাড়ায় এসেছিলাম অন্য কাজে, এসে শুনলাম, নীরার অসুখ।

ওর মা বললেন দ্যাখো দেখি, হঠাৎ কী রকম জ্বর। দুপুরেও ভাল ছিল।

—কী হয়েছে ?

— বুঝতে পারছি না তো। টেম্পারেচার একশো ডিগ্রি।

—ডাক্তার এসেছিলেন ?

—রথীনকে তো খবর পাঠিয়েছি। ন'টার সময় আসবে বলেছে। টেলি-ফোনটা আবার আজকে খারাপ। ওর বাবাও এখনো অফিস থেকে ফেরেননি।

কথাবার্তা শুনে নীরা চোখ মেলে একবার তাকাল। ঘোলাটে দৃষ্টি। আমাকে চিনতে পারল কিনা কে জানে।

আমি চেয়ারে বসে নীরার মাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন ওষুধ-টসুধ আনতে হবে? আমি এনে দিতে পারি?

—না। রথীন এসে দেখুক।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। উনি কি একবারও ঘর ছেড়ে উঠে যাবেন না!

আজকালকার মায়েরা তেমন অবুঝ নন্। একটু বাদেই উনি বললেন, তুমি একটু বসো। আমি একটু গরম দুধ নিয়ে আসি, যদি খায়।

উনি ঘর থেকে চলে যাওয়া মাত্রই আমি উঠে গিয়ে দরজার কাছে উঁকি মেরে দেখলাম, উনি একতলায় রান্নাঘরেই যাচ্ছেন কিনা। উনি তাই-ই গেলেন। তা হলে ফিরতে অন্তত দু' মিনিট তো লাগবেই।

নীরার শিয়রের কাছে এসে আমি ওর কপালে হাত দিলাম। কপালটা যেন পুড়ে যাচ্ছে একেবারে।

নীরা চোখ মেলে তাকাল আবার। তারপর অস্পষ্ট গলায় বলল, আমি আজ যেতে পারিনি।

—ও কথা এখন থাক। তোমার কষ্ট হচ্ছে?

—আমার মন খারাপ লাগছে খুব।

—ছিঃ এখন মন খারাপ করে না। হঠাৎ অসুখ বাধালে কী করে?

—আমার তো অসুখ হয়নি, আমার মন খারাপ।

—লক্ষ্মীটি এখন মন খারাপ করো না।

নীরা আমার হাতটা টেনে নিজের চোখের ওপর রাখলো। আমি ভালো লাগায় বিধুর হয়ে গেলাম। আবার ভয়ও করতে লাগল। ওর মা এক্ষুনি এসে পড়বেন না তো?

নীরা বলল, তুমি যেও না।

আমি হাত সরিয়ে নিয়ে চেয়ারে এসে বসলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওর মা এসে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে। উত্তেজনায় আমি কাঁপছি।

ডাক্তার না-আসা পর্যন্ত আমি বসেই রইলাম সেই ঘরে। এর আগেই নীরার বাবা এলেন, দু চারটে কথা বললেন আমার সঙ্গে। আমি জানি, ওঁরা তো আমাকে জোর করে চলে যেতে বলবেন না।

ডাক্তার এল সাড়ে ন'টায়। ওদেরই কী রকম আত্মীয়। নীরার সঙ্গে তুই

তুই বলে কথা বলেন। নীরার জ্বর তখনও একটুও কমেনি। বরং বেড়েছে মনে হয়।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, তোর হঠাৎ কী হল?

নীরা বলল, আমার কিছু ভালো লাগছে না।

—কোথায় ব্যথা?

নীরার সেই একই উত্তর, কিছু ভালো লাগছে না।

ওরা কেউ জানে না, শুধু আমি জানি, নীরা কখনো অসুখের কথা আলোচনা করতে ভালবাসে না। কোনদিন ও শরীরের কোন ব্যাপার নিয়েই অভিযোগ করেনি। কিংবা আমার সামনে করে না।

ডাক্তার নীরার বুক-পিঠ পরীক্ষা করে গম্ভীর হয়ে গেলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, জ্বর তো একশো পাঁচের কম নয় মনে হচ্ছে। কোন রকম ভাইরাস ইনফেকশান মনে হচ্ছে। রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। আজ তো হবে না! কাল সকালেই পাঠিয়ে দেব।

তার পরদিন থেকে কলকাতা শহরে কী তুলকালাম কাণ্ড। আগের দিনের ঘটনার জেরে ছাত্র ধর্মঘট। পুলিশের সঙ্গে আবার মারামারি। ট্রাম-বাস পুড়ল। কলকাতা শহরটা বিকল হয়ে গেল।

আমি বিকেলে দৌড়তে দৌড়তে গেলাম নীরার কাছে। নীরার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। কোন কথা বলতে পারছে না, প্রায় অজ্ঞানের মতন অবস্থা। এদিকে রক্ত পরীক্ষার কোন ফলাফল তখনও আসেনি।

বিষণ্ণ মনে বেরিয়ে এলাম নীরাদের বাড়ি থেকে। রাস্তাঘাট ফাঁকা, থমথমে। যে-কয়েকজন লোককে দেখা গেল, সকলের মুখ থমথমে। মাঝে মাঝে হিংস্র চেহারায় পুলিশের গাড়ি টহল দিচ্ছে।

আমি তো জানি, কলকাতার এই অবস্থা তো শুধু নীরার জন্যই। নীরার অসুখ ঠিক না করলে এই শহর রসাতলে যাবে।

পরদিনও নীরার ঠিক সেই একই রকম অবস্থা। ডাক্তাররা কিছু বলতে পারছেন না। আমি তীব্রভাবে মনে মনে বলতে লাগলুম, আপনারা করছেন কী? আপনারা কি কলকাতা শহরটাকে ভালোবাসেন না? ওকে সারিয়ে না তুললে যে এই শহরটা ধ্বংস হয়ে যাবে। হঠাৎ ভূমিকম্পে সব কিছু ভেঙে পড়তেও পারে। সেদিন কলকাতার সাত জায়গায় ট্রামে-বাসে আগুন লেগেছে, পুলিশের সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধ হয়েছে অনেক জায়গায়। আমি একটু ফাঁকা ঘর পেয়ে অচেতন নীরার কপালে হাত দিয়ে বললাম নীরা, ভাল

হয়ে ওঠো। তোমাকে ভাল হয়ে উঠতেই হবে। তুমি এতগুলো মানুষের কথা ভাব।

পরদিন কলকাতায় কারফিউ জারি হবে কিনা এরকম জল্পনা-কল্পনা চলছিল, কেউ কেউ বলছে আর্মিকে ডেকে আনা হবে। কিন্তু সেদিনই রক্ত পরীক্ষার ফল পাওয়া গেল, জানা গেল ভাইরাস। ঠিক ইঞ্জেকশান দেবার পরই নীরার জ্ঞান ফিরে এল। এক ঘণ্টা বাদে ওর মুখের রঙটা দেখাল অনেক স্বাভাবিক।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, নীরা, এখন কেমন আছ?

নীরা সামান্য হেসে বলল, আমার মন ভালো হয়ে গেছে।

সেদিন বাইরে এসে দেখলাম, চমৎকার ফুরফুরে হাওয়া বইছে। রাস্তায় অনেক বেশি লোকজন। কয়েকজন পুলিশের মুখেও হাসি।

পরদিন সকাল থেকে কলকাতা একেবারে স্বাভাবিক।

ভিতরের চোখ

অফিসের কাজে বোম্বে গিয়েছিলাম, ভাবলাম, চট করে একবার গোয়া থেকে ঘুরে আসা যাক। হাতে তিনদিন সময় আছে! পাঞ্জিমে একদিন কাটাবার পর চলে গেলাম কালাংগুটের সমুদ্রতীর দেখতে।

তখন বিকেল শেষ হয়ে এসেছে, চতুর্দিকে অপরূপ নরম আলো। দূরে সমুদ্রে সূর্য অস্ত যাচ্ছেন। দৃশ্যের সৌন্দর্য এখানে একটা বিশাল মহিমা বিস্তার করেছে। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এখানে বেশ ভিড়। হিপিদের বড় একটা দল তো রয়েছেই, তা ছাড়া এখন ভ্রমণকারীদের মাস এবং ভ্রমণকারীদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা যথেষ্ট।

প্রায় বীচের ওপরেই একটা ছোট রেস্তোরাঁ। সেখানে বসবার জায়গা নেই। বালির ওপরে হুটোপুটি করছে অনেকে। কেউ কেউ এগিয়ে যাচ্ছে জলের দিকে। জল বেশ খানিকটা দূরে।

একটি পুরুষ ও একটি রমণীকে আমি পাশাপাশি জলের দিকে এগিয়ে যেতে দেখলাম। আমি শুধু দেখতে পাচ্ছি তাদের পিঠের দিক। সূর্যাস্তের দিকে এগোচ্ছে বলে, বিপরীত দিক থেকে আসা আলোয় তাদের শরীর দুটি কালো রেখায় আঁকা। হাওয়ায় উড়ছে মেয়েটির আঁচল, ছেলেটির হাতে সিগারেট। মন্থর তাদের চলার ভঙ্গি।

হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগলো। মনে হলো ঐ মেয়েটির হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গি আমার পরিচিত।

আর একবার তাকিয়ে আমি নিশ্চিত হলাম। রূপাকে আমি এতদিন ধরে এতভাবে দেখেছি যে আমার ভুল হবার কথা নয়। শুধুমাত্র পেছন দিকটা দেখে, তাও প্রায় একশো গজ দূর থেকে এবং গোধূলিকালীন ম্লান আলোয় কোনো মেয়েকে চিনতে পারার কথা নয়, কিন্তু আমার মনে কোনো দ্বিধা রইলো না।

আমি অপেক্ষা করলাম না। পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলাম। রূপা

জলের ধার থেকে এক্ষুনি ফিরে আসবে, আজ যেন আমাকে দেখতে না পায়। আমার অভিমান বড় তীব্র।

তা ছাড়া, রুপা হয়তো ভেবে বসতে পারে, ও এখানে ওর স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে আসবে জেনেই আমি এখানে এসেছি। মেয়েদের মন বড়ো বিচিত্র। আমি এখনো রুপার জন্য কাতর হয়ে আছি কিংবা ওদের সুখে বিঘ্ন ঘটাতে এসেছি—এরকম ভেবে বসাও বিচিত্র নয়।

আমার ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল। ফিরে এসে বললাম, চলো।

ট্যাক্সিওয়ালা অবাক। মাত্র পনেরো মিনিটের জন্য কেউ এত টাকা খরচ ক'রে ট্যাক্সি ভাড়া নিয়ে কালাংগুটের বেলাভূমি দেখতে আসে না। কিন্তু প্রকৃতি আমার জন্য বিস্বাদ হয়ে গেছে।

পাঞ্জিমে ফিরে ঠিক করলাম, তার পরের দিন ভোরেই বাস ধরে ফিরে যাবো বোম্বে। রুপাও নিশ্চয়ই পাঞ্জিমে আসবে, তখন আমার সঙ্গে দেখা হোক, আমি চাই না।

একবার শুধু মনে হয়েছিল, যদি রুপা না হয়! আমার দিকে পিছন ফিরে থাকা একটি নারীমূর্তি, উড়ন্ত শাড়ির আঁচল—শুধু এইটুকু দেখেছি। পরক্ষণেই মনে হলো, ঐ মেয়েটা রুপা ছাড়া আর কেউ নয়। আমি নিজের সঙ্গেই নিজে একটা বাজি ধরে ফেললাম। এবং ফিরে গেলাম পরদিন ভোরে।

রুপার সঙ্গে দ্বিতীয়বার আমার দেখা কলকাতার রবীন্দ্রসদনে। দেখা মানে, এবারও এক পক্ষের ব্যাপার, অর্থাৎ আমিই শুধু দেখেছি, রুপা দেখেনি।

একটা বিখ্যাত নাটক দেখতে এসেছিলাম। টিকিট হাতে নিয়ে রবীন্দ্র-সদনের কাঁচের দরজাগুলোর সামনে এসে সবেমাত্র দাঁড়িয়েছি, দেখলাম, ভেতরের লবিতে আরও দু-তিনজন নারী-পুরুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে রুপা। এবারও আমার দিকে পেছন ফেরা। নতুন ডিজাইনের খোঁপা, একটা ময়ূরকণ্ঠী রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছে, হাতে একটা অনুষ্ঠান-পত্র, খুব গল্পে মত্ত।

দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। আজ চিনতে ভুল হবার কোনো প্রশ্নই নেই। বিয়ের পর সামান্য একটু শারীরিক পরিবর্তন হয়েছে, আগের মতন ছিপছিপে ভাবটা আর নেই। তবু ওর হাতের একটা আঙুল শুধু দেখলেও বোধহয় আমি চিনতে পারবো।

এখন ভেতরে ঢুকলে রুপার চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই। ঠিক করলাম, একটু পরে ঢোকা যাবে। এখন গিয়ে দরকার নেই।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে চলে গেলাম ময়দানে। একটা সিগারেট ধরিয়ে

হাঁটতে লাগলাম। খানিকটা বাদে ঘড়ি দেখে বুঝলাম, এতক্ষণে নাটক আরম্ভ হয়ে গেছে, এখন সকলেই ভেতরে ঢুকে গেছে। এখন যাওয়া যেতে পারে।

তবু আমার যেতে ইচ্ছে করলো না। মনে মনে একটা যুক্তি খাড়া করলাম, নাটক শুরু হবার পরে ভেতরে ঢোকা অভদ্রতা। অন্য দর্শকদের ব্যাঘাত হয়। আসলে, একই হলঘরের মধ্যে, এক ছাদের নিচে, যেখানকার হাওয়ায় রূপার নিশ্বাসের সঙ্গে আমার নিশ্বাস মিলবে—আমি থাকতে চাইছিলাম না। আমার জীবনে রূপা নামে কেউ নেই।

অনেকক্ষণ একলা একলা ঘুরলাম ময়দানের অন্ধকারে। তারপর হঠাৎ এক-সময় আমি ভাবলাম আমার কি মন খারাপ? আমি একা অন্ধকারে ঘুরছি কেন?

কথাটা ভেবেই আমার হাসি পেল। আড়াই বছর আগে বিয়ে হয়ে গেছে রূপার! এখনও সেইজন্য মন খারাপ করে করে ঘুরে বেড়াবার মতন নরম প্রেমিক তো আমি নই। এমন কি এই জন্য একটা থিয়েটারের টিকিট নষ্ট করারও কোনো মানে হয় না। অথচ রূপাকে দেখলেই আমার মনে একটা দুরন্ত অভিমানবোধ জেগে ওঠে। যুক্তিহীন এই অভিমান। রূপার বিয়ের আগে আমি তো জোর করে কিছু বলিনি। রূপাকে শুধু বলেছিলাম, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে। রূপা আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারেনি। আমি তো নিজেই জানি, ওর অনেক অসুবিধা ছিল। যাই হোক সেসব এখন চুকে-বুকে গেছে।

কিন্তু কলকাতা শহরটা আসলে খুব ছোট। কোথাও না কোথাও দেখা হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকেই। আমাকে অবশ্য চাকরির জন্য প্রায়ই কলকাতার বাইরে থাকতে হয়। রূপার স্বামীও বদলির চাকরি করে শুনেছি।

কিছুদিন পরেই রূপাকে আর একবার দেখলাম। এবার রূপাও হয়তো আমাকে দেখেছে, তাও দু-এক পলকের জন্য মাত্র।

আমার এক বন্ধুকে ট্রেনে তুলে দিতে গিয়েছিলাম হাওড়া স্টেশনে। প্ল্যাটফর্মে প্রচুর ভিড়, কিন্তু ব্যস্ততার কিছু ছিল না আমাদের। সিট রিজার্ভ করাই ছিল। আমি আর অসিত পাশাপাশি হাঁটছিলাম। অসিতের সঙ্গে একটা ছোট সুটকেশ, কুলি নেওয়ারও দরকার ছিল না।

হঠাৎ একটি কামরার জানালার দিকে চোখ পড়লো। রূপা বসে আছে জানালার ঠিক পাশটিতেই। একেবারে চোখাচোখি হয়ে গেল।

চোখের পলক পড়তে বোধহয় একটু দেরি হয়েছিল। কিন্তু আমি থামিনি। এগিয়ে গেলাম। রূপা কি আমাকে চিনতে পেরেছে? যদি অন্যমনস্ক থাকে তা হলে লক্ষ না করতেও পারে।

হঠাৎ রূপার দিকে আমার চোখ গেল কেন? অসিতের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত ছিলাম, কোনোদিকে তো আগে তাকাইনি। অবশ্য, মেয়েদের দিকে চোখ আপনি চলে যায়। কিন্তু রেলের এতগুলো কামরায় আর কোনো জানালার পাশে আর কোনো মেয়ে কি বসে নেই!

অসিত জিজ্ঞেস করলো মেয়েটিকে চেনা চেনা মনে হলো না?

আমি কথা ফেরাবার জন্য বললাম, কে? ঐ সামনে যিনি যাচ্ছেন লম্বা মতন?

অসিত বললো, না, ঐ যে জানালায় যাকে দেখলাম।

কারুর চোখের দিকে ঠিক তাকিয়ে আমি মিথ্যে কথা বলতে পারি না। তাই সিগারেট ধরাবার ছলে মুখ নিচু করে বললাম, আমি ঠিক লক্ষ করিনি।

অসিতের সংরক্ষিত আসন সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। আমরা দু'জনে কামরায় উঠে বসলাম। ট্রেন ছাড়তে এখনো মিনিট পনেরো দেরি আছে।

কিছুক্ষণ গল্প করার পর আমি লক্ষ করলাম, প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে রূপা। হাতে একটা জলের ফ্লাস্ক। চোখে কিছু একটা খোঁজার দৃষ্টি। কী আর খুঁজবে, জলের কল নিশ্চয়ই।

একটু পরে যখন ট্রেন ছাড়লো আমি প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়ালাম। ট্রেনটা চলতে লাগলো আমার সামনে দিয়ে। অসিতের উদ্দেশে আমি রুমাল ওড়াতে লাগলাম। আর একবার রূপার দিকে চোখ তো পড়বেই। কিন্তু সঠিক সময়ে আমি চোখ ফিরিয়ে নিতে পেরেছি, এবং রুমালটা ভরে নিয়েছি পকেটে। ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাবার পর আমার মনে হলো, আমি এবার সত্যিই রূপাকে আমার জীবন থেকে বিদায় দিয়ে দিলাম।

এরপর সত্যিই আর বছর তিনেকের মধ্যে রূপার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। সময়ে অনেক কিছু ম্লান হয়ে যায়। কত গাছের পাতা ঝরে পড়ে। এই চোখে পুরোনো হয়ে যায় পৃথিবী। অনেক গুরুতর মান-অভিমানও হয় অতি সামান্য।

অফিসের কাজেই গিয়েছিলাম দিল্লিতে। উঠেছি হোটেলে। সারাদিন বহু অকিঞ্চিৎকর লোকের সঙ্গে দেখা করার কাজ। অকারণ ভদ্রতার হাসি দিতে দিতে চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়!

পরদিন খুব ভোরে উঠে হোটেলের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি কি, যেন একটা পুজোর প্যাণ্ডেল সেখানে। এর মধ্যেই পরিচ্ছন্ন পোশাকের অনেক নারী-পুরুষের ভিড়! দুম করে মনে পড়ে গেল আজ সরস্বতী পুজো। আমার খেয়ালই ছিল না।

খুব ছেলেবেলা থেকেই আমি সরস্বতী পুজোর দিন অঞ্জলি দিয়ে থাকি। সেই ছেলেবেলায় যখন নিজেরাই পুজো করতাম, তখন এটা আমরা মেনে চলতাম খুব। ছেলেবেলার অনেক কিছুই আর নেই, শুধু এই অভ্যেসটা রয়ে গেছে। চা খেলাম না। ভাবলাম, এত কাছেই যখন পুজো তখন অঞ্জলিটা দিলেই তো হয়। সরস্বতীর সঙ্গে এখন আর কোনো সম্পর্ক নেই। খবরের কাগজ আর ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনী ছাড়া কিছু পড়ি না—তবু পুরোনো অভ্যেসটা খোঁচা মারতে লাগলো।

ধুতিটুতি নেই। প্যাণ্ট-শার্ট পরেই চলে গেলাম পুজো প্যাণ্ডেলে। এখানে কারুকেই চিনি না। তবু বাঙালীদের ব্যাপার, নিজেকে খুব একটা বহিরাগত মনে হয় না।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি দিচ্ছিলাম। পাশ থেকে একটা সুগন্ধ পেলাম। ফুলের নয়; কারুর চুলের অনেক কালের চেনা গন্ধ। লালপেড়ে গরদের শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে রূপা। হাতের ফুলগুলি ছুঁড়ে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছো?

পুরোনো অভিমান-টভিমান সব মরে গেছে। আমি হাসিমুখে বললাম, ভালো। তুমি কেমন?

রূপা বললো, চা খাওনি নিশ্চয়ই? তুমি তো অঞ্জলি দেবার আগে কিছু খেতে না।

—মনে আছে!

—সব মনে আছে। আমার বাড়ি কাছেই। আসবে?

এর আগে রূপাকে দেখলেই এগিয়ে চলে গেছি। আজ এই সকালবেলার প্রসন্ন আলোয় আমার বাল্যকালের বান্ধবীকে দেখে মনের মধ্যে আর কোনো রাগ দুঃখ অনুভব করলাম না। মনে হলো, এই রোদ হাওয়া ও শিশুদের কলরবের মতন সবকিছুই স্বাভাবিক।

পুজো-প্যাণ্ডেল থেকে বেরিয়ে এলাম দুজনে। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার স্বামী আসেননি?

—না, এখনো ঘুম ভাঙেনি।

কয়েক পা নিঃশব্দে চলার পর কিছু একটা বলার জন্যই আমি বললাম, কতদিন পর দেখা। প্রায় ছ-বছর তো হবেই। কী বলো?

রূপা বলল, কেন? এর আগে তো আরও দেখা হয়েছে।

রূপার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে আমি অবাক হবার ভান করে বললাম, কোথায়?

রুপা হাসলো। বললো, কেন? আমার বিয়ের কয়েক মাস পরেই গোয়ার কালাংগুট বীচে তুমি ছিলে না?

চমকে উঠলাম। শুধুমাত্র পেছন দিক থেকে দেখে আমি সেই মেয়েটিই রুপা কিনা এ-সম্পর্কে একটু দ্বিধা করেছিলাম। আর রুপা আমাকে কখন দেখলো?

রুপা বলল, আমি ফিরে এসে তোমাকে আর খুঁজে পেলাম না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম তোমার জন্য।

—আমার হাতে বেশি সময় ছিল না। ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল।

—আমি ভেবেছিলাম পাঞ্জিমে ফিরে এসে অন্তত দেখা হবেই। ছোট জায়গা তো। তোমাকে কয়েকটা কথা বলার ছিল।

—আমি পরদিন ভোরেই…

—তারপর রবীন্দ্রসদনে—তুমি গেট দিয়ে ঢুকছিলে।

—সেদিন তুমি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে?

—কেন পাবো না?

—তুমি তো অন্যদিকে ফিরে ছিলে।

—মেয়েদের ভেতরে একটা আলাদা চোখ থাকে জানো না? সেই চোখ দিয়ে দেখেছিলাম। তুমি গেট ঠেলে ঢুকতে গিয়েও ঢুকলে না। আমি ভাবলাম, কিছু একটা বোধহয় ফেলে এসেছো। আমি তোমার জন্য বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম অনেকক্ষণ। নাটক শুরু হয়ে গেল, তবু আমি ভেতরে ঢুকিনি, কিন্তু তুমি এলে না আর।

কোনো মিথ্যে অজুহাত দিতে ইচ্ছে করলো না আর। তাই চুপ করে রইলাম।

রুপা আবার বললো, তারপর একদিন হাওড়া স্টেশনে, আমি জানালার ধারে বসে, সেদিন বোধহয় তুমি আমাকে দেখতে পাওনি, না?

মৃদু গলায় বললাম, পেয়েছিলাম।

—তবু তুমি আমার সঙ্গে কোনো কথা বললে না কেন? চেনা কারুর সঙ্গে দেখা হলে বুঝি চোখ ফিরিয়ে চলে যেতে হয়?

না, ঠিক তা নয়।

—তারপর আমি প্ল্যাটফর্মে নেমে তোমাকে খুঁজলাম! গাড়ি ছাড়ার আগে পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিলাম।

—কেন দাঁড়িয়েছিলে, রুপা? আমি ভেবেছিলাম, ঐ সব সময়ে তুমি কোনোবারই আমাকে দেখতে পাওনি। তাই আমি—

রূপা খুব নরমভাবে বললো, কেন এরকম ভাবলে? আমি তোমায় না দেখে পারি?

আমি রূপার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালাম। সত্যিই আজ কোনো রাগ আর অভিমান নেই। রূপা আজ এই সকালবেলাটার মতনই সুন্দর। আজকের সকাল শুধু আজকেরই সকাল।

রূপা আবার বললো, তুমি এক-সময় আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলে। আমি তখন পারিনি। তারপর, তোমাকে যখনই দেখেছি, গোয়ার সমুদ্রের ধারে, রবীন্দ্রসদনে, হাওড়া স্টেশনে—আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে থেকেছি, তোমাকে একটা কথা বলার ছিল, কিন্তু তুমি আসোনি।

আমি বললাম, আজ আর সে কথা বলার দরকার নেই। আমি সব বুঝতে পেরে গেছি।

—সত্যি বুঝতে পেরেছো?

—না হলে মনটা এমন পরিষ্কার লাগছে কেন?

জনবিরল রাস্তায়, বিরাট আকাশের নিচে, নরম রৌদ্রে রূপার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে আমার মনে হলো, এই নারী আর আমার নয়, কিন্তু আমি কিছুই হারাইনি। সবই থেকে গেছে। অভিমান আমাকে রিক্ত করে দিয়েছিল, কিন্তু এখন আমি অনুভব করতে পারি—আবার কখনো সমুদ্রবেলায় সূর্যাস্তের মুখোমুখি এই নারীকে হেঁটে যেতে না দেখলেও, সেই দৃশ্য শাশ্বত হয়ে থাকবে।

কাঁটা

তোমার পায়ে কাঁটা ফুটেছিল। টিটলাগড়ে আলপথে, তখন সন্ধ্যা ঝুঁকে পড়েছে। তুমি উঃ বলতেই আমি বললাম, দাঁড়াও নোড়ো না। তোমার পায়ে আমি হাত দেব, এজন্য তোমার লজ্জা। তোমার পা তো ফাটা ফাটা নয়, লজ্জা কী! তোমার পা কোদালের মতন বড়ো বিশ্রী নয়। নরম এবং যতটা ছোট হলে মানায়। জাপানী মেয়ের মতন খুব নরম, খুব ছোট নয় অবশ্য। কোনও জাপানী মেয়ের পা আমি এ পর্যন্ত হাতে ছুঁইনি যদিও।

আমি মাটিতে বসে, হাতে তোমার পা। তুমি দাঁড়িয়ে, একটু বেঁকে, শরীরের ভঙ্গি জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতন। তোমার লাল টুকটুকে চটি, পায়ের পাতাও লালচে। কোথায় ব্যথা? যেখানে কাঁটা ফুটছে। কোথায় কাঁটা? আমি জানি না। ঠিক, কাঁটার কথাটা আমারই জানা উচিত। আমি সত্যিই দেখেছিলাম, দু'হাতের মুঠোয় তোমার নরম, যতটা ছোট হলে মানায় পায়ের পাতাটি ধরে টিটলাগড়ের সেই অবনত সন্ধ্যায় আমি গভীরভাবে দেখেছিলাম। কাঁটা দেখিনি, দেখেছি গোলাপি-রঙা সৌন্দর্য। কিন্তু কাঁটা খুঁজতেই হবে, নইলে তোমার পায়ে ব্যথা, বিষ। এই তো এখানে, খুব ছোট, প্রায় দেখাই যায় না। এত ছোট কাঁটা হাত দিয়ে তোলা যায় না। ঠোঁট দিয়ে তোমার কাঁটা তোমার জন্য আমি তোমার পদচুম্বন করলাম। তুমি 'এই অসভ্য' বলে আমার মাথায় হাত রাখলে, দেবীমূর্তির মতন ভঙ্গি।

তুমি এখন স্বাধীন স্বাস্থ্যবান পায়ে অন্য পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াও। আমি তোমাকে আর দেখি না। তুমি আমার দেখাও চাও না। জানি না, তোমার পদতল এখনও গোলাপি কিনা। কিন্তু সেই ছোট্ট কাঁটাটা আমি রেখে দিয়েছি, খুব গোপনে, খুব ভেতরে, লুকিয়ে। প্রায়ই টের পাই।

সিঁড়িতে

—তুমি কেমন আছো ?

— ভালো আছি।

উত্তরটা দেওয়ার সময় মনীষা মাথাটা সামান্য একটু ঝুঁকিয়েছিল, ঠোঁটে লেগেছিল পাতলা কুয়াশার মতন হাসি। দশ বছর পর দেখা হলো মনীষার সঙ্গে। নেমন্তন্ন বাড়িতে। শুনেছি ওর স্বামী তার স্ত্রীর অন্য কারুর সঙ্গে মেলামেশা করা পছন্দ করেন না। মনীষার স্বামী নামকরা ডাক্তার, নিজে তিনি কতক্ষণ স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পান জানি না।

আমি উঠছিলাম, সিঁড়ি দিয়ে নামছিল মনীষা, এক মুহূর্তের জন্য স্থির চোখাচোখি। আমার বুক কাঁপছিল। পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসেও আমার বুক কাঁপে। তবে গত দশ বছর কাঁপেনি। একটু আগে সিঁড়ির নিচে আমি, পঞ্চাশ-জনের সঙ্গে চোখাচোখিতে আমার গলা শুকিয়ে এলো। এই সব মুহূর্তে নিজের হৃদ্‌স্পন্দনের শব্দও শুনতে পাই।

—তুমি কেমন আছো ?

—ভালো আছি।

মনীষার স্বামী সিঁড়ির দু-তিন ধাপ নেমে গেছেন, মনীষা আর দাঁড়ালো না, নেমে গেল, আমি ওপরে উঠে গেলাম। উঠছি তো উঠছি। সিঁড়ির কি আর শেষ নেই ? এটা কি কুতুব মিনারের ঘোরানো সিঁড়ি ?

একটু বাদে খেয়াল হলো, আমি তো সিঁড়ির সেই ধাপেই দাঁড়িয়ে আছি। একবার মনে হলো, সমস্ত সিঁড়িটা ফাঁকা, খাঁ-খাঁ করছে। আলো নেবানো, আমি সেখানে একা।

পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলুম, ভিড়ের নেমন্তন্ন বাড়িতে অনবরত নারী-পুরুষ আমাকে ঠেলে ঠেলে উঠছে নামছে। আমি শুনতে পাচ্ছি পুরুষদের রাজনীতি আলোচনা, মেয়েদের সিল্কের শাড়ির সপ্‌সপ্‌ শব্দ। মনীষা নেই।

দশ বছর বাদে মাত্র দুটি শব্দ, ভালো আছি, এর মানে কী? মনীষার ঠোঁটে ঐ পাতলা কুয়াশার মতন হাসিটুকু লেগেছিল কেন? এর মানে জানতে না পারলে সারা জীবনে আর কি কখনো আমি কোনো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারবো?

দুদ্দাড় করে লোকজন ঠেলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। মনীষা কোথায়? নেই। দশ বছর পর মাত্র দুটি শব্দ, ভালো আছি-এর মধ্যে অনেক কথা লুকিয়ে আছে আমাকে জানতে হবে। মনীষা তো জিজ্ঞেস করলো না, আমি কেমন আছি?

একজন চেনা লোক, জিজ্ঞেস করলাম, অমুক ডাক্তার আর তার স্ত্রীকে দেখেছেন? এইমাত্র তো বেরিয়ে গেল, বাইরে সাদা গাড়ি...। সাদা গাড়ি, সাদা গাড়ি কোথায় তুমি? সদ্য স্টার্ট নিয়েছে, জানালার কাছে মনীষার মুখ। দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও। গাড়ি দাঁড়ালো না, আমি ছুটতে লাগলাম, পঁয়ত্রিশ বছরেও অন্তত একবার চক্ষুলজ্জাহীন হয়ে ছুটতে দ্বিধা লাগে না।

সাদা গাড়ি মিশে গেল অনেক কালো গাড়ির মধ্যে। বৃষ্টি নামলো। আমি কত রাস্তায় ঘুরেছি জানি না, নিঃশব্দে চিৎকার করলাম বহুবার—মনীষা, তুমি জিজ্ঞেস করলে না, আমি কেমন আছি?

হঠাৎ নিঃসঙ্গ গানের মতন বেজে উঠলো গির্জার ঘণ্টা। সেই শব্দ যেন সমস্ত শহরের সব কিছু ঢেকে দিল। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমি শুনতে পেলাম, গির্জার সেই মন খারাপ ধ্বনির মধ্যে স্পষ্ট মনীষার গলা: আমি ভালো নেই, আমি ভালো নেই, আমি ভালো নেই—

স্বর্গ দর্শন

মহেন্দ্র পর্বতের চূড়ায় এসে দাঁড়ালেন যুধিষ্ঠির। মাথার ওপরে শুধু আকাশ। এতবড় আকাশের নিচে মানুষের নিঃসঙ্গতা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। পথে পড়ে আছে তাঁর চার ভাই ও স্ত্রীর মৃতদেহ। যুধিষ্ঠির আর পেছন ফিরে তাকালেন না। সঙ্গের কুকুরটি একটু ছটফট করছে। তিনি তাঁর কাঁধের ঝুলি থেকে এক টুকরো পিষ্টকখণ্ড তাকে দিয়ে বললেন, দাঁড়া, আর একটু অপেক্ষা কর।

একটু বাদেই আকাশ থেকে অগ্নিময় শকট নেমে এল। তার থেকে একজন নভোচারী বেরিয়ে আসতেই যুধিষ্ঠির হাঁটু মুড়ে অভিবাদন জানালেন। নভোচারী বললেন, বৎস যুধিষ্ঠির, তুমি পৃথিবীর সামান্য মানুষ হলেও তোমার ধৈর্য ও শুভবোধের জন্য তোমাকে আমরা সশরীরে নক্ষত্রলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্বাচিত করেছি। এসো—!

যুধিষ্ঠির বললেন, আগে এই কুকুরটিকে ভেতরে নিয়ে যান।

নভোচারী একটু অবাক হলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, এই সারমেয়টিকে কেন?

যুধিষ্ঠির নম্র অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, সেটাই আমার অভিপ্রায়।

একটুক্ষণ চিন্তা করে নভোচারী হাসলেন। তারপর বললেন, বুঝেছি। যুধিষ্ঠির, তুমি প্রকৃতই বুদ্ধিমান। তুমি আগে পরীক্ষা করে দেখতে চাও যে আমাদের এই নক্ষত্রযান পৃথিবীর প্রাণীদের উপযোগী কি না। তোমার আগে জীবিত অবস্থায় কেউ এই যানে চড়েনি। সেইজন্যই এত দূরের পথ কুকুরটাকে সঙ্গে করে এনেছ?

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি মিথ্যা কথা বলি না। আমার সন্দেহ নিরসনের জন্যই ওকে এনেছি। ও যাতে মাঝপথ থেকে চলে না যায়, সেজন্য মাঝে মাঝে ওকে এক টুকরো করে পিষ্টকখণ্ড ছুঁড়ে দিতে হয়েছে।

নভোচারী আর বাক্যব্যয় না করে কুকুরটিকে নিয়ে যানে চড়লেন এবং মহাশূন্যে উড়ে গেলেন। যুধিষ্ঠির তাকিয়ে রইলেন আকাশের দিকে।

একদণ্ড পর যানটি ফিরে এল, কুকুরটি তার থেকে বেরিয়ে এল লেজ নাড়তে নাড়তে। যুধিষ্ঠির তাঁর ঝুলির বাকি পিষ্টকখণ্ডগুলি সবই কুকুরটিকে দিয়ে বললেন, যাঃ! তুই অনেক উপকার করেছিস আমার। আমি বর দিলাম, এখন থেকে কুকুর মানুষের পোষ্য হবে।

নভোচারী যুধিষ্ঠিরের মাথায় স্বচ্ছ হেলমেট পরিয়ে দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে?

যুধিষ্ঠির বললেন, না।

—তাহলে এস!

যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে স্বর্গীয় রথ উড়ে চলল। যুধিষ্ঠির শেষবারের মতন তাকালেন পৃথিবীর দিকে। তাঁর বুক একটু টনটন করতে লাগল। যদিও আত্মীয়-পরিজন আর কেউই প্রায় বেঁচে নেই, তবু এই পৃথিবী বড়ো প্রিয় জায়গা ছিল!

নভোচারী বললেন, তুমি একটু ঘুমিয়ে নিতে পার। আমাদের পেঁছিতে দেরি হবে।

যুধিষ্ঠির বললেন, বাইরের এই শোভা তো আর দেখতে পাব না। শুধু শুধু ঘুমিয়ে নিজেকে বঞ্চিত করি কেন?

—তা ঠিক। বৎস, তুমিই এই পৃথিবীর প্রথম নভোচারী। তোমার আগে কারুকে আমরা এই সুযোগ দিইনি। তোমার কীর্তির জন্যই আমরা আর তোমাকে মৃত্যুরূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে দিইনি। তোমার ভয় করছে না?

—ভয়? কেন, ভয় করবে কেন?

—হাজার হোক, আমাদের স্বর্গ নামক গ্রহটি তোমার অচেনা।

—অচেনা হবে কেন? আমাদের পূর্বপুরুষরা সবাই সেখানে গেছেন, তাঁরা স্বর্গের গুণকীর্তন করেছেন। আমি সারাজীবন নিজেকে বহুভাবে বঞ্চিত করেও ধর্মপালন করে গেছি স্বর্গে আসবার জন্য। সেখানে যেতে ভয় পাব কেন?

—ভাল কথা! দেখা যাক্!

—আপনি আমাকে প্রথম নভোচারীর সম্মান দিলেন বটে, কিন্তু আমি আপনাকে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমাদের পূর্বপুরুষ রাজা পুরুরবাও স্বর্গে গিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলেন। এরকম আরও কারুর কারুর কথা জানি।

—অনেকে ওরকম মিথ্যে গল্প করে। তোমাকে ছাড়া আর কারুকে আগে আনা হয়নি। তোমাকেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একটি বিশেষ পরীক্ষার জন্য।

—পরীক্ষা?

—হ্যাঁ, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। প্রশ্নটা অতি জটিল, তুমি সব বুঝবে না। তবু সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলি। শরীরটা হচ্ছে একটা বস্তু আর প্রাণ হচ্ছে শক্তি। বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা কিংবা শক্তিকে বস্তুতে —একৌশল আমরা জানি, পৃথিবীর মানুষ এখনও জানে না। আমরা পৃথিবীর কিছু কিছু মানুষকে বেছে নিয়ে তাদের মৃত্যুর পর প্রাণগুলো ওপরে নিয়ে আসি। আবার বস্তুতে রূপান্তর করলেই তারা শরীর ফিরে পায়। তার আগে আমরা তাদের লোভ, মোহ, হিংসা ইত্যাদি পৃথিবীর বাজে স্বভাবগুলো মুছে দিই। এখন চেষ্টা হচ্ছে, মৃত্যু-টৃত্যুর ঝামেলা না করে যদি তোমার মতন এরকম সশরীরেই নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলেও ওই লোভ, মোহ ও হিংসা-টিংসাগুলো মুছে ফেলা যায় কিনা।

যুধিষ্ঠির একটু দুঃখিত হলেন। তারপর হঠাৎ অহংকারের সঙ্গে বললেন, হে দেব, পৃথিবীতে থাকার সময়েও আমার চরিত্রে কেউ কখনও লোভ, মোহ, মাৎসর্যের চিহ্নমাত্র দেখেনি।

—সেইজন্যই তো তোমাকে বাছা হয়েছে। তবে তুমি যতটা নিজেকে দোষ-শূন্য ভাবছ, ততটা নয়। পৃথিবী গ্রহটারই কিছু দোষ আছে, তা তোমাকে স্পর্শ করবেই! আমি তো পারতপক্ষে এখানে বেড়াতে আসতেই চাই না। বিষ্ণু মাঝে মাঝে আসেন বটে। পৃথিবীর খর্বকায় মেয়েদের তাঁর খুব পছন্দ। বেছে বেছে প্রত্যেকবার কী রকম খর্বকায় সুন্দরীদের বিয়ে করেছেনা দেখেছ?

দেবতাদের লীলা বিষয়ে যুধিষ্ঠির কোনো মন্তব্য করলেন না। মুখ নিচু করে রইলেন।

মহাশূন্য-যানের গতি কমে এসেছে। নভোচারী বললেন, শিগগিরই আমরা নরক নামে একটা উপগ্রহে থামব একটুক্ষণের জন্যে। দেখো, ওখানেই যেন থেকে যেতে চেও না। অনেকে আবার ওই জায়গাটাই বেশি পছন্দ করে।

যুধিষ্ঠির সেখানে যান থেকে নামলেনই না। এবং চোখ বুজে রইলেন। তবু অসংখ্য মানুষের চিৎকার ও ডাকে তাঁর কানে প্রায় তালা লাগবার উপক্রম। তিনি দু'হাত দিয়ে কানও চেপে রইলেন। তবু যেন কিছু চেনা কণ্ঠস্বর তাঁর কানে এসে লাগলো।

নরক থেকে স্বর্গ অতি অল্পক্ষণের পথ। স্বর্গে পেঁছিবার পর নভোচারী বললেন, আমার কর্তব্য এখানেই শেষ। এরপর অন্য বিশেষজ্ঞেরা তোমার ভার

নেবেন, তা আজ আর কিছু হবে না বোধহয়। এখন তুমি যেখানে ইচ্ছে যেতে পার। আর এও শুনে রাখ, এখানে যে কোনো গৃহই তোমার বাসগৃহ, প্রত্যেক জায়গাতেই খাদ্য আছে, কোনো খাদ্য বা পানীয়ই অপরের নয়, যে কোনো নারীকেও তুমি তোমার বল্লভা হবার জন্য আবেদন জানাতে পার।

যুধিষ্ঠির নেমে রকেট স্টেশন থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন। যখন নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য নেই, তখন রাস্তা হারাবারও কোনো ভয় নেই। এখানে সব ক'টি পথই সোজা, জটিল গলি-ঘুঁজির অস্তিত্ব নেই, দুপাশে সারি সারি গাছ, তবে তাদের পাতা সবুজ নয়, নীল। তিনি বুঝতে পারলেন, কেন নীল রঙ দেবতার এত প্রিয়। চতুর্দিকেই নীলের সমারোহ। যুধিষ্ঠিরের চোখ সবুজ দেখা অভ্যেস বলে একটু একটু পীড়িত বোধ করছিল।

আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করার জন্যই যুধিষ্ঠির বেশি ব্যগ্র হয়েছিলেন। বিশেষত তিনি দেখা করতে চান পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে। যে-কোনো সংকটে তিনি পিতামহের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছেন। স্বর্গের হাল-চালও পিতামহের কাছ থেকেই জেনে নেওয়া ভাল।

কিন্তু অদূরেই তিনি দেখতে পেলেন, একটি বিশাল গাছের নিচে পাথরের লম্বা আসনে বসে আছে দুর্যোধন এবং কর্ণ। যুধিষ্ঠির একটু চমকে উঠলেন। সামান্য বিষাদও অনুভব করলেন। এরা আগে থেকেই এসে স্বর্গসুখ ভোগ করছে? তাঁর আপন ভাইরা এবং পরম আদরণীয়া দ্রৌপদী এখনও এসে পৌঁছয়নি।

ওদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়নি। যুধিষ্ঠির ভাবলেন ওদের এড়িয়ে রাস্তার অন্যপাশ দিয়ে চলে যাবেন। তারপরই চমকে উঠলেন। তিনি কি ওদের ভয় পাচ্ছেন? না ঈর্ষা? কেউ টের পায়নি তো?

তাড়াতাড়ি তিনি এগিয়ে এসে কর্ণকে প্রণাম করলেন এবং দুর্যোধনকে স্নেহ সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই, তোমার উরুর ব্যথা সেরেছে তো?

ওরা দু'জনেই একটু চমকে উঠেছিলেন প্রথমে। তারপর দুর্যোধন বললেন, কে ধর্মরাজ, এসে গেছ? বাঃ বাঃ। না, ব্যথা-ট্যথা আর কিছু নেই। এখানে ওসব কিছু থাকে না। খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা।

কর্ণ নীরব। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন যুধিষ্ঠিরের দিকে। যুধিষ্ঠিরের বুক দুরুদুরু করছে। যদিও কর্ণ তাঁর আপন সহোদর দাদা, তবু এ পর্যন্ত তিনি কখনো ওঁর সঙ্গে সামনা-সামনি কথা বলেননি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণ একবার তাঁকে হাতের মুঠোয় পেয়েও হত্যা না করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন

অবশ্য যুধিষ্ঠির জানতেন না যে কর্ণ তাঁর দাদা হন। অনেক কটুভাষ্য করেছেন কর্ণের উদ্দেশে তখন।

তিনি হাঁটু গেড়ে বসে কর্ণের পাদবন্দনা করে বললেন, হে জ্যেষ্ঠ, আপনার কুশল তো?

কর্ণ দুর্বিনীত এবং কর্কশভাষী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর কণ্ঠস্বর আশ্চর্য কোমল। তিনি যুধিষ্ঠিরের মস্তকের ঘ্রাণ নিয়ে বললেন, হে অনুজ, তোমাকে দেখে আমি যৎপরোনাস্তি খুশি হয়েছি। তুমি পৃথিবীর গৌরব ছিলে এবং এই স্বর্গভূমি তোমাকে পেয়ে গৌরবান্বিত হল।

দুর্যোধন জিজ্ঞেস করলেন, ধর্মরাজ, তুমি খেয়েছ-টেয়েছ তো? বেরিয়েছ সেই কবে! তার ওপর আবার পাহাড় ভেঙে এসেছ। আমরা টেলিভিশনে তোমাদের পাহাড় চড়া দেখছিলাম।

কর্ণ ডান দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, ওই দিকে পান্থশালা আছে, তুমি ভোজন সেরে নিতে পার।

দুর্যোধন উৎসাহের সঙ্গে বললেন, যা খুশি খেতে পার। এমন রান্না কখনও খাওনি। দাম-টাম কিছু দিতে হবে না।

কর্ণ বললেন, ভাই, পাহাড়-ভাঙার পরিশ্রমে তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত। যে-কোনো ভবনে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পার।

দুর্যোধন বললেন, পা টিপে দেবার জন্য কিংবা সম্ভোগের জন্য যদি কোনো নারী চাও, দূরভাষণীতে শুধু কার্যালয়ে জানিয়ে দিও। যাকে ইচ্ছে, তাকেই পাবে।

কর্ণ মৃদুহাস্যে বললেন, শুধু উর্বশীকে চেও না। যদিও তিনি চিরযৌবনা এবং সুন্দরীশ্রেষ্ঠা—কিন্তু সূর্যবংশের কেউ ওঁকে পাবে না। উনি দাবি করেন, উনি আমাদের সকলের দিদিমা। কারণ সূর্যবংশের পূর্বপুরুষ পুরুরবার উনি বউ ছিলেন কিছুদিন।

যুধিষ্ঠির ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর নন। নারী-সঙ্গের জন্যও উন্মুখ নন। তিনি চান আত্মীয়-বন্ধুদের দেখা পেতে।

তিনি বললেন, আপনারা বসুন, আমি আগে একবার পিতামহের সঙ্গে দেখা করে আসি।

দুর্যোধন বললেন, তা যাও! পিতামহ বেশ বহাল তবিয়তে আছেন। এখানে আর তাঁকে জিতেন্দ্রিয় থাকতে হবে না। এখানে তো বিয়ে-টিয়ের ব্যাপার নেই, বাচ্চা-টাচ্চাও হয় না, তাই ওঁকে আর প্রতিজ্ঞা মানতে হবে না।

—পিতামহকে কোথায় পাব ?

— খুঁজে দেখ, পেয়ে যাবে। আমরা এখানে বসে আছি, কারণ শুনেছি আজই যাজ্ঞসেনী আসবেন। তাঁকে দেখব বলেই তো —

যুধিষ্ঠির চমকে উঠলেন। দ্রৌপদী আসবেন ! তা তো ঠিকই। মধুর-হাসিনী দ্রুপদ-তনয়া নিশ্চয়ই স্বর্গে আসবার অধিকারিণী !

দুর্যোধন বললেন, অন্য কেউ দ্রৌপদীকে প্রার্থনা করার আগেই আমার আবেদনটা জানিয়ে রাখব। দ্রৌপদীকে পাওয়ার সাধ আমার বহুদিনের। জুয়া খেলায় ওকে তো জিতেই নিয়েছিলাম, তবু বাবার বকুনি খেয়ে তোমাদের হাতে ফেরত দিতে হল। ওর জন্য এতবড় যুদ্ধটা করলাম। এখন আর মনে কোনো রাগ নেই। পরম রমণীয়া দ্রৌপদীকে আমি সপ্রেমে কোলে বসাব।

যুধিষ্ঠিরের মনে হল, তাঁর সর্বাঙ্গে যেন ক্ষত, সেখানে কেউ নুনের ছিটে দিচ্ছে। তাঁর ইচ্ছে হল ছুটে এখান থেকে চলে যান। চাই না স্বর্গ। দ্রৌপদীকেও তিনি পথে আটকাবেন।

দুর্যোধন আপন মনে অনেক কথাই বলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কর্ণের দিকে চোখ পড়ায় থেমে গেলেন। লজ্জা পেয়ে জিভ কাটলেন এবং কান মুললেন। তারপর বললেন, না, না, আমি প্রথম না, আমি দ্বিতীয়। দ্রৌপদীর ওপর সর্বাগ্রে অধিকার মহাত্মা কর্ণের। দ্রুপদ রাজার স্বয়ংবর সভায় আমরা কেউ লক্ষ্যভেদ করতে পারিনি বটে, কিন্তু মহাধনুর্ধর কর্ণের কাছে ও তো ছেলেখেলা ! অর্জুনের অনেক আগেই কর্ণ লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে নিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু তাঁকে সেই সুযোগ দেওয়া হল না। ইনি স্বয়ং সূর্যের পুত্র, রাজমাতা কুন্তী এঁর জননী, অর্থাৎ মহাক্ষত্রিয়, অথচ এঁকে সূতপুত্র বলে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সেদিন। সেই মিথ্যের আজ অবসান হবে। স্বর্গে মিথ্যের কোনো স্থান নেই।

কর্ণ কোনো কথা না বলে মৃদু হাসছেন। যুধিষ্ঠির স্তম্ভিত, নির্বাক। তাঁর মস্তিষ্ক মোহাচ্ছন্ন হয়ে যাবার মতন অবস্থা। যে দ্রৌপদীর জন্য তাঁরা পাঁচ ভাই এত কষ্ট সহ্য করেছেন, সেই দ্রৌপদী আজ দুরাত্মা দুর্যোধনের অঙ্কশায়িনী হবে ! এবং কর্ণ ? দাদা হয়েও তিনি ছোটভাইদের স্ত্রীকে কামনা করবেন !

যুধিষ্ঠির আর সেখানে দাঁড়ালেন না। দু'একটি শুকনো ভদ্রতার কথা বলে বিদায় নিলেন তাড়াতাড়ি। আর একটু হলে তাঁর ক্রোধের প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছিল। কিংবা তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, কৃষ্ণা আজ আসবে না, সে এখনও মরেনি। মিথ্যে কথা ! কিংবা পুরো মিথ্যে নয়, দ্রৌপদীর আর এক নাম কৃষ্ণা হলেও ওই নামে

আরও অনেক নারী আছেন পৃথিবীতে। রথচালক বাহুক-এর স্ত্রীর নামই তো কৃষ্ণা, সে এখনও বেঁচে। অর্থাৎ ইতি গজের মতন ব্যাপার। কিন্তু স্বর্গে এসেও মিথ্যের ছলনা!

যুধিষ্ঠির বেশি দূরে যেতে পারলেন না। পিছন দিকটা তাঁকে চুম্বকের মতন টানছে। পিতামহ কিংবা অন্য আত্মীয়দের সঙ্গে পরে দেখা করলেও হবে। তিনি একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালেন। দ্রৌপদীকে যদি আগে থেকেই কোনোক্রমে সতর্ক করে দেওয়া যায়!

তাঁর খুব আশা হল, দ্রৌপদীর আগেই ভীম বা অর্জুন এসে পড়তে পারে। তখন দেখা যাবে! ভীমার্জুনের কাছ থেকে দ্রৌপদীকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া দুর্যোধন-কর্ণের সাধ্য নয়! কিন্তু যদি ওরা আগে না আসে! অর্জুনটা তো আবার অতি ভদ্র কিনা! নরক থেকে স্বর্গে যখন রথ আসবে, তখন অর্জুন হয়তো বলবে, মহিলারই অগ্রাধিকার, দ্রৌপদীই আগে যাক।

যুধিষ্ঠির বুঝতে পারছেন, এটা তাঁর ঈর্ষা। প্রথমেই এরকম কঠিন পরীক্ষায় পড়বেন, তিনি ভাবতেই পারেননি। শুধু ঈর্ষা নয়, স্বর্গে এসে তিনি যুদ্ধেরও চিন্তা করছেন। তিনি ভাবছেন দ্রৌপদীকে উপলক্ষ করে আবার ভীমার্জুন আর দুর্যোধন-কর্ণের একটা লড়াই বাধাবেন। ছিঃ ছিঃ! আত্ম-গ্লানিতে যুধিষ্ঠিরের মন ভরে গেল। তিনি গাছতলায় বসে চোখ বুজে চিত্তশুদ্ধি করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারছেন না। বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠলো দ্রৌপদীর মুখ। পাহাড়ী পথে চলতে চলতে দ্রৌপদী যখন ঢলে পড়েছিলেন, তখন তিনি তাকে তোলার চেষ্টা করেননি। পাথরের ওপর সেই রাজনন্দিনীর কোমল তনু না জানি কত ব্যথা পেয়েছে! মৃত্যুর আগে দ্রৌপদী জিজ্ঞেস করেছিলেন, মহারাজ, কোন্ পাপে আমি এইভাবে মৃত্যুবরণ করছি? তিনি বলেছিলেন, তোমার কাছে তোমার পাঁচ স্বামীই সমান, তবু তুমি অর্জুনকে বেশি ভালবাসতে!

এই কথাটা বলার সময় তাঁর কণ্ঠে কি একটু শ্লেষ ফুটে উঠেছিল? তিনি বহুদিন ধরেই জানতেন যে দ্রৌপদী অর্জুনকেই বেশি ভালবাসে, তবে কোনোদিন মুখ ফুটে বলেননি, এইজন্যে তাঁর মনের মধ্যে একটা কাঁটা ছিল। তিনি কি এজন্য অর্জুনকেও হিংসে করতেন? না, না, না, তা হতেই পারে না! অর্জুন তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। সবচেয়ে? না, দ্রৌপদীর চেয়ে বেশি নয়। দ্রৌপদীর মন পাবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গায়ের জোর বা বীরত্বের

দিকেই দ্রৌপদীর ঝোঁক বেশি। মেয়েদের এই এক দোষ! তাঁর যে এত শাস্ত্রজ্ঞান এত ধর্মবোধ—এসব দ্রৌপদী বেশি পাত্তাই দেয় নি কখনো। ব্যাসদেব যখন এসে বলেছিলেন, এক বউকে নিয়ে পাঁচ ভাইয়ের যাতে মনোমালিন্য না হয় সেই জন্য তোমরা প্রত্যেকে একটা করে দিন ঠিক করে নাও, সেইদিন অন্য কেউ তার কাছে যাবে না—তখন যুধিষ্ঠির নিজের জন্য রবিবারটা ঠিক করে নিয়েছিলেন আগেই। রবিবারে কোনো কাজকার্য থাকে না, সারাদিন অখণ্ড অবসর। সারাদিন ধরে তিনি দ্রৌপদীকে পেতেন। অন্য ভাইদের অন্যান্য দিন শাসনকার্যের জন্য বেশ কিছুক্ষণ বাইরে ঘোরাঘুরি করতে হতই। একবার তিনি যখন দ্রৌপদীর সঙ্গে রতিক্রীড়া করছিলেন, তখন অর্জুন হঠাৎ সেই ঘরে ঢুকে পড়ে। এজন্য অর্জুনকে একবছরের জন্য বনবাসে যেতে হয়েছিল। তিনি তখন মুখে অনেকবার তাকে নিষেধ করলেও মনে মনে খুশি হয়েছিলেন একটু। সেই বছরটা দ্রৌপদীকে বেশি করে পাওয়া গিয়েছিল।

হঠাৎ যুধিষ্ঠিরের ঘোর ভেঙে গেল। পরিচিত কণ্ঠস্বর। তাকিয়ে দেখলেন দূরে দ্রৌপদী আসছেন, একা। দুর্যোধন আর কর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্ভাষণ করছেন। যুধিষ্ঠির হাত নেড়ে দ্রৌপদীকে ইশারা করতে লাগলেন, যাতে তাড়াতাড়ি এইদিকে চলে আসেন। কিন্তু দ্রোপদী দেখতেই পেলেন না। দ্রৌপদী যেন আরও বেশি রূপসী হয়েছেন। বয়সের কোনো ছাপ নেই। চিক্কণ মসৃণ ত্বক। কোমর পর্যন্ত ছড়ানো চুল। সুগোল বর্তুল দুই স্তন। সিংহের মতন সরু কোমর। গুরু নিতম্ব। দ্রৌপদীর দাঁত এত সুন্দর যে হাসলেই মনে হয় যেন চারদিকটা আলো হয়ে গেল। তাঁর ওষ্ঠ ও অধর পাকা আঙুর ফলের মতন।

যুধিষ্ঠির দেখলেন কর্ণ ও দুর্যোধন দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন দ্রৌপদীর দিকে। তিনি শুনতে পেলেন, কর্ণ বলছেন, হে বরবর্ণিনী, তোমার আগমনে সুরলোক ধন্য হল। আমরা তোমার প্রতীক্ষায় বসেছিলাম। হে সুন্দরী, তোমার রূপের ছটায় আমি বিমোহিত। তোমার তুল্যা মোহময়ী নারী আমি দুই জীবনে দেখিনি!

দ্রৌপদী মধুর হাস্যে বললেন, হে বীরশ্রেষ্ঠ, আপনার কথা আমার কানে সুধাবর্ষণ করছে। আপনার মত তেজোদ্দীপ্ত পুরুষের সামনে দাঁড়ালেই শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

দুর্যোধন বললেন, হে যাজ্ঞসেনী, আমাকে দেখতে পাচ্ছ না নাকি? আমিও তোমার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি যে—

দ্রৌপদী বললেন, হে সখা, তোমাকে দেখব না কেন? তোমার ওই সহাস্য সুন্দর মুখ কোনো নারী কি না দেখে থাকতে পারে?

যুধিষ্ঠির বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেলেন। জন্ম-শত্রুদের সঙ্গে দ্রৌপদী এরকম আদুরে আদুরে ভাবে কথা বলছে কেন? সে কি ঘৃণাভরে ওদের এড়িয়ে চলে আসতে পারত না?

তারপরেই সেই নভোচারী দেবতার কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। দুর্যোধন, কর্ণ, দ্রৌপদী—ওরা তিনজনেই মৃত্যুর পর স্বর্গে এসেছে। তাই শরীর থেকে রাগ, হিংসা, দ্বেষ সব মুছে দেওয়া হয়েছে। চিরকালের আনন্দ ও সম্ভোগসুখেই ওরা নিমজ্জিত থাকবে শুধু।

দুর্যোধন বললেন, হে দ্রুপদ-নন্দিনী, তোমাকে দেখে আমরা অধীর হয়েছি। রাজসভায় তোমাকে একদিন আমার উরু প্রদর্শন করে বলেছিলাম, তোমাকে এইখানে এসে বসতে হবে। কিন্তু তখন সে কার্যে সক্ষম হইনি। কিন্তু তখন থেকেই আমার সেই বাসনা রয়ে গেছে। এবার কি তুমি একবার সেখানে এসে বসবে?

দ্রৌপদী বললেন, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে। এখনি!

দুর্যোধন বললেন, এখনি নয়। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। পুরুষ-শ্রেষ্ঠ কর্ণও তোমার প্রার্থী। এবং একথা কে না জানে, তোমার প্রতি কর্ণের প্রণয় ও আকাঙ্ক্ষা বহুদিনের। তুমি যতকাল ইচ্ছা কর্ণের সঙ্গে সুখ-সম্ভোগ কর—আমি প্রতীক্ষায় থাকব। স্বর্গে কোনো নারীই উচ্ছিষ্টা নয়। এখানে অমৃত এবং নারী সমতুল্য।

দ্রৌপদী কর্ণের দিকে ফিরে প্রগাঢ় আবেগের সঙ্গে বললেন, হে সূর্যপুত্র, এই দেখুন, আপনার সন্দর্শনেই আমার শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছে। আমি বহুকাল ধরেই মনে মনে আপনাকে কামনা করেছি। আপনি আমাকে ধন্য করুন।

দ্রৌপদী নিজেই কর্ণের প্রশস্ত বক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নিজের বক্ষদ্বয় কর্ণের শরীরে নিবিড়ভাবে মিশিয়ে দিয়ে ব্যগ্র মুখখানি তুললেন ওপরের দিকে। তারপর তাঁর পাকা আঙুরের মতন অধর ডুবে গেল কর্ণের ওষ্ঠের মধ্যে।

যুধিষ্ঠির আর দেখতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি চোখ ঢাকলেন। স্বর্গে এসে তাঁর এ-কী বিরাট পরাজয় হল! তিনি পারলেন না। ক্রোধে কম্পিত হচ্ছে শরীর, বুকের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলছে হিংসা। দেবতারা কি এই অবস্থায় তাঁকে দেখে ফেলেছেন? দেখুক!

নিতান্ত পৃথিবীর মানুষের মতন যুধিষ্ঠিরের চোখ দিয়ে টপটপ করে কান্না ঝরে পড়তে লাগল।

কুকুরের ভাষা

প্রিয় সুবিমল, আমি এখন কিছুদিন ধরে কুকুরের ভাষা শিখছি। আমার কুকুরটার নাম আইক। আমার বড়ো প্রিয়। আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের ডাকনাম আইক, কিন্তু তার সঙ্গে এর কোনো মিল খুঁজতে যাসনি। আইক নিছক একটা শব্দ। যেমন ইল্বল, আর্জেন্টিনা, হলুদ, প্রেম, স্ট্রাইক, ঘাড়, দেবদারু, টাকা—উঁহুঃ, টাকা নয়। টাকা শব্দ না, অর্থ।

মানুষ কুকুর পোষে—তারপর কুকুরকে মানুষের ভাষা শেখাতে চায়—এটা আমার হাস্যকর লাগে। মানুষের ভাষা বলতে ইংরেজি ভাষা। অনেক হাড় হাভাতে পরিবারেও লেড়িকুত্তাকে লোকে বলে, জনি, কাম হিয়ার, ভুলো, গো, গো, ? পাখি পুষলে তাকে শেখানো হয়, ময়না, বলো, রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ আর কুকুর পুষলে, জনি, জনি, সিট ডাউন, জনি !

ইংরেজি বা বাংলা যাই হোক, আমি মানুষের ভাষা মানুষের জন্য ও কুকুরের ভাষা কুকুরের জন্য আলাদা রাখতে চাই। বাঁশির সুর কিংবা বাঁশিওয়ালার হাতের নড়াচড়া, এর কোনটাতে সাপ মুগ্ধ হয়—সে সম্পর্কে আমি এখনও মীমাংসায় আসতে পারিনি।

আইক আমার সঙ্গে সঙ্গে, কখনো পাশে কখনো সামনে ছুটে যাচ্ছে, শিকল ছাড়া আমি নদীর ধার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলুম। বেশ দূরে, পাকুড় গাছটার কাছে আর একটা অপরিচিত কুকুর এক ঠ্যাং তুলে খুব ব্যস্ত—আইক ওটাকে দেখতে পায়নি। বস্তুত সেই কুকুরটার ঠ্যাং-তোলা ভঙ্গিটাই আমার কাছে আস্পর্ধা বলে মনে হয়, আমি অজান্তেই চেঁচিয়ে উঠলুম, আইক, লুঃ লুঃ লুঃ ! সঙ্গে সঙ্গে আইক আমার দিকে তাকাল, আমার চোখ অনুসরণ করে দেখতে পেলো সেই কুকুরটাকে—চাপা গর-র্-র্ শব্দ তুলে আইক আবার আমার দিকে। আমি ফের বললাম লুঃ লুঃ লুঃ—আইক বিদ্যুতের মতন ছুটে গেল। সেই কুকুরটার সাইজ ছোট ছিল, আইক তাকে ধরতে পারলে—যদি মাদি না হয়—তবে কামড়ে

ছিঁড়ে একেবারে শেষ করে ফেলত—কিন্তু সেই সাদা রঙের কুকুরটা, কোনো দৈবদৃশ্যের মতন হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়।

আমি চিন্তিত হয়ে পড়ি অন্য কারণে। আমি সর্বসমেত তিন রকম মানুষের ভাষা জানি, কিন্তু তার কোনোটাতেই লুঃ লুঃ জাতীয় শব্দ নেই। আইকও কখনো এত নরম শব্দ উচ্চারণ করে না। তবু আমি ওটা বললাম কেন, এবং সেই আইক বুঝলো কি করে? এও কি বাঁশীর সুর ও বাঁশীওয়ালার হাত নাড়ার ধাঁধা? অন্যমনস্কভাবে আমি নির্জন নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ছড়্ ছড়্ শব্দে একটু আগে অন্য কুকুরটা যা করছিল, সেই কাজ করতে লাগলুম, আইক খুব যেন আনন্দ পেয়ে আমার চারপাশে দৌড়ে দৌড়ে ঘুরতে লাগালো।

কুকুরের সবচেয়ে দোষ এই, সব সময়ে সে পায়ে পায়ে ঘোরে, কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ে না। অপ্রত্যাশিতভাবে তিনতলার চিলেকোঠায় শিখা এসে উপস্থিত দুপুরবেলা, বিব্রতভাবে বললো, ও আপনি এখানে? ভেবেছিলাম মন্দিরা এখানে থাকবে, মন্দিরা কোথায়? আমি তখন আইকের গা থেকে এঁটুলি বাছছিলাম, তাকে ছেড়ে খপ্ করে শিখার হাত চেপে ধরে বললুম, মন্দিরা নেই, কিন্তু আমি আছি! শোন—। শিখা ঈষৎ হাসি, কিছুটা ভয় ও বেশ খানিকটা অহঙ্কারের সঙ্গে বললো, কী, কী বলছেন? হাত ছাড়ুন। আমি ওর হাত ছেড়ে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে, প্রার্থনার ভঙ্গিতে আমার হাত জোড় করে, ওর ঠিক ভুরু সন্ধিতে স্থির দৃষ্টি রেখে, মানুষের কাতরতম কন্ঠে বললাম, শিখা, আমি তোমাকে চিনি না, আর সময় কত কম ।

শিখা মুখখানা একটু বাঁদিকে ঘুরিয়ে গর্জন তেলের মতন দুপুরের রোদ মাখলো! তারপর সংক্ষিপ্তভাবে বললো, তাহলে আমি চললাম!

কী কথার কী উত্তর! ও যেন আমার কথা শোনেইনি, কিংবা বুঝতে চায় না। আমি তৎক্ষণাৎ হাঁটু গেড়ে দাঁড়িয়ে দু'হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে আকর্ষণ করলাম, শিখা ছটফটিয়ে উঠলো, আমি ওর খোলা পেটের ফর্সা জায়গায়, ঠিক ওর নাভিতে—আজকাল নাভির নিচেই শাড়ি পরার রেওয়াজ—আমার মুখখানা চেপে ধরলাম, এলোমেলো ব্যস্ত হাতে পৌঁছবার চেষ্টা করলাম উরুর দিকে—মোটেই বেশি সময় নেই, ছাতে বড় মাসিমা যে কোনো মুহূর্তে বড়ি শুকোতে দিতে আসতে পারেন—তা বলে তো আর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলে না—খোলা, স্বাধীন যে কটা মুহূর্ত পাওয়া যায়, তা নষ্ট করার কোনো মানেই হয় না, শিখা নিজেকে সামলাবার কিংবা ছাড়াবার চেষ্টায় পড়ি-মরি, আর কুকুরটা—এই সময় উঠতে চাইলো আমার কোলে, ভুক-

ভুক-ভুক-ভুক—ঘেউ-উ-উ লম্বাভাবে ডেকে উঠলো, আমি কোনোক্রমে একটা হাত একটুক্ষণের জন্য ছাড়িয়ে আইকের মাথায় চাঁটি মেরে বললুম, এই এখন যা, যা বলছি। আইক শুনলো না, দুটো থাবা আমার ঘাড়ে তুলে দিতে চাইল— আইককে আমি খুন করে ফেললেও সে আমাকে কামড়াবে না জানি— কিন্তু ঐ সময়ে তার আদেখলেপনা অসহ্য—কিন্তু তখন আমার দুটি হাতের একটিকেও সামান্য ছুটি দেবার উপায় নেই, ভীষণভাবে খুঁজছি শিখাকে, যেন শিখার শরীরের ঠিক কোন জায়গায় শিখা তা না জানলে আমার চলবেই না। ওর বুকে, কোমরে, ঊরুতে আমার সেই খোঁজাখুঁজির নিশ্বাস, আর তখনও সেই রকমই হাসি, কিছুটা ভয় ও বেশ খানিকটা অহংকার মেশানো গলায় শিখা বলছে, ছাড়ুন, ছাড়ুন, আপনার পায়ে পড়ি, এ রকম জানলে ..লক্ষ্মীটি, প্লিজ, আপনি এ রকম অসভ্য, ছোটলোক—শিখার হাত থেকে সব বইগুলো ছড়িয়ে পড়েছে, বারবার চোখ ফিরিয়ে দেখছে—ছাদে আর কেউ আছে কিনা কিংবা দূরের কোনো বাড়ি থেকে দেখা যাচ্ছে কিনা—সেদিকে আমিও নজর রেখেছি, কিন্তু ঘাড়ের ওপর আইক এমন ঝটাপটি লাগিয়েছে যে অসহ্য—খুশি না রাগ—কিসে যেন সে গর-র-র শব্দ করে লাফাচ্ছে। শিখাকে মাটিতে শুইয়ে ওর আগুনের হলকাময় ঠোঁট দু'খানা আমার ঠোঁটে চেপে ধরে আমি অতি কষ্টে সার্কাসের খেলোয়াড়দের মতন শরীর বাঁকিয়ে আইককে একটা লাথি কষিয়ে গা থেকে ঝেড়ে ফেলেছি, ছিটকে পড়ে আইক একটু হিংস্রভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, ঘ্যাঁক। ঘেউ-উ, ঘেউ-উ, ঘেউ-উ। এত বিরক্ত লাগলো, আমিও একবার মুখ তুলে দাঁত খিঁচিয়ে বললাম ঘ্যাঁক। ঘেউ-উ, ঘেউ-উ, ঘেউ-উ। সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য ফল ফললো। আইক আমার দিকে কুতকুতে চোখ মেলে লেজ গুটিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সেই প্রথম আমি কুকুরের ভাষায় ফল পেলুম। আইক ছাতে ছুটোছুটি করতে করতে হঠাৎ আবার ডেকে উঠল, ভুক্, ভুক্, ভুক্। সাংকেতিক ডাক, এ ডাকের মানেও আমি বুঝলুম। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, দ্রুত উঠে শিখা পোশাক সামলে নিয়েছে, ক্রুদ্ধ ভ্রূ-ভঙ্গি করে শিখা বললো, অসভ্য কোথাকার, আমার সেফটিফিনটা কোথায় গেল, দিন খুঁজে দিন।

দোহাই সুবিমল, এর থেকে তুই বার্লিন ক্রাইসিসের কোনো রূপক খুঁজতে যাস না। কেন একথা বলছি, তার একটা কারণও আছে। আজ সকালবেলা দীনবন্ধু সরকার এসেছিলেন একটা লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে—আমি যদি আমার বন্ধু তপনকে ধরে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে (জানিস তো আমাদের তপন মুখ্যমন্ত্রীর কী রকম যেন ভাগ্নে) ওঁকে নিয়ে যাই, বাড়িতেই—অন্য কোথাও নয়—মুখ্য-

মন্ত্রীর সঙ্গে ওঁর কী একটা গূঢ় প্রয়োজন আছে—যা আমাকে বললেন না—
—তাহলে দীনবন্ধু সরকার ওঁর ঘাটশিলার বাগানবাড়িটা আমাকে এক মাসের জন্য বিনামূল্যে ব্যবহার করতে দেবেন। প্রস্তাবটা এমন চাঁছাছোলা ভাষায় আসেনি, আধঘন্টা আমড়াগাছির পর এই নির্যাস বেরিয়ে এলো। ঘাটশীলায় শুধু এক মাসের জন্য একটা বাগানবাড়ি পেয়ে আমি কী করবো একলা একলা? অথচ একেই তো লোভনীয় প্রস্তাব বলে, তাই না? হ্যাঁ কিংবা না কিছুই স্বীকার না করে আমি প্রস্তাবটা নিয়ে মনে মনে খেলা করতে লাগলুম। তপনকে এই অনুরোধ করা তো কিছুই না আমার পক্ষে। কিন্তু কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী মূল্য। কী দরকার ওঁর? ঘাটশিলার বাগানবাড়িতে একমাস—খুব বেশি কি? ভাড়া লাগবে না, কিন্তু একমাস সেখানে থাকার অন্যান্য খরচ কে দেবে? এর বদলে আমার ভাইয়ের চাকরিটা—

এই সময় আইক লেজ নাড়াতে নাড়াতে, ঘরে ঢুকেই দীনবন্ধু সরকারকে শুঁকতে লাগলো। দীনবন্ধু শিউরে উঠলেন, পাংশু মুখে বললেন, এটাকে সরিয়ে নিন্ মশাই, আমি কুকুর একদম সহ্য করতে পারি না।

আমি অভয়হাসি দিয়ে বললুম ও কিছু করবে না। আইক খুব ভালো ছেলে, মানে, ভালো কুকুর—

—আইক? একী অদ্ভুত নাম। ভদ্দরলোক মরতে বসেছেন, তার নাম নিয়ে এ রকম অশ্রদ্ধা—সত্যি ব্যাড টেস্ট।

—কোন্ ভদ্রলোক মরে গেছেন? আমি খাঁটি বিস্ময়েই জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমার সত্যিই খেয়াল ছিল না। এখানে কাগজ পাওয়া যায় না ঠিকমতন।

— আইসেনহওয়ার। নামটা বদলান। এ সব ঘরোয়া ব্যাপারে আমেরিকাকে টেনে আনবেন না।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, নাম বদলাবো? ঠিক আছে, আপনি এই কুকুরটাকে গোলাপ ফুল বলে ডাকুন না।

আমি আইকের বাকলস ধরে টেনে এনে আলতোভাবে ওর ঘাড়ে একটা চাপড় মারলাম। কুঁই কুঁই ঘড়র ঘড়র শব্দে আইক ডাকলো! প্রথমটা আমি বুঝতে পারিনি। তারপর আইক আমার কোলের ওপর দু'পা দিয়ে দাঁড়িয়ে সোজা আমার মুখের দিকে চেয়ে ফের ঐ শব্দ করলো। এবার আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, আইক বলছে, সাবধান, সাবধান, লোকটা ভালো না। লোকটা ভালো না। আমি মনে মনে বললুম, তাতো জানিই। কেই বা ভালো! আমি ভালো, তুই ভালো? অপ্রত্যাশিতভাবে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো

ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক। আইক চাকিতে ছুটে গিয়ে দীনবন্ধু সরকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। উনি লাফিয়ে উঠতে গিয়ে চেয়ার উল্টে পড়ে যেতেই—

নাঃ, বুঝলি সুবিমল, আমাকে কুকুরের ভাষা শিখতেই হবে। নইলে কুকুর পোষার কোনো মানে হয় না। ইতি তোর পরিতোষ।

প্রিয় পরিতোষ, তোর চিঠি পেলাম। শিখার সঙ্গে তুই যে ওরকম ব্যবহার করেছিস—তাতে আমি মর্মাহত হয়েছি। তোর কাছ থেকে ওরকম ব্যবহার আশাই করিনি। আমি ভেবেছিলাম, তুই 'ফেয়ার-গেম'-এ বিশ্বাসী। ঐরকম ছাদের ঘরে একা পেয়ে অতর্কিতে বর্বরের মতন ব্যবহার, তুই কি পাগল হয়ে গিয়েছিলি? মফস্বলে পড়ে আছিসই বা কেন? শিখাকে আমরা দু'জন ভালোবেসেছিলাম—তার মানে অবশ্যই এই নয় যে, শিখাকে আমরা দু'জনে সমান ভাগে ভাগ করে নেবো। কোনো মেয়ে রাজি হয় না, অন্তত প্রকাশ্যে। সুতরাং শিখাকে যে কেউ একজন চাই, তার জন্য আমি সসম্ভ্রম ধৈর্যে অপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু তুই খেলার নিয়ম মানিসনি। সব খেলারই একটা নিয়ম আছে, নইলে সেটা হুটোপুটি হয়ে যায়। জীবনটা হুটোপুটি নয়। অবশ্য তুই যতখানি বাড়িয়ে লিখেছিস—অতটা কিছুই হয়নি। শিখার সঙ্গে এর মধ্যে আমার একদিন দেখা হয়েছিল। ও যা বললো, তাতে, বুঝলুম, তুই চিলেকাঠায় ওকে একা পেয়ে ওর হাত ধরে টেনেছিলি, ওর বুকে হাত দেবার চেষ্টা করেছিলি—এই সময় কুকুরটা খুব চেঁচাতেই মাসিমা ছুটে আসেন। শিখা খুব আঘাত পেয়েছে। শুনে আমারও রক্ত গরম হয়ে গিয়েছিল—ভাগ্যিস সে সময় তুই সামনে ছিলি না। নিজেকে এখনও সামলাবার চেষ্টা কর। ইতি সুবিমল

সুবিমল, যাচ্চলে, এসব কী লিখেছিস্! তুই আমার চিঠিটা কিছুই বুঝতে পারিসনি, দেখছি! শিখার কথা এর মধ্যে এলো কী করে? আমি তো তোকে লিখেছিলাম কুকুরের ভাষা সম্পর্কে! শিখার ব্যাপারটা তো আর কিছুই না, একটা উদাহরণ মাত্র। শিখার বদলে যে কেউ হতে পারতো—ছাদের ঘরে নির্জন দুপুরে, জ্বলন্ত সূর্য আর অর্ধলুপ্ত চাঁদ এক আকাশে আড়াআড়ি —তখন যদি একটি মেয়ে আসে, মনে কর পাঁচ মিনিট আঠারো হাজার বুদ্বুদ— এই সামান্য সময়ে শরীর ছাড়া আর কিছুতেই জীবন খোঁজাখুঁজি সম্ভব নয়—এমনকি কোনো সীমান্ত সমস্যাও পাঁচ মিনিটে মেটে না, তখন যদি আমি মেয়েটির যে-কোনো মেয়েই হোক্ না কেন, পোশাক না খুলেও তার সমস্ত শরীরটা স্পর্শ করে বিদ্যুতের তরঙ্গ পাই, এবং সেও খেলাচ্ছলে আমাকে বাধা

দেয়—এতে পৃথিবীর কারুরই কোনো ক্ষতি হয় না, একটি পালকও খসে না, মনুষ্য-সমাজে একটু চিড়ও খায় না—কিন্তু দুটো শরীর টনকো হয়ে ওঠে—পঞ্চাশ দিনের ব্যর্থতা ঐ পাঁচ মিনিটে মিলিয়ে যায়—আইককে এই কথাটা আমি বোঝাতে পেরেছিলুম, কিংবা ও আমাকে বুঝিয়েছিল—সেই বিষয়েই আশ্চর্য হয়ে তোকে লিখেছিলুম। এর মধ্যে শিখাকে অপমান করা কিংবা তোকে রাগানোর প্রশ্ন আসে কিসে?

হ্যাঁ, যা বলছিলুম, কুকুরের ভাষা এর মধ্যে আমি অনেকটা শিখে গেছি। খুব শক্ত না, বুঝলি। স্বয়ং ধর্ম কুকুরের ছদ্মবেশ নিয়ে ঠিকই করেছিলেন। কুকুরের চরিত্র ধর্মের মতনই সরল। মানুষের ষড়্‌রিপুর বদলে কুকুরের রিপু মাত্র তিনটি। কুকুর-ভাষায় নবরসের বদলে রসও মাত্র তিনটি। প্রত্যেক কুকুরই এক্সজিস্টটেনশিয়ালিস্ট। ওরা ব্যঞ্জনবর্ণের চেয়ে স্বরবর্ণ বেশি ব্যবহার করে। কাঁধে বোঁচকাওয়ালা যে-কোনো লোককেই কুকুর ঘোরতর অপছন্দ করে। কুকুর অশরীরীদের দেখতে পায়। দেখবি, একটা কুকুর চুপচাপ বসে আছে, হঠাৎ এক ঝলক হাওয়া বয়ে গেল—আর কোনো পশু-প্রাণী ধারে কাছে নেই—তবু কুকুরটা তারস্বরে ডেকে উঠলো। এসব কথা শুনে তোর কি কিছু মনে পড়ছে? আইক এত ভালো কুকুর যে, আমাকে ওর ভাষা শেখাবার বদলে আমার কাছ থেকে অতিরিক্ত কোনো প্রশ্রয় দাবি করে না। মাঝে মাঝে আমি ওকে আমার খোলা পা চাটতে দিই। তাতেই খুশি। আজ এই পর্যন্ত।—

তোর পরিতোষ

প্রিয় পরিতোষ,

ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক। ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ। ঘেউ-উ-উ-উ, ঘেউ-উ-উ।

গর র্-র-র-র-র-ঘেউ ঘেউ

ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ

গর-র্-র্র্ ঘ্যাঁক্ ঘ্যাঁক্

ও-ও-ও ঘাউ ঘাউ ঘাউ।

ঘা-ঘা-ঘা-ঘাউ। ঘা-ঘা-ঘা-ঘাউ।

ইতি—সুবিমল

প্রিয় সুবিমল, তোর চিঠি পড়ে আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে এরকম ভুল বোঝাবুঝি সত্যিই খুব খারাপ। তুই যে লিখেছিস আমি তোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, তার কোনো মাথামুণ্ডুই আমি

খুঁজে পেলাম না। প্রথমত, তোর সঙ্গে আমি কোনোদিন কোনো শর্ত করিনি। করে থাকলেও, সংবিধানের ১৪৭ ধারার গ উপশাখা অনুযায়ী হোয়েন এ নেশান্ অর এ সভরেন স্টেট—অর্থাৎ আমাদের শাস্ত্র অনুযায়ী, প্রেমে ও রণে যে শর্ত মানে, সে নির্বোধ। আমি অবশ্য এ দুটোর কোনোটাতেই জড়িয়ে পড়িনি, কিন্তু ঐ যে পাঁচ মিনিট সময়ের কথা বলেছিলাম, সেই মহাদুর্লভ পাঁচ মিনিটের মধ্যে নিহিত আছে এই বস্তুবিশ্বের নির্বাচিত সত্য। অর্থাৎ, 'পারচান্স হি ফর হুম দিস বেল টলস্, মে বি সো ইল, অ্যাজ দ্যাট হি নোজ নট ইট টলস্ ফর হিম,'—আশা করি এ সব তোর জানা আছে, আমি মৃত্যুর কথা বারবার মনে করিয়ে দিতে চাই না। মনে পড়লে, তুই বুঝতে পারতি, নির্জন ছাদে ঐ একই আকাশে বিরাজমান জ্বলন্ত সূর্য ও অর্ধলুপ্ত চাঁদের দুপুরে—তুই কিংবা আমি যে হোক, শিখা কিংবা লেখা কিংবা ঝরণা কিংবা শান্তা, যে-হোক, ওই পরম পাঁচ-মিনিটে একটা ভাষা শিক্ষা করা দরকার। আমি হঠাৎ সেই ভাষা শিখেছিলাম—শিখার গায়-টায় হাত দেওয়া অবান্তর—ও তো একটা মিডিয়াম মাত্র। আচ্ছা বাবা, আমি কথা দিচ্ছি, এখন থেকে আমি চাঁদ কিংবা সূর্যকে নিয়ে ভাষা-শিক্ষা চালাবো, আমি জানি শরীরের মধ্যে ওদেরও পাওয়া যায়। আর একটা কথা, মাঝরাতে মানুষ যখন ভয় পায়, তখন তার সেই ভয়ের মধ্যে একটা কুকুরের ডাক মিশে থাকে। ইতি—তোর পরিতোষ

চিঠিখানা খামে মুড়ে সুবিমলের ঠিকানা লিখে পরিতোষ বাইরে বেরিয়ে এলো। হুইশ্ল দিতেই আইক ছুটে এলো। সামান্য দূরে লালরঙা চিঠির বাক্স, সেখানে চিঠি ফেলে পরিতোষ এগিয়ে গেল হালকা পায়ে। বাচ্চা ঘোড়ার মতন ফুরফুরে গতিতে ছুটছে আইক।

মাঠ পেরিয়ে এলো একটা নদীর ধারে। নদীর ওপর ঝুঁকে আছে হেমন্তের সন্ধ্যা। নির্জনতারও একটা শব্দ আছে, সেই শব্দে চরাচর আচ্ছন্ন। কদমগাছ থেকে কয়েকটা কদম ফুল পেড়ে নিয়ে আইক আর পরিতোষ লোফালুফি খেলতে লাগলো। দূরে একটি মেয়ে হাই-ল্যান্ডার-চেক রঙা ব্যাগ নিয়ে একটু ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটছে। পরিতোষ বিস্মিতভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, আরে, ঐ তো শিখা! মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে, থেমে একটা গাছের তলায় দাঁড়ালো। আইক আওয়াজ করলো গর-র-র, ঘাউ, ঘাউ। পরিতোষ মৃদু হেসে বললো, কী করে বুঝলাম? এসো প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি। তখন আইক আর পরিতোষ, পরিতোষ আর আইক, দু'জনেই ছুটলো, কখনো এ আগে, কখনো ও আগে।

মাথার পিছনে হাত দুটি রেখে সাঁওতালনীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। আইক ও পরিতোষ দু'জনে কাছে এসে মেয়েটির বগল ও নিতম্ব, বুক ও ঘাড় শুঁকে দেখলো। আনন্দে ঘন ঘন লেজ নাড়তে লাগলো আইক। পরিতোষ জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোন ট্রেনে এলে? মেয়েটি নিচু হয়ে আইকের লোমশ কাঁধে হাত রেখে বললো, আইক আমাকে খুব ভালোবাসে।

পরিতোষ মেয়েটিকে আবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি ঋণ চাও? তোমাকে আমি অর্ধেক পৃথিবী ঋণ দিতে পারি।

মেয়েটি শাড়িটা গাছ-কোমর করে বাঁধলো। আর দৃঢ় স্তন দুটি কচি বাঁধাকপির মতন স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সে আইকের দিকে চেয়ে জিভ ও ঠোঁটে শব্দ করলো, উস্, চু, চু, চু—। আইক ডেকে উঠলো, ঘাউ ঘাউ ঘাউ—পরিতোষ চাপা গর-র—গর-র শব্দ করতেই আইক শূন্যে লাফিয়ে উঠলো প্রবলভাবে, মাটিতে পড়েই শিখার জানুর কাছে এক পলক হুটোপুটি করে আবার লাফিয়ে উঠলো পরিতোষ মেয়েটির টিনখোলা মাখনের মতন তক্‌তকে ঘাড়ের দিকে চেয়ে তার সব ক'টা চোখের পল্লব কাঁপিয়ে হাসলো। তারপর মেয়েটির হাত ধরে বললো, এসো! মেয়েটি নাচের ভঙ্গিতে দ্রুত ঘুরে যেতেই পরিতোষ স্প্যানিশ নর্তকের মত সাবলীল ভঙ্গিতে তার কোমর ধরে হেলিয়ে নাচের আর একটি মুদ্রা দেখিয়ে বললো, আমি তোমাকে চিনি। অন্তত এই মুহূর্তে—

তারপর ওরা তিনজনে নাচতে লাগলো। সন্ধেবেলার সূর্য থেকে মোটা-সোটা লাল শিখা নেমে আসছে, মেয়েটির শাড়ি উড়ছে ঘাগরার মতন, পরিতোষ আর আইক ঘুরছে তার দু'পাশে, নদী থেকে উঠে আসছে আলো-ছায়াময় হাওয়া, গাছের প্রত্যেকটি পাতার ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে শেষ রঙ ঘরে ফেরার ডাকে ঝঙ্কৃত হয়ে গেল নিখিল-বিশ্বের আবহ তাল, এইমাত্র ওরা একটা দমকা ঘূর্ণি ধুলোর ঝড়ে ঢেকে গেল।

সখী, আমার

সখী, আমার তৃষ্ণা বড় বেশি, আমায় ভুল বুঝবে ?
শরীর ছেনে আশ মেটে না, চক্ষু ছুঁয়ে আশ মেটে না
তোমার বুকে ওষ্ঠ রেখেও বুক জ্বলে যায়, বুক জ্বলে যায়
যেন আমার ফিরে যাওয়ার কথা ছিল, যেন আমার
দিঘির পাড়ে বকের সঙ্গে দেখা হলো না !
সখী, আমার পায়ের তলায় সর্ষে, আমি
বাধ্য হয়েই ভ্রমণকারী
আমায় কেউ দ্বার খোলে না, আমার দিকে চোখ তোলে না
হাতের তালু জ্বালা ধরায়, শপথগুলি ভুল করেছি
ভুল করেছি
মুহুর্মুহু স্বপ্ন ভাঙে, স্বপ্নে আমার ফিরে যাওয়ার
কথা ছিল, স্বপ্নে আমার স্নান হলো না
সখী, আমার চক্ষু দুটি বর্ণকানা, দিনের আলোয়
জ্যোৎস্নাধাঁধা
ভালোবাসায় রক্ত দেখি, রক্তনেশায় ভ্রমর দেখি
সুখের মধ্যে নদীর চড়া, শুকনো বালি হা হা তৃষ্ণা
হা হা তৃষ্ণা
কীর্তি ভেবে ঝড়ের মুষ্টি ধরতে গেলাম, যেন আমার
ফিরে যাওয়ার কথা ছিল, যেন আমার
স্বরূপ দেখা শেষ হলো না।

কবিতা ঃ এক

ছায়া

হিরণ্ময়, তুমি নীরার মুখোমুখি দাঁড়িয়ো না,
আমি পছন্দ করি না
পাশে দাঁড়িয়ো না, আমি পছন্দ করি না
তুমি নীরার ছায়াকে আদর করো।
হিরণ্ময়, তোমার দিব্য বিভা নেই, জামায় একটা
বোতাম নেই, ছুরিতে হাতল নেই,
শরীরে এত ঘাম, রক্তে এত হর্ষ
চোখে অস্থিরতা
এ কোন্ ঘাতকের বেশে তুমি দাঁড়িয়েছো ?
ঘাতক হওয়া তোমাকে মানায় না
তুমি বরং প্রেমিক হও
সামনে দাঁড়িয়ো না, পাশে এসো না
তুমি নীরার ছায়ার মুখ চুম্বন করো।

তোমাকে ছাড়িয়ে

জাদুদণ্ড তুলে বললে, এখন বিদায়।
অমনি ঘুরে গেল মঞ্চ, রণক্ষেত্রে এলোমেলো ছুটির বাতাস
নদীর রেখায় মেশে আকাশের ডালপালা, ঐখানে হিরণ্যাভ আলো
শ্রাবণের অপরাহ্ণ মহিষের ঘণ্টাধ্বনি স্বাগত জানালো!
আমার চোখের নিচে কালো দাগ, কিছু কিছু স্বপ্ন-পদাঘাত
ব্যাণ্ডেজের মধ্যে একটা পোকা ঢুকলে যত অসহায়
তার চেয়ে কিছু কম, চিঠি হারানোর চেয়ে বেশি
অমলিন দুঃখ ছায়া তোমাকে ছাড়িয়ে বহুদূরে ভেসে যায়।

শব্দ যাকে ভাসায়

শব্দ যাকে ভাঙে তাকে তুলোর মতো ভাঙে
ভাঙতে ভাঙতে ওড়ায় তাকে ধূপের মতো পোড়ায়
নীলিমাভুক প্রেতের মতো ফেরে স্মৃতির ছায়া
চোখের মধ্যে লাল ধুলোর প্রবাস উঁকি মারে
ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় শরীরহীন জ্বালা
শব্দ যাকে খায় তাকে নদীর মতন খায়।

দ্যাখো দ্যুলোক শুয়ে থাকে যৎসামান্য রোদে
এমন মায়া হাতে ছুঁলেই ভালোবাসার আঠা
আবার ফের পলক ফেললে কাচের মতো জল
জলের মধ্যে নারী এবং নারীর চোখে আগুন
কিংবা সবই দৃষ্টিভুলো শব্দ শব্দ খেলা
শব্দ যাকে ভাসায় তাকে সর্বনাশে ভাসায়।

ঘুরে বেড়াই

তোমার পাশে, এবং তোমার ছায়ার পাশে ঘুরে বেড়াই
তোমার পোষা কোকিল এবং তোমার মুখে
বিকেলবেলা রোদের পাশে ঘুরে বেড়াই
তোমার ঘুমের এবং তোমার যখন-তখন অভিমানের
অর্থ খুঁজি অভিধানে
ঘুরে বেড়াই, ঘুরে বেড়াই
গাছের দিকে মেঘের দিকে বেলাশেষের নদীর দিকে
পথ চেনে না পথের মানুষ
ঘুরে বেড়াই ঘুরে বেড়াই
মেলা-শেষের ভাঙা উনুন ছাইয়ের গাদায়
ল্যাজ গুটানো একলা কুকুর
পুকুর পাড়ে মাটির খুরি, সবুজ ফিতে
ঘুরে বেড়াই ঘুরে বেড়াই
তোমার পাশে এবং তোমার ছায়ার পাশে
ঘুরে বেড়াই

বিদেশে

ঠোঁট দেখলেই বুঝতে পারি, তুমি এদেশে বেড়াতে এসেছো
ঐ গ্রীবা, ঐ ভুরুর শোভা এদেশী নয়—
কপালে ঐ চূর্ণ অলক, নিমেষ-হারা দৃষ্টি পলক
ঐ মুখ, ঐ বুকের রেখা এদেশী নয়!
বৃষ্টি থামা বিকেলবেলায় পথ ভরেছে শুকনো কাদায়
আমরা সবাই কাতর, বুকে পাথর
তোমার পা মাটি ছুঁলো না
তোমার হাসি পাখি-তুলনা
তুমি বললে, আবার বৃষ্টি নামুক!
আমরা সবাই রূপ চেয়েছি
ধর্ম অর্থ কাম চেয়েছি
তোমার হাতে শুধু দু' মুঠো বালি!
রুক্ষ দিনের মতন আমরা রুক্ষতাময় তৃপ্তিহারা
আগুন থেকে জ্বলে আগুন, চক্ষু থেকে অগ্নিধারা
তুমি হাওয়ায় শূন্য ফসল দেখতে পেয়ে
বাজালে করতালি।
এই পৃথিবী বিদেশে তোমার
কতদিনের জন্য এলে?
বেড়াতে আসা, তাই কি মুখ অমন সুখ-ছোঁয়া!
যদি তোমায় বন্দী করি,
মুঠোর মধ্যে ভ্রমর ধরি
দেবতা-রোষে হবো ভস্ম ধোঁয়া?

সারাটা জীবন

আমাকে দিও না শাস্তি, শিয়রের কাছে কেন এত নীল জল
কোথাও বোঝার ভুল ছিল, তাই ঝড় এলো সন্ধের আকাশে
আমাকে দিও না শাস্তি, কেন ফেলে চলে গেলে অসমাপ্ত বই
চতুর্দিকে এত শব্দ, শব্দ গিরিবক্ষে ঝোলে অদ্ভুত শূন্যতা
আকাশের গায়ে গায়ে কালো তাঁবু, জগতের সব দীন-দুঃখী
শুয়ে আছে
একজন শুধু বাইরে, তুমি তার একাকিত্ব তুলে নাও মরাল
গ্রীবার মতো হাতে
আমাকে দিও না শাস্তি, দাও বাল্য-প্রেমিকার স্নেহ,
সারাটা জীবন আমি
অবাধ্য শিশুর মতো প্রশ্রয় ভিখারি।

তোমার কাছেই

সকাল নয়, তবু আমার
প্রথম দেখার ছটফটানি
দুপুর নয়, তবু আমার
দুপুরবেলা প্রিয় তামাশা
ছিল না নদী, তবুও নদী
পেরিয়ে আসি তোমার কাছে
তুমি ছিলে না তবুও যেন
তোমার কাছেই বেড়াতে আসা !

শিরীষ গাছে রোদ লেগেছে
শিরীষ কোথায়, মরুভূমি !
বিকেল নয়, তবু আমার
বিকেলবেলায় ক্ষুৎপিপাসা
চিঠির খামে গন্ধবকুল
তৃষ্ণা ছোটে বিদেশ-পানে
তুমি ছিলে না, তবুও যেন
তোমার কাছেই বেড়াতে আসা !

দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি

দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি বারান্দায়
অহঙ্কার তোমাকে মানায় না
তুমি কি যে-কোনো নারী
যে-কোনো বারান্দা থেকে
সন্ধ্যার শিয়রে
মাথা রেখে আছো ?
তুমি তো আমারই শুধু, দূর থেকে দেখা
শুকনো চুল, ভিজে মুখ, করতলে মসৃণ চিবুক
তুমি নারী, অহঙ্কার তোমাকে মানায় না—
যে তোমাকে দেখে, সে-ই তোমাকে সুন্দর করে
দ্রষ্টা যে, ঈশ্বরও সে।
তোমার নিঃসঙ্গ রূপ মেশে বাতাসের হাহাকারে।

অচেনা

তোমার হাতে গোলাপ, তুমি ফুলের কাছে ঋণী রইলে
তোমার হাতে গোলাপ, তুমি ফুলের কাছে ঋণী রইলে
বাসের অমন ভিড়ের মধ্যে মেয়েটা
আমাকে এক লাইন কবিতা দিয়ে হঠাৎ নম্র-নেত্রপাতে
বেলগাছিয়ায় নেমে গেল রক্ত গোলাপ হাতে
বাকিটা পথ রইলো শুধু ঘামের গন্ধ, ব্রিজের ধুলো
তোমার হাতে গোলাপ, তুমি আমার কাছে ঋণী রইলে।

ভালোবাসা

শরীর ছেলেমানুষ, তার কত টুকিটাকি লোভ
সব সাঙ্গ হলে পর, ঘুম আসবার আগে
নতুন টাকার মতন সরল নিরাবরণ
দুখানি শরীর
বিছানায় অবিন্যস্ত।
ঠাণ্ডা বুকের কাছে স্বেদময় মুখ
উরুর উপরে আড়াআড়ি ফেলে রাখা
এইমাত্র লোভহীন হাত
চরাচরে তীব্র নির্জনতা, এই তো সময় ভালোবাসার—
ভালোবাসা মানে ঘুম, শরীর-বিস্মৃত পাশাপাশি
ঘুমোবার মতো ভালোবাসা।

সপ্তপদী এবং আরো এক লাইন

এত ছোট হাতে কী করে ধরেছ বিশ্ব,
কী করে নিজেকে সাজালে আকাশী নীলে ?
অথচ আমি যে কত দীন কত নিঃস্ব
শুধু লুকোচুরি খেলেছি কথার মিলে।
তোমার স্বপ্ন, সুখের অমরাবতী
আমার হৃদয়ে অতল অন্ধ পাতাল,
তবুও দুজনে মিল হলো সম্প্রতি

ফর্সা দেয়ালে শিকারী কীটের জাল।

দেখা

—ভালো আছো ?

– দেখো মেঘ, বৃষ্টি আসবে !

—ভালো আছো ?

—দেখো ঈশান কোণের কালো, শুনতে পাচ্ছো ঝড় ?

—ভালো আছো ?

—এইমাত্র চমকে উঠলো ধবধবে বিদ্যুৎ।

– ভালো আছো ?

—তুমি প্রকৃতিকে দেখো

—তুমি প্রকৃতিকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছো

—আমি তো অণুর অণু, সামান্যের চেয়েও সামান্য

—তুমিই তো জ্বালো অগ্নি, তোলো ঝড়, রক্তে এত উন্মাদনা

—দেখো সত্যিকার বৃষ্টি, দেখো সত্যিকার ঝড়

– তোমাকে দেখাই আজও শেষ হয়নি, তুমি ভালো আছো ?

অপরাহ্নে

তোমার মুখের পাশে কাঁটাঝোপ, একটু সরে এসো
এপাশে দেয়াল, এত মাকড়সার জাল।
অন্যদিকে নদী, নাকি ঈর্ষা ?
আসলে ব্যস্ততাময় অপরাহ্নে ছায়া ফেলে যায় বাল্যপ্রেম
মানুষের ভিড়ে কোনো মানুষ থাকে না
অসম্ভব নির্জনতা চৌরাস্তায় বিহ্বল কৈশোর
এলোমেলো পদক্ষেপ, এতদিন পর তুমি এলে ?
তোমার মুখের পাশে কাঁটাঝোপ, একটু সরে এসো।

দেখা হবে

দেখা হবে চৌরাস্তায় বুধবার বিকেল পাঁচটায়
অথবা যদি না যেতে পারি
দেখা হবে নদীতীরে বালার্ক ঊষায়
কামানের ঘোর শব্দ যখন জোয়ার-স্রোত ভাঙে
অথবা যদি না যেতে পারি
দেখা হবে স্কুল-পথে যেমন শৈশবে
বারবার দেখা হয়ে যেত
একটি চাহনি কিংবা দু'পলক হাসির ঝিলিক
দেখা হবে অশ্লেষায়, পরাজিত ঘোর অবেলায়
দেখা হবে শৃঙ্খলিত দিনে, কিংবা নিকষ রাত্রিতে
অথবা যদি না যেতে পারি
যদি সব পথ জুড়ে খাড়া থাকে উল্লুকের পাল
প্রলয়ের শেষে দেখা হবে।

ভালোবাসা

ভালোবাসা নয় স্তনের ওপরে দাঁত ?
ভালোবাসা শুধু শ্রাবণের হা-হুতাশ ?
ভালোবাসা বুঝি হৃদয় সমীপে আঁচ ?
ভালোবাসা মানে রক্ত চেটেছে বাঘ !
ভালোবাসা ছিল ঝরনার পাশে একা
সেতু নেই তবু অক্লেশে পারাপার
ভালোবাসা ছিল সোনালি ফসলে হাওয়া
ভালোবাসা ছিল ট্রেন লাইনের রোদ।
শরীর ফুরোয় ঘামে ভেসে যায় বুক
অপর বাহুতে মাথা রেখে আসে ঘুম
ঘুমের ভিতরে বারবার বলি আমি
ভালোবাসাকেই ভালোবাসা দিয়ে যাবো।

কবিতা ঃ ষোল

ইচ্ছে হয়

এমনভাবে হারিয়ে যাওয়া সহজ নাকি
ভিড়ের মধ্যে ভিখারি হয়ে মিশে যাওয়া ?
এমনভাবে ঘুরতে ঘুরতে স্বর্গ থেকে ধুলোর মর্ত্যে
মানুষ সেজে এক জীবন মানুষ নামে বেঁচে থাকা ?
রূপের মধ্যে মানুষ আছে, এই জেনে কি নারীর কাছে
রঙের ধাঁধা খুঁজতে খুঁজতে টনটনায় চক্ষু-স্নায়ু।
কপালে দুই ভুরুর সন্ধি, তার ভিতরে ইচ্ছে বন্দী
আমার আয়ু, আমার ফুল ছেঁড়ার নেশা
নদীর জল সাগরে যায়, সাগরজল আকাশে মেশে
আমার খুব ইচ্ছে হয় ভালোবাসার
মুঠোয় ফেরা !

স্বপ্ন নয়

সুগন্ধ নারীর পাশে শুয়ে থাকা স্বপ্ন নয়
বাইরে বর্ষার কলরোল
কানের লতির পাশে ঠোঁট এনে
পুরোনো কাব্যের পঙ্‌ক্তি বলাবলি হলো
স্বপ্ন নয়
বাইরে ক্ষুধা ও মৃত্যু চোখাচোখি করে
হাতের আঙুল নিয়ে খেলা
দুরন্ত আঙুল কভু ছুঁয়ে দেয় স্তন,
স্বপ্ন নয়

বাইরে দুঃখের মতো মিহিন বাতাস
জীবন এমন ছিল, আজো নেই তোমার আমার ?
ভুলে থাকি বহু শোক, ছড়ানো কুন্তলে যত অন্ধকার
স্বপ্ন নয়
বাইরে যখনই আসি, বহু মিথ্যে প্রিয় সঙ্গী হয়।

দ্বিধা

ভালোবাসা ছিল তাই আমি অত ঘৃণায়
ডুব দিতে ভয় পাইনি
মানুষ মেরেছি রক্ত মোছার আঁচল
সামনেই ছিল, সঞ্জীবনীর আয়না
কে কাকে দেখায়, কার মুখ কার ওষ্ঠ
উষ্ণ ললাট চায় না—
ঘোরে ধাতু, ঘ্রাণ শাসন করেন হেডিস
পাহাড় চূড়ায় দুঃখের কাছে যাইনি
ভালোবাসা ছিল নাকি ঘৃণা ছিল ? এখন
ঠিক মনে নেই, ঠিক যেন মনে পড়ে না।

সময় খোলেনি

দরজা খুলেছো তুমি, সময় খোলেনি
চোখ থেকে খসে গেল শেষ অহংকার
কেন বুক কাঁপে, কেন চক্ষু জ্বালা করে
তারও ইতিহাস আছে, যেমন যৌবন
কাঁটাবনে খুঁজে এলো বিখ্যাত অমিয়—
দরজা খুলেছো তুমি, সময় খোলেনি।
আরও কাছাকাছি এলে বুকে লাগে বুক
তোমার ঊরুর কাছে আমার পৌরুষ
সম্রাটত্ব শেষ করে ভিখারি সেজেছে
এর পরও কথা থাকে, শূন্য প্রতিধ্বনি
যেমন মৃত্যুকে বলে তিলেক দাঁড়াও!
দরজা খুলেছো তুমি সময় খোলেনি।